পরিবেশ সংরক্ষণে নীতি ও নৈতিকতা

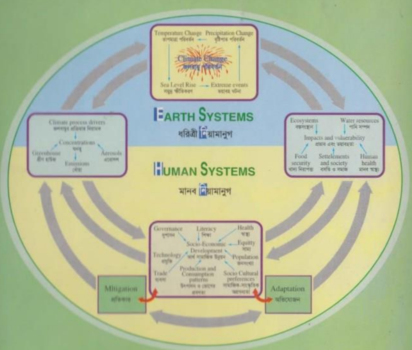

- ড. এ এইচ এম মোস্তাইন বিল্লাহ

পরিবেশ সংরক্ষণে নীতি ও নৈতিকতা

ড. এ এইচ এম মোস্তাইন বিল্লাহ

আধুনিক প্রকাশনী
ঢাকা

www.nagorikpathagar.org

প্রকাশনায়
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত
আধুনিক প্রকাশনী
২৫ শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৭১১৫১৯১, ৯৩৩৯৪৪২
ফ্যাক্স ঃ ৮৮-০২-৭১৭৫১৮৪

ISBN-978-984-416-040-8

কপিরাইট © লেখক

আঃ প্রঃ ৪১৪

১ম প্রকাশ ঃ জানুয়ারী	২০১১
সফর	১৪৩২
মাঘ	১৪১৭
জানুয়ারী	২০১১

বিনিময় মূল্য ঃ ২৩০.০০ টাকা

মুদ্রণে
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত
আধুনিক প্রেস
২৫ শিরিশদাস লেন,
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

PORIBESH SHONGROKSHONA NITI-O-NOYTIKOTA by Dr. A H M Mostain Billah, Published by Adhunik Prokashani, 25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100

Sponsored by Bangladesh Islamic Institute
25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.

Price : Taka 230.00 Only.
4.00 US $

www.nagorikpathagar.org

উৎসর্গ

পরিবেশ দূষণে ক্ষতিগ্রস্থ
সকল মানব ও প্রানীকূলকে

www.nagorikpathagar.org

পরিবেশ সংরক্ষণে নীতি ও নৈতিকতার প্রেক্ষাপট

বর্তমান বিশ্বে সবচেয়ে আলোচিত বিষয় জলবায়ু পরিবর্তন, বায়ু দূষণ, পানি দূষণ, উপকূলীয় পরিবেশ সংরক্ষণ সর্বোপরি পরিবেশ সংরক্ষণ ও টেকসই উন্নয়ন। এ নিয়ে বিশ্বের বড় বড় বিজ্ঞানীরা ছাড়া ও নীতিনির্ধারক, রাজনীতিবিদ, সমাজবিদ, অর্থনীতিবিদ, রাষ্ট্রনায়ক, সুশীল সমাজের সদস্য, কৃষককুল, ব্যবসায়ী, পেশাজীবীসহ সর্বস্তরের জনগোষ্ঠী ভীষণভাবে উদ্বিগ্ন। সৃষ্টির উষালগ্ন থেকে গত অর্ধশতাব্দীতে পৃথিবীর সবচেয়ে বেশী উন্নয়ন হয়েছে প্রযুক্তি, জ্ঞান বিজ্ঞান, কৃষি, সেবাখাত, শিল্প-সাহিত্যের কমতি নেই কোন সেক্টরেই। উন্নয়নের চরম বিকাশের ফলে উৎপাদনের উপকরণের আকাশচুম্বী চাহিদা সৃষ্টি হয়েছে, বেড়েছে প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারের ও আহরণের যেমন বিদ্যুৎ, জ্বালানী, তেল, গ্যাস, কয়লা, পারমানবিক শক্তি, পানি, বায়ু, মাছ, গাছ, বন, গুল্মলতা, উপকূলীয় সম্পদ, জীববৈচিত্র্য, মোট কথা সকল প্রকার জৈব ও অজৈব সম্পদের। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিসহ উন্নয়নের অপ্রতিরোধ্য অগ্রযাত্রা ও সীমাহীন সাফল্যের ফলে মানুষের জীবনের স্বাচ্ছন্দ্যের চাহিদা তাদের এত দ্রুত প্রলোভিত ও প্রতিযোগী করে তুলেছে যে, তারা প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষার বিষয়টি বিবেচনায় রাখতে পারেনি। কারণ আজ হতে দু দশক আগেও পৃথিবীর নির্মল পরিবেশ ও প্রাকৃতিক সম্পদের ভাণ্ডার অফুরন্ত বলে বিবেচিত হত। দ্রুত উন্নয়নের ফলে হুমকির মুখে প্রাকৃতিক পরিবেশ, বিনষ্ট হচ্ছে খাদ্য চক্র (Food Chain), উষ্ণ হয়ে উঠছে ধরণী, ব্যাপক পরিবর্তন আসছে জলবায়ুতে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও পরিবেশ বিপর্যয়ের ফলে মারাত্মক ঝুঁকির মুখে আজ বিশ্বব্যাপী উন্নয়নের জোয়ার।

উন্নয়নের এই গতিধারাকে টেকসই করার জন্য বিশ্বব্যাপী বিজ্ঞানী, নীতি নির্ধারকগণ ও সকল পেশাজীবী সর্বসম্মতভাবে ঐক্যবদ্ধ। চলছে ব্যাপক ও বিস্তর গবেষণা, পর্যালোচনা, ডায়লগ, স্বাক্ষরিত হচ্ছে কনভেনশনাল, প্রটোকল, ট্রিটি আরো নানা ধরনের আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক চুক্তি এবং সমঝোতা স্বাক্ষর।

এত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও এ পৃথিবীর জনগোষ্ঠী আজো নিশ্চিত হতে পারেনি বিশ্বব্যাপী পরিবেশ বিপর্যয় ঠেকাতে। তাই সময় এসেছে আত্মোপলব্ধির, আত্মপর্যালোচনার। বিশ্বব্যাপী এতো তোড়জোড়ের মধ্যেও পরিবেশ বিপর্যয়ের বহুমুখী উদ্যোগের আশানুরূপ ফল পাওয়া যাচ্ছে না, এর কারণ উদঘাটনের প্রচেষ্টাই ছিল এই বইটির মূল প্রতিপাদ্য বিষয়।

বিশ্বের উন্নয়ন ও জ্ঞান বিজ্ঞানের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, পৃথিবীর জন্মলগ্ন থেকে গত ৫০ বৎসরে জ্ঞান বিজ্ঞান ও উন্নয়নের ইতিহাস অতীতের সকল রেকর্ডকে ছাড়িয়ে গিয়েছে। এর ফলে দুটি জিনিসের চাহিদা বেড়েছে। তা হ'ল প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহারের এবং মানুষের বিলাসবহুল জীবন যাত্রার মানোন্নয়নের তীব্র প্রতিযোগিতা। অপ্রতিরুদ্ধ

www.nagorikpathagar.org

উন্নয়নের অগ্রযাত্রা দিনদিন আরো বেগবান হওয়ার ফলে দ্রুত আহরণ ও ব্যবহার বাড়ছে প্রাকৃতিক সম্পদেরও। এতে করে দ্রুত বিনষ্ট হয়ে যাচ্ছে প্রকৃতির প্রতিবেশগত ভারসাম্য (Ecological Balance)। জ্ঞান বিজ্ঞানে পরিবেশ সংরক্ষণ এ শাখাটি অতি নতুন হলেও ইহা বর্তমানে পৃথিবীর সবচেয়ে আলোচিত ও সংবেদনশীল বিষয়। পরিবেশ আইন ও নীতি বিকাশের ও বিবর্তনের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, তা কোন দেশ বা গোষ্ঠির সাথে বা কোন বিশেষ অঞ্চল বা এলাকা থেকে এর উদ্ভব হয়নি। বিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে বিশ্বজনগোষ্ঠি বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করে আসছিল। উল্লেখ্য ইউরোপে শিল্পবিপ্লবের সাথে বৃটিশ তথা ইউরোপীয় সম্রাজ্যবাদের ইতিহাস প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণ ভিত্তিক তাদের উন্নয়নের বিকাশ। যা শোষন ও শাসনের ইতিহাস ও প্রাকৃতিক সম্পদ লুন্ঠনকে কেন্দ্র করেই। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বৃটিশ ও ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদের পতনের পরপরই তারা অনুভব করতে লাগলো তাদের কর্তৃত্ব ও প্রাকৃতিক সম্পদের সরবরাহ সীমিত হয়ে আসছে। তাই প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহারের ও আহরণের প্রতি আরো যত্নশীল হতে হবে। সে সাথে আরো যোগ হলো উন্নয়নশীল বিশ্বে জনসংখ্যা বিস্ফোরণ এবং উন্নত বিশ্বে বিলাস বহুল জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের সীমাহীন প্রতিযোগিতা। ফলে প্রকৃতির উপর দু'ধরণের চাপ সৃষ্টি হলঃ একদিকে শিল্পের কাঁচামাল (Raw Materials) সরবরাহের জন্য প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণের চাহিদা বৃদ্ধি। অন্যদিকে উন্নয়নশীল বিশ্বে জ্যামিতিক হারে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত জনগোষ্ঠির ভরনপোষনের জন্য প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক সম্পদের উপর চাপ। পরিনতির এখানেই শেষ নয়। দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে নানাবিধ বর্জ্য। যেমন, গৃহস্থালি বর্জ্য, শিল্পবর্জ্য সহ আরো বহুবিধ। সবকিছু মিলে পরিবেশ দূষণ প্রকৃতির (Critical Threshold) এর মাত্রাকে অতিক্রম করে চলছে। তাই উন্নয়ন টেকসই করা নিয়ে সর্বত্রই আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছে। সর্বোপরি ইহা একটি বৈশ্বিক (Global) সমস্যা। সমস্যাটির তীব্রতা বর্তমানে ব্যাপকহারে বৃদ্ধি পেয়েছে বলে তা এতো আলোচনায় এসেছে। তবে এ নিয়ে আন্তর্জাতিক ভাবে চিন্তা ভাবনা চলেছে শতাব্দীকাল আগে থেকেই।

এ বিষয়ে ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, ১৯০০ সালের পূর্বে পরিবেশ সংরক্ষণ সংক্রান্ত কতিপয় বহুজাতিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল। ইউরোপীয় জলধার ও "রাইন নদীর" পানি ব্যবহারে অংশীদারিত্ব, নৌ চলাচল ও মৎস্য সম্পদ আহরণ নিয়ে নিজ নিজ দেশের সার্বভৌমত্বের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে বহুজাতিক চুক্তি হয়েছিল। তখন অবশ্য দূষন ও প্রতিবেশ রক্ষার বিষয়টি ততটা গুরুত্ব পায়নি। ১৯০৯ সালে US-UK সীমানা চুক্তির (Boundary Treaty) এর অনুচ্ছেদ ৪ এ বিধান রয়েছে কোন পক্ষই পানি দূষণ করতে পারবেনা যা অন্য পক্ষের স্বাস্থ্য ও সম্পদের জন্য ক্ষতির কারণ হতে পারে।

বিংশ শতাব্দির শুরুতে আরো কতিপয় উল্লেখযোগ্য চুক্তির মধ্যে রয়েছে ১৯০২ সালের Convention for the Protection of Birds Useful to Agriculture, ১৯১৬ সালের Convention for the Protection of Migratory Birds in the US

www.nagorikpathagar.org

and Canada. ১৯০০ সালের London Convention for the Protection of Wild Animals, Birds and Fish in Africa.

ত্রিশ ও চল্লিশ দশকের দিকে বিভিন্ন রাষ্ট্র প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণের গুরুত্ব নিয়ে বহু আলোচনা ও দরবার করে। তারা Fauna and Flora সংরক্ষণের বিভিন্ন চুক্তি নিয়েও নেগোশিয়েট করেছিল। এর ফলে ১৯৩৩ সালে London Convention on Preservation of Fauna and Flora, ১৯৪০ সালে Washington Convention on Nature Protection and Wildlife Preservation স্বাক্ষরিত হয়।

১৯৫০-৭২ ঃ পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে বিশ্ব সম্প্রদায় পারমানবিক (Neuclear) ব্যবহারের ধ্বংস যজ্ঞ ও তেল চুয়ানোর ফলে সমুদ্র দূষণ (Marine Pollution) নিয়ে উদ্বিগ্ন ছিল। ষাট দশকের দিকে জাতীয় পর্যায়ে পরিবেশ সংরক্ষণ সচেতনতার ফলে USA National Environmental Policy Act of 1969 পাশ করে। ১৯৭১ সালে USA Council on Environmental Quality and USA Environmental Protection Agency গঠন করা হয়।

১৯৭২ সালের পরবর্তী সময়কে আন্তর্জাতিক পরিবেশ আইনের আধুনিক অধ্যায় বলা হয়ে থাকে। এই সালে UN Stockholm Conference on Human Environment উপলক্ষে বিশ্ব সম্প্রদায় একত্রিত হয় ও পরিবেশ সংরক্ষণ বিষয় সমঝোতায় পৌঁছে। গঠন করা হয় United Nations Environment Program (UNEP).

নরওয়ের প্রধান মন্ত্রীর নেতৃত্বে UN General Assembly ১৯৮৩ সালে World Commission on Environment and Development গঠন করে এবং এর রিপোর্ট (Brundland) প্রকাশিত হয় ১৯৮৭ সালে।

United Nations Conference on Environment and Development (UNCED) ১৯৯২ সালে ব্রাজিলের রিও তে অনুষ্ঠিত হয়, সেখানে বিশ্বের প্রায় ১৮০টি দেশের রাষ্ট্র প্রধান/সরকার প্রধান অংশগ্রহন করেন। উক্ত সম্মেলনে আইনগত বাধ্যবাধকতা বিহীন তিনটি চুক্তি গৃহীত হয়। যাকে রিও ঘোষনাও বলা হয় ঃ- ক) Non Binding Authoratative Statement of Principle for Global Consensus on Management, Conservation, Sustainable Development of All types of Forest (UNCED Forest Principles) and Agenda 21; খ) Convention on Biological Diversity (CBD); গ) UN Framework for Convention on Climate Change (UNFCCC). এই তিনটি দলিলই আধুনিক বিশ্বে আন্তর্জাতিক ও জাতীয় পর্যায়ে পরিবেশ নীতি ও আইনের তাত্ত্বিক বুনিয়াদ।

www.nagorikpathagar.org

বাংলাদেশের পরিবেশ নীতি ও আইনের দিকটি আলোচনা করলে দেখা যায় যে, দেশের আইনের উৎস শাসনতন্ত্রে কোথাও পরিবেশ সম্বন্ধে কোন অনুচ্ছেদ/বিধানের বিষয় উল্লেখ নেই। তবে শাসনতন্ত্রের অনুচ্ছেদ ১০২ এর ক্ষমতাবলে হাইকোর্টের ব্যাখ্যার ভিত্তিতে পরিবেশ সংরক্ষণ জনগণের মৌলিক অধিকার বলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।*

সাম্প্রতিক কালে আধুনিক পরিবেশ বিজ্ঞানে পরিবেশ নৈতিকতা (Environmental Ethics) নামে বহু কোর্স উন্নত বিশ্বে অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ানো হচ্ছে। এ বিষয়ে সৃষ্টির আদি ইতিহাস পর্যালোচনা করলে আরো অনেক রহস্য উৎঘাটিত হবে। সৃষ্টির প্রতিটি উপাদানের জন্য তার নিজস্ব নিয়ম রয়েছে, মানব কর্মকান্ড এর ব্যতিক্রম কোনকিছু ঘটালেই প্রাকৃতিক বিপর্যয় নেমে আসে। প্রকৃতির ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব মানুষেরই তবে নিয়ন্ত্রনের নয়। এ শিক্ষা সৃষ্টির উষালগ্নে মানুষকে দেওয়া হয়েছে। হযরত নূহ (আঃ) এর নৌকার ঘটনা কারো অজানা নয়। ওহীর মাধ্যমে নিজের বংশধরকে নৌকায় আরোহনের আদেশ দিতে আল্লাহ বলেছিলেন। "প্রত্যক প্রাণিকূল হতে প্রত্যক প্রকারের এক জোড়া নৌকায় উঠিয়ে লও" (সূরা ঃ হুদ, আয়াত ঃ ৪০)। এই আয়াতের তাৎপর্য হ'ল প্রকৃতিকে সংরক্ষণের দায়িত্ব মানুষের এবং এর সুবিধাভোগের একচ্ছত্র অধিকারও মানুষেরই। পৃথিবীতে এমন কোন ধর্ম নেই যে ধর্ম প্রকৃতির সাথে সুন্দর আচরণ করতে না শেখায়। যেমন পানির দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করা হয় ইসলাম ও হিন্দু উভয় ধর্মেই বিধান রয়েছে। হিন্দু ধর্মে পানিতে দেবীর প্রতিচ্ছবি রয়েছে বলে গঙ্গাকে "গঙ্গা দেবী" বলা হয়। ইসলাম ধর্মে পানি দূষণ না করার বিষয়ে কঠোর অনুশাসন রয়েছে। প্রাণী কূলের প্রতি সদয় হওয়ার জন্য ইসলামে, হিন্দু ধর্মে এবং বৌদ্ধ ধর্মে বহু কঠোর অনুশাসন রয়েছে। বৌদ্ধ ধর্মে জীব হত্যা মহা পাপ, হিন্দু ধর্মে বহু আমিষ ভোজী রয়েছে। ভারতে বিরাট জনগোষ্ঠি রয়েছে যারা আমিষ ভোজী তারা ডিম পর্যন্ত খায়না। প্রতি ধর্মে এরূপ বিলুপ্ত প্রায় বহু মূল্যবোধ রয়েছে। যেগুলোর বিষয় সচেতনতা সৃষ্টি করলে পরিবেশ আইন প্রয়োগ ও বাস্তবায়নে বিপুল অংকের অর্থ ও জনবল নিয়োগ সাশ্রয় করা যাবে। কারণ মানুষের মধ্যে পরিবেশ সংরক্ষণে যখন ধর্মীয় মূল্যবোধ কাজ করবে, তখন বিরাট সংখ্যক নিরাপত্তা প্রহরী অনুন্নয়ন খাতে নিয়োগ ও নিয়োজিত

---

* In Pursuant to the International Law. The Chief Justice of Bangladesh thus recognizes that any ecological disaster, environment and ecology are now matters of universal concern. He also referred to Principle 10 of the Rio Declaration on Environment and Development ("the Rio Declaration") which provides that environmental issue are best handled with the participation of all concern citizen at the relevant level. Thus the Appellate Division considers the Rio Declaration as theoretical foundation for grant of standing and environmental protection as part of fundamental rights of a citizen.

In another judgment Justice B.B. Roy Chowdhury referred to the fundamental rights protected under Article 31 (Rights to Protection of Life) and 32 (Protection of rights to life and personal liberty) of the constitution of Bangladesh, which provides as follows: In the judgment (paragraph 102), the Justice B.B Roy Chowdhury stated that under the provision of the Article 31 and 32 of our constitution the protection to the right as fundamental right. This right encompasses with its ambits, the protection and preservation of environment, ecological, balance free from pollution of air and water, sanitation without which life can hardly be enjoyed. Any act or omission, which causes environmental damages or pollution, would thus be violative of the said right to life.

www.nagorikpathagar.org

করার প্রয়োজন হবে না। অবশ্যি এর জন্য প্রয়োজন ব্যাপক প্রচার, প্রসার ও সচেতনতা সৃষ্টি করা। এ ক্ষেত্রে আরো প্রয়োজন তৃণমূল পর্যায়ে জনগোষ্ঠিকে সংগঠিত করা ও শিক্ষা প্রসার। এ দায়িত্ব পালন করতে পারে সুশীল সমাজ, সাধারণ নাগরিক, রাজনৈতিক নেতৃত্ব, এনজিও, গণমাধ্যম (Electronic and Print), সর্বোপরি নীতি নির্ধারকগণ। আলোচ্য বইটিতে উপরোক্ত বিষয়েই গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

"পরিবেশ সংরক্ষণে নীতি ও নৈতিকতা" গ্রন্থটি সাতটি অধ্যায়ে বিভক্ত করা হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়টি "জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও খাদ্য নিরাপত্তা : বাংলাদেশ প্রেক্ষিত"। বাংলাদেশ পৃথিবীর অন্যতম ঘনবসতিপূর্ণ দেশ। স্বাধীনতা পূর্ব সময় থেকেই বিভিন্ন বঞ্চনা ও শোষণের কারণে দেশটি কখনোই খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করতে পারেনি। স্বাধীনতাত্তোর কৃষিক্ষেত্রে ব্যাপক উন্নতি ও অগ্রগতি হয়েছে, উন্নয়নের বিভিন্ন ছোঁয়া প্রায় সর্বত্রই দৃশ্যমান। দ্রুত খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধি ও দারিদ্র্য বিমোচন করতে গিয়ে পরিবেশ সংক্রান্ত পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াগুলি কম গুরুত্ব পায়। অপ্রিয় সত্য হল, আমাদের জীববৈচিত্র্য আজ বিপন্ন যা খাদ্যচক্রের মূলধারার উপাদান। কি প্রাণী! কি উদ্ভিদ! আমাদের খাদ্য নিরাপত্তার জন্য যে কোন মূল্যে জীববৈচিত্র্য ও খাদ্য চক্রকে সজীব রাখতেই হবে। এজন্য প্রচলিত পরিবেশ নীতি বাস্তবায়নের পাশাপাশি সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধকে পুঁজি হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে "বৃক্ষরোপণ দারিদ্র্য বিমোচন ও ধর্মীয় অনুশাসন"। বৃক্ষ প্রকৃতির অলংকার, পরজগতেও সুন্দর পরিমিত ও মনোরম পরিবেশে বসবাসের জন্য বৃক্ষ শোভা বৃদ্ধি করবে। বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন বর্তমানে শুধু বক্তৃতার উপকরণ নয়, অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে সামাজিক বনায়নের সাফল্য কথা আজ অনুকরণীয়। সর্বোপরি বৃক্ষ জীবনের অবিচ্ছেদ্য অবলম্বন যার মধ্যে রয়েছে সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে বিচরণ। এ উপলব্ধি ফিরিয়ে আনতে হবে নীতি নির্ধারক ও সাধারণ জনগোষ্ঠীর মাঝে।

তৃতীয় অধ্যায়ে "প্রাণী সম্পদ সংরক্ষণের" বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। প্রাণী সম্পদ সংরক্ষণে এদের প্রতি আচরণ কি হওয়া উচিত একটি হাদিসেই তা স্পষ্ট করে দিয়েছে। "ওহে জগতবাসী, জগতে আল্লাহর সৃষ্টি প্রাণী জাতির প্রতি সদয় হও; স্বর্গবাসীও তোমাদের প্রতি দয়াশীল হবেন" - তিরমিজী। প্রাণী জগৎ আমাদের খাদ্যচক্রের অন্যতম অপরিহার্য উপাদান। এ চক্রের কোথাও বিঘ্ন সৃষ্টি হলে প্রকৃতি ভারসাম্যহীন হয়ে যায়। তাতে সৃষ্টি জগতের বিপর্যয় অনিবার্য। তাই প্রচলিত নিয়ম নীতি অনুসরণের পাশাপাশি প্রকৃতির অমোঘ বিধান অনুসরণে প্রাণীজগতের প্রতি সদয় হওয়ার স্বভাব অর্জন করতে হবে।

www.nagorikpathagar.org

চতুর্থ অধ্যায়ে "উপকূলীয় পরিবেশ সংরক্ষণে নীতি ও নৈতিকতার" বিষয়ের বিভিন্ন দিকের বিশ্লেষণ করা হয়েছে। পৃথিবীর তিন ভাগ জল আর এক ভাগ স্থল। পৃথিবীর জলভাগের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল উপকূলীয় এলাকা। উপকূলীয় অঞ্চল খাদ্য চক্র, বিকল্প বাণিজ্য, যোগাযোগ, পানি ও জলবায়ু পরিবর্তনসহ সর্ব বিষয়ে এর তাৎপর্য অপরিসীম, যা সংরক্ষণের কোন বিকল্প নেই। প্রাণীজগতের অন্যতম প্রধান আবাসস্থল উপকূলীয় অঞ্চল। তাছাড়া মৎস্য সম্পদের প্রজনন ক্ষেত্র হল উপকূলীয় এলাকা। এ অঞ্চলকে সংরক্ষিত রাখলেই খাদ্যচক্র ও প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষা করা অনেকটা সম্ভব।

পঞ্চম অধ্যায়ে "পানি ও জীবন" বিষয়ের বিভিন্ন দিকের বিশ্লেষণ করা হয়েছে। পানিই সকল জীবনের উৎস। সকল উন্নয়ন কর্মকাণ্ডেই পানির প্রয়োজন ও ব্যবহার অপরিহার্য। অথচ আমাদের দেশসহ সর্বত্রই পানিসম্পদ দূষিত হচ্ছে, যা আমাদের টেকসই উন্নয়নকে মারাত্মক ঝুঁকির মধ্যে ঠেলে দিচ্ছে। পানিসম্পদ সংরক্ষণ সংক্রান্ত বহু আইন ও নীতি রয়েছে, যা কেউ স্বেচ্ছায় অনুসরণ করে না। আইন প্রয়োগকারী সংস্থারও কর্তব্য নিষ্ঠার অভাব রয়েছে। কারণ অনুসন্ধান করলে সহজেই প্রতীয়মান হয় যে, কেউ এ কাজকে নৈতিক কর্তব্য অথবা পুণ্যের কাজ বলে মনে করে না। তাই এসব সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধ জাগিয়ে তুলতে পারলে সমাজের প্রতিটি নাগরিক স্বতঃস্ফূর্তভাবে এ দায়িত্ব পালনে এগিয়ে আসবে। তাতে খরচও কমবে, সংরক্ষণও নিশ্চিত হবে। জনজীবনে শান্তিও সৃষ্টি হবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়ে "বাংলাদেশে পরিবেশ সংরক্ষণ ও দারিদ্র্য বিমোচন" সম্পর্ক প্রসঙ্গে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। দারিদ্র মানুষের জীবনে অভিশাপ। দারিদ্র্য মানুষকে কুফুরির দিকে ঠেলে দেয়। তাই দারিদ্র্য থেকে সবাইকেই আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাওয়া উচিত। এসব গুরুত্ব বিবেচনা করেই দারিদ্র্য বিমোচন নাগরিকের সাংবিধানিক অধিকার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তেমনি পরিবেশ সংরক্ষণ ও নাগরিকদের একটি মৌলিক অধিকার যা রাষ্ট্রের জন্য নিশ্চিত করা অবশ্য পালনীয়। দারিদ্র্যের বিভিন্ন দিক পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে-শিক্ষা, পুষ্টি, স্বাস্থ্যসহ সার্বিক দারিদ্র্য বিমোচন করতে আমাদের আরো অনেক সময় লাগবে তাই আর কালক্ষেপণের সুযোগ নেই। তবে এর জন্য সর্বক্ষেত্রে জনগোষ্ঠীর ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত আন্তরিক সহযোগিতার প্রয়োজন।

সপ্তম অধ্যায় "জলবায়ু পরিবর্তন ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ।" বর্তমান শতাব্দীর মানব গোষ্ঠীর, বিশ্ব সভ্যতার ও টেকসই উন্নয়নের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ জলবায়ু পরিবর্তন ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ। পৃথিবীর সৃষ্টির ইতিহাস, সভ্যতার ইতিহাস ও উন্নয়নের ধারা ও গতি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, মানুষের অতিলোভী এবং অপরিণামদর্শী উন্নয়ন কর্মকাণ্ডই সকল বিপর্যয়ের কারণ। এর প্রতিকারের জন্য মানবগোষ্ঠীর প্রকৃতির প্রতি যথাযথ আচরণ নিশ্চিত করতে হবে এবং লাগামহীন উন্নয়ন কর্মকাণ্ড করতে সংযত হতে হবে।

www.nagorikpathagar.org

মুখবন্ধ

মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব। সৃষ্টির সকল উপাদানই মানব কল্যাণে সৃষ্টি করা হয়েছে। "তোমরা কি দেখ না আল্লাহ্ নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে সবই তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করে দিয়েছেন এবং তোমাদের প্রতি তার প্রকাশ্য / অপ্রকাশ্য নিয়ামতসমূহ পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন" (আল কোরআন, সুরা লোকমান-আয়াত ২০)। সে সাথে আল্লাহ মানুষকে তার খলিফা হিসেবে দায়িত্বও দিয়েছেন প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষার। "এ ধরণী অতীব সবুজ, তিনি তোমাদের তার প্রতিনিধি হিসেবে পাঠিয়েছেন, তিনি দেখতে চান কত সুন্দরভাবে তোমরা এ দায়িত্ব পালন করতে পার" - মুসলিম শরীফ।

আর মানুষ যখন প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষায় ব্যর্থ হয় তখনই নেমে আসে মারাত্মক বিপর্যয়। সৃষ্টির সেরা মানবগোষ্ঠীর মূল্যবোধের অবক্ষয়ের ফলে অতীতের মত বর্তমানে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে প্রাকৃতিক বিপর্যয় দেখা দিচ্ছে। যার ফলে উদ্বিগ্নতা বাড়ছে বিশ্ব জনগোষ্ঠীর, বাড়ছে উন্নয়ন খরচ, সৃষ্টি হচ্ছে আঞ্চলিক বৈষম্য, সামাজিক ও রাজনৈতিক অস্থিরতা। তাই পরিবেশ সংরক্ষণ নিয়ে বিশ্বের সর্বস্তরের জনগোষ্ঠি সোচ্চার।

পরিবেশ সংরক্ষণে নীতি ও নৈতিকতা আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে অনেকটা নতুন বিষয়ই বলা চলে। ১৯৯৪ সালে Tufts University, Boston, USA-তে অধ্যয়নকালে লক্ষ্য করেছি আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়সহ পার্শ্ববর্তী Harvard University ও MITতে এ বিষয়ে Post Graduation পর্যায়ে বহু কোর্স রয়েছে। Harvard University-তে Religion and Environment এর উপর একটি স্কুলও রয়েছে। নব্বই দশকের শেষের দিকে এ বিষয় নিয়ে বাংলাদেশে আলোকপাত করার মত সুযোগ ও পরিবেশ সৃষ্টি করা অত্যন্ত কঠিন ছিল। কারণ বাংলাদেশে তখনও পরিবেশ আইনই তৈরি হয়নি। তাছাড়া দেশে এ বিষয়ে Literature ও দুষ্প্রাপ্যই বলা চলে। পরবর্তীতে পরিবেশ অর্থনীতিতে পিএইচডি থিসিস মূল্যায়নের জন্য জমা দিয়ে ১৯৯৯ সালে অবসর সময় কাটছিল, সে সুযোগে Spoken আরবি শিক্ষার জন্য বিভিন্ন বই Literature খোঁজার জন্য কুয়ালালামপুরস্থ আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরিতে প্রায়ই যাতায়াত ছিল। সেখানে অধ্যাপক ড. এ এইচ এম সাদেক ও অধ্যাপক ড. আতাউর রহমান প্রামাণিক (অর্থনীতি) ড. ওমর ফারুক, ড. আনোয়ারুল কবির তাঁদের সাথে বিশেষত ইসলামী অর্থনীতির বিষয়াদি নিয়ে আলোচনা হত। ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ের Literature খুঁজতে গিয়ে এক সময় চোখে পড়ে ইংরেজি ও আরবিতে Islam & Environment এর ওপর কতিপয় বই ও প্রবন্ধ। তারপর শুরু হলো Internet এ অনুসন্ধান। তাতে যোগাযোগ হল ড. ইয়াসিন দত্ত (UK) ও প্রফেসর নাসের হুসাইন, MIT Graduate, Washington বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শন শাস্ত্রের অধ্যাপক। তাদের মাধ্যমে বহু Literature ও তথ্য-উপাত্তের

www.nagorikpathagar.org

সন্ধান পাই। এভাবে শুরু হয় এ বিষয়ে চিন্তা ভাবনা। দেশে ফিরে ১৯৯৯-২০০১ সালের মাঝামাঝি পর্যন্ত প্রায় ১ বৎসর পদায়নের অপেক্ষায় থাকতে হয়েছিল। চাকরিতে হতাশা কাটাতে গবেষণাই ছিল কর্মব্যস্ততা ও প্রশান্তির আশ্রয়স্থল। পরিশেষে ২০০১ সালের নির্বাচনের পর BIDS এ লিয়েনে গিয়ে পরিবেশ নীতি নিয়ে গবেষণার সুযোগ হল। তাতে পরিবেশ নীতির ওপর নতুন বহু অভিজ্ঞতা অর্জন করি।

কিন্তু দুর্ভাগ্য আমার পিছু ছাড়েনি। ২০০৩ সালে পদোন্নতি নীতিমালা তৈরি হল। সরকার উপাধিধারী অত্যন্ত প্রভাবশালী কর্মকর্তা লিয়েনে থাকার অপরাধে পদোন্নতি বঞ্চিত করেন। হতাশা কাটাতে আবারো গবেষণার ওপর জোর দেই। অন্যান্য বই ও জার্নালে প্রকাশনার পাশাপাশি আবারো পরিবেশ সংরক্ষণে নীতি ও নৈতিকতা নিয়ে লেখালেখি শুরু করি। কতিপয় জার্নাল ও সাময়িকীতে প্রকাশিত হয় বেশ কিছু প্রবন্ধ।

অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগে চাকরীকালে Aid Harmonization & Aid Effectiveness নিয়ে প্রচুর গবেষণার কাজে ব্যস্ততার ফলে আর এগোতে পারিনি। জানুয়ারি ২০০৯-এ মেয়েকে ভর্তি করাতে ১ মাস বহিঃ বাংলাদেশ ছুটি কাটিয়ে দেশে ফিরে জানতে পারলাম আমাকে বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে। ভাবলাম দশ বৎসর ধরে চিন্তার বিষয়টি এখনই বাস্তবায়নের সময়। আবারো হতাশা নিরসন কর্মসূচি গবেষণাকরণ। কর্মজীবনে বিভিন্ন শাসনামলে ছন্দপতনই আমার প্রকাশনা ক্ষেত্রে সাফল্যের সোপান।

এ গবেষণাটি পরিচালনাকালে আমি বিশেষভাবে কৃতার্থ জনাব শেখ এনায়েতুল্লাহ সাবেক কৃষি সচিব এর প্রতি, তিনি কৃষি মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সব নীতিমালা সরবরাহ করে বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ দিয়েছেন। অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের সাবেক অতিরিক্ত সচিব মরহুম শহিদুল হক। তিনি বিশ্বব্যাংক ও এডিবির বিভিন্ন প্রকাশনা দিয়ে আমাকে সহায়তা করেছেন। এ জন্যে তাকে কৃতজ্ঞতা জানাই এবং তার রুহের মাগফেরাত কামনা করি। সিডর সংক্রান্ত সর্বশেষ তথ্যাবলীর জন্য আমার সহকর্মী অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের উপসচিব জনাব মনোয়ার আহমেদ, সি. সহকারী প্রধান জনাব রফিক আহমেদ সিদ্দিক ও জনাব সাইফুল হক চৌধুরীর কাছে কৃতজ্ঞ। ড. আইনুন নিশাত, আই ইউ সি এন, (বর্তমানে উপাচার্য, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়) জনাব মনোয়ার আহমেদ অতিরিক্ত সচিব (মহা পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর), তারা আইইউসিএন-এ কর্মরত থাকাকালে আমাকে জীববৈচিত্র্য সংক্রান্ত বিভিন্ন গবেষণাধর্মী তথ্য-উপাত্ত দিয়ে সহযোগিতা করেছেন, যে জন্য তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত সর্বশেষ তথ্যাবলী ও একশন প্লান ইত্যাদি সরবরাহের জন্য পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের কাছে আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

www.nagorikpathagar.org

বইটি মূল্যায়নের ও পর্যালোচনার জন্য আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি জনাব রফিকুল ইসলাম, জনাব আলতাফ হোসেন ও জনাব নাজমুল আহসান-এর প্রতি। সর্বোপরি বইটির ভাষাগত দুর্বলতা, পরিমার্জন, সুন্দর ও হৃদয়গ্রাহী ছবি সরবরাহ করে সহায়তা করার জন্য জনাব আলতাফ হোসেনের কাছে বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

আধুনিক প্রকাশনী বইটি প্রকাশনার দায়িত্ব নেয়ার জন্য আমি ব্যক্তিগত ভাবে তাদের কাছে কৃতজ্ঞ। তাদের সার্বিক সহযোগিতা ও উৎসাহ প্রদানের জন্য বইটি প্রকাশ করা সম্ভব হয়েছে। সর্বোপরি বইটির Peer Reviewer এর প্রতি ভীষণ ভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। তিনি বইটি পর্যালোচনান্তে মন্তব্য করছেন "বইটি আমার জানা মতে খুবই উন্নতমানের। এ বিষয়ে বাজারে খুব কম বই রয়েছে। পুস্তকখানার বিষয়বস্তু যথাযথ ভাবে ব্যাখ্যা ও উপস্থাপন করা হয়েছে। পাণ্ডুলিপি খানার ভাষা, বিষয়, বিশ্লেষণ ও উপস্থাপনা সন্তোষজনক।"

বইটিতে পরিবেশ নীতি বাস্তবায়নে নৈতিকতার গুরুত্ব সংক্রান্ত একটি নতুন বিষয়ের প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে ব্যাখ্যা ও উপস্থাপনায় অনেক অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকা স্বাভাবিক। এ সংক্রান্ত যে কোন পরামর্শ সাদরে গৃহীত হবে। বইটির বিষয়বস্তুর সব মতামত লেখকের ব্যক্তিগত। এ ক্ষেত্রে তার দাপ্তরিক কর্মকাণ্ডের সাথে কোন সম্পৃক্ততা নেই।

আগস্ট ২০১০ — ড. এ এইচ এম মোস্তাইন বিল্লাহ্

www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়
জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও খাদ্য নিরাপত্তা ঃ বাংলাদেশ প্রেক্ষিত

সার সংক্ষেপ ১
ভূমিকা ২
জীববৈচিত্র্য ও অর্থনীতি ৪
জীববৈচিত্র্যের অর্থনৈতিক ও সামাজিক মূল্য নির্ধারণ ৪
জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে ও ব্যবস্থাপনায় আর্থিক প্রনোদনা ৫
জৈব সম্পদ সংরক্ষণে সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টি ৫
খাদ্যচক্র ও জীববৈচিত্র্যের তাৎপর্য ৮
জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ ৯
প্রতিবেশগত ভিন্নতার ভিত্তিতে বাংলাদেশের জীববৈচিত্র্য সমৃদ্ধ এলাকা ১৩
পার্বত্য চট্টগ্রামের বনাঞ্চল ও জীব বৈচিত্র্য ১৩
সুন্দরবনের বনাঞ্চল ও জীববৈচিত্র্য ১৪
ঢাকা-মধুপুর বনাঞ্চল ও জীববৈচিত্র্য ১৫
জলাভূমি (Wetland) ও জীববৈচিত্র্যের আবাসস্থল ১৬
পরিবেশ সংকটাপন্ন ঘোষিত এলাকা জীববৈচিত্র্যের অবস্থা ১৭
ঔষধি উদ্ভিদের বাণিজ্যিক সম্ভাবনা ২২
ঔষধি উদ্ভিদ ও উদ্ভিদজাত ঔষধের রপ্তানির সম্ভাবনা ২৩
রপ্তানির সমস্যা ২৪
ঔষধি উদ্ভিদ ও ভেষজ চাষাবাদের অর্থনৈতিক গুরুত্ব ২৪
ঔষধি উদ্ভিদ চাষের সামাজিক গুরুত্ব ২৭
উদ্ভিদের ঔষধি গুণাবলী ২৯
বাংলাদেশে চাষাবাদযোগ্য ঔষধি উদ্ভিদ ৩৪
উদ্ভিদ জীববৈচিত্র্যের খাদ্য মূল্যমান ৩৪
কাঁঠাল কাঠ ও ফলের গুণাবলী ৩৬
কাঁঠালের ঔষধি গুণাবলী ৩৮
কাঁঠালের পুষ্টিমান ৩৮
কৃষি উৎপাদনে নীলাভ-সবুজ শৈবালের গুরুত্ব ৩৯
ভেষজ সংরক্ষণে পর্যাপ্ত নীতিমালার অভাব ৪০
ভেষজ সম্পদ সংরক্ষণে পদক্ষেপ ৪১
পশুর রক্ত উৎকৃষ্ট জৈব সার ৪২
ইসলাম ও বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে মধুর গুণাবলী ৪৩
বিলুপ্তির পথে বিভিন্ন প্রজাতির মাছ ৪৭
বিপন্ন ইলিশের কথা ৪৮
পরিবেশগত মারাত্মক সংকটাপন্ন এলাকা ৫১

www.nagorikpathagar.org

মৎস্যসম্পদ সংরক্ষণে সরকারি উদ্যোগ ৫৩
বন্যপ্রাণী আইন সময়োপযোগীতাকরণ ৫৬
জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে আন্তর্জাতিক কনভেনশন ৫৭
জীববৈচিত্র্যে সংরক্ষণে ধর্মীয় প্রভাব ৫৮
জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের জন্য কতিপয় সুপারিশ ৬১
উপসংহার ৬১
তথ্যসূত্র ৬৩

দ্বিতীয় অধ্যায়

বৃক্ষরোপণ, দারিদ্র্য বিমোচন ও ধর্মীয় অনুশাসন

সার সংক্ষেপ ৬৫
সূচনা ৬৬
বাংলাদেশের প্রকৃতি ও বর্তমান অবস্থা ৬৬
বাংলাদেশে বনায়নের উদ্যোগ ৬৭
বৃক্ষসম্পদের অর্থনৈতিক গুরুত্ব ৬৯
চা রপ্তানিতে বৃক্ষের প্রভাব ৭০
বৃক্ষ ও উদ্ভিদের ঔষধি গুণাবলী ৭১
নিম গাছের উপকারিতা ৭২
ক্যান্সার ঠেকাতে মাশরুম ৭৩
জাতীয় ফল কাঁঠাল ৭৫
পরিবেশ সংরক্ষণে বৃক্ষ ৭৬
জীব বৈচিত্র্য সংরক্ষণে বৃক্ষ ৭৯
বন সম্পদ ও জ্বালানি শক্তি ৮০
বৃক্ষ আল্লাহর তসবিহ্ পাঠ করে ৮১
বৃক্ষ ও জীবন ৮৩
বৃক্ষ জীবন, সাহিত্য এবং এ দেশের সংস্কৃতি ৮৪
বনায়ন সংক্রান্ত আইন ও বিধিবিধান ৯০
প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণে মালিকানা ৯১
সামাজিক বনায়ন ও অংশীদারিত্বমূলক সুবিধা ৯২
লভ্যাংশ বন্টন হার ৯২
বাগান কর্তন এবং অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে লভ্যাংশে বন্টন ৯৩
অংশীদারিত্বমূলক সামাজিক বনায়ন ও দারিদ্র্য বিমোচন ৯৩
অংশীদারিত্ব মূলক বনায়নের স্থায়িত্বশীলতা ৯৪
বৃক্ষরোপণে ধর্মীয় বিধান ও সামাজিক সচেতনতা ৯৫
উপসংহার ৯৯
সহায়ক গ্রন্থপুঞ্জি ১০০

www.nagorikpathagar.org

তৃতীয় অধ্যায়
প্রাণী সম্পদ সংরক্ষণ

সারাংশ	১০১
ভূমিকা	১০২
প্রাণী সম্পদ সংরক্ষণের অর্থনৈতিক গুরুত্ব	১০৪
পশুপালন ও কর্মসংস্থান ঃ সাফল্য কথা	১০৬
প্রাণী সম্পদ সংরক্ষণে সাংস্কৃতিক গুরুত্ব	১১০
পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় পাখি	১১১
বাংলাদেশে অতিথি পাখি	১১৪
প্রকৃতির সুন্দরতম সৃষ্টি পাখি	১১৬
প্রাণী জগতের আবাসভূমি বাংলাদেশ	১২০
বাংলাদেশের প্রাণী সম্পদের বিবরণ	১২১
বিচিত্র প্রাণীর প্রকারভেদ ও সংখ্যা	১২২
মৎস্যসম্পদ সংরক্ষণ ও দারিদ্র বিমোচন	১২২
বাংলাদেশের বিপন্নপ্রায় মাছের কথা	১২৫
বাংলাদেশে বিপন্ন ইলিশ	১২৬
পশুসম্পদ	১২৮
পশুসম্পদের উৎপাদন	১২৯
বিপন্ন রয়েল বেঙ্গল টাইগার	১৩০
বাংলাদেশের বিলুপ্ত বন্য প্রাণীর বিবরণ	১৩১
প্রাণী সম্পদ সংরক্ষণে সামাজিক তাৎপর্য	১৩২
হাঁস-মুরগির খামার	১৩৩
বন্য প্রাণীর উপকারিতা	১৩৩
মানব কল্যাণে প্রাণী সম্পদ সৃষ্টির রহস্য	১৩৩
প্রাণী সম্পদ সংরক্ষণে আইন ও নীতি	১৩৭
প্রাণী সম্পদ সংরক্ষণ	১৩৭
উপকূলীয় অঞ্চল নীতি ২০০৫	১৪০
প্রাণী সম্পদ সংরক্ষণে অন্যান্য ধর্ম	১৪১
প্রাণী সম্পদ সংরক্ষণে ইসলামের বিধান	১৪২
প্রাণীকূলের প্রতি আচরণ	১৪৩
জবাই উত্তম ঃ গবেষণার বিস্তারিত বর্ণনা	১৪৬
ফলাফল এবং সিদ্ধান্ত ঃ হালাল পদ্ধতি	১৪৬
পশ্চিমাদের (Captive Bolt Stunning -CBP) পদ্ধতি	১৪৭
উপসংহার	১৪৭
গ্রন্থপুঞ্জি	১৪৯

www.nagorikpathagar.org

চতুর্থ অধ্যায়

উপকূলীয় পরিবেশ সংরক্ষণের নীতি ও নৈতিকতা

সারাংশ	১৫১
বাংলাদেশের উপকূলীয় ভূ-ভাগ বিবর্তনের ইতিহাস	১৫২
সামদ্রিক পরিবেশের গুরুত্ব	১৫৪
বঙ্গোপসাগরের মৎস্য সম্পদ ও এর অর্থনৈতিক গুরুত্ব	১৫৫
প্রধান আহরিত চিংড়ি প্রজাতিসমূহ	১৫৭
অনাহরিত/আহরণযোগ্য সম্পদ	১৫৮
গভীর সমুদ্রে ট্রলার দ্বারা আহরণ	১৫৯
বিভিন্ন জালের ব্যবহারের দ্বন্দ্ব	১৫৯
ট্রলার বহর দ্বারা উৎপাদন	১৫৯
উপকূলীয় বনাঞ্চলের গুরুত্ব	১৬০
সমুদ্র দূষণের উৎস	১৬১
প্রাকৃতিক দুর্যোগ	১৬১
সেন্টমার্টিনের প্রবাল ও শৈবাল	১৬২
সুন্দরবন ঃ পরিবেশ সম্পদ ও মানুষ	১৬২
সুন্দরবন এলাকার নদী	১৬৩
বনের গাছপালা	১৬৪
মিঠা পানির বনাঞ্চল, মৃদু লবণাক্ত বনাঞ্চল ও তীব্র লবণাক্ত বনাঞ্চল	১৬৪
সুন্দরবনে বন্যপ্রাণী	১৬৫
সুন্দরবনের মৎস্যসম্পদ	১৬৫
কর্মসংস্থানে সুন্দরবন	১৬৬
সুন্দরবন নিধনের কারণ	১৬৭
মিঠা পানির প্রবাহ হ্রাস ও সুন্দরবন অঞ্চলে পরিবেশগত প্রতিক্রিয়া	১৬৭
লবণাক্ততা	১৬৮
পোল্ডার বা বেড়ি বাঁধ নির্মাণ	১৬৮
বিশ্বঐতিহ্য ও সুন্দরবন	১৬৯
ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত নীতিমালা	১৭১
উন্নয়ন বৈষম্য ঃ কোস্টাল জোন পলিসির প্রয়োগ ও ব্যবহার	১৭১
সামুদ্রিক পরিবেশ সংরক্ষণে ধর্মীয় বিধান	১৭২
উপসংহার	১৭৫
তথ্যসূত্র	১৭৬

পঞ্চম অধ্যায়

পানি ও জীবন

সার সংক্ষেপ	১৭৭
পানি ও পরিবেশ	১৭৮
বাংলাদেশের ভূ-গর্ভস্থ পানিসম্পদ ও পরিবেশ	১৮০

www.nagorikpathagar.org

পানি দূষিত হয় কেন ১৮১
পানিতেই জীবনের অস্তিত্ব ১৮৪
পানিসম্পদের অর্থনৈতিক গুরুত্ব ১৮৫
পানি চক্র ১৮৮
খাদ্য নিরাপত্তা ১৮৯
পানি সম্পদের সামাজিক গুরুত্ব ১৯০
পানি ও আমাদের সংস্কৃতি ১৯১
বাংলাদেশে পানিসম্পদের ব্যবস্থাপনা ও সংকট ১৯৩
বিপন্ন বুড়িগঙ্গা ১৯৫
বুড়িগঙ্গা দূষণের প্রধান উৎস ১৯৮
ভবিষ্যতে বাংলাদেশের পানির চাহিদা ১৯৮
পানি ঃ মরণাপন্ন মানুষ ২০১
পানির রাজনীতি ২০২
বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক নদীগুলোর উৎস ও এদের অবস্থা ২০২
পানি সৃষ্টির শ্রেষ্ঠতম নেয়ামত ২০৩
পানি সংরক্ষণ ঃ ইসলামের বিধান ২০৬
পানিসম্পদের মালিকানা ২০৭
পানিসম্পদ সংরক্ষণে অন্যান্য ধর্মের বিধান ২০৮
পানি সংরক্ষণে ব্যক্তিগত নৈতিক মূল্যবোধ ২০৮
পানি সংরক্ষণে নাগরিক ও ব্যক্তিগত দায়িত্ব ও কর্তব্য ২১০
উপসংহার ২১১
তথ্যসূত্র ২১২

ষষ্ঠ অধ্যায়
জলবায়ু পরিবর্তন ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ

সার সংক্ষেপ ২১৩
সূচনা ২১৪
জলবায়ু পরিবর্তন ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ ২১৫
জলবায়ু পরিবর্তন ও বাংলাদেশ ২১৮
ধর্মীয় দৃষ্টিতে প্রাকৃতিক দুর্যোগের তাৎপর্য ২২১
নিয়তি নয়, কর্মফল ২২৩
সোচ্চার বিশ্বনেতারাও ২২৩
জলবায়ু পরিবর্তন, দুর্যোগ ও দুরবস্থা ২২৪
বন্যা ২২৭
বঙ্গোপসাগরীয় সাইক্লোন এবং বাংলাদেশ ২২৯
পরিবেশগত ক্ষয়ক্ষতি ২৩১
ঘূর্ণিঝড় ও পরিবেশ বিপর্যয়ের কারণ ২৩৪

www.nagorikpathagar.org

খরা ও মরুময়তা ২৩৫
ভূমিকম্প কেন হয়? ২৩৬
ভূমিকম্প ঃ বাংলাদেশ ২৩৭
বাংলাদেশে সাম্প্রতিক ভূমিকম্প ২৩৮
পরিত্রাণের উপায় কী? ২৩৯
প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঃ ইসলাম ও ইতিহাসের শিক্ষা ২৪১
সুপারিশ ২৪৬
সহয়াক গ্রন্থপুঞ্জী ২৫১

সপ্তম অধ্যায়

পরিবেশ সংরক্ষণ ও দারিদ্র্য বিমোচন ঃ বাংলাদেশ প্রসঙ্গ

সার সংক্ষেপ ২৫৩
সূচনা ২৫৪
দারিদ্র্য বিমোচনে ইসলামের শিক্ষা ও আদর্শ ২৬১
বাংলাদেশের দারিদ্র্য চিত্র ও মৌলিক অধিকার ২৬২
দারিদ্র্য বিমোচনে ধর্ম ও কর্মে প্রণোদনা ২৬৩
দারিদ্র্য বিমোচনে প্রাকৃতিক সম্পদ ২৬৫
পরিবেশ ও দারিদ্র্য প্রাথমিক সম্পর্ক ২৬৬
পরিবেশ ও পারিদ্র্যের মাধ্যমিক সম্পর্ক ২৬৭
জলমহাল ব্যবস্থাপনা ২৬৯
বৃক্ষ নিধন ও দারিদ্র্য ২৬৯
প্রাকৃতিক দুর্যোগ, জলবায়ু পরিবর্তন ও দারিদ্র্য ২৭০
প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ ও মালিকানা ঃ ধর্মীয় মূল্যবোধ ২৭১
তাকওয়া, অর্থবিত্ত মর্যাদার মাপকাঠি নয় ২৭২
সম্পদের সুষম বন্টন ও আবর্তন ২৭২
কর্মসংস্থান নাগরিকের মৌলিক অধিকার ২৭২
উপার্জন অক্ষম জনগোষ্ঠীর সামাজিক নিরাপত্তা বিধান ২৭৩
শ্রমিকের মর্যাদা দান ও দারিদ্র্য বিমোচন ২৭৮
বৈষম্য দূরীকরণে হালাল উপার্জন ২৭৬
বায়তুল মাল প্রতিষ্ঠা ও দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন ২৭৭
দারিদ্র্য বিমোচনে যাকাত ব্যবস্থার প্রবর্তন ২৭৮
উশরের বিধান ২৭৯
বাংলাদেশের ভূমি নীতিমালা ও রাজস্ব আদায় ২৮০
ফিতরার প্রবর্তন ২৮১
নবীর শিক্ষা করো না ভিক্ষা ২৮১
উপসংহার ২৮১
সহায়ক গ্রন্থপুঞ্জী ২৮৪

www.nagorikpathagar.org

সারণী ১.১ ঃ কাঁঠালের পুষ্টি উপাদান (প্রতি ১০০ গ্রাম খাদ্যে উপযোগী অংশে) ৩৯
সারণী ১.২ ঃ বাংলাদেশের পরিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা (ECA) ৫২
সারণী ৩.১ ঃ খামার সাইজ অনুসারে পরিবার প্রতি পশুপাখির সংখ্যা ১২৯
সারণী ৩.২ ঃ দুধ, মাংস ও ডিমের উৎপাদন ও চাহিদা ১২৯
সারণী ৫.১ ঃ মানবদেশে পানির ভারসাম্য ১৯০
সারণী ৬.১ ঃ উল্লেখযোগ্য খাতসমূহ পরিকল্পিত অভিযোজন (Adaptation) ২১৭
সারণী ৬.২ ঃ বৈশ্বিক উষ্ণতার ঝুঁকিতে থাকা ৫টি ক্যাটাগরিতে ১২টি করে দেশের তালিকা ২২৪
সরণী ৬.৩ ঃ ২০০৪ সালের বন্যায় সম্পত্তি ও ফসলের ক্ষয়ক্ষতির প্রাথমিক হিসাব (মিনিয়ন টাকা) ২৩১
সারণী ৬.৪ ঃ অতীতের মারাত্মক ভূমিকম্পের বিবরণ ২৩৭

সংলগ্নি সারণী - ৬.১
দীর্ঘমেয়াদি দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় বিনিয়োগ কর্মসূচি ২৪৯

সংলগ্নি সারণী - ৬.২
সিডরোত্তর পুনরুদ্ধার ও পুনর্বাসনের জন্য আর্থিক সহায়তা প্রয়োজন ২৪৯

সংলগ্নি সারণী - ৬.৩
বাংলাদেশের সিডর সাইক্লোনের সার্বিক ক্ষয়ক্ষতি ও লোকসান (টাকা মিলিয়ন) ২৫০

সংলগ্নি সারণী - ৭.১
সিডরে (২০০৭) ক্ষতিগ্রস্তদের সহায়তার জন্য ইউএন বাংলাদেশ অর্থ আহরণ (USSM) ২৮৪

www.nagorikpathagar.org

পরিবেশ সংরক্ষণে নীতি ও নৈতিকতা

www.nagorikpathagar.org

জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও খাদ্য নিরাপত্তা : বাংলাদেশ প্রেক্ষিত

মহানবী (সাঃ) ঘোষণা দিয়েছেন, "এ ধরণী অতীব সুন্দর ও সবুজ, তিনি তোমাদেরকে তার প্রতিনিধি হিসেবে পাঠিয়েছেন। তিনি দেখতে চান কত সুন্দরভাবে তোমরা এ দায়িত্ব সম্পাদন করতে পার" (মুসলীম শরীফ)।

"মানুষ তার খাদ্যের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করুক। আমরা পানি বর্ষণ করেছি। এদিকে মাটিকে বিস্ময়করভাবে দীর্ণ করেছি। ---------- আর রকম বেরকম ফল ও উদ্ভিদ খাদ্য। তোমাঁদের জন্য এবং তোমাদের চতুষ্পদ জন্তুর জন্য জীবিকা হিসেবে"

(সূরা আকসা ৮০ : ২৪-৩২)।

সার সংক্ষেপ

চিরসবুজ বাংলাদেশ সর্বকালেই জীববৈচিত্র্যে ছিল অত্যন্ত সমৃদ্ধ। বিশ্ব জনগোষ্ঠী ও প্রাণিজগতের আবাসন ও খাদ্যের উৎস হিসেবে এর গুরুত্বও অপরিসীম। বাংলাদেশ স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে বহু উদ্যোগ গ্রহণ করেছে এবং প্রচুর বিনিয়োগও করেছে। দেশের অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদের সীমাবদ্ধতা হেতু এবং ঘন জনবসতির জন্য স্বাভাবিকভাবে জীববৈচিত্র্যের ওপর মাত্রাতিরিক্ত চাপ পড়েছে। এ প্রবন্ধে জীববৈচিত্র্যের অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক গুরুত্বের বিষয় তুলে ধরা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে আর্থসামাজিক তাৎপর্য এবং সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জগুলোও আলোচনা করা হয়েছে।

এ সম্পদ সংরক্ষণে সরকার প্রচুর বিনিয়োগও করেছে। এ সংক্রান্ত বহু নীতিমালা, আইন ও বিধি বিধানও প্রণয়ন করা হয়েছে। তদুপরি অবিশ্বাস্য হলেও সত্য যে, জীববৈচিত্র্য আহরণ ও পুনর্জন্মের মধ্যে পার্থক্য দিন দিন বাড়ছেই। অর্থাৎ দ্রুত বিলুপ্ত হচ্ছে এ সম্পদ। বর্তমান অবস্থার প্রেক্ষাপটে এ সম্পদ আহরণের ফলে উপকারের চেয়ে অপকারের দিকটিই বেশি। এতো বিনিয়োগ ও নীতি থাকা সত্ত্বেও জীববৈচিত্র্য বিলুপ্তি রোধ করা যাচ্ছে না, এর প্রধান কারণ মানুষের মূল্যবোধের অবক্ষয়। তাই সামাজিক দায়বদ্ধতা ও বিভিন্ন ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ জাগানোর জন্য ব্যাপক গণসচেতনতা সৃষ্টি করা যেতে পারে। পাশাপাশি আইনের প্রয়োগও নিশ্চিত করতে হবে।

মোট কথা, খাদ্য নিরাপত্তা একটি জাতির অস্তিত্বের পূর্বশর্ত। তাছাড়া সব প্রাণীর খাদ্যের উৎসই জীববৈচিত্র্য। তাই এ দু'য়ের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করতে হলে বলতে হয়, আগে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ নিশ্চিত করতে হবে যাকে আমরা সরবরাহের দিক বলতে পারি। আর খাদ্য নিরাপত্তার দিক হলো চাহিদার দিক, যা দ্রুত বর্ধন ও সম্প্রসারিত হচ্ছে। এ ক্ষেত্রে নীতি নির্ধারকদের একমাত্র উপায় হল্ সরবরাহ বৃদ্ধি নিশ্চিত করা। বাস্তবে গতানুগতিক নীতি ও আইন জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে আশানুরূপ সুফল লাভে কার্যকর ভূমিকা রাখতে ব্যর্থ হয়েছে। সরবরাহ অবস্থাটি নিশ্চিত করার জন্য জনগণের সম্পৃক্তকরণ একান্ত আবশ্যক। এজন্যে তাদের মূল্যবোধ, সামাজিক ও ধর্মীয় নৈতিকতাকে প্রাত্যহিক ব্যবহারিক জীবনে অভ্যস্ত হতে হবে। প্রতিটি মানুষ নিজের বিবেকের কাছে এমনভাবে দায়বদ্ধ থাকবে যেন সর্বোত্তমভাবে তারা এ দায়িত্ব পালনে স্বপ্রনোদিত হয়।

www.nagorikpathagar.org

ভূমিকা

বাংলাদেশের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের ইতিহাস অতিপ্রাচীন। উপনিবেশ শাসনামলে Elephant Preservation Act 1879 এবং Wildbirds and Animal Protection Act 1912 প্রণয়ন করা হয়েছিল। স্বাধীনতাউত্তর পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে ১৯৭৩ সালে বাংলাদেশের বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইন (Wildlife Preservation Act) (1973) প্রবর্তনের সময় পূর্বের আইনগুলো বাতিল করা হয়। আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটেও বাংলাদেশ পিছিয়ে নেই। ১৯৯২ সালে অনুষ্ঠিত ধরিত্রী সম্মেলনে বাংলাদেশ Convention of Biodiversity (CBD) স্বাক্ষর করে। সে সময় থেকে বিভিন্ন জাতীয় এবং খাতভিত্তিক (Sectoral) নীতি নির্ধারণে জীববৈচিত্র্যের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্ব পেয়েছে। এছাড়াও বাংলাদেশ RAMSAR Convention 1971 (Convention on wetlands of international importance and waterfowl habitat) ১৯৭২ সালে World cultural heritage এবং ১৯৭৩ সালে The Convention of International Trade and Endanger Species (CITES) স্বাক্ষর করেছে।

উপরোক্ত চুক্তিগুলো স্বাক্ষর করার পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের ওপর অনেক দায়িত্ব ও কর্তব্য বর্তায়। এসব লক্ষ্যার্জনে ১৯৯৫ সালে National Environmental Management Action Plan (NEMAP) দলিল, ১৯৯৫ সালে National Conservation Strategy (NCS) দলিল, ১৯৯৩ সালে Forestry Master Plan প্রণয়ন করা হয়েছে। সম্প্রতি বাংলাদেশ IUCN-এর সহায়তায় Biodiversity Conservation Strategy Action Plan প্রণয়ন করেছে।

আন্তর্জাতিক জীববৈচিত্র্য কনভেনশন (১৯৯২) অনুসারে জীববৈচিত্র্য বলতে বিভিন্ন উৎসের জৈব অর্গানিজমকে বুঝায়। এ ক্ষেত্রে ভূচর (terrestrial), উপকূলীয় (marine) ও অন্যান্য জলজ উদ্ভিদ প্রতিবেশ সংস্থানকে (ecosystems) এবং এ সংক্রান্ত জটিল প্রতিবেশকে বুঝানো হয়। অর্থাৎ জীববৈচিত্র্য বলতে বিভিন্ন প্রজাতির জৈব অর্গানিজম, জেনেটিক বৈচিত্র্য ও ভিন্ন শ্রেণীর প্রতিবেশ সংস্থানকে (ecosystems) বুঝানো হয় (ইউএনইপি ১৯৯৫)। জীববৈচিত্র্য খাদ্যচক্রের প্রধান উৎস, বিশেষত মানবজাতির। এ সম্পদ হ্রাস পাওয়ায় সারা বিশ্ব আজ উদ্বিগ্ন। জীববৈচিত্র্যের এ বিরাট ভাণ্ডার মূলতঃ গ্রীষ্মমণ্ডলীয় বনাঞ্চলে, যার আসল ঠিকানাও তৃতীয় বিশ্ব। দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও মানব কর্মকাণ্ডের ব্যাপক প্রসারের ফলে জীববৈচিত্র্যের পরিমাণ ব্যাপকভাবে হ্রাস পাচ্ছে। যার ফলে এ সম্পদ ভাণ্ডারের জেনেটিক পুল দ্রুত সংকুচিত হয়ে আসছে, যা ধরিত্রীকে ক্রমান্বয়ে ঝুঁকিপূর্ণ করে তুলেছে। এক পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে, বন উজার ফলে বিশ্বে প্রতিদিন ২০ থেকে ৭৫ ধরনের প্রজাতি বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। প্রতি বৎসর ১৭ মিলিয়ন হেক্টর ট্রপিক্যাল বন উজার হয়ে যাচ্ছে। এ ধারা অব্যাহত থাকলে আগামী ৩০ বছরে ৫ থেকে ১০ শতাংশ বনজ

www.nagorikpathagar.org

সম্পদ (ট্রপিক্যাল বন) উজার হয়ে যাবে (মিলার, ১৯৯৩)। এ অবস্থা থেকে পরিত্রাণের জন্য আশির দশকের শুরু থেকে বিশ্বব্যাপী জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের উদ্যোগ গ্রহণ শুরু হয়। এ ধারার প্রতিফলন বাংলাদেশেও অব্যাহত রয়েছে।

প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি, বিশ্বের অন্যতম বৃহত্তম বদ্বীপ বাংলাদেশ জীববৈচিত্র্যে অত্যন্ত সমৃদ্ধ। দক্ষ ব্যবস্থাপনা ও যথাযথ সংরক্ষণের অভাবে আজ মারাত্মকভাবে বিপন্ন হতে চলেছে এ অমূল্য প্রাকৃতিক সম্পদ। বাংলাদেশে প্রায় ৫,০০০ প্রজাতির পুষ্পজাতীয় উদ্ভিদ, ৫০০ প্রজাতির মাছ, ৮৪০ প্রজাতির বন্য প্রাণী রয়েছে। তার মধ্যে ১৯ প্রজাতির উভচর প্রজাতির সরীসৃপ, ৫৭৮ প্রজাতির পাখি, ১১৯ প্রজাতির স্তন্যপায়ী প্রাণী এবং ২০০ প্রজাতির অতিথি/যাযাবর পাখি রয়েছে। তাই এ দেশে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের তাৎপর্য অপরিসীম। প্রথমত, যদি খাদ্যচক্র (food chain)-এর বিষয়ে আলোচনা করা হয় তাহলে দেখা যাবে মানব জীবনের অস্তিত্বের অন্যতম উপাদান খাদ্যের প্রধান উৎস হচ্ছে এ জীববৈচিত্র্য। ত্রিশ বৎসর পূর্বেও দেশের বর্তমান জনসংখ্যার অর্ধেক জনগোষ্ঠীরও খাদ্য সরবরাহ যেখানে সম্ভব ছিল না, সেখানে সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশ খাদ্যে প্রায় স্বয়ংসম্পূর্ণ (শস্যে)। তার প্রধান কারণ উন্নতমানের ধান, মৎস্য ও পশুসম্পদের চাষ এবং এসবের উৎপাদন বৃদ্ধি ও সম্প্রসারণ। এ ক্ষেত্রে প্রাকৃতিকভাবে বেড়ে ওঠা জীববৈচিত্র্য, যার মধ্যে অনেক ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির ছোঁয়া রয়েছে, তা সংরক্ষণ করা অত্যাবশ্যক। অন্যথায়, পরিবর্তনশীল প্রকৃতি ও জলবায়ুর মোকাবেলায় এ ক্রমবর্ধমান জনগোষ্ঠীর খাদ্য নিরাপত্তা, চিকিৎসা ও বাসোপযোগী পরিবেশ মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হতে পারে। তাই জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে আজ সারা পৃথিবী সোচ্চার। এক্ষেত্রে জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকিপূর্ণ বাংলাদেশের মতো বিশাল জনগোষ্ঠীর দেশের পিছিয়ে থাকার কোন সুযোগ নেই।

জীববৈচিত্র্যের উপরোক্ত গুরুত্বের পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য প্রবন্ধে বাংলাদেশের জীববৈচিত্র্য সম্পদ সম্ভার ও এর সম্ভাবনা, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও দারিদ্র্য বিমোচনের গুরুত্ব এবং সম্পদ সংরক্ষণের ক্ষেত্রে বিদ্যমান প্রতিবন্ধকতাগুলো চিহ্নিত করা হয়েছে। এসব সমস্যা মোকাবিলায় বাংলাদেশের উদ্যোগগুলোও পর্যালোচনা করা হয়েছে। দ্রুত পরিবর্তনশীল প্রকৃতি, বিশেষত আবহাওয়া ও জলবায়ুর পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন উদ্যোগের পাশাপাশি বাংলাদেশের বিশাল জনগোষ্ঠীর দীর্ঘদিনের লালিত সামাজিক, সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ ও ধর্মীয় অনুভূতিকে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে কাজে লাগিয়ে দারিদ্র্য বিমোচনের বিরাট সম্ভাবনার দ্বারকে উন্মোচিত করা যায়।

এ প্রবন্ধে বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকার জীববৈচিত্র্যের সম্পদ সম্ভারের গতি-প্রকৃতির বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের প্রভাব, এ সম্পদ সংরক্ষণের লক্ষ্যে গৃহীত বিভিন্ন সরকারি উদ্যোগের পর্যালোচনা করা হয়েছে। তাছাড়া জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে সামাজিক মূল্যবোধ ও নৈতিকতার প্রভাব বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

www.nagorikpathagar.org

বিশেষ করে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে ধর্মীয় অনুভূতির বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। পরিশেষে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে সময়োপযোগী কিছু পদক্ষেপ গ্রহণের সুপারিশ করা হয়েছে।

জীববৈচিত্র্য ও অর্থনীতি

এ ধরণীর সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ প্রাকৃতিক বন, ভূমি, পাহাড়/পর্বত, জলাভূমি এবং সামুদ্রিক আবাসস্থল। ভূমণ্ডলে জীববৈচিত্র্যের আধার এসব স্থানেই। জীববৈচিত্র্য দু'ধরনের হতে পারে- জৈবিক ও উদ্ভিদ। দক্ষ ও কার্যকর ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির মাধ্যমে এ সম্পদ প্রয়োজনীয়ভাবে ব্যবহার করেও তা সংরক্ষণ করা অত্যাবশ্যক। এ ধরনের নীতি অনুসরণ করলে টেক্সই উন্নয়ন (Sustainable Development) এবং জাতীয় অর্থনৈতিক অগ্রগতি অর্জন ত্বরান্বিত করা সম্ভব। প্রকৃতপক্ষে বনসম্পদ, জলাভূমি এবং সামুদ্রিক সম্পদ সংরক্ষণের পরিবর্তে ব্যাপক হারে ধ্বংস করা হচ্ছে এবং এর ফলে এ সম্পদ হ্রাস পাচ্ছে আশংকাজনকভাবে। বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যাচ্ছে, শুধু বাজার মূল্য বিবেচনায় এসব সম্পদ আহরণ করা হলে এ সম্পদ সংরক্ষণ করা একেবারেই সম্ভব নয়। কারণ সচেতনতার অভাবে এসব সম্পদ আহরণের ক্ষেত্রে বাজার মূল্য, অর্থনৈতিক মূল্য, সামাজিক মূল্য, পরিবেশগত মূল্য এবং সম্পদ ধ্বংসের অন্যান্য পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ার বিষয়াদি বিবেচনা করা হয় না। বর্ণিত অবস্থায় এসব সম্পদ সংরক্ষণে বর্তমান পরিস্থিতিতে সরকারি হস্তক্ষেপ একান্ত আবশ্যক। এ ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক প্রলোভনের (Economic incentive) মাধ্যমে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে জনগণকে উদ্বুদ্ধ ও সম্পৃক্ত করা একান্ত অপরিহার্য।

জীববৈচিত্র্যের অর্থনৈতিক ও সামাজিক মূল্য নির্ধারণ

দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে নীতি নির্ধারকদের জীববৈচিত্র্যের মূল্য নির্ধারণের জন্য অর্থনৈতিক বিষয়াদি বিবেচনায় আনা আবশ্যক। জৈব সম্পদের মূল্য নির্ধারণের পদ্ধতি নিম্নোক্তভাবে হতে পারে -

(ক) প্রাকৃতিক সম্পদের উৎপাদনের মূল্যমান পরিমাপ করা যেমন জ্বালানী কাঠ, গো-খাদ্য এবং মাংস যা সরাসরি ভোগ করা হয় প্রকৃত বাজার যাচাই ব্যতীত। এ ক্ষেত্রে এসব সম্পদের বাজার মূল্য ও সামাজিক মূল্য বিবেচনায় আনা হলে এসবের গুরুত্ব বেড়ে যাবে।

(খ) বাণিজ্যিকভাবে আহরণ করা হয় এমন সব উৎপাদিত জীবপণ্যের মূল্য পরিমাপ করা যেমন টিম্বার, মৎস্যসম্পদ, পশুসম্পদ এবং বনজ ঔষধি বৃক্ষলতা। এগুলো সামাজিক মূল্য বিবেচনায় নিলে সমাজের সবাইকে অবাক করে দিবে।

বাস্তুসংস্থান (ecosystem) এর কার্যাবলীর পরোক্ষভাবে মূল্য পরিমাপ করা যেতে পারে, যেমন (watershed protection, photo synthesis) আবহাওয়া নিয়ন্ত্রণ এবং মৃত্তিকা উৎপাদন এবং এর ওপাদিকা শক্তি বৃদ্ধিকরণ।

www.nagorikpathagar.org

জৈব সম্পদ সংরক্ষণ যেহেতু অর্থনৈতিকভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, তাই প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণকেও অর্থনৈতিক উন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ অংশ বলা সমীচীন হবে। অতএব, জৈব সম্পদ সংরক্ষণে বাজার অর্থনৈতিক মূল্য, বিনিময়, সেবা ও সুবিধার অর্থনৈতিক দিক বিবেচনা করা অত্যাবশ্যক। এ বিনিয়োগ ও সংরক্ষণ অর্থনৈতিকভাবে সুবিধা প্রদান নিশ্চিত করবে নিঃসন্দেহে এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নে শুভ প্রভাব ফেলবে সন্দেহাতীতভাবে।

জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে ও ব্যবস্থাপনায় আর্থিক প্রলোভন

জীববৈচিত্র্য ব্যবস্থাপনায় ভূমি, মূলধন শ্রমকে অত্যন্ত দক্ষ ও সুনিপুণভাবে ব্যবহার করতে হবে। সংরক্ষিত এলাকার পার্শ্ববর্তী জনগণের শ্রম ও সম্পদকে সুপরিকল্পিতভাবে ব্যবহার করতে হবে যেন তারা বাহ্যত দেখতে এবং বুঝতে পারে যে, জীববৈচিত্র্য ধ্বংসের চেয়ে তা সংরক্ষণ করলে তাদের বর্তমান কর্মসংস্থান অনেক লাভজনক ও সুবিধা বেশি পাওয়া যায়। এ জন্যে সংরক্ষিত এলাকার পার্শ্ববর্তী জনগোষ্ঠীর জন্য আইন করে অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর করা যেতে পারে। এ ক্ষেত্রে স্থানীয় সমবায় গড়ে তোলা যেতে পারে। যারা নতুন কর্মসূচির নিয়ন্ত্রণের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে এমন লোকজনকে ক্ষতিপূরণ দিয়ে তাদের পুনর্বাসন করতে হবে। এ ধরনের প্রলোভন তখনই অর্থবহ হবে, যখন জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে জনগণ অনুপ্রাণিত হবে এবং ক্ষতিপূরণ প্রদানসহ এসব কর্মকাণ্ডের অর্থনৈতিক খরচ অর্থনৈতিক সুবিধার চেয়ে অনেক কম হবে। এ ধরনের ব্যবস্থাপনাকে সফল করতে হলে নিম্নোক্ত বিষয়াদি বিবেচনায় আনতে হবে ঃ

(ক) সংশ্লিষ্ট সবার জন্য আইনগত আচরণবিধি প্রণয়ন,

(খ) এসব আচরণবিধির প্রয়োগ নিশ্চিতকরণ,

(গ) এসব কার্যকলাপ নিরীক্ষণ ও মূল্যায়ন,

(ঘ) এসব কার্যকলাপ বাস্তবায়নে স্থানীয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া বিবেচনায় আনতে হবে।

(ঙ) এসব কর্মসূচি আরোপিত না করে উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করতে হবে এবং পরিবর্তনশীল অবস্থার সাথে অবশ্যই সামঞ্জস্য রাখতে হবে। এসব ক্ষেত্রে আর্থিক প্রণোদনা যেমন সহজ শর্তে ঋণ, সার, উৎপাদিত পণ্য বাজারজাতকরণের সুবিধা ইত্যাদি নিশ্চিত করা যেতে পারে।

জৈব সম্পদ সংরক্ষণে সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টি

জৈব সম্পদ সংরক্ষণের ক্ষেত্রে সামাজিক সম্প্রদায়কে সর্বজনীন বিশেষ কোন প্যাকেজ বা পদ্ধতি নেই। কারণ যে জনগোষ্ঠী বনাঞ্চলের বা উপকূলের কাছাকাছি এলাকায় থাকে, বৃক্ষ এবং প্রাণী তাদের খাদ্য, ঔষধ, আশ্রয়, নির্মাণ সামগ্রী এবং তাদের আয়ের উৎসের সন্ধান দিয়ে থাকে। নদী তাদেরকে যোগাযোগের সুযোগ সৃষ্টি করে, মাছ, পানি ইত্যাদি সরবরাহ করে। ভূমি জনগণকে কোরাল রীফ এবং উপকূলীয় বন ইত্যাদি সরবরাহ করে থাকে। এসব সম্পদের ব্যবহারের মাধ্যমে গ্রামীণ জনগণ তাদের জীবিকা নির্বাহের প্রত্যক্ষ সুবিধা পেয়ে

www.nagorikpathagar.org

থাকে। অতিরিক্ত আহরণের ফলে প্রাকৃতিক সম্পদ প্রায়শই ধ্বংসের হুমকির সম্মুখীন। তাই চার দেয়ালের মাঝে বসে প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন না করে সাধারণ জনগোষ্ঠীর সাথে প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণের দায়িত্ব পালন করতে হবে। এ ক্ষেত্রে গ্রামীণ যে লোকটি প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণ করতো তার বিকল্প আয় বৃদ্ধির বিষয়টি বিবেচনায় রাখতে হবে। তাছাড়া বর্তমান সংরক্ষণ ব্যয়ও হ্রাস করতে হবে। যেমন স্থানীয় জনগণ মুনাফা অংশীদারীর ভিত্তিতে প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত থাকলে তাদের জন্য সরকারি খরচে বাসস্থানের প্রয়োজন হবে না। তাদের যাতায়াত খরচের প্রয়োজন হবে না উপরন্তু বহুবিধ সম্পদ অপচয় ও ধ্বংস থেকে রক্ষা পাবে। উল্লেখ্য, বনাঞ্চলের নিকটবর্তী এলাকায় বেশির ভাগই অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীর বাসস্থান অথচ তাদের চতুর্পার্শ্বে রয়েছে অতিসমৃদ্ধ জীববৈচিত্র্য। দারিদ্র্য পীড়িত জনগণ জীবিকা নির্বাহের জন্য বন ধ্বংস করে কৃষি কাজে লিপ্ত হতে বাধ্য হয়। তাই পরিবর্তনশীল অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সরকারের সম্পদ ব্যবস্থাপনার পদ্ধতি এবং নীতি পুনঃপর্যালোচনা করতে হবে। জবর দখলকারী এবং অনুপ্রবেশকারী গ্রামীণ জনগোষ্ঠীকে প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণে কিভাবে উদ্বুদ্ধ করা যায় সে জন্য নতুনভাবে সময়োপযোগী নীতি ও বিধিমালা প্রণয়ন করা এবং তা বাস্তবায়ন এমনভাবে করতে হবে যেন অবৈধ সম্পদ আহরণকারী, সংরক্ষণকারীতে পরিণত হয়। এক্ষেত্রে বন বিভাগের নিঃসর্গ প্রকল্পের কিছু সাফল্যের বিষয় উল্লেখযোগ্য।

প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ নীতি প্রণয়নে নিম্নোক্ত ব্যবস্থাদি অন্তর্ভুক্তি বাঞ্ছনীয়,

(ক) প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনার স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসহ অন্যান্য স্থানীয় প্রতিষ্ঠান যেমন- স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, মক্তব, স্থানীয় সমাজসেবী প্রতিষ্ঠানগুলোকে দায়িত্ব প্রদান করা যেতে পারে।

(খ) স্থানীয় সম্প্রদায়/সমাজভিত্তিক সম্পদ ব্যবস্থাপনার পদ্ধতি গড়ে তোলা যেতে পারে।

(গ) প্রাকৃতিক সম্পদের মূল্য নির্ধারণের নীতি আলোচিত বিষয়াদির আলোকে পুনঃনির্ধারণ করা যেতে পারে।

(ঘ) প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণে কর সুবিধাদি নিশ্চিত করা যেতে পারে।

(ঙ) প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনায় বিভিন্নভাবে সম্পদের মালিকানা প্রদানের পদ্ধতি প্রদান করা যেতে পারে। যেমন বাংলাদেশ সামাজিক বনায়নের ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণের জন্য উপকারভোগীরা ৬৫ শতাংশ মালিকানা অথবা মুনাফা লাভ করবে। গতানুগতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনার পদ্ধতিকে আধুনিকীকরণ করে সময়োপযোগী করে তোলা যেতে পারে। সরকার বা সরকারি কর্মকর্তা নয় বরং যে জনগোষ্ঠী বনাঞ্চল, জলাভূমি, উপকূলীয় অঞ্চলের চতুর্পার্শ্বে থাকে তাদের প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারের পূর্ণ কর্তৃত্ব থাকবে। তাদের উৎসাহিত করতে হবে, প্রণোদনা দিতে হবে যেন নিজেদের স্বার্থে নিজেদের খরচে এসব সম্পদের টেক্সই ব্যবস্থাপনায় এগিয়ে আসে, জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নে অবদান রাখে এবং এর সুফল ভোগের অংশীদার হয়।

www.nagorikpathagar.org

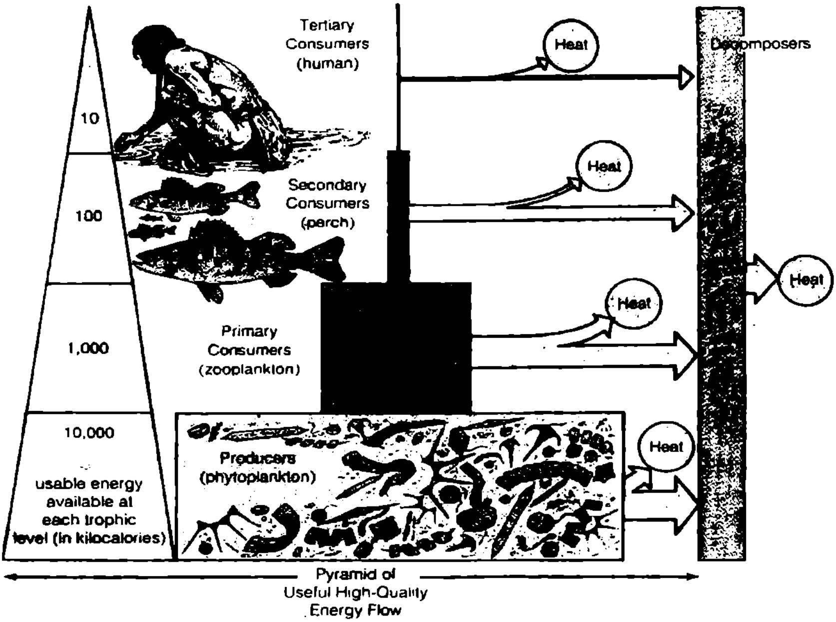

চিত্র ১.১ ঃ শক্তি ক্ষয় (Energy Loss) চক্রের পিরামিড

উৎস ঃ T. Miller, 1993

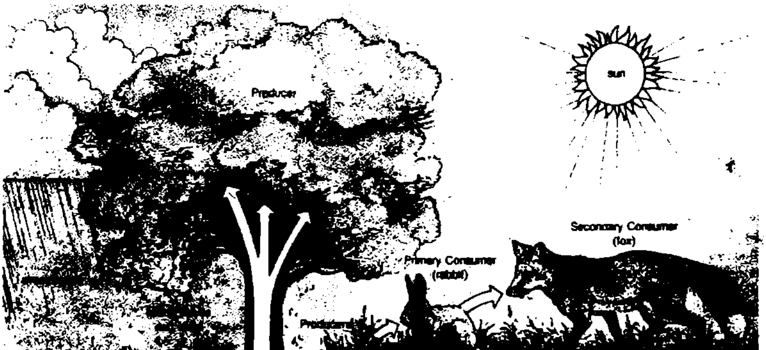

চিত্র ১.২ ঃ বাস্তসংস্থান (Ecosystem) এর কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

উৎস ঃ T. Miller, 1993

www.nagorikpathagar.org

খাদ্যচক্র ও জীববৈচিত্র্যের তাৎপর্য

খাদ্যচক্রে জীববৈচিত্র্যের ভূমিকা আলোকপাত করলেই স্পষ্ট হয়ে যাবে এ সম্পদের গুরুত্ব কত অপরিসীম। প্রতিবেশ সংস্থানে (Ecosystem) কতিপয় প্রাণী খাদক (Consumer or heterotrophs) যা নিজেদের প্রয়োজনীয় nutrient সরাসরি গ্রহণ করে না। তারা হয় অন্যান্য উৎপাদক (Producers) এর টিস্যু থেকে খাদ্য গ্রহণ করে অথবা খাদক (Consumer) আহার গ্রহণ করে থাকে। এই খাদ্যের উৎস ভেদে বিভিন্ন ধরনের (Consumer) খাদক রয়েছে। যেমন Primary Consumer (herbivorous) যা উদ্ভিদ বা অন্যান্য উৎপাদক (Producers) থেকে খাবার গ্রহণ করে থাকে যেমন গরু, ছাগল, হরিণ ইত্যাদি প্রাণী উদ্ভিদ থেকে খাদ্য গ্রহণ করে থাকে। Secondary Consumers (Carnivores) যাঁদেরকে Primary Consumers এর ওপর জীবন ধারণ করতে হয়। তারা বেশির ভাগই প্রাণী, এর মধ্যে কিছু বিরল প্রকৃতির উদ্ভিদও রয়েছে যারা বিভিন্ন ধরনের কীট পতঙ্গ খেয়ে থাকে। তাছাড়া Tertiary or higher level consumers (Carnivores) যারা শুধু প্রাণী খেয়ে জীবন ধারণ করে থাকে যেমন বাঘ, ভল্লুক, সিংহ ইত্যাদি প্রাণী। Omnivores (সর্বভোজী) প্রাণী যারা প্রাণী ও উদ্ভিদ উভয় প্রকার খাবার খেয়ে জীবন ধারণ করে থাকে। তারা হল মানুষ, শিয়াল, শূকর ইত্যাদি প্রকার প্রাণী। Detritivores (decomposers and debritus feeders) Decomposers- দের মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন প্রকার ব্যাকটেরিয়া, ফান্‌জাই ইত্যাদি। আবার রেকটবিল ও ফানজাই অন্যদিকে কীটও (worms) অন্যান্য পোকামাকড়ের খাবার। Debritus feeder হলো কাঁকড়া, পিঁপড়া ইত্যাদি শ্রেণীর প্রাণী।

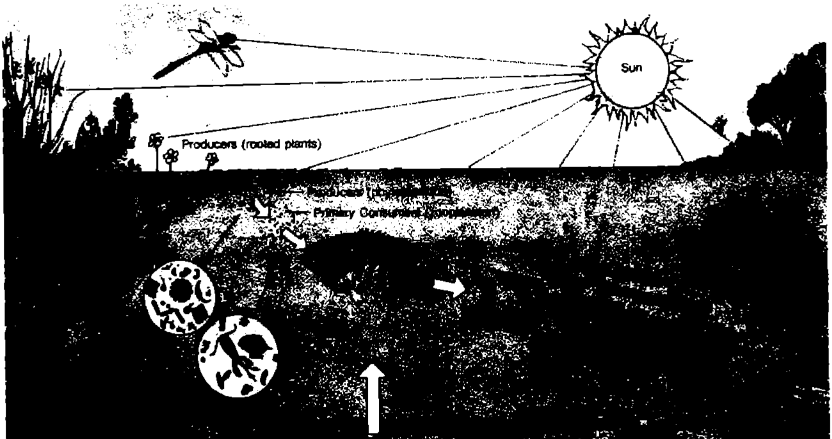

চিত্র ১.৩ ঃ Fresh Water Pond Ecosystem এর উপাদান।
উৎস ঃ T. Miller, 1993

www.nagorikpathagar.org

১. খাদ্যচক্রের প্রক্রিয়াকে সদৃশ্য করার জন্য চিত্রের সাহায্যে এর গুরুত্বটি ব্যাখ্যা করা যায় (চিত্র ১.১)
২. পুকুর বা বদ্ধ জলাশয়ে পরিবেশ সংস্থানের একটি অবস্থা নিম্নে দেখানো হলো (চিত্র ১.২)
৩. স্থল ভূমির পরিবেশ সংস্থানের একটি দৃশ্য দেখানো যেতে পারে;
৪. তাছাড়া উপকূলীয় ও সমুদ্রের খাদ্যচক্র জটিল দৃশ্যের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে।

জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ

প্রাকৃতিক সম্পদ সৃজন, ব্যবস্থাপনা এদেশের সংস্কৃতির একটি অঙ্গ। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে বাংলাদেশের প্রায় প্রতিটি বাড়িতেই পরিবারের মহিলাদের কোন না কোন গাছ এবং বিভিন্ন লতা-গুল্ম ও ফলমূলের গাছ লাগানোর অভ্যাস রয়েছে। তাছাড়া আদি পুরাতন বাড়িগুলিতে বাঁশের ঝাড় তো আছেই। কেউ পরিবার থেকে আলাদা হয়ে অন্য ক্ষেতের মাঝখানে একটি দুইটি ঘর উঠিয়ে নতুন বাড়ি করলেও বাঁশের একটি গুঁড়ি বৈশাখ/জ্যৈষ্ঠ মাসে লাগানোর অভ্যাস ছিল। হালে ইটের ও কাঠের বাড়িঘর গড়ে উঠার ফলে এ সংস্কৃতি আজ বিলুপ্তির পথে। বনজ সম্পদ আহরণের এবং ফলদ গাছ পরিচর্যা ও ব্যবস্থাপনাও একটি পুরানো সংস্কৃতি। বৃষ্টির আগে চৈত্রের শেষে এবং বৈশাখের শুরুতে আম-কাঁঠাল গাছের গোড়ায় গোবর দেয়ার ও কাঁঠালের পাতাগুলো ছেঁটে দেয়া হত যেন ফলন ভালো হয়। গাছে কলম করার প্রবণতাও গ্রামেগঞ্জে লক্ষ্য করা যেত। তাছাড়া বৃহস্পতিবার ও রবিবার দিন বাঁশঝাড় থেকে বাঁশ না কাটার একটি প্রথাও ছিল গ্রামবাংলায়। বিষয়টি কুসংস্কার যতই হোক না কেন সপ্তাহে সাত দিনের মধ্যে দুই দিন বাঁশ কাটা থেকে বিরত থাকলে পরোক্ষভাবে বাঁশ সম্পদ সংরক্ষণের একটি মনোভাব বা সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল। ধর্মীয় কারণে ক্রিসমাস বৃক্ষকে খৃস্টান ধর্মের লোকজনের বড় দিনগুলোতে ভীষণ আকর্ষণীয়ভাবে সাজানোর প্রথা রয়েছে। দক্ষিণ আমেরিকায় ও অন্যান্য দেশে দেখা গেছে প্রতিটি বাড়ির আঙিনায় অন্তত একটি করে ক্রিসমাস ট্রি রয়েছে। বড়দিনগুলোতে ঝাড় বাতি দিয়ে সাজিয়ে রাখে। মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া ও থাইল্যান্ডের জলাভূমিতে (wetland) হিজল গাছ থাকে বিশেষত জলাভূমি (swamp forest) এলাকায় রাতে যখন জোনাকী পোকা এসব হিজল গাছে বসে এবং উড়তে থাকে তখন ভীষণ আকর্ষণীয়ভাবে সাজানো (decorated) ক্রিসমাস ট্রি'র মত দেখায়। এসব দৃশ্য দেখার জন্য দক্ষিণ আমেরিকান এবং ইউরোপীয় পর্যটকদের প্রচণ্ড ভিড় দেখা যায়। দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় দেশগুলো এভাবে প্রাকৃতিক সম্পদভিত্তিক পর্যটন কেন্দ্র গড়ে তুলে প্রকৃতিকে সংরক্ষণ করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জন করে থাকে।

হিন্দু সমাজে তুলসী গাছকে পূজার উপসর্গ হিসেবে ব্যবহার করে বিধায় সাধারণত বাড়ির আঙিনায় এ গাছটি লাগানোর ও সংরক্ষণের অভ্যাস রয়েছে তাদের। ভারতের মেঘালয়, আসাম, ত্রিপুরা, মণিপুরী, অরুণাচল এবং হিমালয়ান এলাকার গবেষকদের অভিজ্ঞতা ও মাঠ

www.nagorikpathagar.org

পর্যায়ে পর্যবেক্ষণে দেখা গিয়েছে যে, বিভিন্ন উপজাতি, মন্দির, জলপ্রপাত (waterfall) যেমন চেরাপুঞ্জি, বড় জলধার এবং পাহড়ের উঁচু টিলায় বড়বৃক্ষের গোড়ায় বেশ কিছুটা জায়গাকে তারা "পবিত্র গ্রোভ" (Sacrad Grove) হিসেবে সংরক্ষণ করে সেখান থেকে কোন গাছ পাতা আহরণ করা পাপ অথবা অকল্যাণ বয়ে আনতে পারে বলে তারা মনে করে। এসব সংরক্ষিত এলাকা হালে স্থানীয় লোকজনের অংশগ্রহণের মাধ্যমে পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে গড়ে উঠেছে। এসব স্থানীয় সংস্কৃতি ও মূল্যবোধকে আধুনিকায়ন করে স্থানীয় জনগণকে সম্পৃক্ত করে টেকসই ব্যবস্থাপনার জন্য দক্ষিণ এশিয়া এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ান দেশগুলোতে ব্যাপক উদ্যোগ পরিলক্ষিত হচ্ছে। এসব উদ্যোগ ও প্রয়াসকে আরো উৎসাহিত করে জীববৈচিত্র্যের সংরক্ষণ ও টেকসই ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা যেতে পারে।

ইতিমধ্যে বাংলাদেশে নিম গাছ চাষের বিষয়ে ব্যাপক সচেতনতা সৃষ্টি হয়েছে। নিমের পাতা, ছাল ও ডালের উপকার প্রায় সর্বজন স্বীকৃত। তাবলীগ জমায়েতসহ সাধারণ মুসলমান নিমের ডাল দিয়ে দাঁত মাজন করে সওয়াব এবং বিরাট উপকার রয়েছে বলে এ বিশ্বাসে ব্যবহার করে। তেমনি অর্জুন, আমলকী ইত্যাদির ঔষধি মূল্য সম্বন্ধে অনেক মানুষই যথেষ্ট সচেতন। এমন ধরনের অনেক বিলুপ্তপ্রায় মূল্যবোধ ডকুমেন্ট করে তা আগামী দিনের প্রজন্মের কাছে তুলে ধরলে নিঃসন্দেহে তা জীববৈচিত্র্যের সংরক্ষণে সহায়ক হতে পারে।

জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে এ দেশের খনার বচনে অসংখ্য রচনা রয়েছে ঃ

খনা বলে শোন শোন। শরতের শেষে মুলা বোন ॥
তামাক বুনে গুঁড়িয়ে মাটি। বীজ পুঁত গুটি গুটি ॥
ঘন রূপে পুঁত না। পৌষের অধিক রেখো না ॥ .... নবযুগ পঞ্জিকা

বলে গেছে বরাহের পো। দশটি মাস বেগুন রো ॥
চৈত্র বৈশাখ দিবে বাদ। ইহে নাই কোন বিবাদ ॥
পোকা ধরলে দিবে ছাই। এর চেয়ে ভাল উপায় নাই ॥
মাটি শুকাইলে দিবে জল। সকল মাস পাবে ফল ॥
বেগুন তোল বারবার। আলু তোল একবার ॥ .... সিলেট

অর্থাৎ ঃ সময়মত একেবারেই সব আলু উঠাতে হয়, বারবার আলু উঠানো যায় না কিন্তু বেগুন সর্বদাই উঠাতে হয়।

পটোল বুনলে ফাগুনে। ফল বাড়ে দ্বিগুণে ॥ - নবযুগ পঞ্জিকা

অর্থাৎ ঃ ফাল্গুন মাসই পটোল লাগাবার প্রকৃষ্ট সময়। তার পূর্বেও পটোল বোনা যায়। আধুনিক কৃষিবিদগণ কার্তিক-ফাল্গুন পর্যন্ত পটোলের লতা মূল লাগানোর কথা বলেন। ২৪ পরগনায় ব্যাপক পটোলের চাষ হয়। খনা ২৪ পরগনার লোক, তা পরোক্ষভাবে প্রমাণ করে।

উঠান ভরা লাউ শসা। খনা বলে লক্ষ্মীর দশা ॥ ..... নবযুগ পঞ্জিকা

www.nagorikpathagar.org

অর্থাৎ ঃ বাড়ির আঙিনায় লাউ-শসা জন্মিলে বাড়তি লাভ পাওয়া যায়।

তুঃ জমি অভাবে উঠোন চষা। - প্রবাদ
উঠান ভরা শস্য ছিলো, হাস্য ভরা দেশ। -নজরুল
উঠানের এক কোণে শাকতে করো,
মাচায় কুমড়া কদু ফলে বড়ো বড়ো। -বন্দে আলী

লাউ গাছে মাছের জল। ধেনো মাটিতে বাড়ে ঝাল ॥ ..... নবযুগ পঞ্জিকা

পাঃ লাউয়ের বল মাছের জল। ধেনো মাটিতে ঝাল প্রবল ॥

...... বাংলা প্রবাদ

চৈত বৈশাখে লাগাইয়া ঝাল। সুখে কাটায় বর্ষাকাল ॥

অর্থাৎ ঃ বোরো মরিচ চৈত্র-বৈশাখে রোপণ করলে সারা বর্ষা মৌসুমই ফল পাওয়া যায়।

চাল ভরা কুমড়া পাতা। লক্ষ্মী বলেন আমি তথা ॥ ..... নবযুগ পঞ্জিকা

এ পাঠটি এবং উড়িয়া পাঠ সম্পূর্ণ এক- আ-কার ই-কারেও বেশকম নেই। সুতরাং এ পাঠটিকেই মৌলিক ধরা যায়।

পাঃ বৈশাখ মাসে হলুদ রো। দারা পাশা ফেলিয়ে থো ॥
আড় হাওনে নিড়ায়ে মাটি। ভাদরে নিড়ায়ে করহে খাঁটি ॥
অন্য নিয়মে পুঁতিলে হলদি। মাটি বলে তাতে কি ফলদি ॥ .... সিলেট

হলুদের কণা। আদার ফণা ॥ .... গফরগাঁও

অর্থাৎ ঃ হলুদ কেটে কেটে লাগানো যায় কিন্তু আদা ফানায় ফানায় লাগাতে হয়।

বাঁশের ধারে হলুদ দিলে। খনা বলে দ্বিগুণ ফলে ॥
অর্থ ঃ বাঁশঝাড়ের ধারে হলুদ ভালো ফলে।

আজও এক প্রকার হলুদ আছে, যার নাম বাঁশ-ঝাড়ী। অপর একটি বচনে বাঁশঝাড়ের ধারে আলু লাগালে ভালো ফলে বলা হয়েছে। বাড়ির আঙিনায় মরিচ ও মুলা, ঘরের আশেপাশে লাউ কুমড়া এবং জমির আইলে শসা ইত্যাদি করার জন্যে সুপারিশ রয়েছে অন্যান্য বচনে। পতিত জমি কাজে লাগানোই এর উদ্দেশ্য।

পান পুঁতে শাওনে। খেয়ে না ফুরায় রাবণে ॥
তুঃ পান রূপিলে শ্রাবণে। লাভ হয়ে দ্বিগুণে ॥
খাইলে বাহিলে ন হয়ে শেষ। খনা বলে ঘেন এ উপদেশ ॥ ..... উড়িয়া
ঘেন= গ্রহণ কর

www.nagorikpathagar.org

এখানে বাংলা ও উড়িয়া বচনগুলোর বক্তব্য অভিন্ন অর্থাৎ শ্রাবণে পান রোপণ করলে প্রচুর ফলে। উড়িয়া বচনটিতে অর্থ স্পষ্ট হয়েছে।

পান লাগালে শ্রাবণে। খেয়ে না কুলায় রাবণে ॥

অর্থাৎ ঃ শ্রাবণ মাসে পান রোপণ করলে এত বেশি হয় যে, রাক্ষসের মতো খেলেও ফুরোয় না। মতান্তরে, শ্রাবণ মাসের পান পিত্ত বর্ধক বলে রসও জারতে পারে না।

খনার বচনের প্রায় সর্বত্রই নঞর্থক অব্যয় ক্রিয়ার অগ্রে বসেছে, যা বাংলা ভাষার প্রাচীন শব্দ-সমাবেশ।

ফাগুনে আগুন চৈতে মাটি। বাঁশ বলে শীঘ্র উঠি ॥
চৈতে আগুন বৈশাখে মাটি। বাঁশ বলে উঠি উঠি ॥
ফাল্গুনে ছালি চৈতে মাটি। বাঁশ বলে শীঘ্র উঠি ॥
খনা ডাক দিয়ে কয়। একথা না মিথ্যা হয় ॥ ....চব্বিশ পরগনা
ঈাঃ ফাল্গুনে-আগুনে চৈত্রে মাটি। বাঁশ বলে শীঘ্র উঠি ॥ ....নবযুগ পঞ্জিকা

অর্থাৎ ঃ ফাল্গুন মাসে বাঁশের ঝাড়ে পতিত শুষ্ক পাতা পুড়িয়ে চৈত্র মাসে মাটি-চাপা দিলে বাঁশ শীঘ্র বর্ধিত হয় ও নতুন কড়ল গজায়।

অর্থাৎ ঃ বাঁশের ঝাড়ের আগাছা ও পতিত শুকনো পাতা পুড়িয়ে ঐ ছাই-এর ওপর চৈত্র মাসে মাটি ফেলে পরিপাটি করে দিতে হবে। তাহলে দেখবে বাঁশ কি প্রকার বাড়ে।

ফাল্গুন চৈতে গর্ত করি। গুয়ে গোবরে রাখ ভরি ॥
বৈশাখে জ্যৈষ্ঠের বৃষ্টিপাতে। বাঁশের চারা দিবে পুঁতে ॥
পাঃ বৈশাখ (অ)

অর্থাৎ ঃ ফাল্গুন-চৈত্র মাসে গর্ত করে মানুষের বিষ্ঠা ও গোবর দিয়ে পূর্তি করে রাখতে হবে। বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠে বৃষ্টি হলে গর্তে বাঁশের চারা লাগিয়ে দিতে হবে। মানুষের বিষ্ঠা বাঁশের উৎকৃষ্ট সার। এ জন্যেই সম্ভবত গাঁয়ের মানুষ বাঁশের ঝাড়ে মলত্যাগ করে। এটা নিশ্চয়ই খনার বচনের প্রভাবে সৃষ্ট একটি প্রাচীন প্রথা।

বাঁশ মরে ফুলত। মানুষ মরে ভুলত ॥

অর্থাৎ ঃ ফুল আসলে বাঁশ মারা যায়। ভুল মানুষের অসাধারণ ক্ষতি করে।

এ বচনটি প্রবাদের প্রকৃতি পরিগ্রহ করেছে।

গোয়ে গোবরে বাঁশে মাটি। অফলা নারিকেল শিকড় কাটি ॥ ...... নবযুগ পঞ্জিকা

অর্থাৎ ঃ মানুষের বিষ্ঠা ও গোবর মিশ্রিত মাটি বাঁশের জন্য উপকারী। সাংকেতিক ভাষা এ বচনেও ব্যবহৃত।

www.nagorikpathagar.org

নারিকেল গাছের ছাই। যেমন পড়িব হর ভাই ॥
সফা করিব তারই মূল। খনা কহে ফলিব ফল ॥

অর্থাৎ ঃ নারিকেল গাছ যেন ছায়ায় না পড়ে, আর নারিকেল গাছের গোড়া সাফ করে দিতে হবে, তবেই ফল ফলবে।

শুনরে বাপু চাষার বেটা। মাটির মধ্যে বেলে যেটা ॥
তাতে যদি বুনিস পটোল। তাতে তোর আশা সফল ॥

মধুমাসের ত্রয়োদশ দিনে যদি হয় শনি।
খনা বলে সে বছর হবে শস্যহানি ॥ -নবযুগ পঞ্জিকা

জ্যৈষ্ঠে খরা আষাঢ়ে ভরা। শস্যের ভার সহে না ধরা ॥
শাকের রাজা পুঁই। মাছের রাজা রুই ॥

ফাল্গুনে ফুল, চৈতে কড়া, বৈশাখে বড়া।
জ্যৈষ্ঠে মিষ্টি ফল। আষাঢ়েতে নিঝুম জল ॥ -কুমিল্লা

এদেশের খনার বচন ও প্রচলিত গ্রামীণ সংস্কৃতি থেকে স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয় যে, প্রকৃতি অত্যন্ত সমৃদ্ধ ছিল, নীর্ধির করার বিষয় ও বস্তু সমৃদ্ধ এবং ব্যবহারিক বিজ্ঞান খনার বচনের মধ্যে গড়ে উঠেছিল, যা সংরক্ষণ না করলে হারিয়ে যাবে। জীববৈচিত্র্য গাছপালা ও গুল্মলতা লাগানো ও পরিচর্যার জন্য স্থানীয় সংস্কৃতিভিত্তিক ম্যানুয়েল তৈরি করা যেতে পারে।
খনার বচন ও গ্রামীণ সংস্কৃতি চর্চার অন্য প্রত্যক্ষ সুফলের প্রত্যক্ষ উল্লেখযোগ্য দিক গৃহ আঙিনায় বনায়নের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন ত্বরান্বিত করা যেতে পারে, বিশেষত গ্রামীণ মহিলাদের তাতে ক্ষমতায়ন বৃদ্ধি পাবে। দ্বিতীয়তঃ অতিসহজেই গ্রামীণ পুষ্টি বৃদ্ধি করা সম্ভব হচ্ছে, যা খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করায় সহায়তা করে।

প্রতিবেশগত ভিন্নতার ভিত্তিতে বাংলাদেশের জীববৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ এলাকা

প্রতিবেশগত কারণে বাংলাদেশের জীববৈচিত্র্য সম্পদের অবস্থান ও প্রকৃতি এলাকা ভেদে ভিন্ন। এ পরিপ্রেক্ষিতে নিম্নে বাংলাদেশের জীববৈচিত্র্য সমৃদ্ধ এলাকাগুলোর সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেয়া হল ঃ

পার্বত্য চট্টগ্রামের বনাঞ্চল ও জীববৈচিত্র্য

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে বাংলাদেশের বৃহত্তর এবং সমৃদ্ধতম এক বিরাট এলাকার বনভূমি রয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের ৩টি এলাকার মোট ৭০৪০ বর্গ কিলোমিটার এলাকা বনাচ্ছাদিত ভূমি রয়েছে। এই পার্বত্য বনরাজির তলদেশজুড়ে বিস্তীর্ণ বাঁশবন। এছাড়া এ অঞ্চলে বিভিন্ন প্রজাতির শ্যাওলা, অর্কিড ও অন্যান্য পরাশ্রয়ী উদ্ভিদ রয়েছে। এ বনাঞ্চলে ৬১ প্রজাতির স্তন্যপায়ী জীব, বিভিন্ন ধরনের পাখি, সরীসৃপ এবং জলচর পাখি রয়েছে। এছাড়াও বিভিন্ন প্রকার দুস্প্রাপ্য প্রজাতির প্রাণী রয়েছে যেমন, এশীয়

www.nagorikpathagar.org

হাতি, বাঘ, চিতাবাঘ, ভাল্লুক, অজগর সাপ, বুনো শূকর এবং সাদা ও অন্যান্য বন ঘুঘুও দেখা যায়। দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে, ৭ হাজার বর্গ কিলোমিটার বনাঞ্চলের মধ্যে ১৫৩৮.৭৯ বর্গ কিলোমিটার রিজার্ভ ফরেস্ট, বাকি ৫৪৫২.৫০ বর্গ কিলোমিটার অশ্রেণীভুক্ত, রাষ্ট্রীয় বনাঞ্চলের বেশিরভাগ বৃক্ষরাজি উজাড় হয়ে শুধু ঝোপঝাড় এবং নতুন বনায়নের আওতাধীন কিছু বন রয়েছে। এ ব্যাপক হারে বন ধ্বংসের ফলে উদ্ভিদ প্রজাতির মতই দুর্লভ প্রজাতির প্রাণীরও ব্যাপক হারে বিলুপ্তি ঘটছে।

চিত্র ১.৪ ঃ পার্বত্য চট্টগ্রাম প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি

সুন্দরবনের বনাঞ্চল ও জীববৈচিত্র্য

বাংলাদেশের প্রধান বনাঞ্চল হল সুন্দরবন। পৃথিবীর দীর্ঘতম ম্যানগ্রোভ বনভূমির মোট আয়তন ১০,০০০ হেক্টর স্থল ও জলাভূমি। এই বনাঞ্চলে ৩৩০ প্রজাতিরও বেশি সংখ্যক ম্যানগ্রোভ উদ্ভিদ রয়েছে। উল্লেখযোগ্য উদ্ভিদ সুন্দরী, গেওয়া, গোলপাতা ইত্যাদি। এই বনাঞ্চলের বিভিন্ন শ্রেণীর পশুপাখির সংখ্যা ও অসংখ্য প্রজাতির জীববৈচিত্র্য বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এখানে ১২০ প্রজাতির বিভিন্ন মাছ, ৬০ প্রজাতির ছোট-বড় চিংড়ি, ২৭০টিরও বেশি প্রজাতির পাখি এবং ৪২ প্রজাতির স্তন্যপায়ী জীবজন্তু রয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য রয়েল বেঙ্গল টাইগার, চিত্রল হরিণ, রীসাস বানর রয়েছে। ৫০টি সরীসৃপ জাতীয় প্রজাতি দেখা যায় যেমন বড় কুমির, অজগর এবং ৮ প্রজাতির উভচর প্রাণী রয়েছে। সুন্দরবনের এ বিশাল সম্পদও দক্ষ ব্যবস্থাপনার অভাবে দ্রুত ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে।

www.nagorikpathagar.org

চিত্র ১.৫ ঃ অপরূপ সৌন্দর্যে সুন্দরবন ম্যানগ্রোভ

অনুরূপভাবে চকোরিয়া সুন্দরবন নামে অন্য একটি ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল রয়েছে কক্সবাজার এলাকায়। ক্রমবর্ধমান চিংড়ি চাষের ফলে আজ তা বিলুপ্তপ্রায়। সুন্দরবনের জীববৈচিত্র্যে অর্থনৈতিক তাৎপর্য ছাড়াও হালে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে দক্ষিণাঞ্চলের জলোচ্ছ্বাস ও সিডরের আঘাত থেকে দেশ রক্ষা করার অত্যন্ত শক্তিশালী প্রাকৃতিক দেয়াল। তাছাড়া লোনা পানি ও মিষ্টি পানির সংযোগস্থল হওয়ায় মৎস্য সম্পদের গুরুত্বপূর্ণ প্রজননস্থলও (Breeding Ground) দ্রুত বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে।

ঢাকা-মধুপুর বনাঞ্চল ও জীববৈচিত্র্য

প্রায় ৯৫২ কিলোমিটার বিস্তৃত এ বনাঞ্চল। এ অঞ্চলের প্রধান প্রজাতির বৃক্ষ হচ্ছে শাল এবং ১৪০ প্রজাতির পাখি, তাছাড়া ২১ প্রজাতির স্তন্যপায়ী জীব রয়েছে। পূর্বে এ বনে এক শৃঙ্গ গণ্ডার, বাঘ, চিতাবাঘ এবং হাতিও পাওয়া যেত। বর্তমানে এসব প্রজাতি এ অঞ্চল থেকে একেবারেই বিলুপ্ত হয়ে গেছে। সোহরাওয়ার্দী ও রমনা পার্ক ঢাকা শহরের কেন্দ্রবিন্দুতে বিশাল এলাকায় বিস্তৃত। দেশি-বিদেশি ৭১টি প্রজাতির উদ্ভিদ রয়েছে এখানে। এর মধ্যে রমনা পার্কে ৩০ মিটার প্রশস্ত এবং ৮০০ মিটার দৈর্ঘ্যের একটি লেকও রয়েছে এখানে। সেখানে বিভিন্ন প্রজাতির মাছ পাওয়া যায়। সোহরাওয়ার্দী পার্ক ৮৩ একর বিস্তৃত জায়গাজুড়ে। এখানেও ৭১টি প্রজাতির উদ্ভিদ রয়েছে।

www.nagorikpathagar.org

চিত্র ১.৬ : বিলুপ্তির পথে ভাওয়াল মধুপুর শালবনের জীববৈচিত্র্য

৭৫ মিটার X ১০০ মিটারের একটি পুকুরও রয়েছে। ৩৫টি গোত্রের ৯৬টি প্রজাতির প্রাণী রয়েছে। এর মধ্যে ২৯টি প্রজাতির প্রাণী শীতকালে আসে। ২৩টি প্রজাতির পাখি এখানে ডিম ও বাচ্চা দেয়।

জলাভূমি (Wetland) ও জীববৈচিত্র্যের আবাসস্থল

বাংলাদেশ জলাভূমির দেশ। রামসার কনভেনশনের সংজ্ঞা অনুসারে, বাংলাদেশের মোট ভূমির দুই-তৃতীয়াংশই ওয়েটল্যান্ড বা জলাভূমি। দেশের ৬.৭ শতাংশ সারা বৎসর পানিতে নিমজ্জিত থাকে। এর বিরাট অংশ মারাত্মকভাবে বন্যাকবলিত থাকে এবং প্রায় ৩৫% এলাকা হালকা বন্যায় প্লাবিত হয় (এফএও ১৯৮৮ ও বাংলাদেশ পরিবেশ চিত্র ২০০১;পৃ ০৩)।

বাংলাদেশের জলাভূমিসমূহকে নিম্নোক্তভাবে শ্রেণীভাগ করা যেতে পারে, ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট এলাকায় ৫৭৭,১০০ হেক্টর এলাকা প্রাকৃতিক লেক (রেইন থাইয়োন কাইন, বোগা কাইন এবং আগুলিয়া), কৃত্রিম জলধারা (কাপ্তাইলেক), পরিষ্কার পানির জলাভূমি ৪০০ হাওর, ৫৪৮৮ হেক্টর বাঁওড়, ১,০০০টি বিল এবং ১১৫,০০০ হেক্টর ছোট পুকুর ও মাছের পুকুর। ৯০,০০০-১,১৫,০০০ হেক্টর চিংড়ি চাষের জলাশয়। এই বিশাল জলাভূমির প্রাণী সম্পদ অসংখ্য। এসব জলাশয়ে ছোট-বড় চিংড়ি ছাড়া ঘড়িয়ালসহ নানা প্রজাতির সরীসৃপ প্রায় ২৫ প্রজাতির কাছিম, কাইট্টা, গঙ্গাশালুক এবং ১৫০ প্রজাতির জলচর পাখি রয়েছে, যার মধ্যে প্রায় ৭০ প্রজাতির জলচর পাখি একেবারে দুষ্প্রাপ্য।

www.nagorikpathagar.org

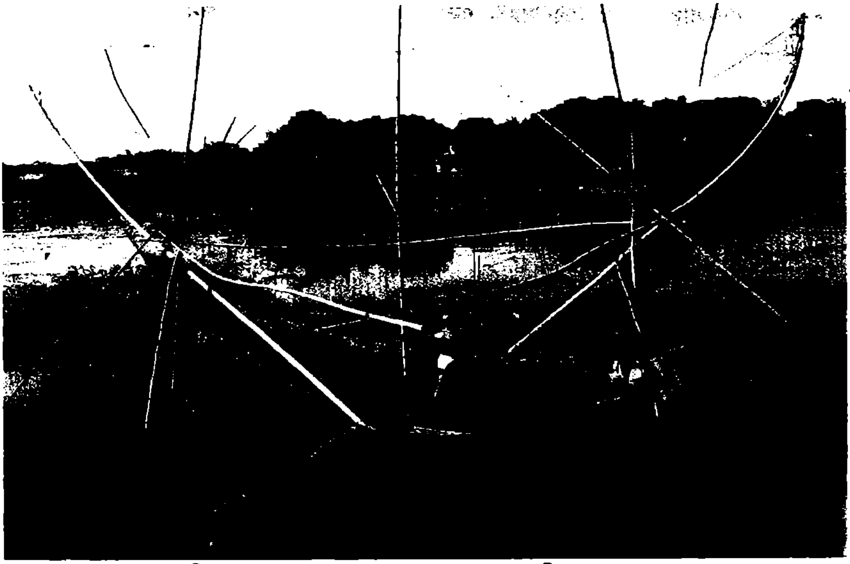

চিত্র ১.৭ঃ Open access জলাশয় সহজলভ্য পুষ্টির সন্ধানে।

দেশের সবচেয়ে বড় জলাভূমি বলতে এখনো সিলেট-ময়মনসিংহের হাওর এলাকাকেই বুঝায় যা প্রকৃত পক্ষে মেঘনা নদীর বিস্তীর্ণ বর্ষা প্লাবিত ভূমি। বর্ষায় এ এলাকার বিল অঞ্চল পানিতে ডুবে গিয়ে এক অবিচ্ছিন্ন ও বিশাল জলাভূমিতে পরিণত হয়। এসব নদী-নালায়, হাওর, বাঁওড় এবং বিলে প্রচুর পরিমাণে সুস্বাদু মাছ পাওয়া যায়। ২৫ প্রজাতির কাছিম ও কাইট্টা পাওয়া যায়। উপকূলীয় অঞ্চলে ৪৭৫ প্রজাতির মাছ পাওয়া যায়। এদের মধ্যে ৬৫ প্রজাতির মাছ সাধারণত ব্যবসায়িক ভিত্তিতে আহরণ করা হয়ে থাকে (বাংলাদেশ পরিবেশ চিত্র ২০০১)।

জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে উদ্ভিদ জীববৈচিত্র্যের গুরুত্বের বিষয় আলোকপাত করা যেতে পারে। এক সময় বাংলাদেশে প্রায় ১০,০০০ প্রজাতির ধানের চাষ হত। বর্তমানে উচ্চ ফলনশীল প্রজাতির ধানের চাষ ব্যাপকভাবে বাড়ায় অন্যসব প্রজাতির অধিকাংশই প্রায় বিলুপ্তির পথে। ফলে দেশে ঐতিহ্যবাহী নানা প্রজাতির দেশীয় গম ও ধানের চাষ আজ হারিয়ে যেতে বসেছে। বরিশালের বাগান এবং ময়মনসিংহের বিল আজ বিলুপ্তপ্রায়। সর্বোপরি উদ্ভিদের গুণাবলি সম্বন্ধে বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল দেশে সচেতনতার অভাব রয়েছে।

পরিবেশ সংকটাপন্ন ঘোষিত এলাকায় জীববৈচিত্র্যের অবস্থা

বাংলাদেশের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের গুরুত্বের কথা বিবেচনা করে উপকূলীয় এলাকায় জীববৈচিত্র্যের আবাসস্থল হিসেবে মোট ১৬,০০০ হেক্টর এলাকা চিহ্নিত করা হয়েছে। এছাড়াও অতিরিক্ত ২০,০০০ হেক্টর এলাকার পরিবেশও সংকটাপন্ন। বাংলাদেশের সমুদ্র

পরিবেশ/২—

www.nagorikpathagar.org

উপকূলীয় এলাকায় জীববৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ এলাকাগুলোর গুরুত্ব নিম্নে বর্ণনা করা হল।

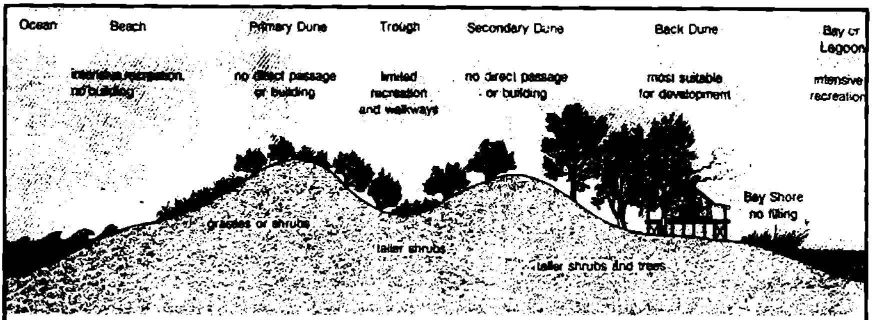

চিত্র ১.৮ ঃ সমুদ্র তীরে ভূমি সংরক্ষণের জন্য বালুস্তূপ (Dune)

উৎস ঃ T. Miller, 1997

টেকনাফ উপদ্বীপ- টেকনাফ ৮০ কিলোমিটার দীর্ঘ সমুদ্র সৈকত, যা প্রায় ১১,৬১৫ হেক্টরব্যাপী বিস্তৃত। এ সৈকত ইন্দো-হিমালয়ান এবং ইন্দো-মালেয়ান প্রতিবেশ উপ-অঞ্চলের বিচিত্র প্রাণীর প্রাপ্তি ও অবস্থান এবং প্রান্তিকালীন আবাসস্থল হিসেবে এর গুরুত্ব অপরিসীম। এ এলাকাটি আন্তর্জাতিকভাবে গুরুত্বসম্পন্ন চার ধরনের প্রজাতির প্রাণীর আবাসস্থল ও সূতিকাগার হিসেবে বিবেচিত। সেগুলো হচ্ছে উপকূলীয় কচ্ছপ (Turtles), অতিথি পাখিদের নিরাপদ আহার স্থান, বিচিত্র দেশীয় পাখির চারণভূমি এবং আন্তর্জাতিক গুরুত্বপূর্ণ সংকটাপন্ন সামুদ্রিক স্তন্যপায়ী প্রাণীর (Threatened marine mamals) আবাসস্থল। এ তথ্যানুসারে এ এলাকায় ৮৭ প্রজাতির প্রাণী, ৪২ প্রজাতির স্তন্যপায়ী প্রাণী, ৪০ প্রজাতির সরীসৃপ, ৪ প্রজাতির উভয়চর এবং ৩৭ প্রজাতির পাখি দেখা যায়। এছাড়া ১১২ প্রজাতির উদ্ভিদও রয়েছে (BCAS, ১৯৯৭)।

সেন্ট মার্টিন - বাংলাদেশের একটি প্রধান শৈবাল দ্বীপ। ইহা Coral algai and community rockcy reefs'এর আবাসস্থল হিসেবে অতীব গুরুত্বপূর্ণ (Tomasceik, 1998)। এ দ্বীপটি জৈব ও অজৈব সম্পদের অবস্থানের জন্য পরিবেশগত দিক দিয়ে বাংলাদেশে অদ্বিতীয়। এ শৈবাল দ্বীপটিও সামুদ্রিক কচ্ছপের (Turtles) সূতিকাগার এবং আন্তর্জাতিক যাযাবর পাখি (Migratory) ও জলচর দীর্ঘপদ পাখি (Wader) এর চারণভূমি।

সোনাদিয়া - এ এলাকাটি বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলীয় এলাকার ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চলের শেষাংশ। এ ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চলটি সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভের চেয়ে ভিন্ন। কারণ এখানে বহু প্রজাতির পাখি এবং অত্যন্ত সমৃদ্ধ mullusks, echinoderms এবং সামুদ্রিক কচ্ছপ রয়েছে।

বিভিন্ন গবেষণা ও পর্যবেক্ষণ থেকে উপরোক্ত এলাকাগুলোর জীববৈচিত্র্য ধ্বংসের জন্য

www.nagorikpathagar.org

নিম্নোক্ত কারণগুলোকে চিহ্নিত করা হয়েছে :

- জ্বালানী হিসেবে নির্বিচারে ম্যানগ্রোভ বন নিধন। ১৯৮৩ সালে টেকনাফে গ্যাস অনুসন্ধান অবকাঠামো ও কার্যক্রম শুরু;
- এসব এলাকায় নির্বিচারে অবৈধভাবে সামুদ্রিক কচ্ছপ এবং এদের ডিম আহরণ;
- ধ্বংসাত্মক পদ্ধতিতে মাছ চাষ এবং মৎস্যসম্পদ আহরণ;
- সামুদ্রিক পাখিদের নির্বিচারে শিকার করা;
- অনিয়মিত ও অবৈধভাবে পশু চারণের ফলে ম্যানগ্রোভের দ্রুত ক্ষতি সাধন;
- অনিয়ন্ত্রিত ও অপরিকল্পিত পর্যটন ব্যবসা সম্প্রসারণ।

তাছাড়া জীববৈচিত্র্যের সমৃদ্ধ এলাকাসমূহে কৃষি সম্প্রসারণ, লবণ চাষ, শিল্প কারখানা স্থাপন এবং পর্যটনের ভৌত অবকাঠামো উন্নয়নের ফলে জীববৈচিত্র্যের চারণভূমি দ্রুত বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। পর্যটন, শিল্প কারখানার বর্জ্য (waste) নির্গমন এবং কৃষিতে রাসায়নিক সার ব্যবহার ও মানুষের বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের ফলে ভূমিসহ অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদ দ্রুত দূষিত হয়ে যাচ্ছে। মৎস্য চাষীদের অস্থায়ী আবাসন নির্মাণ ও ট্রাফিক ইত্যাদির কর্মকাণ্ডের ফলে বালুর পাহাড়গুলো দ্রুত নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এসব অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের ফলে কচ্ছপের আবাসস্থলসহ অন্যান্য বন্য প্রাণীর আবাসস্থল মারাত্মক হুমকির সম্মুখীন।

হাকালুকি হাওর- এ হাওরটিকে বন্যপ্রাণীদের অভয়ারণ্য হিসেবে ঘোষণা করা হয় ১৯৭৪ সালে। এ হাওরে ১০০ প্রজাতির বিভিন্ন উদ্ভিদ (গাছ, ঘাস, বাঁশ, বনলতা ইত্যাদি) এবং ৬৫ প্রকার প্রাণী প্রজাতি রয়েছে (BCAS, 1997)। এ হাওরটি প্রায় ১৮,৩৮৩ হেক্টর এলাকাব্যাপি বিস্তৃত। বিচিত্র ওয়াটার ফাউলস-এর জন্য এ হাওরটির গুরুত্বও অপরিসীম। এ হাওরটি যাযাবর উপকূলীয় পাখি এবং মৎস্যসম্পদের সূতিকাগার হিসেবে অত্যন্ত তাৎপর্য বহন করে। এ হাওরের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সমস্যাগুলোর মধ্যে হচ্ছে, দ্রুত কৃষি সম্প্রসারণের ফলে ছনমহল (Reed land), জলাভূমি বন (Swamp forest) বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। ব্যাপক সেচের জন্য পানি নিষ্কাশন এবং পলি পড়ে এ হাওরটি দ্রুত বিলীন হওয়ার পথে। সে সাথে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে মাছের আবাসস্থল। কৃষিতে রাসায়নিক দ্রব্য সামগ্রীর ব্যবহার মৎস্যের আবাসস্থলগুলোকে দূষিত করে তুলেছে। নিম্নোক্ত কারণগুলোকে প্রধানত হাকালুকি হাওরের জীববৈচিত্র্য বিলুপ্তির জন্য দায়ী বলে চিহ্নিত করা হচ্ছে ঃ যেমন- বিলগুলি লিজ দিচ্ছে ভূমি মন্ত্রণালয়, আর CDM coastal Development and Management (CDMP) বাস্তবায়ন করছে পরিবেশ অধিদপ্তর। তাদের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে মারাত্মকভাবে।

- এ সম্পদ সংরক্ষণে কোন আইনগতভাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান নেই। তাছাড়া কোন সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষও গড়ে উঠেনি।
- স্থানীয় জনগণের নীতি নির্ধারণে ও ব্যবস্থাপনায় অংশগ্রহণের সুযোগ সীমিত, ফলে সময়োপযোগী ও বাস্তবায়নযোগ্য কৌশল ও নীতির অভাব রয়েছে।
- প্রাকৃতিক সম্পদ সংক্রান্ত তথ্যের অভাবে, সম্পদের বর্তমান অবস্থা ও বিলুপ্তির পরিমাপ

www.nagorikpathagar.org

নির্ণয় করা সম্ভব হচ্ছে না।

- বাস্তব জ্ঞান সচেতনতার অভাব, বিকল্প জ্বালানী ও পশু খাদ্যের অভাব, কারিগরি দক্ষতা ও দুর্বল সংরক্ষণ ব্যবস্থাপনার অভাব। মোট কথা, সমন্বিত পরিবেশ ব্যবস্থাপনার অভাবেই এ হাওরের জীববিচিত্র্যার দ্রুত বিলুপ্তি ঘটছে।
- সরেজমিনে পরিদর্শন করে দেখা যায় যে, হাওরের প্রায় প্রতিটি বিল ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক লীজ দেয়ার ফলে লীজিগণ ইচ্ছেমত মাছ চাষ করে হাওরের জীববৈচিত্র্য ধ্বংস করে দিয়েছে। ECA ঘোষণার কোন কার্যকারিতাই মাঠে পরিলক্ষিত হচ্ছে না, যা পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব।

টাংগুয়ার হাওর - দেশের অন্যতম জলাভূমি হিসেবে টাংগুয়ার হাওরের প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণের মূল্য অত্যধিক। শীতের মৌসুমে এ হাওরে ৬০ হাজারেরও বেশি অভিবাসনকারী অতিথি পাখি এবং স্থানীয় পাখির আগমন ঘটে। এ হাওরে রয়েছে প্রায় ১৪০ প্রজাতির মাছ। এ ছাড়াও ১৭টি বিপন্নপ্রায় মাছের প্রজাতিও রয়েছে এ হাওরে। এ এলাকায় ৮৬টি গ্রামে ৫২,০০০ লোকের বাস। তাদের অধিকাংশই কৃষি কাজ এবং মাছ চাষ করে জীবিকা নির্বাহ করে। পরিকল্পিত ব্যবস্থাপনার অভাবে টাংগুয়ার হাওরের বর্তমান সমস্যাগুলো প্রকট বলে প্রতীয়মান হচ্ছে ঃ

- নির্বিচারে অবৈধভাবে মাছ আহরণের ফলে মাছ উৎপাদন দ্রুত হ্রাস পাচ্ছে।
- মাছ ছাড়াও অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদ দ্রুত হ্রাস পাচ্ছে, যেমন ছন সম্পদ, পাথর ও বালু।
- শিকারীদের উৎপাতের ফলে প্রতি বৎসর আগত যাযাবর অতিথি পাখির সংখ্যা কমে যাচ্ছে।
- নির্বিচারে অবৈধভাবে আহরণের ফলে জলাভূমি বন (Swamp Forest) বিপন্ন হবার পথে।
- IUCN Community Based হাওর ব্যবস্থাপনার জন্য ৮০টি সমিতি গঠন করেছে। তারা বেশ সংগঠিত। তারা বর্তমানে জীবিকা নির্বাহের জন্য মাছ ধরার অধিকার চায়। লীজ প্রথা বাতিলে স্থানীয় জনগণ অত্যন্ত আনন্দিত। সমিতির মাধ্যমে জেলা প্রশাসন ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের তত্ত্বাবধানে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে প্রকৃত মৎস্য চাষীদের মাছ ধরার অধিকার দেয়া পেতে পারে। তাদেরকেই এ সংরক্ষণের দায়িত্বও ন্যস্ত করা যেতে পারে। সিলেট বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা প্রশাসন এবং স্থানীয় জনগণ এ অভিমত প্রকাশ করেন।

দেশের সামগ্রিক জীববৈচিত্র্যের অবস্থা ও ব্যবস্থাপনা পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, মূলত সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার অভাবে বাংলাদেশে জীববৈচিত্র্যের দ্রুত বিলুপ্তি ঘটছে। সামগ্রিকভাবে জীববৈচিত্র্যের দ্রুত বিলুপ্তির জন্য নিম্নোক্ত কারণগুলো উল্লেখযোগ্য।

(ক) বাংলাদেশে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে যথাযথ উদ্যোগ ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার অভাব;

(খ) জীববৈচিত্র্য ও শস্য-উদ্ভিদের জেনেটিক বৈচিত্র্য সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয়

www.nagorikpathagar.org

বিজ্ঞানসম্মত জ্ঞান, প্রাতিষ্ঠানিক নেটওয়ার্ক এবং প্রশিক্ষণের অভাব;

(গ) বর্তমানে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের জন্য সরকারি বন বিভাগ কর্তৃক কয়েকটি নির্দিষ্ট বনাঞ্চলকে বন্য প্রাণীর অবাধ বিচরণের জন্য অভয়ারণ্য হিসেবে ঘোষণা করেছে। কিন্তু বন্য প্রাণীর সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণের জন্য কোনো নির্দিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও কর্তৃপক্ষ নেই। তাছাড়া প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনায় অন্যান্য প্রতিষ্ঠান ও স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণের অভাব;

(ঘ) বনভূমির অন্তর্গত জলাভূমিতে বসবাসকারী জলচর প্রাণী ও জলজ উদ্ভিদ সংরক্ষণের কোন ব্যবস্থাপনা এবং কার্যকরী পদক্ষেপ এখনো গ্রহণ করা হয়নি;

(ঙ) বনভূমি এলাকার অন্তর্ভুক্ত জল ও স্থলভাগ ছাড়াও দেশের অন্যান্য এলাকার উদ্ভিদ ও প্রাণী সংরক্ষণের এবং ব্যবস্থাপনার বিষয়ে তেমন কোন কার্যকর নীতি বা কর্মসূচি নেই;

(চ) দেশের বিশাল এলাকাজুড়ে বিস্তৃত জলাভূমি এবং এতে অবস্থিত জৈব-সম্পদের ব্যবস্থাপনা জন্য সরকারি সুস্পষ্ট নীতি ও কর্মসূচির অভাব।

প্রাকৃতিক সম্পদ থেকে আর্থিক অথবা সেবা প্রদানের মাধ্যমে এ উদ্দেশ্য অর্জন করা যেতে পারে। যেমন সংরক্ষিত এলাকার ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের মাধ্যমে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে - এ ক্ষেত্রে ভূমি, মূলধন, শ্রমকে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে অত্যন্ত দক্ষ এবং সুনিপুণভাবে ব্যবহার করতে হবে। সংরক্ষিত এলাকার পার্শ্ববর্তী জনগণের শ্রম ও সম্পদকে এমন পরিকল্পিতভাবে ব্যবহার করতে হবে যেন তারা বাস্তুত দেখতে এবং বুঝতে পারে যে, জীববৈচিত্র্য/প্রাকৃতিক সম্পদ ধ্বংসের চেয়ে তাদের বর্তমান কর্মসংস্থান অনেক লাভজনক, সুবিধাদানকারী ও টেকসই। এ জন্যে সংরক্ষিত এলাকার পার্শ্ববর্তী জনগণের জন্যে আইন করে এবং উপযুক্ত অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা যেতে পারে। ফলে এ সংক্রান্ত সংরক্ষণ ব্যবস্থাপনা ও নীতিমালার বৈষম্য দূর করা যেতে পারে। যেমন, সমবায় গড়ে তোলা যেতে পারে। নতুন কর্মসূচি গ্রহণের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত লোকজনকে পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ দিতে হবে এবং পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে হবে। এ ধরনের প্রণোদনামূলক ব্যবস্থা তখনই অর্থবহ হবে, যখন জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে জনগণ অনুপ্রাণিত হবে এবং ক্ষতিপূরণ প্রদানসহ এসব কর্মকাণ্ডের অর্থনৈতিক খরচ ও সুবিধা অর্জনের চেয়ে কম হবে। এ ধরনের ব্যবস্থাপনাকে সফল করতে হলে নিম্নোক্ত বিষয়াদি বিবেচনায় আনা যেতে পারে।

(ক) জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে সংশ্লিষ্ট সবার জন্য আইনগত আচরণবিধি প্রণয়ন করতে হবে;

(খ) এসব আচরণ বিধির যথোপযুক্ত ও কার্যকর প্রয়োগের প্রাতিষ্ঠানিক নেটওয়ার্ক থাকতে হবে ;

(গ) এসব কার্যকলাপ নিরীক্ষণ ও মূল্যায়নের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে ;

(ঘ) আইনগত আচরণবিধি বাস্তবায়নে স্থানীয়, সামাজিক, ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া বিবেচনায় আনা যেতে পারে; এবং বিভিন্ন ধর্মীয় মূল্যবোধকে কাজে লাগাতে হবে;

www.nagorikpathagar.org

(ঙ) শুধু আচরণ বিধি আরোপিত না করে জনগণকে উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করতে হবে এবং পরিবর্তনশীল অবস্থার সাথে অবশ্যই সামঞ্জস্য রাখতে হবে।

ঔষধি উদ্ভিদের বাণিজ্যিক সম্ভাবনা

সৃষ্টির উষালগ্ন থেকেই উদ্ভিদরাজি মানব কল্যাণে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। মানব সভ্যতার মৌলিক অনন্য উপাদান অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থানের প্রধান উৎস উদ্ভিদবর্গ। প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে জীবজগতের স্বাস্থ্যসেবার পরম অবলম্বন উদ্ভিদজগৎ। আধুনিক সভ্যতা বিকাশের সাথে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও চিকিৎসা ও ব্যাধি শাস্ত্রের অভূতপূর্ব উন্নতিতে বিশ্বব্যাপী স্বাস্থ্য-চিকিৎসা ও জনস্বাস্থ্যের বৈপ্লবিক অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। তা সত্ত্বেও পৃথিবীর সিংহভাগ মানুষ, বিশ্ব-স্বাস্থ্য সংস্থার হিসাবে কমপক্ষে ৪০০ কোটি লোক ভেষজ চিকিৎসার ওপর নির্ভরশীল। মোট কথা স্বাস্থ্য সুরক্ষা, রোগ প্রতিরোধ, চিকিৎসা ও ব্যাধি নিরাময়ে উদ্ভিদকুলের প্রতি মানবজাতির নির্ভরশীলতা ও আস্থা বর্তমান বিজ্ঞানের যুগেও অটুট রয়েছে।

বিশ্ব যুদ্ধোত্তর বিশেষত সাম্প্রতিক দশকসমূহে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সামগ্রিক উন্নয়নের কল্যাণে ব্যাপক হারে নতুন নতুন ঔষধ উদ্ভাবিত হয়েছে। সাফল্য ড্রাগ, অ্যান্টিসেপটিক, অ্যান্টিবায়োটিক, অ্যান্টিম্যালেরিয়াল, সিডেটিভ, সিরাম, ভ্যাকসিন, কন্ট্রাসেপটিভ প্রভৃতি শ্রেণীর ঔষধ স্বাস্থ্য-চিকিৎসা সেবায় নতুন মাত্রা সৃষ্টি করেছে। হালে মরণ ব্যাধি ক্যান্সার, এইডস, সার্স আর দুরারোগ্য নানা রোগের ঔষধ অনুসন্ধান চলছে বিশ্বব্যাপী এবং এসব রোগের নিরাময়ও ভেষজ উদ্ভিদে অন্তর্নিহিত বলে বিজ্ঞানীদের বিশ্বাস।

রাসায়নিক সংশ্লেষণের সাহায্যে উদ্ভাবিত অপ্রাকৃতিক বা সংশ্লেষিত উপাদান রোগ নিরাময়ে অধিক শক্তিবান, দ্রুত কার্যকর ও ফলপ্রদ হলেও নানাবিধ স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়েছে সর্বব্যাপী। এসব পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের আন্দোলনের জোয়ার ক্রমান্বয়ে জোরদার হচ্ছে সর্বত্র।

ছয় হাজার কোটি ডলার যা স্থানীয় মুদ্রায় সাড়ে তিন লক্ষ কোটি টাকার এই খাতের বিশ্ব বাণিজ্য প্রতিদিন সম্প্রসারিত হচ্ছে। এই ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অংশীদারিত্ব শূন্যের কোঠায় বলা চলে। দেশীয় চিকিৎসার ঐতিহ্যের সূত্রে বিশ্ব-স্বাস্থ্য সংস্থার তাগিদে ১৯৮২ সালের ঔষধ নিয়ন্ত্রণ অধ্যাদেশের সুবাদে দেশে বর্তমানে পাঁচ শতাধিক ছোট বড় ইউনানী-আয়ুর্বেদিক ও হোমিওপ্যাথিক ঔষধ কারখানা গড়ে উঠেছে। এ সংখ্যা দেশের অ্যালোপ্যাথিক ঔষধ শিল্পের প্রায় দ্বিগুণ। দেশের ঔষধ উৎপাদন প্রতিষ্ঠানসহ ইউনানী-আয়ুর্বেদিক চিকিৎসকগণ তাদের নিজস্ব বিপণন ও প্রয়োজনে অসমর্থিত হিসাব অনুযায়ী বছরে কমপক্ষে একশত থেকে দেড় শত কোটি টাকার ঔষধি উদ্ভিজ উপাদান ব্যবহার করে থাকে। উদ্ভিজ কাঁচামালের একটা অংশ দেশের বাইরে থেকে আমদানি ও চোরাচালানির মাধ্যমে এসে থাকে। কিন্তু বিশ্বব্যাপী জীব বৈচিত্র্য ও পরিবেশ সংরক্ষণ এবং নির্বিচার বৃক্ষ নিধনে বিলুপ্তপ্রায় বিরল প্রজাতির উদ্ভিদ সংরক্ষণে সরকারের বিভিন্নমুখী উদ্যোগের ফলে ঔষধি উদ্ভিদের আন্তঃদেশীয় চলাচলে কড়াকড়ি আরোপিত হচ্ছে। ভেষজ ঔষধ, প্রসাধনী,

www.nagorikpathagar.org

সুগন্ধি, স্বাস্থ্য-খাদ্য প্রভৃতির উত্তরোত্তর চাহিদা বৃদ্ধির ফলে অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাজারে ঔষধি উদ্ভিদের ক্রমাগত চাহিদা বাড়ছে। অধিকন্তু স্বল্পোন্নত তালিকার বিশেষ অধিকারভুক্ত দেশ হিসাবে গ্যাট ও ট্রিপস চুক্তির আওতায় বাংলাদেশ ভবিষ্যতে আরো লাভবান হতে পারে (মাহবুব রহমান সাকী, ২০০৩)।

প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের কারণে বাংলাদেশের মাটি দুনিয়ার অনেক দেশের মাটির চেয়ে এত বেশি উর্বরা যে, আমাদের চারপাশে অগোচরে ছড়িয়ে রয়েছে অজস্র ঔষধি বৃক্ষ-লতা-গুল্ম-ফুল-ফলের অপূর্ব সমারোহ। অথচ প্রকৃতির এ অনিঃশেষ দানকে অনুধাবন করার মতো প্রয়োজনীয় জ্ঞান-মানসিকতার অভাবে আমরা চেষ্টা করি না তার সঠিক যত্ন-লালন-পালন তথা সংরক্ষণের। জাতীয়ভাবে আমাদের সুষ্ঠু পরিকল্পনা, দূরদর্শী দৃষ্টিভঙ্গির অভাব ও উদাসীনতাই মূলতঃ এ জন্য দায়ী। এ দায়িত্বশীলতা সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় পর্যায় থেকে সমাজের তৃণমূল স্তর পর্যন্ত বিস্তৃত। সময় এসেছে নিজস্ব প্রকৃতি, প্রয়োজন ও দায়বদ্ধতার দিকে নতুন মূল্যায়নী চোখ নিয়ে গভীরতর অনুসন্ধানের।

হাজারো বছরকাল ধরে এ দেশের লোকসমাজ প্রকৃতি-নির্ভর জীবনে অভ্যস্ত ছিল। এ সমাজেই বৈদ্য-হাকিম-কবিরাজগণ জীবনব্যাপী সাধনায় ঔষধি বৃক্ষ-লতা-পাতা-কাণ্ড-গুল্ম-ফুল-ফল, শিকড়-বাকল এসব শনাক্ত করে তা দিয়ে মানুষের দুরারোগ্য ব্যাধি নিরাময়ে চিকিৎসাকর্মে নিরন্তরভাবে নিবেদিত ছিল। তারাই প্রয়োজনীয় প্রজাতির ঔষধি গাছ-গাছড়া সংরক্ষণ করে তা সাধারণ জনগোষ্ঠীকে রোপণ-পালন-সংরক্ষণ-উদ্বুদ্ধকরণে অগ্রণী শিক্ষকের ভূমিকা পালন করেছেন।

সাম্প্রতিককালে প্রত্যক্ষ সুফলপ্রাপ্তির কারণে ফলদ ও বনজ বৃক্ষরাজি পরিকল্পিত রোপণ-সংরক্ষণে মানুষের মধ্যে অল্প-বিস্তর সচেতনতা সৃষ্টি হয়েছে। সাধারণ জনগোষ্ঠী অলাভজনক মনে করার ফলে অত্যন্ত মূল্যবান ঔষধি বৃক্ষরোপণ ও সংরক্ষণে এখনও অনেক পিছিয়ে আছে। কারণ এসবের প্রয়োজনীয়তা, গুরুত্ব ও মূল্য সবার কাছে তুলে ধরা যায়নি বলে এ বিষয়ে ব্যাপক সচেতনতা এখনও সৃষ্টি হয়নি। এ লক্ষ্যে বিষয়টি সাধারণ জনগোষ্ঠীর কাছে পরিষ্কারভাবে তুলে ধরাকে জাতীয় পর্যায়ে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিতেই হবে।

এর ফলে ঔষধি উদ্ভিদের দুষ্প্রাপ্যতা লাঘবের পাশাপাশি দারিদ্র্য বিমোচনেও অত্যন্ত সহায়ক ভূমিকা রাখতে পারে। পরিবেশের উন্নতি বিধান, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, কর্মসংস্থান, বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন, দেশীয় চিকিৎসা প্রভৃতি আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বিরাট সহায়ক হতে পারে। ঔষধি উদ্ভিদ ও ভেষজপণ্য রপ্তানি ও বাণিজ্যিক সম্ভাবনার জন্যে প্রয়োজন ঔষধি উদ্ভিদের পরিকল্পিত চাষাবাদ করা।

ঔষধি উদ্ভিদ ও উদ্ভিদজাত ঔষধের রপ্তানির সম্ভাবনা

বিশ্বব্যাপী উদ্ভিদজাত ঔষধের বিশাল বাজার রয়েছে এবং এটা দ্রুতগতিতে বাড়ছে। এক সমীক্ষায় দেখা গেছে-

১৯৮০ সালে বিশ্বব্যাপী হার্বাল ঔষধ বিক্রি হয়- ৪.৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, ১৯৯০ সালে

www.nagorikpathagar.org

বিশ্বব্যাপী হার্বাল ঔষধ বিক্রি হয়- ১৫.৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, বৃদ্ধির হার- ২৪৫%, ১৯৯৯ সালে ইউরোপ, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, কানাডায় হার্বাল ঔষধ বিক্রি হয়- ৭০.০০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা পূর্বাভাস দিয়েছে, ২০৫০ সালে হার্বাল ঔষধের বিশ্ব বাজার দাঁড়াবে ৫.০০ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার।
উক্ত পরিসংখ্যান হতে দেখা যায় যে, হার্বাল ঔষধের বাজার অতিদ্রুত সম্প্রসারণশীল। এই সুযোগ আমাদের গ্রহণ করে টেকসই উদ্ভিদ সম্পদ সংরক্ষণ, ব্যবস্থাপনা ও বাজারজাত নিশ্চিত করতে হবে।

রপ্তানির সমস্যা

আমাদের দেশে রফতানিযোগ্য হার্বাল ঔষধের ব্যবস্থাপনা ও বিদেশে বাজারজাতকরণের নিম্নোক্ত সমস্যাগুলো নিরসনের অত্যন্ত প্রয়োজন রয়েছে।

বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন ঔষধ আইন রয়েছে, আমাদের দেশে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের অভাব; বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন ভাষা ও সংস্কৃতি, যার সাথে আমাদের সমন্বয় প্রয়োজন; আন্তর্জাতিক বিপণন ব্যয়বহুল, এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া আবশ্যক; আন্তর্জাতিক বিপণনের জন্য দক্ষ জনশক্তির অভাব, উপর্যুক্ত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তি গড়ে তুলতে হবে; আন্তর্জাতিক বিপণনের জন্য এ দেশের অভিজ্ঞতা অপ্রতুল, এ বিষয়ে যৌথ ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হবে; রপ্তানির উৎসাহ প্রদানে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা অপ্রতুল, প্রাতিষ্ঠানিক সুবিধা, আইনগত কাঠামো তৈরির জন্য সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা নিশ্চিত করতে হবে।

ঔষধি উদ্ভিদ ও ভেষজ চাষাবাদের অর্থনৈতিক গুরুত্ব

বাংলাদেশ ২০০৫-২০১৬ সাল পর্যন্ত ঔষধি উদ্ভিদ ও ভেষজ পণ্য রপ্তানির মাধ্যমে বিপুল অংকের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে সক্ষম হতে পারে। এ বিষয়ে জাতীয় পর্যায়ে স্বীকৃতি ও উদ্যোগের একান্ত প্রয়োজন। এক্ষেত্রে কবির উক্তিটি যথার্থই স্মরণযোগ্য।

আপন ঘরে বোঝাই সোনা / পরে করে লেনা দেনা
আমি হলাম জন্ম কানা / না পাই দেখিতে ------ লালন শাহ্

বাংলাদেশে ঔষধি উদ্ভিদের প্রধান ব্যবহারকারী ছোট-বড় ২৯৭টি ইউনানী ও ২০৪টি আয়ুর্বেদিক ঔষধ উৎপাদক প্রতিষ্ঠান রয়েছে। তাছাড়া দেশের বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক চিকিৎসকগণ তাদের পেশা পরিচালনার জন্য নিজস্ব চিকিৎসা কেন্দ্রে বেশ কিছু ঔষধি উদ্ভিদ ব্যবহার করে থাকেন। পরিমাণে কম হলেও দেশের ৭৭টি হোমিওপ্যাথিক ঔষধ কারখানায় ব্যবহৃত ভেষজের পরিমাণ খুব নগণ্য নয়।
আমাদের জীবনে উদ্ভিদ ও ভেষজ পণ্যের বৃক্ষের অপরিহার্য ভূমিকা অনুধাবনের যথেষ্ট অভাব রয়েছে। দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য, প্রকৃতির নিজস্বতার ওপর যখনই আমরা

www.nagorikpathagar.org

জবরদস্তির চেষ্টা করেছি, তার নেতিবাচক প্রভাব মানব সমাজকে বিপর্যস্ত করেছে বারে বারে। কিন্তু আমরা তা থেকে কোনও শিক্ষাই গ্রহণ না করে মুখ ফিরিয়ে থাকি। প্রকৃতি কাউকে মাফ করে না। তার অমোঘ শাস্তি মানুষকে ভোগ করতে হচ্ছে এবং ভবিষ্যতে এর ব্যত্যয় না ঘটলে আরও কঠিন দুর্ভোগ সইতে হবে। সময় থাকতে যদি আমরা সচেতন হই, তাহলে এই জাতিকে জাগ্রত করে তোলা সম্ভব হবে।

দীর্ঘ ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণ-প্রভাবজাত তথাকথিত উন্নয়ন, শিক্ষা ও পরনির্ভর মানসিকতার নাগপাশ থেকে এ দেশের জনগোষ্ঠীর স্বাধীনতার ৩৮ বছর পরও নিজেদের সাংস্কৃতিকভাবে মুক্ত করতে পারিনি, যা অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়। নিজস্ব মাটি ও মানুষের মন পাঠ করাই হোক আমাদের স্বাধীনতার প্রথম স্তবক। এই মাটি ও মানুষের মনে লুকায়িত অমূল্য সম্পদরাজি ও সম্ভাবনার সন্ধান না পেলে আমাদের সব কথা-পরিকল্পনা-কর্মকাণ্ড অসার বলে প্রতিপন্ন হবে। তাই সমাজের সর্বস্তরব্যাপী ব্যাপক প্রভাব বিস্তারী সাংস্কৃতিক জাগরণ সৃষ্টি করে নিজেদের সহায়-সম্পদ নিজেদের মতো করে চিনবার, জানবার, বুঝবার, কাজে লাগাবার স্বচ্ছ পথ করে নেয়ার দায়-দায়িত্ব জাতি হিসেবে এ দেশের জনগোষ্ঠীর নিজেদের ওপরই বর্তায়।

প্রকৃতি বাংলাদেশকে পাঁচ শতাধিক প্রজাতির মূল্যবান ঔষধি উদ্ভিদ ব্যবহারের সুযোগ দিলেও তার উল্লেখযোগ্য বাণিজ্যিক চাষাবাদ, উৎপাদন ও ব্যবহার নেই বললেই চলে। অথচ বিশ্ববাজারে প্রতি বৎসর ৬ হাজার কোটি মার্কিন ডলারের ঔষধি উদ্ভিদের ব্যবসা রয়েছে, যার মধ্যে ১ হাজার কোটি রুপির ব্যবসা করায়ত্ত করে নিয়েছে প্রতিবেশী ভারত। চীন প্রতি বছর ঔষধি গাছের উপকরণ রপ্তানি করে অর্জন করছে ৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। তার পরপরই থাইল্যান্ড, শ্রীলংকা, কোরিয়া, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, নেপালসহ এশিয়ার বেশ কয়েকটি দেশ অন্যান্য দেশের তুলনায় এগিয়ে রয়েছে। খোদ বাংলাদেশেই এখন ইউনানী, আয়ুর্বেদিক, হোমিওপ্যাথিক ঔষধ উৎপাদনকারী বৃহৎ, মাঝারি ও ক্ষুদ্র শিল্প গড়ে উঠেছে যার বর্তমান সংখ্যা ৫৮২। ঔষধি উদ্ভিদজাত উপাদানের অভ্যন্তরীণ চাহিদা প্রতিনিয়ত বাড়ছেই। এ দেশের কাঁচামাল উৎপাদনে যে গুণগত ও পরিমাণগত সীমাবদ্ধতা এখনও রয়েছে তা দ্রুত কাটিয়ে উঠতে না পারলে এই খাতেও এ দেশের শিল্পের অনিবার্যভাবে বিদেশের কাঁচামাল আমদানিনির্ভর হয়ে পড়তে হবে। অথচ পরিকল্পিত চাষাবাদ, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ, ব্যবহার ও বাজারজাতকরণের যথাযথ উদ্যোগ নিলে এবং তা অত্যন্ত সমন্বিতভাবে কার্যকর করতে সক্ষম হলে দেশের অভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটিয়ে স্থানীয় অর্থনীতিকে চাঙ্গা করার সুযোগ হবে, যা দারিদ্র্য বিমোচনেও সহায়ক হবে। তাছাড়া আন্তর্জাতিক বাজারে তা বিপুল পরিমাণে রপ্তানি করতে পারলে বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জনের আরেকটি সম্ভাবনাময় দুয়ার খুলে যাবে। ফলে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে প্রায় ১০ লাখ লোকের। এই সম্ভাবনা কাজে লাগাতে সরকার, সুশীল সমাজ, ব্যাংকসমূহ, গবেষক ও ব্যবসায়ী সমাজ একযোগে কাজ করতে পারলে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের বিরাট সুযোগ সৃষ্টি হবে।

www.nagorikpathagar.org

গত ২১শে জুন, ২০০৩ দৈনিক যুগান্তর পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ অনুযায়ী সারাদেশে মোট ২১৫টি ইউনানী, ২০৪টি আয়ুর্বেদীয় এবং ৭৭টি হোমিওপ্যাথিক ঔষধ প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এসব ঔষধ প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানে সরাসরি ঔষধি উদ্ভিদ হতে প্রস্তুতকৃত ঔষধের বাৎসরিক বাজার মূল্য প্রায় ৩০০ কোটি টাকা। এসব অমূল্য সম্পদ সংরক্ষণ ও সুষ্ঠু ব্যবহারের বিষয়ে নীতিনির্ধারক ও জনগণের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি একান্ত আবশ্যক। এ ধরনের শিল্পে ঔষধি উদ্ভিদ বিভিন্ন উপায়ে প্রক্রিয়াজাতকরণের পর পাউডার ফর্ম, অর্ধকঠিন (Semisolid) ইত্যাদি সনাতন পদ্ধতি ও ট্যাবলেট, ক্যাপসুল, সিরাপ ইত্যাদি আধুনিক ফর্মে ঔষধ তৈরি করা হয়। এভাবে বাংলাদেশের নানাবিধ ঔষধি উদ্ভিদ ঔষধ তৈরির কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

এজন্য প্রয়োজন রয়েছে কার্যকর রাজনৈতিক সদিচ্ছা, দৃঢ় সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত, পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা, সে সাথে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে ঔষধি বৃক্ষরোপণ, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ ও যথাযথ ব্যবহারসহ জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক বাজারজাতকরণে ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে।

চাষাবাদের মাধ্যমে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে ঔষধি উদ্ভিদ উৎপাদন করলে দেশ ও দেশের জনগোষ্ঠী বিভিন্নভাবে লাভবান হবে। যেমন- দেশে ঔষধি উদ্ভিদ কাঁচামালের চাহিদা পূরণ হবে। মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা খরচ করে ঔষধি উদ্ভিদ কাঁচামাল আমদানি করতে হবে না। দেশীয় কাঁচামাল দ্বারা উৎপাদিত ঔষধের মূল্য তুলনামূলকভাবে কম হবে। স্বনির্ভরতা ছাড়াও ঔষধি উদ্ভিদ কাঁচামাল বিদেশে রপ্তানি করে বৈদেশিক মুদ্রা আয় করা সম্ভব হবে এবং দেশ অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হবে।

চীন, ভারত ও থাইল্যান্ড চাষাবাদের বাণিজ্যিক ভিত্তিতে ঔষধি উদ্ভিদ উৎপাদন করে দেশের চাহিদা মিটিয়েও প্রতিবছর ঔষধি উদ্ভিদ রপ্তানির মাধ্যমে প্রচুর পরিমাণে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করছে। বাংলাদেশের পক্ষে এভাবে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা অসম্ভব নয়। তাছাড়া ঔষধি উদ্ভিদের চাষাবাদ ফসলী উদ্ভিদের চাষাবাদের তুলনায় অধিক সহজ। যেখানে সেখানে, পতিত জমিতে বা চাষের জমিতে ন্যূনতম পরিচর্যার মাধ্যমে সহজেই ঔষধি উদ্ভিদ উৎপাদন করা যায়। অন্যান্য ফসলের চাষাবাদের চেয়ে ঔষধি উদ্ভিদের চাষাবাদ শুধু সহজই নয়, লাভজনকও বটে। কারণ দেশে ও বিদেশে ঔষধি উদ্ভিদের প্রচুর চাহিদা রয়েছে। একমাত্র বাংলাদেশেই বছরে কমপক্ষে এক হাজার মেট্রিক টন ঔষধি উদ্ভিদ কাঁচামাল বিভিন্ন ঔষধ তৈরিতে ব্যবহৃত হয়ে থাকে (Mia & Ghani, 1990)। দেশে ও বিদেশে এই বিপুল চাহিদার কারণে ঔষধি উদ্ভিদ উৎপাদন অবশ্যই অর্থকরী ফসল হিসেবে বিশেষ করে, তামাক চাষের জমিতে ঔষধি উদ্ভিদ চাষ করলে কৃষক আর্থিকভাবে লাভবান হবে। তা করতে ঔষধি উদ্ভিদের চাষাবাদকে অবশ্যই উৎসাহিত করা প্রয়োজন। ঔষধি উদ্ভিদের চাষ অধিক বা সমপরিমাণ লাভজনক হলে স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে ঔষধি উদ্ভিদের চাহিদা সৃষ্টি হলে এবং উৎপাদিত ফসলের উপযুক্ত বাজার ও মূল্য পেলে সাধারণ কৃষকও তামাক

www.nagorikpathagar.org

চাষের পরিবর্তে ঔষধি উদ্ভিদ চাষাবাদে উৎসাহিত হবে। উপর্যুক্ত পর্যালোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ঔষধি উদ্ভিদ চাষাবাদের এক বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে। এ সম্ভাবনাকে সঠিকভাবে মূল্যায়ন করে ঔষধি উদ্ভিদ চাষাবাদে বাংলাদেশের আরো এগিয়ে আসা প্রয়োজন।

ঔষধি উদ্ভিদ চাষের সামাজিক গুরুত্ব

বাংলাদেশে বেকারত্ব একটি বড় সমস্যা। বহু শিক্ষিত ও অশিক্ষিত লোক এদেশে কর্মহীন বেকার জীবনযাপন করেছে। মানুষের জীবনে বেকারত্ব এক দারুণ অভিশাপ। বেকারত্ব মানুষকে করে তুলে হতাশাগ্রস্ত এবং শারীরিক ও মানসিকভাবে বিপর্যস্ত। ফলে বেকার মানুষ সহজেই অপরাধপ্রবণ হয়ে ওঠে। জীবনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে বিভিন্ন অসামাজিক ও অপরাধমূলক কাজে জড়িয়ে পড়ে। সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড করা ছাড়াও এরা হয়ে পড়ে বিভিন্ন নেশাদ্রব্যে আসক্ত। ফলে সমাজে সৃষ্টি হয় নানা বিশৃঙ্খলা। এই অবস্থা থেকে উত্তরণের একমাত্র পথ দেশীয় সহজলভ্য সম্পদ দিয়ে কর্মসংস্থান। ঔষধি উদ্ভিদের চাষাবাদ এমনি একটি উত্তম কর্মসংস্থানের উপায় হতে পারে। দেশের অগণিত বেকার শিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত লোকজনকে স্বল্পমেয়াদি প্রশিক্ষণ দানের মাধ্যমে ঔষধি উদ্ভিদ চাষাবাদে দক্ষ করে তোলা যেতে পারে। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এসব বেকার জনশক্তি বাড়ির আঙ্গিনায়, নিজেদের পতিত বা চাষের জমিতে বা সরকারি খাস জমি লিজ নিয়ে তাতে ঔষধি উদ্ভিদ উৎপাদনের স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদি প্রকল্প গ্রহণ করতে পারে। এতে তাদের বেকারত্ব যেমন ঘুচবে, তেমনি অর্থ উপার্জনের পথও সুগম হবে। দেশ হবে ঔষধি উদ্ভিদ সম্পদে সমৃদ্ধ।

দেশে মৎস্য চাষ এবং হাঁস-মুরগি পালন প্রকল্প যেমনভাবে বহু মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করেছে, তেমনিভাবে ঔষধি উদ্ভিদ উৎপাদন প্রকল্পও হাজার হাজার মানুষের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে পারবে। দেশে-বিদেশে ঔষধি উদ্ভিদের যে বিপুল চাহিদা রয়েছে তাতে ঔষধি উদ্ভিদ চাষাবাদ প্রকল্প সফল হতে বাধ্য। প্রচলিত ফসল চাষাবাদের চেয়েও ঔষধি উদ্ভিদ চাষাবাদ প্রকল্প অধিক লাভজনক হতে পারে। এতে দেশের মানুষের বেকারত্ব যেমন কমে আসবে তেমনি হ্রাস পাবে সন্ত্রাস, চুরি, ডাকাতিসহ বিভিন্ন সামাজিক অপরাধ। ফলে সমাজের অস্থিরতা দূর হবে এবং সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরে আসবে। শুধু তাই নয়, অন্যান্য উদ্ভিদের মতো ঔষধি উদ্ভিদও প্রাকৃতিক পরিবেশকে দূষণের হাত থেকে রক্ষা করতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। ঔষধি উদ্ভিদ পরিবেষ্টিত মানুষের আবাসস্থলের পরিবেশও হয়ে উঠে নির্মল, পরিচ্ছন্ন ও সুশোভিত। নাটোর উপজেলা সদরে কয়েকটি গ্রামের মানুষ ঔষধি উদ্ভিদ চাষ করে ছোট ছোট ব্যবসা এবং ঔষধি উদ্ভিদ চারা উচ্চমূল্যে বিক্রি করে গ্রামে দারিদ্র্য বিমোচন করছে যা অতিসহজেই দেশের অন্যান্য এলাকায় সম্প্রসারণ করা যেতে পারে। বাংলাদেশে ব্যবহৃত গুরুত্বপূর্ণ ঔষধি উদ্ভিদের ব্যবহারের অর্থনৈতিক তাৎপর্যও বিরাট এবং ব্যাপক যা দারিদ্র্য বিমোচনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে।

www.nagorikpathagar.org

নাটোরে ঔষধি উদ্ভিদের বাণিজ্যিক চাষের সাফল্য কথা

উদ্ভিদের ঔষধি গুণাবলীর কথা কেউ অস্বীকার করে না। তবে এর চাষ ও ব্যবহার যে, বাণিজ্যিকভাবে লাভবান হতে পারে এদেশের কতজন মানুষ বিশ্বাস করেন এবং স্বচক্ষে দেখেছেন। হয়তো বিশেষ পৃষ্ঠপোষকতায় বিচ্ছিন্নভাবে কোথাও কোথাও হয়েছে। কিন্তু নিজস্ব উদ্যোগে এবং শুধু উদ্ভিদের গুণাবলীতে বিশ্বাস করে এবং ব্যবহার করে বিনা লেখাপড়ায় বিনা সহায়তায় নাটোর সদরের কয়েকটি গ্রাম ঔষধি উদ্ভিদের বাণিজ্যিক চাষে সফল হয়েছে। গ্রামগুলো অভূতপূর্ব সচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন করেছে তা না দেখলে বিশ্বাস করার কথা নয়। আগস্ট ২০০৮ সালে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের SIFAT প্রকল্পের একটি আঞ্চলিক ওয়ার্কশপে যোগদানের জন্য বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের প্রায় ১০-১২ জন কর্মকর্তার একটি দল নাটোরে গিয়েছিল। জেলা প্রশাসক মিসেস শাহীন খানের পরামর্শে ঔষধি গ্রাম দেখতে গিয়েছিলাম আমরা সকলেই। সে এলাকার একজন সহকর্মী জনাব সিদ্দিকুর রহমান উপপ্রধান, ইআরডি আমাদের সাথে ছিলেন। জেলা সদর থেকে ৩-৪ মাইল পশ্চিমে খোলাবাড়িয়া গ্রামে বেড়াতে যাই। রাস্তার মোড়ে কতগুলি দোকানঘর, সেখানে দাঁড়িয়ে আশেপাশে জমির দিকে তাকালে দেখা যায়, শুধু বিভিন্ন প্রকার উদ্ভিদ ছাড়া অন্য কোন ফসল নেই। জিজ্ঞাসাবাদে জানতে পারলাম এমন চাষ হচ্ছে এ গ্রামগুলো হলো (১) খোলাবাড়িয়া (২) লক্ষীপুর (৩) ইব্রাহীমপুর (৪) রাজবাড়িয়া (আংশিক)। ৪টি গ্রামের ভোটার সংখ্যা ৫,৫০০, সম্ভবত মোট জনসংখ্যা ৭-৮ হাজার। শুধু উদ্ভিদের চাষ হয় এলাকার প্রায় ১০০-১৫০ একর জমিতে। মোট জনসংখ্যার প্রায় ৪০ শতাংশ পূর্ণভাবে এ চাষে নিয়োজিত। এসব উদ্ভিদ আহরণ, প্রসেসিং ও বাজারজাতকরণে আরো প্রায় ১০ শতাংশ লোক বিভিন্নভাবে নিয়োজিত রয়েছে। যে সমস্ত ঔষধি উদ্ভিদের চাষ হয় সেগুলো হল- শতমূল, ভুঁইকুমড়া, শিমুল মূল, ঈশ্বরমূল, অনন্তমূল, তালমূল, কুস্তিমূল, গাবসিমূল, অগ্নিমূল, রাজকণ্ঠ, নীলকণ্ঠ, কালোমেঘ, বসাক, তুলসী, ঘিতি, কাঞ্চন, পাথরকুচি, ফণীমনসা, আকাশগন্ধা, লোহাচুর, শক্তিবিন্দু, মিস্রিদানা, জোয়ানবীর, মিষ্টিবন, হিমসাগর, দুধসাগর, বাও আদা, কেওমূল, আমরুল, সাদালজ্জাবতী, তুরুপ, চণ্ডাল, কালুচাণ্ডাল, জাপটি চাণ্ডাল ইত্যাদি।

এ চাষাবাদ কিভাবে শুরু হল তা নিঃসন্দেহে রহস্যময়। আমরা সে এলাকায় পৌঁছে অনেক খোঁজাখুঁজির পর প্রায় ঘন্টাখানেক পর খোঁজে পাওয়া গেল আফাজপাগলাকে, মুখভরা দাড়ি, গলায় উদ্ভিদের মালা। একেবারে সাদামাটা জীবনযাপন ও পোশাক-পরিচ্ছদ। লেখাপড়া নেই একেবারেই। জীবন শুরু করেছিলেন মুদির দোকানদার হিসেবে মূল পেশা কৃষি কাজের পাশাপাশি। জীবনের শুরুতে তার দুই স্ত্রী ছিল। স্বাধীনতার পর হঠাৎ করে তার যৌনাঙ্গে জ্বালাযন্ত্রণা রোগ হয়। চিকিৎসার অভাবে তার সংসার ছেড়ে স্ত্রীদ্বয় চলে যায়। যৌবনে যৌনক্ষমতা হারিয়েও হাল ছাড়েননি তিনি। আফাজ পাগলা নিজের তাগিদেই (অবশ্যি উন্নত চিকিৎসার সামর্থ্য নেই বলে) গাছপালার মধ্যে চিকিৎসা খুঁজতে থাকলেন। লোকমান হাকিমের স্মৃতিকথা বুকে নিয়ে তিনি শুরু করলেন গাছ ও উদ্ভিদের অনুসন্ধান। অনুসন্ধান কাজে ওস্তাদ লাগে এ বোধ থাকলে ওস্তাদ পাবে কোথায়? দূর্বাঘাস খেতে খেতে শরণাপন্ন হলেন তার নানীর। নানী তাকে পরম করুণাময়ের কাছে প্রার্থনার পাশাপাশি উদ্ভিদের মাঝে বেঁচে থাকার পরামর্শ দেন ও সাহস যোগান।

নানীর সাহসের পাশাপাশি ওস্তাদ খোঁজেন আফাজ পাগলা। এক সময় দেখা পান জলিল পাগলার। তার কাছে শিখেন তাল দিয়ে হজমীর হালুয়া বানাতে। জলিল পাগলা তাকে পরামর্শ দেয় ঔষধি কিছু গাছ নিয়ে হাট-বাজারে বিক্রি করতে। আস্তে আস্তে স্থানীয় অন্যান্য কবিরাজ তার কাছে এসে তাদের অভিজ্ঞতা বিনিময় করতে লাগলো। আফাজ পাগলার পরিচিতি ও খ্যাতিও বাড়তে লাগলো। তার ঔষধি উদ্ভিদের মধ্যে সবচেয়ে উপকারী উদ্ভিদ ছিল ঘৃত কাঞ্চন। তার অসুস্থতার সময় বড় ভাই স্থানীয় বাজার থেকে পাঁচটি ঘৃত কাঞ্চন চারা ক্রয় করে দিয়েছিলেন। পরবর্তীতে আহমেদপুর বাজার থেকে একটি করে চারা কিনে লাগাতে শুরু করেন। এভাবেই ঘৃতকাঞ্চনের চাষ শুরু হয়।

কিভাবে বাজারজাত শুরু হল। এ প্রসঙ্গে পাগলা জানান। বাজারে রহমত নামে এক শরবত ব্যবসায়ীকে বললেন, স্যাকারিন দিয়ে শরবত বানানোর চেয়ে ঘৃতকাঞ্চন দিয়ে শরবত বানাও। স্যাকারিন মানুষের স্বাস্থ্যের

www.nagorikpathagar.org

ক্ষতি করে। ঘৃতকাঞ্চন শরবতে একদিকে শান্তি, অন্যদিকে ইহা নীরোগ। এক সময় ব্যবসায় আল্লাহর রহমতের ছোঁয়ায় ব্যাপক প্রসার ও খ্যাতিলাভ করলো রহমত। আফাজ পাগলার কেরামতি বাড়লো। নাটোরে এ খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েপ একবার আফাজ পাগলা তার ঘৃতকাঞ্চন ঢাকায় বিক্রি করার পরিকল্পনা হাতে নেন। রমজানকে তিনি ঢাকায় পাঠান গুলিস্তানে প্রথম বিক্রি শুরু করে, এখন সারা বাংলাদেশেই তাদের উদ্ভিদ বিক্রি হয়।
আফাজ পাগলা আলাপকালে জানান প্রথম দিকে বাড়ি বাড়ি চারা লাগিয়ে দিয়ে এবং বাজারজাতকরণের সকল সহায়তা দিয়ে তিনি তার নিজ গ্রাম ও পাশের গ্রামের মানুষকে ঔষধি উদ্ভিদ চাষে উৎসাহিত করেছেন। গ্রামের কতগুলো দোকান ঘুরে দেখলাম দোকানের অর্ধেকেরও বেশি জিনিস বিভিন্ন গাছের শিকড়, মূল ও লতাপাতা। কিছু প্রসেস হচ্ছে, কিছু প্যাকেট হচ্ছে, ঢাকা, ময়মনসিংহ, কিশোরগঞ্জ ও দেশের অন্যান্য স্থানে পিকআপে ভরে পাঠানোর জন্য।
লক্ষণীয় বিষয় হল কৃষি, বন বা সরকারি অন্য কোন সংস্থারই পৃষ্ঠপোষকতা নেই। নেই কোন অর্থায়নের ব্যবস্থা। শিক্ষণীয় বিষয় স্বউদ্যোগ ও নিষ্ঠার মাধ্যমেও আত্মনির্ভরশীল হওয়া সম্ভব। যদিও এর গতি অত্যন্ত ধীর। সম্প্রতি প্রথম আলো, এনটিভি এ কর্মসূচিটিকে গণমাধ্যমে প্রচার করেছে। (তথ্য সরবরাহে সিদ্দিকুর রহমান ও আঃ কাদির)

উদ্ভিদের ঔষধি গুণাবলী

পুঁই শাক ঃ পুঁই শাক তরকারি ও ঔষধ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ইহা নিদ্রাবৃদ্ধি ও শক্তি আনয়ন করে। গ্যাস্ট্রিক ও আলসার রোগীর জন্য এটি বিশেষ উপকারী। অর্শ, ব্রণ ও টিউমার নিরাময়ে চমৎকার ফল পাওয়া যায়। অ্যাজমা, আমাশয় ও বাতরোগীর পক্ষে এটি ক্ষতিকারক। আমাদের দেশের শহরের কাঁচা বাজারে এ শাকের যথেষ্ট চাহিদা রয়েছে। প্রয়োজনীয় বাজারজাতকরণ ও স্টোরেজ সুবিধা থাকলে গ্রামীণ অর্থনীতিতে বর্ধিত আয় ও দারিদ্র্য বিমোচনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে ।

কলমি শাক ঃ কলমি শাক শরীর ঠাণ্ডা রাখে ও শুক্র বৃদ্ধি করে। প্রসূতির স্তনদুগ্ধ বৃদ্ধির জন্য এর ঝোল একটি মহৌষধ। ফোড়া পাকার সময় কিংবা বসন্তের গুটি উঠার সময় কলমি শাকের ঝোল খুব সুফলদায়ক। মেহ কিংবা প্রমেহ হলে কলমি শাক কাঁচা দুধের সঙ্গে খেলে উপকার হয়। মস্তিষ্ক বিকারগ্রস্ত ও হিস্টিরিয়া রোগীর পক্ষে এটি সুপথ্য। সর্দি ও হাঁচি-কাশির রোগীদের এই শাক না খাওয়াই শ্রেয়। গ্রামেগঞ্জে যত্রতত্র অযত্নে এ শাক হয়ে থাকে, মূল্যবান শাক হিসেবে এখনো তেমন পরিচিতি লাভ করেনি। এজন্যে প্রয়োজনীয় উৎপাদন ও বাজারজাতকরণের সুযোগ সৃষ্টি ও সচেতনতা সৃষ্টি করা যেতে পারে।

হেলেঞ্চা শাক ঃ এটি সবজি হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এটি রুচিকারক, ক্ষুধা বৃদ্ধিকারক ও রক্ত পরিষ্কারক। হাত-পা জ্বালায়, যকৃৎ (প্লীহা) দোষে হেলেঞ্চা শাকের রস সামান্য গরম করে সকালে খেলে উপকার হয়। হেলেঞ্চা শাকের সঙ্গে শ্বেতচন্দন ঘষে খেলে বসন্ত রোগের আক্রমণ রোধ করা যায়। মেহ, প্রমেহ রোগে হেলেঞ্চার রস কাঁচা দুধের সঙ্গে খেলে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। এটি শোথ (হাতে পায়ে পানি আসা) ও কুষ্ঠ নাশ করে। এ বিষয়ে স্কুল পর্যায়ে কারিকুলাম প্রবর্তনসহ গ্রামেগঞ্জে সচেতনতা সৃষ্টি করা প্রয়োজন।

পেয়ারা ঃ পেয়ারায় প্রচুর পরিমাণ ভিটামিন সি, প্যাকটিন ও এনজাইম বিদ্যমান। আপেলের

www.nagorikpathagar.org

চেয়েও এর পুষ্টিগুণ বেশি। এটি বলকারক ও গুরুপাক। অজীর্ণ রোগীর পক্ষে কখনই বীজসমেত পেয়ারা খাওয়া উচিত নয়। পুষ্টিকর ফল হিসেবে পেয়ারা এখনো ব্যাপক পরিচিতি লাভ করেনি আমাদের সমাজে। পেয়ারার জেলি তৈরি করে বিদেশে রফতানি করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করার বিরাট সুযোগ রয়েছে আমাদের দেশে।

কয়েৎবেল ঃ ১৯৮৮ সালে জাপানের ওসাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক গবেষণায় কয়েৎবেল এশিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ ফল হিসেবে নির্বাচিত হয়েছে। এতে প্রচুর পরিমাণ প্যাকটিন ও এনজাইম বিদ্যমান। কয়েৎবেল বেটে প্রলেপ দিলে চুলকানি নাশ করে। গণসচেতনতার অভাবে এ ফল এখনো তেমন খ্যাতিমান নয়।

পেঁপে ঃ স্বাস্থ্যসহায়ক গুণে পেঁপের মতো ফল নেই। এই ফল লিভার ও জন্ডিস রোগের মহৌষধ। স্বাস্থ্যহীন ও রোগীর পথ্য হিসেবে পেঁপে হিতকর। পাকা পেঁপে খেলে পরিপাকযন্ত্র নিখুঁত থাকে। বাণিজ্যিকভাবে চাষাবাদের নীতি ও উদ্যোগের প্রয়োজন রয়েছে।

শসা ঃ কচি শসা শরীরে জ্বালা-পোড়া, বমি ও হিক্কায় উপকারী। পাকা শসা পিত্তের জন্য হিতকর ও মূত্র পরিষ্কারক। শসার বীজ থেকে বর্তমানে এইডস রোগের প্রতিষেধক শক্তির সন্ধান পাওয়া গেছে। সমগ্র ইউরোপে এটি উন্নতমানের ত্বকের প্রসাধন হিসেবে ব্যবহার করা হয়। শসা দিয়ে তৈরি ক্রিম বা লোশন পৃথিবী বিখ্যাত। শসার খোসা বেটে মুখে লাগালে মুখের দাগ পরিষ্কার হয় এবং শ্রী বৃদ্ধি করে। এর গুণাবলী আমাদের সমাজে এখনো তেমন পরিচিত হয়ে উঠেনি। ব্রাজিলসহ দক্ষিণ আমেরিকার বহু দেশ শসা রফতানি করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে। বাংলাদেশ থেকেও জাপান ইউরোপসহ বিভিন্ন দেশে রফতানির উদ্যোগ নেয়া যেতে পারে।

আমলকী ঃ আমলকীতে প্রচুর পরিমাণ ভিটামিন সি বিদ্যমান। এ জন্য আমলকীকে ভিটামিন সম্রাট বলা হয়। এটি মুখের রুচি, স্বাদ, ক্ষুধা ও হজমশক্তি বৃদ্ধি করে। বায়ু, পিত্ত, কফ ত্রিদোষনাশক। জন্ডিস, আমাশয়, যোনিশূল, মেহরোগ, শ্বেতপ্রদর, অকালে চুল ওঠা ও চুল পাকায়, যন্ত্রণাদায়ক প্রস্রাব, শিরঃপীড়ায়, মাথা ধরায়, অনিদ্রায়, দৃষ্টিহীনতায় ও হিক্কায় আমলকী খুবই উপকারী। আমলকী ও মেহেদি বেটে চুলে লাগালে চুল পড়া বন্ধ হয়।

বরবটি ঃ বরবটির গুটি ও বীজ ওষুধে ব্যবহৃত হয়। তরল দাস্ত, শুক্রের স্বল্পতায়, সর্দিতে বরবটি হিতকর। প্রতিদিন আধাসিদ্ধ করে বরবটি খেলে ত্বকের লাবণ্য বৃদ্ধি পায়। বাণিজ্যিক চাষাবাদ করতে পারলে দেশে, বিদেশে ও বাজারজাতকরণ সম্ভব।

ইক্ষু ঃ ঠাণ্ডা ও মূত্রবৃদ্ধিকারক। এটি বলকারক ও শুক্রবৃদ্ধিকারক। পিত্ত রোগ নাশ করে, জন্ডিস হলে অনেকে আখের রস খেয়ে থাকেন। এতে অনেক সময় ধুলোবালি থাকে। তাই পরিষ্কার করে খাওয়া উচিত। সতর্কতা- ইক্ষুর রস কফ সৃষ্টি করে। ডায়াবেটিস রোগীদের ইক্ষু খাওয়া উচিত নয়।

কমলালেবু ঃ এতে প্রচুর পরিমাণ ভিটামিন সি বিদ্যমান। এটি শোথ (হাতে-পায়ে পানি

www.nagorikpathagar.org

আসা) নিবারণ করে রক্ত পরিষ্কার করে ও রুচি আনয়ন করে। ইহা রক্ত বমি, তৃষ্ণা, গ্যাস ও স্বপ্নদোষ নাশ করে। ভারতীয় কমলালেবু আমদানি কমিয়ে বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় করার জন্য আমাদের দেশে কমলালেবু বাণিজ্যিকভাবে চাষাবাদ করা প্রয়োজন।

কাগজি লেবু : এতে প্রচুর ভিটামিন সি বিদ্যমান। অরুচি, গলরোগ, টনসিল, কলেরা, ক্রিমি, উদরি ও বাত রোগ নিবারণে এটা অদ্বিতীয়। এর বাণিজ্যিক চাষাবাদ, বাজারজাতকরণ ও খাদ্যাভ্যাস করতে পারলে জনস্বাস্থ্যের উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন সম্ভব। (যুগান্তর ২ জুলাই ২০০০)। **উপর্যুক্ত উদ্ভিদের ঔষধি গুণাবলী ছাড়াও আমাদের অতিচেনা কয়েকটি ভেষজের গুণাবলীর বিষয়ে আলোচনা করা প্রয়োজন। সেগুলো হচ্ছে :**

রসুন : হৃদরোগ প্রতিরোধে প্রতিদিন ১ কোয়া রসুন অল্প গরম দুধে মিশিয়ে খেলে হৃদরোগ হয় না। কাঁচা রসুন হৃদরোগের জন্যও ভীষণ উপকারী। হাসপাতালের পাশাপাশি ঘরেও এ ধরনের ভেষজ খাবারের বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি করা উচিত। কোলেস্টেরল কমানোর জন্যও কাঁচা রসুন খাওয়ার অভ্যাস থাকা প্রয়োজন।

বিষম জ্বর (পুরাতন) : জ্বর ছাড়ে না, বাড়ে-কমে, কিন্তু একটু থেকে যায়, যাকে বলে ঘুসঘুসে জ্বর। এক্ষেত্রে ৫/৭ ফোঁটা রসুনের রসের সাথে আধা বা ১ চামচ গাওয়া ঘি মিশিয়ে খেলে ২/৪ দিনেই জ্বর ছেড়ে যায়।

বাতের যন্ত্রণায় : শর্ষের তেলে রসুন ভেজে সেই তেল মালিশ করলে বাতের যন্ত্রণা কমে যাবে।

আদা : আমাদের খনার বচন রয়েছে, "নুন দিয়ে খায় আদা অরুচি আর থাকে না দাদা"। নতুন সর্দি ও জ্বরভাবে আদার রসে একটু মধু মিশিয়ে খেলে উপকার পাওয়া যায়। আদার রস ১ চা চামচ ও তুলসী পাতার রস ১ চা চামচ একসাথে মিশিয়ে খেলে বসন্তের গুটিগুলো তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়ে। নেফ্রাইটিসে (বৃক্কশোথে) এর চিকিৎসায় রোগীর আহার্য দ্রব্যের সাথে একটু আদার রস মিশিয়ে খেতে দিলে চমৎকার ফল পাওয়া যায়। তবে মাত্রা ঠিক করতে হয় বয়সানুসারে, পূর্ণ মাত্রা ১ গ্রাম। পুরনো আমাশয় রোগীকে ১ গ্রাম মাত্রায় (সহ্যমত) শুকনো আদার গুঁড়ো গরম জলের সাথে খেতে দিলে আম পরিপাক হয়। কোনো জায়গা কেটে রক্ত পড়লে সেখানে একটু শুকনো আদার গুঁড়ো টিপে দিলে রক্ত বন্ধ হয়ে যায় ও তাড়াতাড়ি ক্ষতস্থান শুকিয়ে যায়।

তুলসী : শিশুদের যদি সামান্য কারণেই সর্দি-কাশি হয়, তবে প্রতিদিন সকালে ৫/১০ ফোঁটা তুলসী পাতার রস (২/৫ ফোঁটা মধু মিশিয়ে অথবা শুধু) খাওয়ালে এ অসুবিধা দূর হবে। এমনকি এর দ্বারা শিশুদের কোষ্ঠকাঠিন্যও দূর হয়। এটা অবশ্য সবার জন্যও ব্যবহার্য। মুখে বসন্তের (নতুন) কালো দাগে তুলসীর রস মাখলে দাগগুলো মিলিয়ে যায়। এমনকি হামের পর শিশুর শরীরের কালো দাগে তুলসী পাতার রস মাখলেও দেহের স্বাভাবিক রঙ ফিরে আসে। তুলসী পাতার রস অল্প গরম করে তুলি দিয়ে কানে লাগালে কানের ব্যথা উপশম হয়। তুলসী পাতার রস লবণ মিশিয়ে দাদে লাগালে উপশম হয়।

www.nagorikpathagar.org

দূর্বাঘাস ঃ দূর্বাঘাস থেঁতো করে ক্ষতস্থানে বসিয়ে চেপে বেঁধে দিলে তৎক্ষণাৎ রক্ত বন্ধ হয়ে যায়। গ্রামাঞ্চলে এ চিকিৎসা এখনো বেশ জনপ্রিয়। দূর্বাঘাস শুকিয়ে গুঁড়ো করে সেই গুঁড়ো দিয়ে দাঁত মাজলে পায়রিয়া সেরে যায়।

বেলের গুণাবলী ঃ ভেষজ চিকিৎসা যেমন সহজলভ্য তেমনি প্রকৃতিতে আমরা এর উপকরণ পাই পর্যাপ্ত। প্রয়োজনমতো সঠিক গাছ, লতা বা ফুলটি বেছে নিয়ে ব্যবহার করতে পারলে অনেক সময় অনেক রোগ থেকে রেহাই পাওয়া সম্ভব হয়। ছোট ছোট রোগের তো কথাই নেই। সবচেয়ে বড় কথা হলো এর কোন পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নেই। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ভেষজ চিকিৎসা নিয়ে প্রচুর গবেষণা চলছে। ফিলিপিনের "দ্যা ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি", দ্য ফিলিপন্স কাউন্সিল ফর হেল্‌থ রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট ঐ দেশের বিজ্ঞানীরা ভেষজ ওষুধের কার্যকারিতা নিয়ে প্রচুর গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন। আশ্চর্যের বিষয় যে, শত শত বছরের বিশ্বাসকে লালন করে আধুনিক তাইওয়ানের অলিগলিতে ছোট ছোট ভেষজ ওষুধের দোকান তাদের ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে। প্রাত্যহিক জীবনে প্রকৃতির এমন একটি অপার দান বেল বা বিল্ব। প্রচুর গুণে সমৃদ্ধ এই বেলকে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন নামে অভিহিত করা হয়। যেমন, শল্য, হৃদগন্ধ, শলাটু, শাণ্ডিল্য, শ্রীফল, কর্কঠাহর, শৈলষু, শিবপত্র, শিবেষ্ট, পত্রশ্রেষ্ঠ, দুরারুহ, ত্রিপত্র, লীফল, শিবদ্রুম, সৎফলদ ইত্যাদি। এর বৈজ্ঞানিক নাম Aegle Marmelos. বেলের ফল, পাতা, ফুল, বীজ, আঠা, ফলের শাঁস, শিকড়ের ছাল সবকিছুই রোগ নিরাময়ে বিভিন্ন পদ্ধতিতে ব্যবহৃত হয়। এ জন্য এর এক নাম অতিমঙ্গল্য। এতে ভিটামিন 'এ' ও 'সি' প্রচুর পরিমাণে রয়েছে। বেলের ভেষজ গুণাগুণও রয়েছে। অন্যান্য ফল থেকে বেলের গুণাগুণের একটি ব্যতিক্রমধর্মী বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, তা হলো সব ফল পাকলে গুণের উৎকর্ষতা লাভ করে; কিন্তু বেলের ক্ষেত্রে তা বিপরীত। গবেষণায়ও দেখা গেছে, কাঁচা বেলই বেশি উপকারী। প্রাচীনকাল থেকে আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে বেলের গুণাগুণ ও ব্যবহার বেশি প্রশংসার সাথে প্রচলিত হয়ে আসছে।

আমাশয় ঃ বেল পুরনো আমাশয়ে দারুণ উপকারী। কাঁচা বেল পুড়িয়ে অথবা সিদ্ধ করে সামান্য চিনি অথবা আখের গুড়ের সাথে মিশিয়ে খেলে চমৎকার কাজ করে। সকালে খালি পেটে খাওয়াই ভাল। বেলশুঁট সিদ্ধ করে শরবত তৈরি করে সকালে ও বিকালে ১ গ্লাস করে ৫/৭ দিন খেলে উদরাময় রোগের উপশম হতে পারে। প্রত্যেক দিন সকালে তিনটি বেলপাতার রস খেলে বহুমূত্র ও উচ্চ রক্তচাপ রোগ নিয়ন্ত্রিত থাকে। বেলপাতা সিদ্ধ করার পর যে পদার্থ তৈরি হয় তা হাঁপানি রোগে উপকারী। কাঁচা বেলের শাঁস এক সপ্তাহ বা তিন দিন তেলে ভিজিয়ে রেখে ঐ তেল গোসলের পূর্বে পায়ের তলায় ম্যাসাজ করলে পায়ের তলা জ্বালায় উপশম হয়।

বেলের আঠা ও বীজ কোষ্ঠ কাঠিন্য পরিষ্কারে সহায়ক। বেল মূলের কাথ ঈষদুষ্ণ অবস্থায় খেলে অর্শ রোগের উপশম হয়। ক্রিমিনাশক হিসেবেও বেলের ভূমিকা রয়েছে। খনার বচনে আছে ঃ "বেল খেয়ে খায় পানি/চির বলে মইলাম আমি"। মেধা বৃদ্ধিতে বেলের গুরুত্ব

www.nagorikpathagar.org

রয়েছে। তিনটি বেলপাতা ঘিয়ে মচমচে করে ভেজে কিছুদিন খেলে মেধা ও স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধি পায়। কোন কোন ভেষজ বিজ্ঞানীর মতে কিশোরদের খাওয়ালে ভাল। এতে কিশোর বয়সের চিত্তচাঞ্চল্য হ্রাস পায়। অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসকগণও বেলের গুণাবলী গুরুত্বের সাথে তুলে ধরেছেন। অ্যালোপ্যাথি মতে Anti Dysentry Principle বিদ্যমান থাকায় পুরনো ও নতুন যে কোন আমাশয় ভাল করতে এর জুড়ি নেই। শুধু তাই নয়, এতে পাচক রস বিদ্যমান থাকায় হজমে সাহায্য করে। পেকটিন থাকায় উদরাময়ে ভাল কাজ করে। আবার Resin জাতীয় পদার্থ যা কোষ্ঠবদ্ধতায় চমৎকার কাজ করে। আমাদের দেশের বিশিষ্ট গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজিস্ট ডাঃ এ কে আজাদ খান পেটের পীড়ায় কাঁচা বেল খাওয়ার পরামর্শ দিয়ে থাকেন (জনকণ্ঠ ১৮ জানুয়ারি, ২০০০ ও পরিবেশ পত্র অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০০০)।

ফুলের গুণ ঃ ঝুমকা ফুল (কর্ন ফ্লাওয়ার), এর বৈজ্ঞানিক নাম সিতাউরিয়া সিয়ানাস। গবেষণায় দেখা যায় কমপোসিতা গোত্রের এই উদ্ভিদটি অ্যাসট্রোজেনের বিকল্প হিসেবে কাজ করে যা ক্ষতিগ্রস্ত টিস্যুর পরিচর্যার মাধ্যমে রক্তপাত বন্ধ করে। ইলিক্যামপেন ফুলের বৈজ্ঞানিক নাম ইনুলা হেলেনিয়াম। এই উদ্ভিদের শিকড় ব্যবহৃত হয় হাঁপানি, জমাট কফ এবং পাকস্থলীর আলসার নিরাময়ে। গবেষকরা ধারণা করেন, এটি মাংসপেশীর খিঁচুনিজনিত হাঁপানি ও বুকের শ্লেষ্মা পরিষ্কারেও কার্যকর। জবা ফুলের বৈজ্ঞানিক নাম হিবিসকাস রোজা-সাইনেসিস। পরিচিত এই গাছটির পাতা ও ফুল ত্বকের কোমলতা ও উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি করে। পাতার রস জ্বর উপশমের ঔষধি হিসেবেও ব্যবহৃত হয়। মেরিগোল্ড বৈজ্ঞানিক নাম কালাস পালুসট্রিজ। ত্বকের রোগে একটি কার্যকরী ভেষজ হিসেবে কাজ করে। বাতের ব্যথার জন্যও অনেকে এর শুকনো পাতা খেয়ে থাকেন। সিংহদন্তীর বৈজ্ঞানিক নাম তারাক্সাকাম অফিসিনেল। হলুদ রঙের এই ফুলের চা অনেকেই খেয়ে থাকেন লিভার, গলব্লাডার এবং কোষ্ঠকাঠিন্য জাতীয় জটিলতার উপশমের জন্য (যুগান্তর ১৪ জুন ২০০২)।

ভারতের ৭০ ভাগ মানুষ গাছ-গাছড়া ব্যবহার করে। ভারতের গবেষক আর সুগন্ধি জানান, বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার মতে, পৃথিবীর শতকরা ৮০ ভাগ মানুষ বা চার শত ত্রিশ কোটি মানুষ তাদের প্রাথমিক স্বাস্থ্য রক্ষায় ঐতিহ্যবাহী গাছ-গাছড়ার ওষুধ ব্যবহার করে। জার্মানিতে শতকরা ৪০ জন এবং ফ্রান্সে শতকরা ৩৭ জন ঐতিহ্যবাহী চিকিৎসা পদ্ধতি ব্যবহার করে। ফ্রান্সের শতকরা ৫৭ জন মানুষ হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা গ্রহণ করে। যুক্তরাজ্যে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা ব্যবহার করে শতকরা ২৫ জন মানুষ। তিনি বলেন, ভেষজের প্রতি মানুষের আগ্রহ দিন দিন বাড়ছে। ইউরোপের দেশগুলো ১৯৯৬ সালে ১২ হাজার টন ভেষজ ও সুগন্ধি উদ্ভিদ উপাদান আমদানি করে। ইউরোপে এসব আমদানি সবচেয়ে বেশি করে জার্মানি। তিনি আরো জানান, ভারতে স্থানীয় চিকিৎসা পদ্ধতির ক্ষেত্রে ৭,৫০০ প্রজাতির ভেষজ উদ্ভিদ পাওয়া যায়। এসবের চর্চায় নিয়োজিত রয়েছেন ৩,৬৬,৭৪০ আয়ুর্বেদ চিকিৎসক, ২৯,৭০১ ইউনানী বিশেষজ্ঞ এবং ১১,৬৪০ সিদ্ধ বিশেষজ্ঞ। লাখ লাখ গৃহবধূ, দাই এবং ভেষজ

www.nagorikpathagar.org

গ্রহণকারী ঐতিহ্যবাহী পদ্ধতিতে স্বাস্থ্যচর্চা করে। ভারতের শতকরা ৭০ ভাগ মানুষ এখনও গাছ-গাছড়া থেকে ঐতিহ্যবাহী পদ্ধতিতে স্বাস্থ্যচর্চা করে।

নয়াদিল্লির জওহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয়ের শতদ্রুপ চট্টোপাধ্যায় তার প্রবন্ধে বলেন, সাম্প্রতিক বছরগুলোতে দেখা গেছে, শিল্পোন্নত দেশগুলোতে ঐতিহ্যবাহী চিকিৎসা পদ্ধতির ব্যাপারে আগ্রহ ব্যাপকভাবে বাড়ছে। ফলে ওষুধ প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর কাছে ভেষজ উদ্ভিদের চাহিদাও বাড়ছে। ভারতেই বছরে ১১ কোটি রুপির ভেষজ ওষুধ তৈরি হয়।

উত্তর-পূর্ব ভারতে ব্যাপকভাবে ভেষজ উদ্ভিদ দেখা যায়। সেগুলোর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে, সর্পগন্ধা, ত্রায়মানা ইত্যাদি। কিন্তু বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ব্যবহারের কারণে এগুলো বর্তমানে হুমকির সম্মুখীন। ভারতীয় বন আইন, ১৯২৭, বন (সংরক্ষণ) আইন, ১৯৮০ এবং বন্যপ্রাণী (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ১৯৭২-কে ১৯৯১ সালে সংশোধন করা হয়। এছাড়া বিভিন্ন প্রদেশেও এ রকম আইন রয়েছে। কিন্তু দেখা গেছে, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে এ আইনগুলো ভেষজ উদ্ভিদের বাণিজ্যিক ব্যবহারের সাথে সম্পর্কিত। আইনের বৈধতা দিয়ে অবৈধ বাণিজ্যিক ব্যবহারকে নিয়ন্ত্রণ করা যাচ্ছে না। এসব ভেষজ উদ্ভিদ বেশিরভাগ সংগ্রহ করা হয় বন থেকে, যেখানে সংগ্রহকারী, স্থানীয় এজেন্ট, পাইকারি বিক্রেতা, সরবরাহকারী প্রভৃতি গোষ্ঠী কাজ করে।

বাংলাদেশে চাষাবাদযোগ্য ঔষধি উদ্ভিদ

বাংলাদেশে প্রায় পাঁচ শতের মতো ঔষধি উদ্ভিদ পাওয়া যায় (Yusuf et al, 1990; Ghani, 1998)। এদের অধিকাংশই বনে-জঙ্গলে, বাড়িঘর ও রাস্তার আশপাশ ও বিভিন্ন পতিত জমিতে অযত্নে-অবহেলায় জন্মে থাকে। সব না হলেও এদের অন্ততঃ ৫০টিকে প্রাথমিক পর্যায়ে বাংলাদেশে চাষের আওতায় আনা যায়। আধুনিক চাষাবাদ পদ্ধতি ও প্রযুক্তি ব্যবহার করে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে চাষ করে দেশের চাহিদা পূরণ করে এসব উদ্ভিদ বিদেশে রপ্তানির মাধমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব।

দেশে ও বিদেশে এই সব ঔষধি উদ্ভিদের বিপুল চাহিদা রয়েছে। এদের অধিকাংশই বাংলাদেশের বনে-জঙ্গলে প্রাকৃতিকভাবেই জন্মে, আবার এদের অনেকগুলো শস্যদানা, তেলবীজ, সব্জি ও মসলা হিসেবে এদেশে চাষ করা হয়। ফলে বাংলাদেশে এদরে চাষাবাদ করা মোটেও কষ্টকর হবে না বরং তা সহজেই ফলপ্রসূ অর্থকরী ফসল হিসেবে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে চাষ করা যাবে। ঔষধি উদ্ভিদের পরিকল্পিত ও বাণিজ্যিক চাষাবাদ দেশের সার্বিক উন্নয়নে ও দেশকে ঔষধি উদ্ভিদ কাঁচামালে স্বয়ংসম্পূর্ণ করতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

উদ্ভিদ জীববৈচিত্র্যের খাদ্য মূল্যমান

এক সময় বাংলাদেশে প্রায় ১০,০০০ প্রজাতির ধান চাষ করা হত। বর্তমানে উচ্চ ফলনশীল প্রজাতির ধান চাষের ব্যাপক সম্প্রসারণ হওয়াতে অন্যসব প্রজাতির অধিকাংশই প্রায় বিলুপ্তির পথে। ফলে দেশে ঐতিহ্যবাহী বিচিত্র প্রজাতির দেশীয় গম ও ধানের চাষ

www.nagorikpathagar.org

আজ হারিয়ে যেতে বসেছে। সর্বোপরি উদ্ভিদের গুণাবলি সম্বন্ধে উন্নয়নশীল দেশে সচেতনতার অভাব রয়েছে। উদ্ভিদ জীব-বৈচিত্র্যের সব গুণ জেনে শেষ করা সম্ভব নয়। এ নিয়ে আমাদের মতো অনুন্নত দেশে ব্যাপক গবেষণাও এখনো শুরু হয়নি। সাধারণ ধারণা নেয়ার জন্য কতিপয় উদ্ভিদের বিশেষ গুণাবলীর বিষয়ে আলোকপাত করা হল।

লাউ ঃ শীতকালে লাউয়ের তরকারি এ দেশে বেশ জনপ্রিয়। লাউয়ের কোন অংশই ফেলনা নয়। লাউগাছের লতা ও ডাঁটা দিয়ে সুস্বাদু শাক রান্না করা যায়, যা বেশ পুষ্টিকরও বটে। লাউয়ের ভিতরের অংশটুকু দিয়ে তরকারি এবং ছাল দিয়ে চচ্চড়ি রান্না করা যায়। আবার কচি বীজ খোলায় ভেজে বেটে ভর্তা করে খাওয়া যায়। এছাড়া আরো বিভিন্ন পদ্ধতিতে লাউয়ের তরকারি এবং বিভিন্ন প্রকার খাবার তৈরি করা হয়ে থাকে।

শাক-সবজিতে ভিটামিন সিঃ ভিটামিন সি এ অ্যাসকরবিক এসিড থাকে। মানুষের শরীরে অ্যাসকরবিক এসিড ভিটামিন সি হিসেবে কাজ করে। মানব দেহের জন্য ভিটামিন সি একটি প্রয়োজনীয় উপাদান। এর অভাব থাকলে মানুষের নানাবিধ চর্মরোগ, দাঁতের মাড়ি থেকে রক্ত পড়া, ত্বক বা ঠোঁট কেটে যাওয়া, ঘা হয়। লেবু ও টক জাতীয় ফল এ ভিটামিনের প্রধান উৎস। ভিটামিন সি এর অভাব হলে লৌহ শোষণে বিঘ্ন ঘটে। ফলে যথেষ্ট পরিমাণ লৌহজাত খাদ্য খেলেও শরীরে তেমন উপকারে লাগে না। অন্যান্য খাদ্যোপাদানের মতো ভিটামিন সিও শরীরে জমা থাকে না। বর্জ্য পদার্থের সঙ্গে প্রতিনিয়ত অতিরিক্ত ভিটামিন সি বের হয়ে যায়। তাই শরীরের চাহিদা মিটানোর জন্য আমাদের ভিটামিন সি সমৃদ্ধ খাদ্য গ্রহণ করা উচিত।
আমরা প্রতিদিন যে পুষ্টিকর খাবার খাই যেমন মাছ, মাংস, ডিম ও ডাল। এগুলোতে ভিটামিন সি এর অভাব রয়েছে। তাই এগুলো ছাড়া আমরা যেসব খাদ্য গ্রহণ করি যেমন শাকসবজি, ফলমূল এগুলোতে প্রচুর পরিমাণ ভিটামিন সি রয়েছে। এই ভিটামিন সি এর মত গুরুত্বপূর্ণ উপাদানের জন্য চাহিদা পূরণে বিভিন্ন প্রকার ফলমূল, শাক-সবজি ইত্যাদির ওপর নির্ভর করা আবশ্যক। সেজন্য জীব-বৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও টেকসই ব্যবস্থাপনার জোর দেয়া অত্যাবশ্যক। পৃথিবীর উন্নত দেশে যেমন জাপান, আমেরিকায় প্রসেস করা খাদ্য প্যাকেটে পুষ্টির মান লেখা থাকে, যার ফলে ফলমূল ইত্যাদির কদর অত্যন্ত বেশি। আমাদের দেশে শাক-সবজি ও ফলমূল উপযুক্ত প্রসেস করার অভাবে এবং খাদ্য পুষ্টি সম্বন্ধে জ্ঞান ও যথাযথ সচেতনতার অভাবে অমূল্য প্রাকৃতিক সম্পদ ও জীব বৈচিত্র্যের ৪৫% ভিটামিন সি নষ্ট হয়ে যায়। যেমন কাঁচাটমেটো রান্না করে খাবার চেয়ে সালাদ করে খাওয়াই শ্রেয়। তাই ঘর-বাড়ির আঙ্গিনায় বেশি করে শাক-সবজি চাষ করে অধিক ভিটামিন সি এর যোগান ও খাদ্যাভ্যাস করা উচিত (যুগান্তর ৯ জুলাই, ২০০২)।

লাউয়ের গুণাবলী নিয়ে আমাদের দেশে তেমন বৈজ্ঞানিক গবেষণা এখনো হয়নি। পুষ্টি বিজ্ঞানীদের মতে ১০০ গ্রাম লাউয়ের পুষ্টি উপাদান বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, তাতে প্রোটিন রয়েছে ০.২ গ্রাম, কার্বোহাইড্রেট ২.৫ গ্রাম, ফ্যাট ০.১ গ্রাম, খনিজ পদার্থ ০.৫ গ্রাম, ক্যালসিয়াম ২০ মিঃ গ্রাম, ফসফরাস ১০ মিঃ গ্রাম, লোহা ০.৭ গ্রাম, ভিটামিন বি-১ .০৩ মিলিগ্রাম, ভিটামিন-২ ০.০১ মিগ্রাম, সিয়াসিন ০.০২ মিলিগ্রাম। (ইত্তেফাক ২৮শে নভেম্বর/২০০০)।

অনুরূপভাবে ১০০ গ্রাম কমলালেবুর পুষ্টি উপাদানের পরিমাণ রয়েছে ভিটামিন সি ৫০ গ্রাম, প্রোটিন ০.৯৩ গ্রাম, ফ্যাট ০.২ গ্রাম, কার্বোহাইড্রেট ১১.২ গ্রাম, এনার্জি ৪৫ কিলো

www.nagorikpathagar.org

ক্যালরি। তাছাড়া খনিজ পদার্থের মধ্যে ক্যালসিয়াম ৩৩ মিলিগ্রাম, আয়রন ০.৬ মিলিগ্রাম, ফসফরাস ২৩মিঃ গ্রাম, পটাসিয়াম ২৪০ মিলিগ্রাম (ইত্তেফাক ২৮ নভেম্বর/২০০০)। তাই এসব উদ্ভিদ বৈচিত্র্যের সংরক্ষণের জন্য সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা একান্ত অপরিহার্য ।

চিত্র ১.৯: বাড়ির আঙিনায় বনায়ন ও পুকুর

কাঁঠাল কাঠ ও ফলের গুণাবলী

জীব-বৈচিত্র্যের গুণাবলী, পুষ্টিমান, প্রয়োজনীয়তার কথা লিখে শেষ করার উপায় নেই যেমন কাঁঠাল আমাদের আপামর জনসাধারণের কাছে সর্বাধিক পরিচিত প্রিয় ফল। কাঁঠাল মোরেসি (Moraceae) পরিবারভুক্ত উদ্ভিদ। এর বৈজ্ঞানিক নাম আর্টোকার্পাস হেটেরোপাইলাস (Artocarpus hetorophylus) এর গুণাবলী আলোকপাত করলে অবাক হতে হয়। ছোট বেলা থেকেই জানতাম গ্রীষ্মকালের ছুটির অর্থ আম, কাঁঠাল খাওয়া আর মামার বাড়ি বেড়াতে যাওয়া। অন্যান্য ফলের মধ্যে কাঁঠাল আকারে ও ওজনে অধিকতর বড়। বাংলাদেশের ফলের মধ্যে বিশিষ্ট স্থান দখল করে আছে বলেই কাঁঠাল এদেশের জাতীয় ফল। স্বাদে, গন্ধে, রঙে ও উচ্চমান পুষ্টিতে, সহজলভ্যতার এবং প্রতি অংশের বিবিধ ব্যবহারে এ গাছ ও ফলের গুরুত্ব অতুলনীয়। আজকাল কাঁঠালের দাম বেড়ে গেলেও সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে রয়েছে। গ্রামের মানুষ সস্তার মৌসুমে ভাতের বদলে এখনো কাঁঠাল খেয়ে থাকে। জাতীয় এ ফলটিকে নিয়ে লোককথারও অভাব নেই। 'গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল'। দেবরকে ঠাট্টা করে ভাবী বলেন, 'এ যেন কাঁঠালের আঠা, ছাড়তেই চায় না।'

খাদ্য হিসেবে কাঁঠালের ব্যবহার বহুবিধ। প্রবাদ আছে - 'কাঁঠাল ফল, কাঁঠাল তরকারি সবার জন্য দরকারি'। কাঁঠাল গাছের স্ত্রী ফুল ধীরে ধীরে বড় হয়ে কাঁঠাল ফলে রূপান্তরিত হয়। পক্ষান্তরে ছোট, কচি, লম্বাটে কাঁঠালের কলিগুলো পুরুষ ফুল। ডালের আগায় এ ধরনের

www.nagorikpathagar.org

হাজার হাজার পুরুষ ফুল ধরে এবং পরবর্তীতে ঝরে যায়। এ ধরনের কাঁঠালের পুরুষ কলি টক-মিষ্টি, বাচ্চাদের বড় প্রিয় খাবার। কাঁঠাল ভর্তা হিসেবেও উপাদেয়। কাঁঠালের বীজে "কার্বোহাইড্রেট" এর পরিমাণ বেশি হলেও ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য এটা উত্তম পথ্য। ক্যান্সার প্রতিরোধেও এর গুরুত্ব অনেক।

কাঁঠালের ফার্নিচার অতি মূল্যবান। টিম্বার হিসেবে সেগুনের পরই কাঁঠালের গুরুত্ব। কাঁঠাল কাঠ অতি মূল্যবান। বয়স্ক গাছের কাঠের হলুদ ন্যাচারাল রং অতি আকর্ষণীয়। গাছ লাগানোর প্রথম দু'বছর গাছের ডালপালা কিছুটা ছেঁটে দিয়ে খুব সুন্দর মনোরম করে কাঠামো গড়ে তোলা যায়। এ সময় নিচের ডাল ছেঁটে দিয়ে ৬-৭ হাত লম্বা কাণ্ড তৈরি করলে ভবিষ্যতে টিম্বার ভ্যালু (কাঠের মূল্য) খুব বেড়ে যায়। এ অবস্থায় গাছের নিচে আলো-বাতাস প্রাপ্তির সুবিধা হয়। গাছের নিচে আনারস, আদা, হলুদ কচু প্রভৃতি আবাদ করার সুযোগ সৃষ্টি হয়।

কাঁঠাল গাছের হলুদ রঙের কাঠ ও ফার্নিচার অত্যন্ত ন্যাচারাল ও আকর্ষণীয় হয়। দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য, হালে বিদেশি ইপিল ইপিল, ইউক্যালিপটাস, মিনজিয়াম ইত্যাদি গাছের প্রতি এ দেশের জনগোষ্ঠীকে বেশি আগ্রহী করে তোলার ফলে কাঁঠাল গাছ লাগানোর প্রবণতা অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছে। তাই দেশে স্থায়ী বৃক্ষরোপণ কার্যক্রমে কাঁঠাল গাছ লাগানোর পরিকল্পনার মধ্যে রাখার গুরুত্ব দেয়া উচিত।

কাঁঠাল যে কোন ফলদ গাছ বনজ গাছের প্রয়োজন মেটায়। তাই ফলদ বা বনজ বৃক্ষরোপণে যে কোন আগ্রহী ব্যক্তির এ গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় ফল গাছ রোপণে উদ্যোগী হওয়া উচিত। পরিতাপের বিষয়, কিছু কিছু প্রতিষ্ঠানের ইপিল-ইপিল, ইউক্যালিপটাস, মিনজিয়াম ইত্যাদি ধরনের বিদেশি গাছ রোপণের প্রতি মোহ বেশি। অথচ বহুবিধ গুণসম্পন্ন যে কোন ধরনের বৃক্ষরোপণে (ফলদ বা বনজ) জাতীয় ফল কাঁঠাল গাছকে তেমন প্রাধান্য দেয়া হচ্ছে না। ঘনবসতিপূর্ণ স্বল্প পরিসরসম্পন্ন এদেশে একটি স্থায়ী বৃক্ষরোপণ পরিকল্পনা হিসেবে কাঁঠালকে গুরুত্ব দেয়া আমাদের সবারই দায়িত্ব। রাস্তার ধারে কাঁঠাল গাছ লাগিয়ে অনেক গরিব মানুষের আয়ের সংস্থান হয়েছে। এক্ষেত্রে ময়মনসিংহ-ভালুকা রোডে কাঁঠাল বাগান স্থাপন একটি অনন্য দৃষ্টান্ত। একই দৃষ্টান্ত মাটির গুণাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে অনুসরণ ও সম্প্রসারণ করা হলে দেশের খাদ্য, পুষ্টি, বনজ সম্পদ ও পরিবেশের উন্নয়ন সাধন করা যেতে পারে অতিসহজে।

কাঁঠাল জাতীয় ফল হিসেবে এর গবেষণা ও উন্নয়নে তেমন অগ্রগতি হয়নি। এ পর্যন্ত কাঁঠালের কোন সুনির্দিষ্ট জাত উদ্ভাবন হয়নি। এতে মনে হয়, এ ফলটির গবেষণা উন্নয়নের প্রতি তেমন গুরুত্ব দেয়া হয়নি বা জাতীয় পর্যায়ে কোন ধরনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়নি, যেমনটি নেয়া হয়েছে আম ও অন্যান্য ফসলের ব্যাপারে। এ দেশে কাঁঠালের ওপর গবেষণা ও গবেষকের সংখ্যা খুবই কম। বীজ থেকে প্রাপ্ত গাছে যে ফল আসে তাতে মাতৃগুণ থাকে না, কাজেই কাঁঠালের মাতৃগুণ বজায় রেখে বংশবৃদ্ধির একাধিক পন্থা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার বিরাট সুযোগ রয়েছে।

www.nagorikpathagar.org

কাঁঠালের ঔষধি গুণাবলী

মরটন (১৯৮৭) এবং সোয়েপাদয়ো (১৯৯১) কাঁঠালের ঔষধি গুণের বিশেষ বর্ণনা দিয়েছেন। তাদের মতে, কাঁঠাল চীন দেশে একটি পুষ্টিকর টনিক তৈরির কাজে ব্যবহার করা হয়। মাদকজনিত সমস্যা থেকে পরিত্রাণের জন্য এ টনিকের ব্যবহার হয়।

কাঁঠাল বীজ Aphrodisiac রোগের সমস্যা সমাধানে ব্যবহার করা হয়। কাঁঠালের বীজ গরম করে কোন ক্ষতস্থানে রেখে তা সারানোর কাজে ব্যবহার করা হয়। কাঁঠালের পাতার ছাই, ভুট্টা এবং নারিকেলের মালার সঙ্গে পুড়িয়ে গ্যাস্ট্রিক আলসারের জন্য ওষুধ তৈরি করা যায়। কাঁঠালের আঠা ভিনেগারের সঙ্গে মিশিয়ে সাপের কামড়, গলাফোলা রোগের কারণে তৈরি ও সারানোর কাজে ব্যবহার করা হয়। কাঁঠালের শিকড় থেকে চর্ম ও অ্যাজমা রোগের ঔষধ তৈরি করা হয়। তাছাড়া শিকড় থেকে তৈরি নির্যাস দিয়ে জ্বর ও কলেরা রোগের ঔষধ তৈরি করা যায়। কাঁঠালের বীজে প্রচুর পরিমাণ জ্যাকলিন নামে এক ধরনের প্রোটিন থাকায় বর্তমান বিশ্বে রোগ প্রতিরোধ গবেষণায় ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে।

কাঁঠালের ওপর নির্ভরশীল পরিবারের কথা: কাঁঠাল বিক্রি অতিরিক্ত আয় বাড়ায় আমাদের দেশে এমন বহু পরিবার হলো- এমনি একটি পরিবার রয়েছে গাজীপুর জেলার শ্রীপুর উপজেলার টেপিরবাড়ী গ্রামের মোঃ ইসমাইল হোসেনের (৬৫)। তিনি এ গ্রামের একজন কাঁঠালচাষী। তার ১৪/১৫ সদস্যবিশিষ্ট পরিবারটি মূলত কাঁঠাল চাষের ওপর নির্ভরশীল। তাদের আয়ের প্রায় ৮০ ভাগ আসে কাঁঠাল বিক্রি থেকে। তার মতে কাঁঠাল হচ্ছে সবচেয়ে লাভজনক ফসল। কাঁঠালের রোগ বালাই ও পোকার আক্রমণ সবচেয়ে কম। চাষাবাদ খরচও খুবই কম, তাই তুলনামূলকভাবে কাঁঠাল চাষ সবচেয়ে বেশি লাভজনক (যুগান্তর ২৮ জুন ২০০২)।

কাঁঠালের পুষ্টিমান

খাদ্যমানের দিক থেকে কাঁঠাল অতি উত্তম। এ ফলের কোষের নরম রসালো অংশ মানুষের পুষ্টিকর খাদ্য। একটি কাঁঠালের ৩৩% খাদ্য উপযোগী অংশ, বাকি ৬৭% গো-খাদ্য। কাঁঠালের কোষের ওজন ৪০ গ্রাম থেকে ১০০ গ্রাম পর্যন্ত হতে পারে। কোষের ৭৫% খাদ্য উপযোগী অংশে এবং বাকি ২৫% বীজের ওজন, যা মানুষের খাদ্য ও কাঁঠালের বংশ বৃদ্ধিতে ব্যবহৃত হয়।

চিত্র ১.১০: বাংলাদেশের জাতীয় ফল কাঁঠাল

www.nagorikpathagar.org

কাঁঠালের পুষ্টিমান অনেক ফসলের চেয়ে বেশি, এতে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে শর্করা, খাদ্যপ্রাণ বিশেষ করে ভিটামিন 'এ' ও 'সি'। কাঁঠালের বীজে রয়েছে প্রচুর পরিমাণ ক্যালরি, শর্করা ও আমিষ। এছাড়া এ ফলটির কোষ ও বীজে রয়েছে অধিক পরিমাণে ক্যালসিয়াম, ফসফরাস ও লৌহ। এসব ভিটামিন ও খনিজ পদার্থের অভাবে প্রতিবছর এদেশের মানুষ নানা রোগে ভুগে থাকে। এদের বেশিরভাগই হল শিশু ও মহিলা। সারাবছর কমবেশি কাঁঠালের প্রাপ্যতা পুষ্টির অভাব পূরণে সহায়তা করতে পারে।

সারণী ১.১ ঃ কাঁঠালের পুষ্টি উপাদান (প্রতি ১০০ গ্রাম খাদ্য উপযোগী অংশে)

উৎপাদন	কাঁচা কাঁঠাল (সবজি)	কাঁঠালের কোষ	কাঁঠালের বীজ
ক্যালরি (কে ক্যাল)	৫১	৪৮	১৩৩
আমিষ (গ্রাম)	২.৬	১.৮	৬.৬
স্নেহ (গ্রাম)	০.৩	০.১	০.৪
ক্যালসিয়াম (মিঃ গ্রাম)	৩০	২০	৫০
লৌহ (মিঃ গ্রাম)	১.৭	০.৫	১.৫
ক্যারোটিন (মাইঃ গ্রাম)	০	৭০০	১০
পটাসিয়াম (মিঃগ্রাঃ)	২.৮	০.২	১.৬
শর্করা (গ্রাম)	৯.৪	৯.৯	২৫.৮
ভিটামিন বি১ গ্রাম	০.০৫	০.১১	০.২৫
ভিটামিন বি২ গ্রাম	০.০৪	০.১৫	০.১১
ভিটামিন সি গ্রাম	১৪	২১	১১

উৎস ঃ যুগান্তর ২৮ জুন ২০০২

কাঁঠাল পাতা, কচি ডাল, কাঁচা-পাকা কাঁঠালের যে কোন অংশেরই পুষ্টিমান তুলনায় খুব বেশি। কাঁঠাল গরু-ছাগলের অতি মুখরোচক উপাদেয় খাবার। দুধেল গাভীকে মৌসুমী কাঁঠালের পাতা, ছোবড়া, মোচা, ভুতি, যে কোন অংশ নিয়মিত খাওয়ালে দুধ দেয়ার ক্ষমতা অনেক বেড়ে যায় বলে সত্য ধারণা প্রচলিত আছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, সুস্বাস্থ্যের জন্য জনপ্রতি দৈনিক ৪ আউন্স বা প্রায় ১১৫ গ্রাম ফল (আহার উপযোগী অংশ) খাওয়া দরকার। দেশে কাঁঠালের চাহিদার বিষয়ে সুনির্দিষ্ট গবেষণা না থাকলেও বিশেষজ্ঞরা মনে করেন দেশের প্রয়োজন মেটাতে বছরে প্রায় ৮০ লাখ টন ফলের প্রয়োজন। অথচ এদেশে বর্তমানে যে ১৫ লাখ টন ফল উৎপাদিত হচ্ছে তা চাহিদার তুলনায় মাত্র এক-পঞ্চমাংশ। এ অবস্থায় গ্রামীণ উন্নয়নে বিশেষ করে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর ফল তথা পুষ্টির চাহিদা মেটাতে কাঁঠালের চাষ ব্যাপক সম্প্রসারণ করা অত্যাবশ্যক।

কৃষি উৎপাদনে নীলাভ-সবুজ শৈবালের গুরুত্ব

রাসায়নিক সার ব্যবহারে পরিবেশ ও জীব-বৈচিত্র্যের ওপর প্রভাব আজ প্রায় সবারই জানা। জৈব সার ব্যবহার না করে ক্রমাগত রাসায়নিক সার ব্যবহার করতে থাকলে জমিতে জৈব সারের পরিমাণ কমে গিয়ে জমির উৎপাদন ক্ষমতা হ্রাস পেতে পারে। এ জন্য জমিতে অধিক পরিমাণে জৈব সার ব্যবহার করা প্রয়োজন। জমিতে নীলাভ-সবুজ শৈবাল জন্মায়ে

www.nagorikpathagar.org

জৈব সারের চাহিদা পূরণ করাও সম্ভব। শস্যের ক্ষেত্রে ভেজা মাটিতে বর্ষার সময় প্রচুর পরিমাণে বহুবিধ নীলাভ-সবুজ শৈবাল জন্মে। এদের দেহে বহুবিধ রাসায়নিক পদার্থ সঞ্চয় করে রাখে। এদের মৃতদেহ পচে মাটিতে জৈব পদার্থের পরিমাণ বাড়ায়, এতে মাটি উর্বর হয়। এদের মৃতদেহ থেকে নির্গত বহুবিধ এসিড জমির ক্ষারত্ব দূর করতে সাহায্য করে। Nostoc, Anabaena, Aulosira, Mastigocladum প্রভৃতি নীলাভ-সবুজ শৈবাল বায়ুমণ্ডলের মুক্ত নাইট্রোজেন নিজ দেহে সংবন্ধন করতে পারে। আবার কিছু শৈবাল অন্য উদ্ভিদের সঙ্গে মিত্রজীবী হিসেবে বাস করে মাটিতে নাইট্রোজেন সংবন্ধনে সাহায্য করে। এসব শৈবালের মৃতদেহ পচে মাটিতে অধিক পরিমাণে নাইট্রোজেন ঘটিত পদার্থ যেমন অ্যামোনিয়া জমা হয়। নাইট্রিফাইং ব্যাক্টেরিয়া ওই অ্যামোনিয়া নাইট্রেটে পরিণত করে। ফলে মাটির উর্বরতা বাড়ে। উন্নত বিশ্বের বিভিন্ন দেশ যেমন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, কানাডা, জাপান, জার্মানি; উন্নয়নশীল দেশসমূহ যেমন ভারত, থাইল্যান্ড, পাকিস্তান জৈব সারের ঘাটতি নীলাভ-সবুজ শৈবাল দিয়ে পূরণ করে থাকে। এতে ফসলের ফলন ক্রমাগত বাড়ছে, ফলে বিপুল আর্থিক সাশ্রয় হচ্ছে।

ভেষজ উদ্ভিদ সংরক্ষণে পর্যাপ্ত নীতিমালার অভাব

বাংলাদেশে বিভিন্নভাবে এ ভেষজ উদ্ভিদ নিয়ে গবেষণা চলছে। ভেষজ উদ্ভিদ শনাক্তকরণ, বিভিন্ন ক্ষেত্রে সেসব ভেষজ উদ্ভিদ ব্যবহার, ভেষজ উদ্ভিদ সংরক্ষণ ও চাষ এবং বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যম বা সরাসরি যোগাযোগের মাধ্যমে মানুষের মধ্যে ভেষজ উদ্ভিদ সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টির চেষ্টা চলছে। বর্তমানে স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের কাছে ভেষজ উদ্ভিদ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত তথ্যাবলী সংবলিত পুস্তিকা বিতরণের মাধ্যমে সচেতনতা সৃষ্টি করা হচ্ছে। শ্রীলংকায় ভেষজ উদ্ভিদের ওপর আলাদা একটি মন্ত্রণালয়ই রয়েছে। সেখানে আয়ুর্বেদিক সেন্টার ও বিভাগ রয়েছে। সে বিভাগ থেকে ভেষজ উদ্ভিদ শনাক্তকরণ, চাষ ও সুলভ মূল্যে মানুষের কাছে বিক্রির ব্যবস্থা রয়েছে। অন্যদিকে আমাদের দেশে ভেষজ উদ্ভিদ সংরক্ষণের কোন নীতিমালা ও আইন নেই। আমরা সরাসরি বন থেকে ইচ্ছেমতো ভেষজ উদ্ভিদ সংগ্রহ করছি। আমাদের দেশে বিলুপ্তপ্রায় প্রজাতিগুলোকে নির্দিষ্ট একটি সংরক্ষিত এলাকায় চাষ করতে হবে। ভেষজ উদ্ভিদের প্যাটেন্টশিপ নিয়ে আন্তর্জাতিক আইনও রয়েছে। সে আইনে কৃষকের অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে। বাংলাদেশে অবশ্য এখনো এ বিষয়ে সময়োপযোগী কোন আইন ও নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়নি। তবে আমাদের দ্রুত এ বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করা উচিত। বাংলাদেশে "প্লান্ট জেনেটিক রিসোর্স" এর ওপর একটি জাতীয় কমিটি হয়েছে। সরকারও এ ব্যাপারে সচেতন। দেশের বিজ্ঞানীরাও এ ব্যাপারে সরকারকে বিভিন্নভাবে পরামর্শ দিয়ে আসছে, তবে কার্যকরী উদ্যোগের বেশ অভাব রয়েছে। উপর্যুক্ত পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, ভেষজ উদ্ভিদ সংরক্ষণে সময়ের চাহিদা ও প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ বহু পিছিয়ে রয়েছে, আমাদের আর অপেক্ষা না করে এখনই দ্রুত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে।

www.nagorikpathagar.org

ভেষজ সম্পদ সংরক্ষণে নিম্নোক্ত কতিপয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে ঃ

- প্রতিটি উপজেলা, জেলা, বিভাগ ও শহরে সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগে ঔষধি বৃক্ষের নার্সারি গড়ে তোলা যেতে পারে, যাতে মানুষ তার প্রয়োজনীয় ঔষধি বৃক্ষের বীজ-চারা-তথ্য সুলভে পেতে পারে।
- স্কুল পর্যায়ে শিক্ষা কার্যক্রমে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবায় ঔষধি বৃক্ষ সম্পর্কে আকর্ষণীয় পাঠ্যক্রম চালু করতে হবে। সে সাথে প্রতিবছর বৃক্ষমেলা উদ্‌যাপনকালে এ বিষয়ে শিশু-কিশোরদের আগ্রহ বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার প্রবর্তন করতে হবে।
- সরকারি, ব্যক্তি ও যৌথ উদ্যোগে সরকারি খাস জমিতে স্থানীয় জনগণের অংশীদারিত্বের ব্যবস্থাপনায় ঔষধি বাগান তৈরির আশু ব্যবস্থা করা যেতে পারে।
- সরকারি ও এনজিও এবং প্রচার মাধ্যমের যৌথ উদ্যোগে ঔষধি বৃক্ষ সম্পর্কিত গণসচেতনতা বিস্তার ও উদ্বুদ্ধ করা যেতে পারে, যেমনঃ পত্র-পত্রিকা, রেডিও ও টেলিভিশনে ভেষজ উদ্ভিদ রোপণ ও দেশজ স্বাস্থ্যসেবা পদ্ধতি সম্পর্কে তথ্যসমৃদ্ধ অনুষ্ঠানমালা তৈরি ও সম্প্রচারের আওতা ও সময়সীমা বৃদ্ধি করতে হবে। রাজধানী, বাণিজ্যিক রাজধানী, বিভাগীয় মহানগরী, জেলা, শহর ও উপজেলা সদরের দৃষ্টি আকর্ষণীয় স্থানসমূহে বিলবোর্ড, হোর্ডিং ইত্যাদি স্থাপন করে ঔষধি গাছপালা লাগানো ও সংরক্ষণের ব্যাপারে মানুষকে সচেতন করে তোলা যেতে পারে।
- ভেষজ উদ্ভিদ ও ঔষধের নানাবিধ সম্ভাবনা ও সমস্যা চিহ্নিত করে এ সম্পর্কিত অব্যাহত গবেষণা কর্ম ও প্রায়োগিক সুফল লাভের নিমিত্তে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে জাতীয় ভেষজ গবেষণা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে প্রতিটি হাসপাতালে।
- এশিয়ার যে দেশসমূহ ঔষধি বৃক্ষ উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ, শিক্ষা, গবেষণা, উন্নয়ন ও রপ্তানীতে ঔষধ উন্নয়নের ধারায় জনগণের অধিকতর সেবায় নিয়োজিত, ঐ সকল দেশের নিজস্ব ভেষজ কার্যক্রম, উন্নয়ন নীতি ও কৌশল আত্মস্থ করার জন্য জাতীয় পর্যায়ে তথ্য-উপাত্ত ও অভিজ্ঞতা ধারণক্ষম উপরিকাঠামোসহ সাবলীল ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা যেতে পারে।
- স্থানীয় সরকারকে সম্পৃক্ত করে ও এনজিওগুলোর মাধ্যমে উদ্যোগ নিয়ে প্রতি পাঁচ বছর অন্তর জাতীয় বৃক্ষশুমারি করা যেতে পারে। সেসাথে দেশে বিদ্যমান ৫ শতাধিক ঔষধি বৃক্ষের তালিকা প্রণয়ন করে তার গুরুত্ব ব্যাপকভাবে প্রচারের যথোপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।
- প্রতিটি উপজেলা ও জেলা হাসপাতালে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবার পরিধি বিস্তার ও পরিবেশ সংরক্ষণে ঔষধি বৃক্ষরোপণপূর্বক বৃক্ষের পরিচিতি জনমানসে পরিচিত করানোর উদ্যোগ নেয়া যেতে পারে। এ কার্যক্রমের অগ্রগতি তদারকী করার জন্য স্থানীয় ও কেন্দ্রীয় পর্যায়ে মনিটরিং সেল গঠনের পদক্ষেপ গ্রহণ অপরিহার্য।
- বাংলাদেশের আদিবাসীদের প্রচলিত চিকিৎসায় যেসব ঔষধি বৃক্ষ উপাদান ও

www.nagorikpathagar.org

পদ্ধতিমালা ব্যবহৃত হয় তার উন্নয়নের পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে মূল জাতীয় ধারার সাথে তার সমন্বয় সাধনের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। পাহাড়ি বৈদ্য-ওঝাসহ নগ্নপদ চিকিৎসক সম্প্রদায়কে এ কার্যক্রমে সংযুক্ত করা যেতে পারে।

☛ দেশের প্রতিটি এনজিও, ক্লাব, দুঃস্থ পুনর্বাসন কেন্দ্র, ভবঘুরে কেন্দ্র, এতিমখানায় পরিকল্পিত উপায়ে ঔষধি-ফলদ-বনজ গাছ রোপণ ও পরিচর্যাসহ সংশ্লিষ্ট লোকবলের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের উদ্যোগ নিতে হবে। সর্বোপরি বেসরকারি উদ্যোক্তাদের বাণিজ্যিক চাষাবাদ, স্থানীয় বাজারজাতকরণ ও রফতানীকরণ বিষয়ে উৎসাহিত করতে হবে।

পশুর রক্ত উৎকৃষ্ট জৈব সার

জীববৈচিত্র্যের কোন অংশই ফেলনা নয় তা যতই তুচ্ছ হোক। পশুর উচ্ছিষ্টাংশ, রক্ত এমনকি দেহাবশেষ যথাযথ ব্যবস্থাপনার অভাবে প্রতিনিয়ত পরিবেশ দূষিত করছে। অথচ এই উপাদানগুলোকে পদ্ধতিগতভাবে ব্যবহার করা গেলে একটি মূল্যবান সম্পদে রূপান্তর করা সম্ভব। এই সম্পদটির নাম জৈব সার। মাটির স্বাস্থ্য রক্ষা তথা উর্বরতা বৃদ্ধিতে জৈব সারের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অন্যান্য দেশে মাটির জৈব গুণাগুণ বৃদ্ধি ও খাদ্য চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে শুষ্ক রক্ত, নাড়িভুঁড়ি, পশুর হাড় এমনকি দেহাবশেষ রূপান্তর প্রক্রিয়ায় একটি উৎকৃষ্ট সার হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। মাটিতে স্বাভাবিক জৈব সারের মাত্রা যেখানে ৫ ভাগে থাকা একান্ত আবশ্যক সেখানে দেশের অনেক এলাকায় এর পরিমাণ এক ভাগেরও কম। ফলে কৃষকরা মাথার ঘাম পায়ে ফেলেও প্রত্যাশিত ফসল উৎপাদন করতে ব্যর্থ হচ্ছে। পশুর রক্তে সর্বোচ্চ মাত্রায় উদ্ভিদ খাদ্যের মুখ্য কয়েকটি উপাদান একসঙ্গে পাওয়া যায়। যা অন্য কোন বস্তু বা উপাদানে একসঙ্গে পাওয়া যায় না। শুষ্ক রক্তে নাইট্রোজেন ১৩ ভাগ, ফসফরাস ৯ ভাগ, পটাশ ২ ভাগ থাকা সত্ত্বেও আমরা এর উপযুক্ত ব্যবহার নিশ্চিত করতে পারিনি। এমনকি কসাইখানার আবর্জনাতেও ৮ থেকে ৯ ভাগ নাইট্রোজেন এবং ৭ ভাগ ফসফরাস বিদ্যমান। অথচ বহুল প্রচলিত গোবর সারে উদ্ভিদ খাদ্যের সর্বোচ্চ মাত্রা নাইট্রোজেন ১.৫ ভাগ, ফসফরাস ০.৮ ভাগ, পটাশ ১.৯ ভাগ।

দেশে প্রতিদিন গরু-ছাগল জবাই হচ্ছে। কিন্তু কোন ধারণা না থাকার কারণে দুঃখজনকভাবে উৎকৃষ্ট জৈব পদার্থ অপচয় হচ্ছে। সম্মিলিতভাবে একাধিক পশু গর্তের পাশে জবাই করে রক্ত সংরক্ষণের মাধ্যমে এক থেকে দেড় মাস মাটি চাপা দিয়ে ওই রক্ত পচলে এক উৎকৃষ্ট জৈব সারে রূপান্তর ঘটবে। এছাড়াও পশুর রক্ত বা উচ্ছিষ্টাংশ অন্য যে কোন জৈব উপাদানের সঙ্গে সংযোজন করে সারে রূপান্তর করলে অতি উৎকৃষ্ট জৈব সার প্রস্তুত করা যায়।

মধু ও মধুর উপাদান ঃ রাসায়নিক বিশ্লেষণে দেখা যায় মধুতে প্রায় ৮১ ধরনের উপাদান রয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য উপাদান হচ্ছে - পানি (Moisture Content) ২১%

www.nagorikpathagar.org

ফ্রেকটোজ, লেবুলোজ (Fractose/Labolose) ৩৫-৪০%, ডেক্সট্রোজ গ্লুকোজ (Dextrose/Glucose) ৩০-৩৫%, সুক্রোজ (Sucrose) ২-৫%, আমিষ (Protein) ৫%, ভিটামিন বি, সি এবং কে ২%। এছাড়া রয়েছে পটাশিয়াম, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম, ফসফরাস, সালফেট, ফসফেট, কপার, আয়রন, ম্যাঙ্গানিজ থায়ামিন, রিবোফ্লাবিন, ফলিক এসিড, ল্যাকটিক, ফরমিক এসিড, অ্যাসিটিক এসিড, বুটানিক, গ্লুটকি স্যাক্সিনিক, ফরমিক, পাইরোগ্লোটামিক ও এমাইনো এসিড। প্রতি ১ কেজি মধুতে ক্যালরি রয়েছে ৩১৫০ থেকে ৩৩৫০ পর্যন্ত।

মিষ্টি স্বাদের জন্য বিভিন্ন খাবারের সঙ্গে মধুর ব্যবহার রয়েছে। সকালের নাস্তা ও হালকা খাবারে মধু নেয়া যায়, মধুতে ক্যালরি থাকায় মধু খাওয়ার পর শরীরের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায়, এর প্রোটিন দেহের গঠন, বৃদ্ধিসাধন ও ক্ষয় পূরণে যথেষ্ট কার্যকর। মধুর ম্যাগনেশিয়াম, ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস শরীরের হাড় গঠনে সহায়ক। মধুর ক্যালসিয়াম ও পটাশিয়াম হৃৎপিণ্ডকে সচল রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, বিভিন্ন এসিড পাকস্থলীর বিভিন্ন জৈবিক ক্রিয়ার ফলে প্রতিরোধ কাজ করে। মধুতে শক্তিশালী জীবাণুনাশক রয়েছে, এর নাম 'ইনহিবিন'।

মধু পানে রক্তকণিকা বৃদ্ধি পায়। এনিমিয়া, হাঁপানি, ক্যান্সার রোগে মধু কার্যকর। এছাড়া ঠাণ্ডা, কাশি, সর্দি, আমাশয় ও পেটের পীড়ায় মধু অত্যন্ত উপযোগী। ক্ষতস্থান শুকাতে, পুড়ে গেলে, কেটে গেলে ও ভেঙে-মচকে গেলে মধুর প্রলেপ ফলপ্রদ। রূপচর্চায় মধুর ব্যবহার দীর্ঘকালের, মুখের দাগ তুলতে ও লাবণ্য-মসৃণতায় মধু মেখে উপকার পাওয়া যায়। পরিশ্রম ও গরমে ক্লান্ত অবসন্ন হয়ে পড়লে ঠাণ্ডা পানির সঙ্গে লেবুর রস মিশ্রিত মধুর শরবত পান করলে দেহে উদ্যম ও সজীবতা ফিরে আসে। বিভিন্ন খাদ্য প্রস্তুতে মধুর রয়েছে ব্যাপক ব্যবহার।

ইসলাম ও বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে মধুর গুণাবলী

'মধু' আল্লাহর এক মহান নেয়ামত। পবিত্র কোরআন ও হাদিসে মধুকে পুষ্টিকর সুস্বাদু পানীয় ও মহৌষধ বলে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। মানবদেহের প্রয়োজনে চিকিৎসা বিজ্ঞান মধুর ব্যবহারকে যথেষ্ট কার্যকর বলে উল্লেখ করেছে। মধু এমন এক ব্যতিক্রমধর্মী তরল পদার্থ যা ওষুধ ও স্বাভাবিক খাদ্য হিসেবে সুস্থ-অসুস্থ সবার জন্যই প্রযোজ্য। নবজাতক হতে বৃদ্ধ পর্যন্ত সবার খাবার উপযোগী এটা। আল্লাহ মধু সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে বলেছেন, আপনার পালনকর্তা মৌমাছিকে আদেশ দিলেন পার্বত্যগাত্রে, বৃক্ষে এবং উঁচু চালে গৃহ তৈরি কর। এরপর সর্বপ্রকার ফল থেকে ভক্ষণ কর এবং আপন পালনকর্তার উন্মুখ পথসমূহে চলমান হও। তার পেট থেকে বিভিন্ন রঙের পানীয় নির্গত হয়। তাতে মানুষের জন্য রয়েছে রোগের প্রতিকার, অবশ্যই এতে রয়েছে চিন্তাশীলদের জন্য নিদর্শন (সূরা নহল ৬৯)। অপরদিকে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) মধুকে তাঁর পছন্দের খাবার হিসেবে গ্রহণ করে অন্যদেরও মধু

www.nagorikpathagar.org

খেতে বলেছেন। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রোগের নিরাময়ে তিনি মধু খেতে পরামর্শ দিয়ে মধুর মাহাত্ম্য বর্ণনা করেছেন। পবিত্র কোরআন ও হাদিসের সমর্থনে আধুনিক রসায়নবিদ ও চিকিৎসাবিদরাও মধুকে একটি আদর্শ ও পুষ্টিসম্পন্ন খাদ্য হিসেবে নির্ধারণ করেছেন। আধুনিক বিশ্বে আজ বাণিজ্যিক ভিত্তিতে মধুর উৎপাদন হচ্ছে। বিভিন্ন অঞ্চলের প্রকৃতি ও ভৌগোলিক পার্থক্যের কারণে বিভিন্ন অঞ্চলের মধুর বর্ণ, স্বাদ ও গন্ধের ভিন্নতা থাকলেও সব দেশেই মধুর ব্যবহার বাড়ছে। আধুনিক প্রযুক্তিতে প্রশিক্ষণ গ্রহণের মাধ্যমে একটি লাভজনক শিল্প হিসেবে মধু চাষ ও সংগ্রহ বিস্তার লাভ করছে।

সুন্দর মৌমাছি। চমৎকার সৃষ্টি। ছোট্ট মাপের প্রাণী। উড়ে বেড়ায় সবাই জানি। কখনও তারা দলবেঁধে ওড়ে। কখনও ঠিকানার উদ্দেশ্যে উড়ে যায় বহু দূরে। পাহাড়ে, গাছের ডালে, গৃহের উঁচু চালে তাদের আশ্রয়। দলে দলে জমা হয়ে একসঙ্গে বসবাস। মেঘ, বৃষ্টি-বাদলেও তাদের পরস্পরের থাকে হৃদ্যতা, ভালোবাসা, একে অপরের প্রতি পরম বিশ্বাস। নিজেরাই গড়ে তুলেছে তারা একটি পরিবার। কবি তাদের এই ছন্দ সুরে উড়ে যাওয়া দেখে কবিতা লিখেছেন– 'মৌমাছি মৌমাছি কোথা যাও নাচি নাচি, দাঁড়াও না একবার ভাই।' তখন হয়তো কবির কাব্যের জবাবে মৌমাছিরা বলে, 'ওই ফুল ফোটে বনে, যাই মধু আহরণে দাঁড়াবার সময় তো নাই।' মহান আল্লাহ্ জ্ঞান, বিবেক, বুদ্ধি, বোধশক্তি মানুষ এবং অন্য সব প্রাণীকে দিয়েছেন। ইরশাদ রয়েছে – 'সব সৃষ্টিই আল্লাহর মহিমা কীর্তন করে তসবিহ্ পাঠ করে।' মৌমাছিরা জ্ঞান, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও বিচক্ষণতার দিক দিয়ে সব জন্তুর মধ্যে সবচেয়ে মর্যাদার অধিকারী। কারণ আল্লাহ্ তাকে স্বতন্ত্র ভঙ্গিতে সম্বোধন করেছেন। আর অন্যান্য সব জন্তুর ব্যাপারে সামগ্রিকভাবে সম্বোধন করেছেন। যেমন ইরশাদ হয়েছে– আল্লাহতায়ালা প্রত্যেক বস্তুকে তার যোগ্য আকৃতি দান করেছেন। অতঃপর পথ প্রদর্শন করেছেন। এখানে প্রত্যেক শব্দটি ব্যাপকতার অর্থ প্রদান করেছে। আল্লাহতায়ালা ছোট্ট এ প্রাণীটির জন্য বিশেষ সম্বোধন করে সে কথা নবী (সা.)-কে জানিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে ইরশাদ হয়েছে– তোমার প্রতিপালক মৌমাছিকে তার অন্তরে ইঙ্গিত করে নির্দেশ দিলেন, মৌমাছি তুমি গৃহনির্মাণ কর পাহাড়ের গুহায়, বৃক্ষ ও মানুষ যে গৃহ নির্মাণ করে তার উঁচু চালে (সূরা নাহল-৬৮)।
এখানে আল্লাহ্ মৌমাছিকে সরাসরি সম্বোধন করে তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও সুকৌশলের অধিকারী হওয়ার কারণে তাকে সব প্রাণীর মধ্যে বিশেষ শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। মৌমাছিরা নিজেদের গভীর বোধশক্তি ও তীক্ষ্ণ জ্ঞান এবং বিচক্ষণতার মাধ্যমে একটি রাষ্ট্র গঠন করে থাকে। সেই রাষ্ট্রকে তারা কৌশল ও সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালনা করে। মৌমাছিদের রাষ্ট্রের শাসন ব্যবস্থা দেখে তাদের শ্রেষ্ঠত্ব লাভ ও সুকৌশলী হওয়া অনুমান করা যায়। তাদের রাষ্ট্রের দশটি বিভাগ রয়েছে। শুধু একজন শাসক থাকে। সেই শাসককে রানী মৌমাছি বলে। সে সুষ্ঠুভাবে রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য তার প্রজাদের সবাইকে বাকি নয়টি ভিন্ন ভিন্ন কর্মে নিযুক্ত করে। তার চমৎকার সংগঠন ও কর্মবণ্টনের ফলে গোটা রাষ্ট্র ব্যবস্থা বিশুদ্ধ ও সুশৃঙ্খল রূপে পরিচালিত হয়। তার অলঙ্ঘনীয় আইন ও বিধিমালা দেখে মানব বুদ্ধি অভিভূত হয়ে যায়। স্বয়ং এই

www.nagorikpathagar.org

রানী মৌমাছি তিন সপ্তাহ সময়ের মধ্যে ছয় হাজার থেকে বারো হাজার পর্যন্ত ডিম দেয়। দৈহিক ও অঙ্গসৌষ্ঠবের দিক দিয়ে সে অন্যান্য মৌমাছির চেয়ে ভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। সে কর্মবন্টন পদ্ধতি অনুসারে প্রজাদের যেসব দায়িত্বে নিযুক্ত করে, তা এ রকম– কিছু মৌমাছি দারোয়ান থাকে। তারা অপরিচিত ও বহিঃরাষ্ট্রের কোন মৌমাছিকে নিজেদের সীমার ভেতরে প্রবেশ করতে দেয় না। কিছু মৌমাছি ডিম হেফাজতের দায়িত্বে নিযুক্ত থাকে। কিছু মৌমাছি বাচ্চা মৌমাছিদের লালন-পালনের দায়িত্ব গ্রহণ করে। কোন কোন মৌমাছি চিকিৎসক। তারা মৌমাছি কিংবা কোন বাচ্চা মৌমাছির অসুখ হলে ওষুধ প্রদান করে এবং সেবা-যত্ন করে। কোন কোন মৌমাছি স্থাপত্য নির্মাণ ও ইঞ্জিনিয়ারিং কাজে নিযুক্ত।

মৌমাছি দলের এক অংশ গৃহ নির্মাণ করে। অনেক মৌমাছি আবার মোম সংগ্রহ করার কাজে নিয়োজিত থাকে। তারা বিভিন্ন উদ্ভিদ বিশেষ করে আখের ওপর জমে থাকা সাদা ধরনের গুঁড়া থেকে মোম সংগ্রহ করে স্থপতিদের কাছে পৌছাতে থাকে। তারা মোম দিয়ে নিজেদের ও বাচ্চাদের আবাসগৃহ নির্মাণ করে। তাদের নির্মিত অধিকাংশ চাকে বিশ হাজার পর্যন্ত ঘর থাকে। কোন কোন মৌমাছিকে মধু সংগ্রহ করার দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে। তারা বিভিন্ন প্রকার ফুল ও ফলের ওপর বসে রস চুষে নেয়। এ রস তাদের পেটে পৌছে মধুতে রূপান্তরিত হয়ে যায়। মধু মৌমাছি ও তাদের সন্তানদের খাদ্য। এটি আমাদের সবার জন্য সুস্বাদু খাদ্য নির্যাস ও রোগ নিরাময়ের ব্যবস্থাপত্র। কোন কোন মৌমাছিকে গোয়েন্দা হিসেবে মধু সংগ্রহকারী মৌমাছিদের তদন্ত করার জন্য তাদের রাষ্ট্রের রন্ধ্রে রন্ধ্রে পাঠানো হয়। এ বাহিনী কে কোন স্থান থেকে মধু নিয়ে আসে তা গোপনে গোপনে লক্ষ্য করে।

যদি কোন মৌমাছি নাপাক কিংবা আবর্জনার স্তূপে বসে যায়, তাহলে তারা এ খবর জলদি এসে রানী মৌমাছিকে জানায়। তখন রানী দারোয়ানকে নির্দেশ দেয় তাদের আটক করতে। দারোয়ান তাদের আটক করে ফেলে। কিছু মৌমাছি মধু পরীক্ষা করার কাজে নিযুক্ত থাকে। তারা আটককৃত মৌমাছির মধু পরীক্ষা করে যদি কোন নাপাক ধরা পড়ে তাহলে জল্লাদ বাহিনীর মাধ্যমে তাদের হত্যা করে ফেলে। এ কারণেই মাঝে মাঝে মৌচাকের নিচে কিছু মৃত মৌমাছিকে দেখা যায়। মৌমাছিদের এই বিভিন্ন দল অত্যন্ত তৎপরতা সহকারে নিজ নিজ কর্তব্য পালন করে। রানীর প্রত্যেকটি আদেশ মনেপ্রাণে শিরোধার্য করে নেয়। তাদের এই সুশৃঙ্খল ব্যবস্থাপনা ও কর্মকুশলতা দেখে মানুষ বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যায়।

মৌমাছিদের তৈরি এ মধু যেমন বলকারক খাদ্য, তেমনি আনন্দ ও তৃপ্তিদায়ক। রোগব্যাধির জন্যও ফলদায়ক ব্যবস্থাপত্র। কেন হবে না? স্রষ্টার ভ্রাম্যমাণ মেশিন সর্বপ্রকার ফল-ফুল থেকে বলকারক রস ও পবিত্র নির্যাস বের করে সুরক্ষিত গৃহে সঞ্চিত রাখে। যদি গাছ-গাছড়ার মধ্যে আরোগ্য লাভের উপাদান নিহিত থাকে, তবে এসব নির্যাসের মধ্যে কেন থাকবে না? কেননা আল্লাহ বলেছেন– তাদের পেট থেকে বিভিন্ন রঙের পানীয় নির্গত হয়। তাতে মানুষের জন্য রয়েছে রোগের প্রতিকার (সূরা নাহল ৬৯)।

www.nagorikpathagar.org

তাই চিকিৎসকরা মুখের লালা তৈরি করতে গিয়ে বিশেষভাবে মধু অন্তর্ভুক্ত করেন। মধু এমন পানীয় যা নিজেও নষ্ট হয় না এবং অন্যান্য বস্তুকেও দীর্ঘকাল পর্যন্ত নষ্ট হতে দেয় না। এ কারণে হাজার বছর ধরে চিকিৎসকরা একে অ্যালকোহল হিসেবে ব্যবহার করে আসছেন। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে কোন এক সাহাবি (রা.) তার ভাইয়ের অসুখের বিবরণ দিলে তিনি তাকে মধু পান করানোর পরামর্শ দেন। দ্বিতীয় দিনও এসে আবার সাহাবি (রা.) বললেন, অসুখ তেমনই রয়েছে। তিনি আবারও একই পরামর্শ দিলেন। তৃতীয় দিনও যখন সংবাদ আসে যে, অসুখে কোন পার্থক্য হয়নি, তখন তিনি বললেন– আল্লাহর উক্তি নিঃসন্দেহে সত্য। তোমার ভাইয়ের পেট মিথ্যাবাদী। তারপর রোগীকে আবার মধু পান করানো হয় এবং সে পূর্ণ সুস্থ হয়ে ওঠে।

মধু যে প্রাণীর পেট নিঃসৃত নির্যাস অথচ সে প্রাণীটি স্বয়ং বিষাক্ত। বিষের মধ্যে এ বিষ প্রতিষেধক, নিঃসন্দেহে আল্লাহর অপার শক্তির অভাবনীয় নিদর্শন। খাদ্য ও ঋতুর কারণে মধুর রং বিভিন্ন হয়ে থাকে। এ কারণেই কোন বিশেষ অঞ্চলে কোন বিশেষ ফুল-ফলের প্রাচুর্য থাকলে সেই এলাকার মধুতে তার প্রভাব অবশ্যই পরিলক্ষিত হয়। মধু তিন রঙের হয়ে থাকে। লালচে, হলদে, সাদাটে। মধুর রঙের এই ভিন্নতা মৌমাছিদের বয়সের তারতম্যের কারণেও হয়ে থাকে। মৌমাছি বেশি বয়সী হলে মধুর রং লালচে হয়। মাঝামাঝি বয়সের হলে হলদে হয়। আর অল্প বয়সী মৌমাছিদের জমানো মধু সাদাটে হয়ে থাকে। তবে স্বাদ ও উপকারিতার ক্ষেত্রে সব রঙের মধু সমান। এ তো গেল মধুর উপকারিতা। স্বয়ং মৌমাছির মাধ্যমেও আল্লাহ রাব্বুল আলামিন মানুষের উপকার সাধন করে থাকেন। হযরত আমির আসেম বিন সাবেত (রা.)-এর শাহাদাতের পর তার পবিত্র শবদেহকে একঝাঁক মৌমাছির মাধ্যমে ঘেরাও করে রেখে আল্লাহ কাফেরদের থেকে হেফাজত করেছেন। মোট কথা একটি ছোট্ট বিষাক্ত প্রাণীর সাহায্যে আমরা অতুলনীয় উপকার লাভ করছি। সৃষ্টির বিশেষ উপাদান থেকে মানব জাতির জন্য প্রধান শিক্ষণীয় হল শৃঙ্খলা ও রাষ্ট্র পরিচালনার কৌশল। দ্বিতীয়ত মানব জাতির রোগমুক্তির মহৌষধ। প্রকৃতির এ সন্তানকে সংরক্ষণ করার একক দায়িত্বও মানব জাতির (যুগান্তর ৫ জুলাই ২০০২)।

মৌমাছিদের কঠোর নিয়মের মধু প্রকৃতিগতভাবেই বিশুদ্ধ ও দুর্গন্ধমুক্ত। কোন মৌমাছির ফুল-ফল ছাড়া অন্যত্র বসা ও অন্যান্য তরল গ্রহণ করা নিষিদ্ধ। মধুতে সবসময় থাকে শুধু ফল-ফুলেরই নির্যাস। হাজার বছর ধরে মধু এমনিভাবে বিশুদ্ধ অবস্থায়ই বিরাজ করছে। যাতে মধুর এ সহজপ্রাপ্যতা বজায় থাকে এজন্য রাসূলুল্লাহ (সাঃ) নিষেধ করেছেন মৌমাছি মারতে। মধুর উপকারিতা, স্বাদ ও গ্রহণযোগ্যতার কারণেই আল্লাহ বেহেস্তে মধুর নহর তৈরি করে রেখেছেন, যাতে বেহেস্তবাসীরা অফুরন্ত মধু পান করতে পারেন। প্রাকৃতিক ও চাষ পদ্ধতি উভয় মধুর গুণাগুণ অভিন্ন। হাদিসে মধুর কথা ঃ

- রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "মধু কখনও হাতছাড়া করো না, কারণ এর মধ্যে মৃত্যু ছাড়া যে কোন রোগের ওষুধ রয়েছে।"
- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রঃ) বলেন, "রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন,

www.nagorikpathagar.org

কোরআন হল যে কোন আত্মিক রোগে আরোগ্যকারী এবং মধু হল যে কোন দৈহিক রোগে আরোগ্যকারী" (ইবনে মাজাহ)।

- হযরত আবু হুরায়রা (রঃ) বলেন -"রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি প্রতি মাসে তিনদিন ভোরে মধু চেটে খায় তার বড় রোগ হতে পারে না।" (ইবনে মাজাহ বায়হাকি)।
- রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, "সর্বোত্তম পানীয় হল মধু যা হৃৎপিণ্ডকে সবল করে এবং বুকের ঠাণ্ডা দূর করে।"
- তিনি আরও বলেছেন, "যদি কেউ আরোগ্য কামনা করেন তার ভোরের নাশতা হিসাবে পানি মিশ্রিত মধু পান করা উচিত।"
- তিনি বলেছেন, "আল্লাহর শপথ, যে ঘরে মধু আছে ফেরেশতাগণ সে ঘরের অধিবাসীদের মাগফেরাত করেন। কোন ব্যক্তি যদি মধু পান করে যেন তার পেটে ওষুধ স্থির হল এবং পেট থেকে লাখ রোগ বের হয়ে গেল।"
- হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেছেন- "রাসূলুল্লাহ (সাঃ) মধুর হাগুয়া খুবই ভালবাসতেন।" (বোখারি শরিফ)। (যুগান্তর ০৫/০৭/০২)।

বাংলাদেশের সুন্দরবন মধু চাষের অফুরন্ত ভাণ্ডার। সুষ্ঠু পরিচালনা করে চাষ করলে, মধ্যপ্রাচ্যসহ অনেক দেশেই রফতানী করা যায়। তাছাড়া রবি মৌসুমে সরিষা চাষের সময়ও উন্নতমানের মধু চাষ করা যেতে পারে।

বিলুপ্তির পথে বিভিন্ন প্রজাতির মাছ

বাংলাদেশের প্রায় ৪৩ প্রজাতির মাছের বিলুপ্ত হওয়ার 'আশঙ্কা'র কথা বিশেষজ্ঞরা অকপটে স্বীকার করেছেন। 'মৎস্য গবেষণা ইন্সটিটিউট' এর মৎস্য বিজ্ঞানীরা বিলুপ্তির পথে এ মাছগুলোকে তিন ভাগে ভাগ করেছেন। এই ৪৩ প্রজাতির মাছগুলোকে প্রথমতঃ 'মারাত্মক ভাবে বিপন্ন প্রজাতি' দ্বিতীয়তঃ 'বিপন্ন প্রজাতি' এবং তৃতীয়তঃ 'বিপন্ন হওয়ার পথে' বলে উল্লেখ করে তিনটি স্তরে সাজানো হয়েছে। 'মারাত্মকভাবে বিপন্ন প্রজাতি' এই স্তরের মাছগুলো হচ্ছে নান্দিনা, ভাগনা, মহাশোল, বাঘ আইড়, স্বরপুঁটি, পিপলাশোল, চেওয়া এবং নাপিত মাছ। 'বিপন্ন প্রজাতি' এই স্তর রয়েছে ২৫ প্রজাতির মাছ। এই মাছগুলো হচ্ছে গনিয়া, কালিবাউস, পাবদা, গজার, গুলশা, এলং খয়রা, ঢেলা, রানীমাছ, খোকশা, বোয়াল, শিং, শালবাটা, গাংমাগুর, বাচা, পাঙ্গাশ, গাওড়া, গুজি, আইড়, রিটা, টেংরা, চিতল, বাইম, মেনি (ভেদা), নাপিত কই এবং রাংগা চান্দা। সরকারি বিভাজনে শেষ স্তরের নাম 'বিপন্ন হতে যাচ্ছে'। এই স্তরের ১০টি মাছ হচ্ছে বাটা, বামোস, তিতপুঁটি, কুইচা, মধুপাবদা, কাজলি, আইড়, বাঁশ পাতা, ফলি ও তারাবাইম।

পৃথিবীতে ২০ হাজার প্রজাতির মাছ রয়েছে বলে দাবি করা হয়। এর মধ্যে বাংলাদেশের দখলে ছিল ৭৩৫ প্রজাতির মাছ। দেশের আয়তন হিসাবে এই সংখ্যক প্রজাতির মাছ পাওয়া নজিরবিহীন এবং বিস্ময়কর বিষয় এ মন্তব্য অবশ্য ছিল আন্তর্জাতিক মৎস্য সম্প্রদায়ের

www.nagorikpathagar.org

বিশেষজ্ঞদের। বাংলাদেশে ৭৩৫ প্রজাতির মাছ আর এখন নেই এটা নিশ্চিত করেই বলা যায়। বিলুপ্তির ছাপ লাগা হতভাগ্য মাছগুলোর প্রাপ্যতা নিয়ে একটু চিন্তা করলে দেশের ভোক্তাকুলও স্মরণ করতে পারবেন ৮০'র দশকের প্রায় শেষ ভাগেও নান্দিনা ও মহাশোল ছাড়া অবশিষ্ট সব প্রজাতির মাছের প্রাচুর্য দেশে ছিল। পানি ও মাটির কারণে অঞ্চলভিত্তিক যদিও প্রজাতিগত মাছের উৎপাদন অধিক পরিমাণে হয়ে থাকে তবুও এসব চিহ্নিত মাছ দেশের বড় বড় শহর-মোকাম বিশেষ করে ঢাকা মহানগরের মৎস্য আড়ৎ ও বাজারগুলোতে প্রতিদিন টন টন আমদানি হতো মাত্র এক যুগ আগেও।

নব্বই সালেও যেসব মাছের স্টক দেখা গেছে। মাত্র দেড়দশক সময়ে অর্ধশতাধিক মাছের বিলুপ্তি ঘটেছে অত্যন্ত দুঃখজনক ভাবে। কালো খলিশা নেই। লাল ও সাদা খলিশাও নেই। গুতুম মাছ নেই, নেপাল থেকে আনীত মহাশের, দেশী বলি পাবদা, চিরকা, চ্যাগব্যাগা, (কটকটি), লামা চান্দা, খল্লা, কাউনিয়া ইত্যাদি মাছের বিলুপ্তিও ঘটেছে অথবা ঘটতে যাচ্ছে যা বেশ সুলভ ছিল এই ৯০'এর দশকে। মহাশের মাছের আদলও দেখা হয়নি কারো। '৯১ সনে এ মাছ নেপাল থেকে আনার ক'বছরের মাথায়ই মাছটির বিলুপ্তি ঘটে।

বাস্তবে অতি আহরণই মৎস্য প্রজাতি বিনষ্টের একমাত্র কারণ নয়। পানির পরিবেশ বিনষ্ট, উৎসে পানি না থাকা, প্রজনন স্থান, বিচরণ ক্ষেত্রে পলি ভরাট, বহু নদী, খাল-বিলের মরুকরণ, মাছ চাষের আগে 'রাক্ষুসে' ও 'অপ্রয়োজনীয়' মাছ বিষ প্রয়োগে মেরে ফেলাও এজন্যে কম দায়ী নয়। তাই প্রাকৃতিক রেণু আহরণ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ এবং মৌসুমে দেশের নদ-নদী, খাল-বিলে রেণু শিকারীদের তৎপরতা কঠোর হস্তে দমন এবং জরুরি ভিত্তিতে নদীতে পোনা মাছ অবমুক্ত না করা গেলে রুই, কাতল, মৃগেলের মতো মাছও বিপন্ন প্রজাতি হিসেবে অচিরেই পরিগণিত হবে। নদীতে রুই জাতীয় মাছের প্রচণ্ড অভাব এরই মধ্যে মারাত্মকভাবে লক্ষ্য করা যাচ্ছে। সে সাথে নদী শাসন ও পানি দূষণ বন্ধ করতে হবে সর্বত্র। বুড়িগঙ্গা /গুলশান লেক দিয়েই শুরু করা যেতে পারে সর্বাগ্রে।

বিপন্ন ইলিশের কথা

বাংলাদেশের জাতীয় মাছ বাঙালির সবচেয়ে প্রিয় মাছের রাজা ইলিশ কি বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে? মাছের কথা উঠলেই ঐতিহ্যবাহী রূপালী ইলিশ সম্পর্কে সম্প্রতি এই আশঙ্কা আলোচনায় উঠে আসছে। চলতি ইলিশ মৌসুমে বাজারে মাছের দুষ্প্রাপ্যতা ও সরবরাহে স্বল্পতার কারণে এই আশঙ্কার সৃষ্টি হয়েছে। বিবেকহীনভাবে জাটকা নিধন ও ইলিশ ধরা এক শ্রেণীর অপরিণামদর্শী মানুষের কারণে সৃষ্ট পরিবেশের ভারসাম্যহীনতা এবং সমুদ্র দূষণ ইত্যাদি এই আশঙ্কাকে আরও জোরালো করে তুলেছে। বাস্তবিকই বিষয়টি বাংলাদেশীদের ভাবিয়ে তুলছে। অবশ্য ইলিশ রক্ষায় জনগণকে সচেতন করার লক্ষ্যে সরকারি-বেসরকারি মিডিয়াগুলো যথাসম্ভব প্রচার-প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছে। ইলিশের বিপন্নতা নিয়ে পত্রিকাগুলোতে নিয়মিত লেখালেখি হচ্ছে। এ ছাড়াও ইলিশ রক্ষার জন্য সরকারের মৎস্য বিভাগ রয়েছে, মৎস্য আইন রয়েছে, রয়েছে আইন প্রয়োগকারী সংস্থাও। কিন্তু দেশের মানুষ

www.nagorikpathagar.org

আশ্বস্ত হতে পারছে না এই জন্য যে, ফলাফল দিনের পর দিন খারাপ থেকে খারাপতর হচ্ছে।

ইলিশ অতিদ্রুত গতিসম্পন্ন এনাড্রোমাস (Anadromous) প্রজাতির যাযাবর বা ভ্রমণশীল (Migratory) মাছ। বর্ষাকালে উত্তাল সমুদ্র আর প্রতিকূল সামুদ্রিক আবহাওয়া ইলিশদের জীবনধারণের পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ে। ফলে প্রাণ বাঁচাবার তাগিদে এরা সমুদ্র থেকে নদীর উজানে উঠে আসে। খাদ্য, আশ্রয় ও প্রজননের (Breeding) উদ্দেশে ইলিশ বঙ্গোপসাগর থেকে যাত্রা করে প্রধানত মেঘনা ও পদ্মা এবং এদের শাখা নদীগুলো দিয়ে চলতে থাকে। মূলত এদের যাত্রাপথ দুটি। একটি সন্দ্বীপ, হাতিয়া, রামগতি, ভোলা, বরিশাল, নীলকমল, হাজিমারা হয়ে মেঘনা-পদ্মার সঙ্গমস্থল চাঁদপুর থেকে মোহনপুর ঘাটনাল পর্যন্ত এবং অপরটি চাঁদপুর থেকে পদ্মার হাসাইল, বহর, দিঘলী, মাওয়া (গোয়ালন্দ), আরিচা-শিবালয় পর্যন্ত। একটা নির্দিষ্ট সময় ও গতিপথ অতিক্রম করে ইলিশ পুনরায় ফিরে যায় এদের উৎপত্তিস্থল বঙ্গোপসাগরে। চলার এই দীর্ঘসময়ে স্ত্রী ইলিশের পেটের ডিম পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয় এবং এক সময় মেঘনা ও পদ্মা নদীর স্রোতে তা ছেড়ে দেয়। বেশিরভাগ স্ত্রী ইলিশ ডিম ছাড়ে আগস্ট থেকে নভেম্বর মাসের ভিতর। প্রকৃতপক্ষে ১৫ সেপ্টেম্বর থেকে ১৫ অক্টোবরের অমাবস্যা ও পূর্ণিমার সাত দিনই হচ্ছে সর্বোৎকৃষ্ট সময়। আর এ সময়েই সর্বোচ্চ পরিমাণের স্ত্রী ইলিশ ডিম ছাড়ে। সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে যদি পর্যাপ্ত বৃষ্টি হয় তা হলে ডিম ফোটার হারও বৃদ্ধি পায়। এ সময় বৃষ্টি না হলে ডিম ফোটায় মারাত্মক প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়। এই ডিম ফোটানোর জন্য পুরুষ ইলিশকে ডিমের উপর স্পনিং (Spawning) করতে হয়। একটি পূর্ণবয়স্ক বড় আকারের স্ত্রী ইলিশ প্রায় ২০ লাখ পর্যন্ত ডিম দেয়। কিন্তু ফোটে এর মাত্র ৫ শতাংশ। পুরুষ ইলিশের ঘাটতি এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক ও মনুষ্যসৃষ্ট বিভিন্ন কারণে বাকি ৯৫ শতাংশ ডিমই বিনষ্ট হয়ে যায়। ইলিশের একমাত্র খাদ্য হচ্ছে এক ধরনের শামুক জাতীয় জলজ প্রাণী যার নাম মানাস্কা। খাদ্য গ্রহণের ব্যাপারে ইলিশ খুবই রক্ষণশীল। যা-তা খাবার এরা কখনই খায় না। এ জন্যই স্বাদে-বর্ণে-ঘ্রাণে আর আকৃতিতে ইলিশ হয়ে উঠেছে মাছের রাজা।

প্রাকৃতিক নিয়মে স্ত্রী ইলিশ ডিম ছাড়ে মিঠা পানির (Sweet Water) নদীর স্রোতে। ইলিশের রেণু জাটকায় পরিণত হতে সময় লাগে ৫-৬ মাস। এ সময়টা এরা নদীতেই থাকে। জাটকা ৪-৫ সেন্টিমিটার আকারের হলে এরা আশ্রয় নেয় সাগরের খাঁড়ি অথবা নদীর অববাহিকায়। জানুয়ারি থেকে এপ্রিল মাস পর্যন্ত হচ্ছে জাটকা মৌসুম। মে থেকে জুলাই পর্যন্ত সময়ে জাটকা তরুণ (Juvenile) ইলিশে পরিণত হয়। তখন এদের আকার ২৩ সেন্টিমিটারের চেয়ে বড় হয়। এই তরুণ ইলিশ বিচরণ ক্ষেত্র হিসেবে বেছে নেয় সামান্য লোনা (Brackish) পানির এলাকা। এর পর এরা ধীরে ধীরে সমুদ্রের দিকে চলে যেতে থাকে। যৌবনপ্রাপ্ত হয়ে পরবর্তীতে ইলিশরা আবার ফিরে আসে নদীতে। সাধারণত নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসের দিকে এরা সমুদ্র থেকে উঠে আসতে শুরু করে। সাগর থেকে নদীতে উঠে আসা ইলিশের মাত্র ৫ শতাংশ পুনরায় সাগরে ফিরে যেতে পারে। বাকি ৯৫ শতাংশই মারা পড়ে জেলেদের হাতে। বঙ্গোপসাগর থেকে উঠে চাঁদপুর থেকে পদ্মার

www.nagorikpathagar.org

হাসাইল-বহর-দিঘলী-মাওয়া-আরিচা পর্যন্ত যাওয়া-আসার পথে ইলিশ মারা পড়ে বেশি। এরপরও মেঘনা ও পদ্মা নদীতে সৌভাগ্যবশত বেশ কিছু ইলিশ থেকে যায়। বিভিন্ন কারণে এরা সাগরে ফিরে যেতে পারে না। জানুয়ারিতে এরা নদীতে ডিম ছাড়ে। এ সময় যদি কিছু বৃষ্টি হয় তাহলে এসব ডিম ফোটে। এ কারণে শীতকালেও নদীতে কিছু ইলিশ পাওয়া যায়। বিশেষজ্ঞদের মতে, একটি ইলিশের পূর্ণতা পেতে দুই বছর সময় লাগে। ইলিশ যত বেশি সময় মিঠা পানিতে বাস করবে তত বেশি এর স্বাদ বেড়ে যাবে। বরিশাল, ভোলা, রামগতি, হাতিয়া ও সন্দীপের উপকূলীয় এলাকায়ও প্রচুর ইলিশ পাওয়া যায়। কিন্তু লোনা পানির এসব মাছের চেয়ে পদ্মার ইলিশ বেশ সুস্বাদু। যেসব জাল দিয়ে ইলিশ ধরা হয় সেগুলো হচ্ছে সাংলো জাল, ছান্দি জাল, গুন্টি জাল, বিহুন্দি জাল, জগৎবেড় জাল এবং ভয়ঙ্কর কারেন্ট জাল।

৪-৫ সেন্টিমিটার থেকে ২৩ সেন্টিমিটারের (৯ ইঞ্চির ছোট) কম দৈর্ঘ্যের শিশু ইলিশকে সাধারণত জাটকা বলা হয়। চাঁদপুর, লক্ষ্মীপুর, বরিশাল ও ভোলা জেলা বিশেষ করে মেঘনা নদীর বঙ্গোপসাগরমুখী এলাকা জাটকার অন্যতম বিচরণ ক্ষেত্র। তবে জাটকার সর্ববৃহৎ বিচরণ ক্ষেত্র হচ্ছে মেঘনা নদীর ষাটনল থেকে মোহনপুর-চাঁদপুর-হাজিমারা-নীলকমল-রামগতি পর্যন্ত। দ্বিতীয় বৃহত্তম ক্ষেত্রটি হচ্ছে খুলনা জেলার দুবলারচর থেকে পটুয়াখালীর কুয়াকাটা পর্যন্ত। জাটকা নিধনের প্রধান মৌসুম হচ্ছে জানুয়ারি থেকে এপ্রিল পর্যন্ত। জাটকার ৬০ শতাংশ ধরা পড়ে মার্চের আগেই। একটি নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা যায়, দেশে ১৯৯৩ সালের জানুয়ারি থেকে এপ্রিল পর্যন্ত সময়ে ৩৭০৭.৪৪ মেট্রিক টন জাটকা ধরা হয়। এগুলো মোট সংখ্যা ৪৬৩.৪. মিলিয়ন অর্থাৎ ৪৬ কোটি ৩৪ লাখ ৩০ হাজার। এই জাটকার গড় দৈর্ঘ্য ছিল প্রতিটির ৭.৫ সেন্টিমিটার এবং ওজন ৮.০ গ্রাম। ধৃত জাটকার মোট পরিমাণের ১ হাজার ১২৩.২৮ মেট্রিক টন ধরা হয়েছিল পদ্মার উজান এলাকা থেকে। অবশিষ্ট ১ হাজার ৩০৩.২৮ মেট্রিক টন ধরা হয়েছিল অন্যান্য উৎস থেকে। বর্তমানে প্রতিবছর ৬ হাজার মেট্রিক টন জাটকা মারা হচ্ছে। এ বছর শুধু মেঘনা অববাহিকা থেকেই ৩ হাজার মেট্রিক টন জাটকা মারা হয়েছে। মেঘনায় জাটকা নিধনের এই ব্যাপকতাই প্রমাণ করে দেশজুড়ে জাটকা নিধন কি মারাত্মক আকার ধারণ করেছে।

বাংলাদেশের মোট মাছ উৎপাদনের একটি বৃহৎ অংশ অর্থাৎ ৩০ শতাংশ যোগান দেয় ইলিশ। বিগত বছরগুলোয় ইলিশ আহরণের পরিমাণ ছিল প্রতিবছর গড়ে ১ লাখ ৮০ হাজার থেকে ১ লাখ ৯০ হাজার মেট্রিক টন। বর্তমান গড় আহরণ প্রায় ৩ লাখ মেট্রিক টনের কাছাকাছি গিয়ে পৌঁছেছে। বিশেষজ্ঞরা আরো অভিমত প্রকাশ করেছেন, প্রতিবছর যে পরিমাণ জাটকা নিধন করা হয় তা থেকে যদি এর ২০-৩০ শতাংশ জাটকা রক্ষা করা সম্ভব হতো তাহলে আরও দেড় থেকে ২ লাখ মেট্রিক টন অতিরিক্ত ইলিশ আহরণ করা যেত। অতীতে মোট ইলিশের ৯৫ শতাংশ আহরণ করা হতো নদী থেকে। আর মাত্র ৫ শতাংশ ধরা হতো বঙ্গোপসাগর থেকে। বর্তমানে ইলিশ আহরণের এই হার হচ্ছে ৬৪

www.nagorikpathagar.org

শতাংশে সাগর ও উপকূলীয় অঞ্চল থেকে আর অবশিষ্ট ৩৬ শতাংশ নদী থেকে। বিজ্ঞানীদের বহু বছর গবেষণা ও পর্যবেক্ষণ থেকে প্রাপ্ত এই তথ্য থেকে তারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, ইলিশের সুনির্দিষ্ট চলাচলের পথ (Migratory Route) ক্রমশ পরিবর্তিত হয়ে গভীর সাগরের দিকে ফিরে যাচ্ছে। এর কারণ হিসেবে বিজ্ঞানীরা বলছেন, সহনীয় মাত্রার অধিক ইলিশ ধরা, নির্বিচারে জাটকা নিধন, নদী ও সমুদ্র দূষণ, পরিবেশের ভারসাম্যহীনতা ইত্যাদি মনুষ্য সৃষ্ট বিভিন্ন কারণে ইলিশের প্রজনন, খাদ্য ও প্রাকৃতিক বিচরণ ক্ষেত্র ক্রমশ বিপর্যস্ত হয়ে পড়তে শুরু করেছে। ফলে ইলিশের উৎপাদন কমে যাচ্ছে এবং নিরাপদ আশ্রয় হিসেবে গভীর সমুদ্রকেই বেছে নিতে বাধ্য হচ্ছে। যদি সাগর থেকে বিপুল পরিমাণ ইলিশ ডিম ছাড়ার জন্য নদীতে উঠে না আসে তাহলে স্বাভাবিকভাবে 'পুনঃউৎপাদন চক্র' ব্যাহত হবে। চূড়ান্ত ফলাফল কি দাঁড়াবে সেটা অনুমান করা কারও পক্ষেই কোন দুর্বোধ্য বিষয় নয়। এদের জীবন বিপন্ন হয়ে পড়ার আশঙ্কা দেখা দিলে কিংবা অন্য কোন পারিপার্শ্বিক চাপে পড়লে বাধ্য হয়েই এরা এদের সুনির্দিষ্ট চলার গতিপথ পরিবর্তন করে গভীর সমুদ্রমুখী হয়ে পড়বে। ফলে দেশ হয়ে পড়বে ইলিশশূন্য। আর এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া পড়বে সন্দীপ, হাতিয়া, মনপুরা, রামগতি, লক্ষ্মীপুর, ভোলা, বরিশাল, চাঁদপুরসহ উজান এলাকার প্রায় ২০ লাখ মানুষের ওপর, যারা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ইলিশ অর্থনীতির ওপর নির্ভরশীল। তারা কর্মহীন হয়ে পড়বে। বৈদেশিক মুদ্রার আয় কমে যাবে। সেই সাথে এ দেশের জনগোষ্ঠী জাতীয় পুষ্টিহীনতার সংকটে পড়বে।

ইলিশের খাদ্যমান অত্যন্ত পুষ্টিগুণ সমৃদ্ধ। এতে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে প্রোটিন, ভিটামিন, খনিজ লবণ ও লিপিড। শরীর গঠন ও সুস্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারে এই মাছ প্রোটিন ও অত্যাবশ্যকীয় এ্যামিনো এসিড সরবরাহ করে। ফ্যাটি এসিডের জন্য লিপিড (লিনোলিয়েক, লিনোলাইনিক, এ্যারাহিডোনিক) খুব প্রয়োজনীয় এবং দ্রবণীয় স্নেহজাত ভিটামিনসমূহে বিশ্লেষণের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। ইলিশে রয়েছে ভিটামিন 'এ' ও 'ডি'। ভিটামিন 'এ' রাতকানা রোগ প্রতিরোধ করে এবং 'ডি' শিশুদের রিকেট রোগ থেকে রক্ষা করে। খনিজ বিশেষ করে ফসফরাস দাঁত ও ক্যালসিয়াম হাড়ের পুষ্টির জন্য একান্ত অপরিহার্য। সোডিয়াম, পটাশিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম ও লৌহ স্বাভাবিক শরীর বৃদ্ধি এবং মানসিক বিকাশের জন্য খুবই প্রয়োজনীয় উপাদান।

দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও জাতির পুষ্টি ঘাটতি পূরণের লক্ষ্যে তথা সার্বিক জাতীয় স্বার্থে ইলিশ সম্পদ সংরক্ষণ খুবই জরুরি। এ বিষয়টি যত দ্রুত আমরা অনুধাবন করতে সমর্থ হব ততই আমাদের সঙ্কট কমে আসবে।

প্রতিবেশগত মারাত্মক সংকটাপন্ন এলাকা (Ecologically Critical Areas for Biodiversity)

বাংলাদেশের জীববৈচিত্র্যের সংকট ও সংরক্ষণের কথা বিবেচনা করে এ সম্পদে সমৃদ্ধ কয়েকটি এলাকাকে পরিবেশগত মারাত্মক সংকটাপন্ন এলাকা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

www.nagorikpathagar.org

"বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ১৯৯৫" এর-৫ ধারা অনুযায়ী "প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা" ঘোষণা করার বিধানে রয়েছে। উক্ত আইনের বিধান রয়েছে যে, (১) সরকার যদি এ মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, পরিবেশের অবক্ষয়ের কারণে কোন এলাকার প্রতিবেশ ব্যবস্থা (Eco-system) সংকটাপন্ন অবস্থায় উপনীত হয়েছে বা হবার আশংকা রয়েছে তা সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, উক্ত এলাকাকে প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা (Ecologically Critical Area) হিসেবে ঘোষণা করতে পারে; (২) প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকার কোন্ কোন্ কর্ম বা প্রক্রিয়া চালু রাখা বা শুরু করা যাবে না তা পরিবেশ আইনের ৫ ধারার উপ-ধারা (১) এর অধীন জারিতব্য প্রজ্ঞাপন বা আলাদা প্রজ্ঞাপন দ্বারা সরকার নির্দিষ্ট করে দিবে।

পরিবেশ সংরক্ষণের আইনের বিধান অনুসারে বাংলাদেশে এ পর্যন্ত ৮ (আট)টি এলাকাকে প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা (ECA) হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। এলাকাগুলো হচ্ছেঃ

সারণী ১.২ ঃ বাংলাদেশের প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা (ECA)

ক্রমিক	প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকার নাম	এলাকা (হেক্টর)
১।	সুন্দরবন	৭৬২,০৩৪
২।	কক্সবাজার-টেকনাফ সমুদ্র সৈকত	১০,৪৬৫
৩।	সেন্ট মার্টিন দ্বীপ	৫৯০
৪।	সোনাদিয়া দ্বীপ	৪,৯১৬
৫।	হাকালুকি হাওর	১৮,৩৮৩
৬।	টাংগুয়ার হাওর	৯,৭২৭
৭।	মারজাত হাওর	২০০
৮।	ঢাকার গুলশান-বারিধারা লেক	

উৎস: পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, ১৯৯৯

গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা এসব এলাকাতে ক্ষেত্র বিশেষে নিম্নরূপ কতিপয় উল্লেখযোগ্য কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে।

১. প্রাকৃতিক বন ও গাছপালা কর্তন বা আহরণ;
২. সব ধরনের শিকার ও বন্যপ্রাণী হত্যা;
৩. ঝিনুক, কোরাল, কচ্ছপ ও অন্যান্য বন্যপ্রাণী ধরা বা আহরণ করা;
৪. প্রাণী ও উদ্ভিদের আবাসস্থল ধ্বংস বা সৃষ্টিকারী সকল প্রকার কার্যকলাপ;
৫. ভূমি এবং পানির প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য নষ্ট/পরিবর্তন করতে পারে এমন সব কাজ;
৬. মাটি, পানি, বায়ু এবং শব্দ দূষণকারী শিল্প বা প্রতিষ্ঠান স্থাপন;
৭. মাছ এবং অন্যান্য জলজ প্রাণীর ক্ষতিকারক যে কোন প্রকার কার্যাবলী;
৮. লেকের চারপাশের বসতবাড়ি, বৈদেশিক মিশন, শিল্প প্রতিষ্ঠান এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের পয়ঃপ্রণালী সৃষ্ট বর্জ্য ও তরল বর্জ্য নির্গমন;
৯. লেকের চারপাশের বাসাবাড়ি, বৈদেশিক মিশন, শিল্প প্রতিষ্ঠান এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠান সৃষ্ট

www.nagorikpathagar.org

কঠিন বর্জ্য নিক্ষেপণ;

১০. লেকের কিনারায় বা লেকের পানিতে কোন প্রতিষ্ঠান, প্রতিষ্ঠানের সদস্য, ব্যক্তি বিশেষ বা ব্যক্তি সমষ্টির গোসল করা, কাপড় কাচা, মলমূত্র ও অন্যান্য বর্জ্য ত্যাগ করা। আইনটি প্রয়োগের অত্যন্ত বড় দুর্বলতা হচ্ছে এলাকাগুলোর সীমানা নির্ধারণ করা হয়নি বেশির ভাগ ক্ষেত্রে, এর মধ্যে গুলশান লেক উল্লেখযোগ্য।

সরেজমিনে পরিদর্শন করলে দেখা যায়, গুলশান লেক, হাকালুকি হাওর এবং টাঙ্গুয়ার হাওরে এর কিছুই মানা হচ্ছে না। আইন প্রয়োগ করাও সম্ভব হবে না, কারণ সীমানা নির্ধারণ করা হয়নি। স্থানীয়ভাবে আইন প্রয়োগকারী কোন সংস্থা নেই। সর্বোপরি তৃণমূল পর্যায়ে এ সম্পদ সংরক্ষণের বিষয়ে গণসচেতনতার বিশেষ অভাব রয়েছে।

পরিশিষ্ট 'ক' এ পরিবেশ সংকটাপন্ন ঘোষিত এলাকাসমূহের কার্যক্রমের বর্ণনা দেয়া হয়েছে।

মৎস্যসম্পদ সংরক্ষণে সরকারি উদ্যোগ

বাংলাদেশ পানিসম্পদে যথেষ্ট সমৃদ্ধ, সমস্যা মূলত সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা: দেশের মৎস্যসম্পদ উৎপাদন ও আহরণের প্রধান উৎস হচ্ছে অভ্যন্তরীণ জলাশয় ও সামুদ্রিক এলাকা। অভ্যন্তরীণ জলাশয়ের আয়তন ৪৩.৬৭ লক্ষ হেক্টর। এর মধ্যে প্লাবন ভূমিসহ মুক্ত জলাশয় ৪০.৪৭ লক্ষ হেক্টর এবং উপকূলীয় চিংড়ি খামারসহ বদ্ধ জলাশয় ২.৯০ লক্ষ হেক্টর।

বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ জলাশয়ে ২৬০ প্রজাতির দেশি ও ১২ প্রজাতির বিদেশি মাছ এবং ২৪ প্রজাতির চিংড়ি মাছ রয়েছে। সমুদ্র এলাকায় ৪৭৫ প্রজাতির বিদেশি মাছসহ ২৪ প্রজাতির চিংড়ি মাছ পাওয়া যায়। এ ছাড়া বিভিন্ন প্রজাতির কাছিম, কাঁকড়া, ঝিনুক, শৈবাল ইত্যাদি রয়েছে - অর্থনৈতিক উন্নয়নে ও মানব কল্যাণে এসবের গুরুত্ব বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

মাছ মানুষের দৈনন্দিন খাদ্য তালিকায় সুষম প্রোটিনের প্রধান উৎস। বিশেষ করে বাংলাদেশের মতো জনবহুল দেশের জন্য সহজলভ্য ও সুলভ। প্রয়োজনীয় সুষম প্রোটিনের অভাবে মানবদেহে নানাবিধ জটিল রোগের প্রতিরোধ ও নিরাময়ে এ সম্পদ সহায়ক। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার মোকাবিলায় প্রকট খাদ্য ঘাটতি পূরণে মৎস্যসম্পদ গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক ভূমিকা রাখতে পারে। মৎস্য সম্পদ হ্রাসের সাথে সাথে খাদ্যচক্রের প্রক্রিয়াতে দেশের ব্যাপক পাখিসম্পদ বৃদ্ধির জন্যও মারাত্মক হুমকি হিসেবে দেখা দেয়। তাই পুষ্টি সরবরাহ, কর্মসংস্থান, বৈদেশিক মুদ্রার্জন, বিভিন্ন প্রাকৃতিক সম্পদ সম্প্রসারণ/সংরক্ষণ ও আর্থসামাজিক কর্মকাণ্ডে মৎস্যসম্পদের গুরুত্ব ও সম্ভাবনা অপরিসীম। বাংলাদেশে মৎস্য সম্পদ সম্প্রসারণের প্রধান প্রতিবন্ধকতাগুলো নিম্নরূপভাবে চিহ্নিত করা যেতে পারে:

ক) মৎস্য সম্পদ সংরক্ষণ ও প্রবৃদ্ধি পরিপন্থী বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকাণ্ড যেমন জলাশয়গুলো লিজ দেয়ার ফলে অধিক মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে নির্বিচারে অপরিকল্পিতভাবে মাছ ধরা;

খ) পোকা মারার ঔষধ ধান ও ফসলের ক্ষেতে ছিটানোর ফলে ব্যাপকভাবে মাছের মড়ক দেখা দেয়;

www.nagorikpathagar.org

গ) দারিদ্র্য ও অভাবজনিত কারণে জীবিকার জন্য নির্বিচারে মৎস্যসম্পদ আহরণ করা;

ঘ) বাণিজ্যিক, মুনাফা লাভ এবং অধিক চাহিদার জন্য ব্যাপকহারে নৈতিকতা বিবর্জিতভাবে ইলিশ মাছসহ অন্যান্য মাছের জাটকা আহরণ করে মৎস্যসম্পদের ব্যাপক ক্ষতিসাধন করা;

ঙ) দারিদ্র্য এবং বাণিজ্যিক কারণে শৈবাল/কোরাল, ঝিনুক, কচ্ছপসহ অন্যান্য সামুদ্রিক জীববৈচিত্র্য আহরণ করা।

এছাড়া কারিগরি দুর্বলতা, দক্ষ ব্যবস্থাপনার জন্য জনশক্তির অভাব, কারিগরি জ্ঞানের অভাব, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, প্রশাসনিক দুর্বলতা, আর্থিক সীমাবদ্ধতা সর্বোপরি মূল্যবোধের অভাব জীববৈচিত্র্য বিনাশের অন্যতম কারণ।

চ) মাছের আবাসস্থল নদী, খাল, বিল ও হাওর দ্রুত বিলুপ্ত হওয়া। পানির উৎসে দূষণ অথবা নদী খালগুলোতে শিল্প বর্জ্য ফেলে দূষণ, যেমন বুড়িগঙ্গা, তুরাগ, শীতলক্ষ্যা এমন অজস্র নদী আজ মৃত।

উপরোক্ত সমস্যা ও প্রতিবন্ধকতাগুলো নিরসনকল্পে জাতীয় মৎস্যনীতি ১৯৯৮ প্রণয়ন করা হয় যার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য (অনুচ্ছেদ ২) প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণ, সে জন্য অধিক পরিমাণ মৎস্যসম্পদ উৎপাদন এবং পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও উন্নয়ন।

জাতীয় মৎস্য নীতি ১৯৯৮ (অনুচ্ছেদ ৫) এ বিগত কয়েক বৎসরে বিভিন্ন উৎস থেকে মাছের উৎপাদন হ্রাস পেয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে, তার কারণ প্রধানত প্রাকৃতিক ও মনুষ্য সৃষ্ট কর্মকাণ্ড। এ জন্যে প্রয়োজন সময়োপযোগী অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ে মৎস্য সংরক্ষণ, ব্যবস্থাপনা ও আহরণ (অনুচ্ছেদ ৫)। অভ্যন্তরীণ বদ্ধ জলাশয়ে মৎস্য চাষ ও ব্যবস্থাপনা (অনুচ্ছেদ ৬)। উপকূলীয় চিংড়ি ও মৎস্য চাষ (অনুচ্ছেদ ৭)। সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ সংরক্ষণ, ব্যবস্থাপনা ও আহরণ (অনুচ্ছেদ ৮)। এ নীতিমালায় মৎস্য সম্পর্কীয় শিক্ষা (অনুচ্ছেদ ৯.৫) ও মৎস্য সংক্রান্ত পরিবেশ (অনুচ্ছেদ ৯.১০) বিষয়ে উল্লেখ রয়েছে। নতুন নীতিমালার আলোকে নতুন নতুন কার্যক্রম গ্রহণ ও ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এগুলোর বাস্তবায়ন সুফল প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণের জন্য মৎস্য আইন ২০০২ (সংশোধিত) প্রণয়ন করা হয়েছে। এসব আইন প্রয়োগের জন্য বিরাট অংকের আর্থিক সংস্থানের প্রয়োজন হবে। বাংলাদেশের মতো বিরাট দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ ও প্রাকৃতিক সম্পদের সংরক্ষণের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টির সমাধান অধিকাংশ আইন প্রয়োগের মাধ্যমে করা অত্যন্ত ব্যয়বহুল ও কষ্টসাধ্য ব্যাপার হতে পারে।

গত ২০০২ সালের মৎস্য পক্ষের এক প্রতিবেদনে দেখা যায় যে, দেশে মৎস্যসম্পদের উৎপাদন বেড়েছে; তাতে খুব উৎফুল্ল বোধ করার কোন কারণ আছে বলে প্রতীয়মান হয় না। এ পরিসংখ্যানের একটি শুভংকরের ফাঁক রয়েছে যা অত্যন্ত মারাত্মক। এখানে উৎপাদন অর্থ হলো আহরণ- যার প্রকৃত তাৎপর্য এ দেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে নির্বিচারে মৎস্যসম্পদ নিধন। এ আহরণ তথ্যে কোন্ প্রজাতির মাছ কি পরিমাণ ধরা হয়েছে, তার

www.nagorikpathagar.org

বর্তমান অবস্থা (status) এবং দেশে তার মজুদ ও সংখ্যার পরিমাণের কথা বলা হয়নি। তাছাড়া বিভিন্ন প্রজাতির মাছের জন্মহারও (Growth rate) ভিন্ন। এ ক্ষেত্রে টেকসই ব্যবস্থাপনা নীতি অনুসারে জন্মহার (Growth rate), আহরণ হার (Extraction rate) সমান হওয়া অত্যাবশ্যক, যা এ উৎপাদন পরিসংখ্যানে বিবেচিত হয়নি।

উপরোক্ত অবস্থার প্রেক্ষাপটে মৎস্য সম্পর্কীয় শিক্ষা (৯.৫) এবং মৎস্য সংরক্ষণ পরিবেশ সংক্রান্ত (৯.১০) অনুচ্ছেদ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। বর্তমান নীতিমালা অনুসারে সর্বস্তরে শিক্ষা ব্যবস্থায় মৎস্য বিভাগ ও জীববিজ্ঞান শিক্ষার পাশাপাশি প্রাণী ও জীবজন্তুর প্রতি কি ধরনের আচরণ করা উচিত এবং সম্পদ সংরক্ষণে ধর্মীয় মূল্যবোধের ও প্রশিক্ষণের অত্যন্ত গুরুত্ব রয়েছে। কারণ সরকারি আইন প্রয়োগে ও নীতি প্রতিপালনের বিষয়ে কেউ ব্যক্তিগত দায়িত্বে এগিয়ে আসে না। কিন্তু ধর্মীয় মূল্যবোধটি ব্যক্তি জীবনে প্রতিপালনের তাৎপর্য অনেক বেশি। কেননা এ ক্ষেত্রে ব্যক্তি তার আচরণটিকে পাপ-পূণ্যের বিষয় হিসেবে বিবেচনা করে। তাই রাষ্ট্রীয় নীতিমালা ও আইন প্রয়োগের পাশাপাশি প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণের গুরুত্ব এবং এ সংক্রান্ত বিভিন্ন ধর্মীয় মূল্যেবোধকে জাগিয়ে তুলতে পারলে সরকারি নীতি ও আইনের প্রতি এ দেশের ধর্মপ্রাণ মানুষ স্বতঃস্ফূর্ততা ও স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করবে। ফলে অনেক স্বল্প খরচে এ দেশের এ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা সম্ভব হবে। তাতে সমাজের সাধারণ মানুষের প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনায় সর্বক্ষেত্রে অংশগ্রহণ ও ব্যয় সংকোচন নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

প্রাণীসম্পদ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ে Wildlife Preservation Act 1973-এর অনুচ্ছেদ ১৯ এর আওতায় কতিপয় লোক ও কর্মচারীকে বন্যপ্রাণী নিধনের তথ্য প্রদান বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। অনুচ্ছেদ ১৬-এ ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের বন্যপ্রাণী নিধনের তল্লাশির ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। অনুচ্ছেদ ৩০ ধারায় ভ্রাম্যমাণ আদালত গঠনের কথা বলা হয়েছে। অনুচ্ছেদ ২(৩) এ বন কর্মকর্তাকে ১৯২৭ সনের বন আইনের বিধানমতে কার্যক্রম গ্রহণ করার বিধান রয়েছে।

বন আইন ১৯২৭ (সংশোধিত ১৯৯০) এর প্রয়োগে জটিলতা বন আইনের ৬৯ 'ক' ধারামতে বন অধিদপ্তরের ডেপুটি রেঞ্জারের পদমর্যাদার নিচে নয় এমন যে কোন কর্মকর্তা বন মামলার ক্ষমতা রাখেন। স্থানীয় অধিক্ষেত্র সম্পন্ন ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে বন মামলা পরিচালনার জন্য সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় বন কর্মকর্তা মামলা পরিচালক নিয়োগ করেন। এসব আইনের ব্যবহারিক জটিলতা অনেক। উল্লেখযোগ্য হল বন কর্মকর্তা কদাচিৎ এসব আইনের উপযুক্ত সাক্ষ্য হাজির করে মামলা প্রমাণ করতে পারেন, যা পুলিশ কর্মকর্তার জন্য অনেক সহজ। ফলে বাস্তব ক্ষেত্রে এ আইনের কোন কার্যকরী ক্ষমতা নেই, যা সময়োপযোগী করা প্রয়োজন।

www.nagorikpathagar.org

বন্যপ্রাণী আইন সময়োপযোগিতাকরণ

বাংলাদেশের বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইন ১৯৭৪ প্রণয়ন করার পর ইতোমধ্যে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে বিশ্বব্যাপী ব্যাপক অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। পরিবর্তিত অবস্থার প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইন পরিবর্তন ও সংশোধন করা অত্যাবশ্যক হয়ে পড়েছে। যেমন বন্যপ্রাণীর সংজ্ঞাতে migratory and marine, wild vertribrates-এসবের স্থলে marine/reserves/migratory routes, corridor শব্দগুলোও অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। দুইটি সিডিউলের স্থলে বিলুপ্তপ্রায় প্রাণীর (threatened animals) এর বিষয়ে একটি সিডিউল করা যেতে পারে। এর জীববৈচিত্র্যের আবাসস্থল, ভূমি, জলাধার এসব ক্ষেত্রে ব্যবহার নীতি ও এসব সম্পত্তির মালিকানা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকতে হবে। Breeding ground সংরক্ষণের ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব, কর্তব্য ও দায়বদ্ধতা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকতে হবে। প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারের অংশগ্রহণ পদ্ধতি অভিবাসনকারী প্রজাতির পাখির (migratory species) ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ রাখা যেতে পারে।

বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ উপদেষ্টা কমিটির (Advisory committee) সদস্যগণ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞদের নিয়ে গঠন করতে পারে। এসব আইন বাস্তবায়ন ও মূল্যায়নের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠান ও কর্মকর্তাদের দায়িত্ব, কর্তব্য ও দায়বদ্ধতা সুনির্দিষ্টভাবে বলা থাকতে হবে। উক্ত আইনে কর্মকর্তা বলতে শুধু বন কর্মকর্তাকে বুঝায়, (বন আইন ১৯২৭) তা আরও ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হতে পারে- যেমন পুলিশ কর্মকর্তা, কৃষি কর্মকর্তা, পশুসম্পদ, মৎস্য কর্মকর্তা এমনকি জীববৈচিত্র্য সম্পর্কে সচেতন যে কোন ব্যক্তিকে বুঝাতে হবে। বন্যপ্রাণী নিধনে শাস্তির পরিমাণ বৃদ্ধি করা যেতে পারে। বিচার পদ্ধতিও সংক্ষিপ্ত করা যেতে পারে।

বাস্তবতার নিরিখে দেখা যায়, কেবল সততা দিয়ে অপরাধ প্রমাণ করা যায় না। অপরাধ প্রমাণের জন্য আইনসিদ্ধ সাক্ষ্য, অকাট্য যুক্তি, ভারসাম্য তথ্য উপস্থাপন এবং তথ্যের আইনগত সমর্থনের প্রয়োজন। সমাজের বিভিন্ন প্রকার প্রভাব এবং নৈতিকতা বিবর্জিত কর্মকাণ্ডের জন্য তথ্যের ধারাবাহিকতা অভিযোগ গঠনের সময় যথাযথভাবে আদালতের দৃষ্টিগোচরে আনা সম্ভব নয়। যার ফলে প্রকৃত অপরাধী সহজে খালাস পেয়ে যায়। এছাড়া প্রাকৃতিক সম্পদ যেহেতু সরকারি মালিকানাধীন, কিছু কিছু ছোটখাটো অপরাধীরা বিচারামলে আসলেও বড় রাঘব বোয়ালরা উপর মহলের যোগসাজশে কোন না কোন মতে পার পেয়ে যায়।

তাছাড়া আইনের অনেক দুর্বলতাও রয়েছে, যা খুবই স্বাভাবিক, কারণ চলমান পরিস্থিতিতে বিভিন্ন সময় অপ্রত্যাশিত এবং বিচিত্র পরিস্থিতির উদ্ভব হয়ে থাকে। যেমন বন আইনের ২৬ (১ক) ধারামতে মামলার অপরাধ বিবরণীতে কোথাও উল্লেখ নেই যে, ঘটনাস্থল সংরক্ষিত বন কি না। অপর একটি পুকুর থেকে অবৈধভাবে জমাকৃত কাঠ উদ্ধার করা হলো এবং 'ক' এর বিরুদ্ধে মামলা রুজু করা হলো। কিন্তু পুকুরের মালিক 'ক' কি না বা 'ক' যে ঐ পুকুরে কাঠ লুকিয়ে রেখেছে এমন কোন তথ্যও মামলার বিবরণীতে উল্লেখ নেই। এরূপ ক্ষেত্রে চার্জ

www.nagorikpathagar.org

গঠনে বিড়ম্বনা সৃষ্টি হয়ে থাকে। এভাবে নানা অজুহাতে দোষী ব্যক্তিদের আইনামলে আনা খুবই কষ্টসাধ্য ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে (লস্কর ২০০০)।

এমতাবস্থায় প্রচলিত আইনের সময়োপযোগী সংশোধন ও এর যথাযথ প্রয়োগ অত্যাবশ্যক। আইনগত বিষয়গুলো প্রচলিত অন্যান্য আইনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে পরস্পরের সম্পূরক হিসেবে সংশোধনের বিষয়টি আলাদাভাবে আলোচনা করার সুযোগ রয়েছে। বর্তমান প্রবন্ধে এর প্রয়োগের দুর্বলতার দিকটিই বিবেচ্য। প্রতিটি মানুষের একটি দুষ্ট মন থাকে। তার আদর্শ চরিত্র ও স্বভাব গঠনের মাধ্যমেই সে তার দুষ্ট রিপুকে নিয়ন্ত্রণ করে। আর এজন্যে উপযুক্ত শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রতিটি নাগরিকের মূল্যবোধকে উন্নত করা যেতে পারে। তাহলে তারা স্বেচ্ছা প্রণোদিত হয়ে নৈতিকতার তাগিদে অথবা ধর্মীয় বিবেচনায় পাপ/পুণ্যের তাগিদে তাদের নিজেদের সব কর্মকাণ্ডে দায়িত্বশীল হবে এবং প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণেও যত্নবান হতে পারে। মোট কথা সরকারি নীতিমালা ও আইন জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে অত্যাবশ্যক হলেও নৈতিকতা ও মূল্যবোধ গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক (Sufficient condition) হিসেবে ভূমিকা রাখতে পারে।

জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে আন্তর্জাতিক কনভেনশন

জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে সারা পৃথিবী এখন তৎপর, কারণ প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষার জন্যই জীববৈচিত্র্য রক্ষা করা একান্ত অপরিহার্য। আন্তর্জাতিক সংস্থা ১৯৯১-১৯৯২ সালে Convention of Brodevssity (CBD) চুক্তিতে সম্মত হয়েছে, পরবর্তীতে ১৯৯৩ সালে তা কার্যকর হয়। বর্তমানে ১৭০টি দেশ এ চুক্তি মেনে চলে। এ চুক্তির উদ্দেশ্য হচ্ছে আন্তর্জাতিকভাবে জীববৈচিত্র্য ধ্বংস বন্ধ করা এবং তা সংরক্ষণকরণ নিশ্চিত করা। বাংলাদেশ এ চুক্তি অনুমোদন করেছে ১৯৯৫ সালে।

এ ছাড়াও Convention on international trade in endangered species of wild fauna and flora (CITES) চুক্তি, ১৯৭৩ যা বাংলাদেশ ১৯৮১ সালে স্বাক্ষর এবং ১৯৮২ সালে অনুমোদন করে। এ চুক্তির পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশেও নতুন নতুন আইন বিধি প্রণয়ন করা হয়েছে যেমন Wildlife preservation Act, 1973 ইত্যাদি। এসব আইন ও বিধি প্রণয়নের পর দেশে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের কতটুকু অগ্রগতি হয়েছে, এরূপ সমীক্ষা হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয় না। তবে জীববৈচিত্র্য ক্রমশ বিলুপ্ত হচ্ছে, এ কথা স্পষ্ট। এর কারণ মূলতঃ দারিদ্র্য। পেটে ক্ষুধা থাকলে আইন ভঙ্গ করার প্রবণতা স্বীকৃত। আর্থিক সীমাবদ্ধতার জন্য এসব আইনের সম্পূর্ণ প্রয়োগ নিশ্চিত করাও সম্ভব হচ্ছে না। তাছাড়া উচ্চ শ্রেণীর লোকদের শখ পাখি বা বন্যপ্রাণী শিকার এবং তাদের অনেক ব্যবসায়িক কারণেও এসব আইনের প্রয়োগ অনেক সময় শিথিল হয়ে যায়।

www.nagorikpathagar.org

জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে ধর্মীয় প্রভাব

জাতিসংঘের এজেন্ডা ২১ এ ঐতিহ্যগত (Traditional knowledge) জ্ঞানকে আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞান, দেশীপ্রথা, ধর্ম এবং সংস্কৃতির সাথে সমন্বয় করার সুপারিশ করা হয়েছে। তৎপরিপ্রেক্ষিতে উন্নত বিশ্বে সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ, ঐতিহ্য ও প্রথা (custom & conventions) তুলে ধরাসহ Environmental Negotiation এর ওপর ব্যাপক গবেষণা ও কার্যক্রম চলছে। এক্ষেত্রে অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের পাশাপাশি আমাদের দেশের ধর্মপ্রাণ মানুষের অনুভূতিকে পরিবেশ সংরক্ষণ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের ক্ষেত্রে তুলে ধরা যেতে পারে।

প্রচলিত অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নৈতিকতা বিবর্জিত কর্মকাণ্ডে জড়িত হয়ে অনেকেই একচেটিয়া মুনাফা অর্জন ও কালোবাজারি করে টাকার পাহাড় গড়ে তোলে, তাতে সমাজের অস্থিরতা, অর্থনৈতিক বৈষম্য, আইন-শৃঙ্খলার অবনতিসহ দেশের প্রশাসনিক ব্যয় বৃদ্ধি পায়। এ ক্ষেত্রে ধর্মীয় শিক্ষা সম্প্রসারণ ও দেশে প্রচলিত যাকাত ব্যবস্থাকে বাধ্যতামূলক করে আয়কর আদায় করে আরো কার্যকর পদক্ষেপসহ বিভিন্ন অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে গরিব জনগোষ্ঠীকে ভোকেশনাল প্রশিক্ষণ দিয়ে নানাবিধ কর্মসংস্থানের কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে। এভাবে সম্পদের সুষম বণ্টন ও দারিদ্র্য বিমোচন করতে পারলে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের প্রচেষ্টা সফল হতে পারে।

আল্লাহ্ পৃথিবীর প্রতিটি জিনিসকে যথাযথ আনুপাতিক হারে সৃষ্টি করেছেন তার গুণগত ও পরিমাণগত দিক বিবেচনা করে। যেমন পবিত্র কোরআন শরীফে উল্লেখ রয়েছে - "আমরা প্রত্যেকটি জিনিস আনুপাতিক হারে সৃষ্টি করেছি" (সুরা কমর ৫৪ ঃ ৪৯) অর্থাৎ প্রত্যেকটি জিনিসে নির্দিষ্ট পরিমাণ ও পরিমাপ রয়েছে। অন্য আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, "প্রত্যেকটি জিনিসের জন্য তার নিকট একটি পরিমাণ নির্দিষ্ট রয়েছে" (সুরা রা'দ ১৩ঃ৮)।

আল্লাহ্ পৃথিবীর কোন জিনিসই বিনা প্রয়োজনে সৃষ্টি করেননি। মানুষকে আল্লাহর খলিফা হিসেবে সৃষ্টি করা হয়েছে, আর তার কল্যাণে সব কিছুই সৃষ্টি করা হয়েছে। মানুষ ছাড়াও আল্লাহর প্রতিটি সৃষ্টি তার তসবীহ্ করে। মানবতার কল্যাণ হতে পারে এছাড়া অন্য কোন কারণে প্রাণী বা উদ্ভিদ আহরণ বা ধ্বংস করা যাবে না। তাই মানুষ ও জীববৈচিত্র্যের সম্পর্ক হবে অবিচ্ছেদ্য। প্রাকৃতিক সম্পদের টেকসই (sustainable) ব্যবহার, উন্নয়ন এবং একমাত্র মানুষের স্বার্থ সংরক্ষণ ও কল্যাণ নিশ্চিত করে এমন কাজের জন্যই শুধু ব্যবহার ও সংরক্ষণ করা যাবে। এ ক্ষেত্রে প্রকৃতির প্রতিটি প্রাণীর প্রতি যত্নশীল হওয়া মানুষের একান্ত কর্তব্য। কোন জিনিসের ব্যবহার মানুষের কল্যাণের জন্য এর অর্থ হচ্ছে আল্লাহর সৃষ্টির সবকিছু তার বিধানমত পরিচালিত হওয়া। কেননা আল্লাহ্ মানুষকে তার খলিফা (প্রতিনিধি) হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। তিনি মানুষকে তার প্রকৃতির ব্যবহার ও সংরক্ষণের দায়িত্ব প্রদান করেছেন। তাই মহানবী (সাঃ) ঘোষণা দিয়েছেন, "এ ধরণী অতীব সুন্দর ও সবুজ, তিনি তোমাদেরকে তার প্রতিনিধি হিসেবে পাঠিয়েছেন। তিনি দেখতে চান কত সুন্দরভাবে তোমরা এ দায়িত্ব সম্পাদন করতে পার" (মুসলীম শরীফ)।

www.nagorikpathagar.org

জীববৈচিত্র্য খাদ্য চেইন হিসেবে এর গুরুত্ব মানুষ এবং অন্যান্য প্রাণীর জন্য অপরিসীম। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কোরানে উল্লেখ রয়েছে, "মানুষ তার খাদ্যের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করুক। আমরা পানি বর্ষণ করেছি। এ দিকে মাটিকে বিস্ময়করভাবে দীর্ণ করেছি। অতঃপর উৎপাদিত করেছি শস্য, আঙ্গুর, তরকারি, জয়তুন, খেজুর, ঘন-সন্নিবেশিত বাগিচা আর রকম বেরকম ফল ও উদ্ভিদ খাদ্য। তোমাদের জন্য এবং তোমাদের চতুষ্পদ জন্তুর জন্য জীবিকা হিসেবে (সুরা আবসা ৮০ ঃ ২৪-৩২)। এছাড়াও জীববৈচিত্র্য মানুষের জন্য ঔষধ, তেল, সুগন্ধি, মধু, আঁশ, টিম্বার, জ্বালানি ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ কার্যাদির সম্বন্ধে পবিত্র কোরানে উল্লেখ রয়েছে। "তোমরা কি কখনো চিন্তা করেছ যে, আগুন জ্বালাও? এসব গাছ তোমরা বানিয়েছো না এসবের সৃষ্টিকারী আমরা। আমরা এসব স্মরণের মাধ্যমে এবং প্রয়োজনশীলদের জন্য জীবন উপকরণ বানিয়েছি" (সুরা ওয়াকেয়া ৫৬ ঃ ৭১-৭৩)।
প্রাণী ও উদ্ভিদ একে অন্যের জন্য পারস্পরিক খাদ্য সরবরাহ করে যেমন প্রাণীর উচ্ছিষ্ট মাটি এবং সমুদ্র উর্বর করে যা উদ্ভিদের জন্য খাবার। অন্যদিকে প্রাণীর মাংস মানুষের জন্য প্রোটিন যোগায়, মাংস ও দুধ সরবরাহ করে। এ সম্পর্কে পবিত্র কোরানে উল্লেখ রয়েছে- "জমিনের উপর বিচরণশীল কোন জন্তু এবং বাতাসে ডানার সাহায্যে উড়ন্ত কোন পাখিই দেখ, ইহারা তোমাদের মতই বিচিত্র প্রজাতি" (সুরা আন আম ৬ঃ ৩৮)।

জীববৈচিত্র্য মানুষ ও জ্বীনের মতই আল্লাহর তসবীহ করে। তাই কোন অবস্থাতেই বিনা প্রয়োজনে এদের ধ্বংস/আহরণ করার অর্থ হল আল্লাহর প্রাকৃতিক নিয়মে ফ্যাসাদ সৃষ্টি করা। তাই পবিত্র কোরানে উল্লেখ রয়েছে, "তোমরা কি দেখ না আল্লাহর সামনে সিজদায় অবনত হয়ে রয়েছে সে সব যারা আসমানে রয়েছে আর যারা জমিনে রয়েছে। চন্দ্র, সূর্য, তারকা, গাছ-পালা, জন্তু জানোয়ার বহু সংখ্যক মানুষ" (সুরা হজ্জঃ ২২ঃ১৮)। মহানবী (সাঃ)কে সব প্রাণীর প্রতি দয়াশীল করে প্রেরণ করা হয়েছে যেমন পবিত্র কোরানে উল্লেখ রয়েছে- "হে নবী (সাঃ) তোমাকে দুনিয়াবাসীদের জন্য দয়াশীল, করে প্রেরণ করা হয়েছে"(সুরা আনবিয়া ২১ ঃ ১০৭)। তাই তিনি মানুষ জাতিকে প্রাণীদের প্রতি দয়াশীল হবার জন্য উপদেশ দিয়েছেন, "আল্লাহ তোমাদের প্রতি দয়াশীল তোমরা পৃথবীবাসীদের প্রতি দয়াশীল হও। তাহলে স্বর্গবাসীও তোমাদের প্রতি দয়াশীল হবেন" (আবু দাউদ ও তিরমিজি শরীফ)। এ আয়াতের এবং হাদিসের তাৎপর্য হল জীববৈচিত্র্যের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়া এবং এর সংরক্ষণ নিশ্চিত করা। মানব কল্যাণের প্রয়োজনে টেক্সই অবস্থা নিশ্চিত রেখে আহরণ করা।

এছাড়া আরো অনেক হাদিস রয়েছে প্রাণীদের প্রয়োজনীয় খাবার সরবরাহ করা প্রসঙ্গে। যেমন কোনো ব্যক্তির কারণে যদি কোন প্রাণী না খেয়ে অথবা তৃষ্ণায় মারা যায় আল্লাহ তাকে দোজখে প্রেরণ করবেন। অন্য এক হাদিসে উল্লেখ রয়েছে যে, এক ব্যক্তি মহানবী (সাঃ)কে জিজ্ঞেস করেছিলেন প্রাণীদের প্রতি আচরণের কি প্রতিদান রয়েছে? তিনি উত্তরে বললেন, প্রতিটি জীবিত বস্তুর প্রতিই সুন্দর আচরণের জন্য পুরস্কার রয়েছে। বিনা প্রয়োজনে

www.nagorikpathagar.org

একটি মৌমাছি বা যে কোন প্রকার জন্তুকে অথবা উদ্ভিদকেও নষ্ট না করার জন্য ইসলামের নির্দেশ রয়েছে। "যখন সে ক্ষমতা লাভ করে, তখন পৃথিবীতে তার সমগ্র শক্তি নিয়োগ করে কি করে এ পৃথিবীতে অশান্তি ও বিপর্যয় সৃষ্টি করা যাবে, শস্য ক্ষেত ধ্বংস করে। অথচ আল্লাহ অশান্তি ও বিপর্যয় মোটেই পছন্দ করেন না" সূরা বাকারা ২:২০৫।

ইসলামের বিধানে মানুষের প্রতিটি প্রাণীতে অধিকার রয়েছে যা আদালতের মাধ্যমে প্রয়োগযোগ্য। নবীর (সাঃ) শিক্ষার ওপর ভিত্তি করে শত শত বৎসর পূর্বে প্রাণীদের প্রতি অধিকার সংক্রান্ত বিধান তৈরি হয়েছে। মানুষের দায়িত্ব হল প্রাণীদের প্রতি দয়াশীল হওয়া, যদিও সে বয়স্ক, অথবা অসুস্থ এবং তার থেকে কোন আর্থিক সুবিধা না আসে। তাকে তার সাধ্যাতীত বোঝা দেয়া যাবে না। তাদেরকে এমনভাবে রাখা যাবে না, যেন তারা আহত হয় অথবা তাদের হাড় ভেঙ্গে যায়। যদি তাদের জবেহ করতে হয়, দয়ার সাথে সে কাজ সম্পাদন করতে হবে । তারা নিঃশ্বাস ত্যাগ করে ঠাণ্ডা না হওয়া পর্যন্ত তাদের চামড়া খোলা যাবে না অথবা কোন হাড় ভাঙ্গা যাবে না। তাদের বাচ্চাদের জবেহ করা যাবে না। তাদের বিশ্রামের জায়গা আরামদায়ক হতে হবে। তাদের প্রজননের সময় একসাথে থাকার ব্যবস্থা করতে হবে। প্রাণী শিকার করার সময় হাড় ভাঙ্গা বা এমনভাবে মারা যাবে না যেন তাদের মাংস খাওয়া নিষিদ্ধ হয়ে যায় (ইজাজুদ্দীন)।

জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে বিশ্বব্যাপী সামাজিক, রাষ্ট্রীয় এবং আন্তর্জাতিক আন্দোলন শুরু হয়েছে। এ বিষয়ে পবিত্র কোরানে উল্লেখ রয়েছে "এবং তিনি আসমান হতে পানি বর্ষণ করান, এর সাহায্যে সকল প্রকার উদ্ভিদ সাজিয়েছেন এবং এর দ্বারা শস্য, শ্যামল ক্ষেত খামার ও গাছপালা সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তা থেকে বিভিন্ন কোষসম্পন্ন দানা বের করেছি, খেজুরের ফলের থোকা বানিয়েছি যা ভারের চাপে নুয়ে পড়ে। আর আঙ্গুর, জয়তুন ও আনারের বাগান সাজিয়ে দিয়েছি, সেখানে ফলসমূহ পরস্পরের সদৃশ্য অথচ প্রত্যেকটির বৈশিষ্ট্য আবার ভিন্ন ভিন্ন। এ গাছগুলি যখন ফল ধারণ করে, তখন এদের ফল বের হওয়া এবং এদের পেকে যাবার অবস্থাটা একটু সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখবে" (সূরা আন-আম ৬:৯৯)।

পবিত্র কোরানে জীববৈচিত্র্য এবং টেকসই কৃষি ব্যবস্থা প্রসঙ্গে আরো বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে, "আমরা এতে খেজুর, আঙ্গুর বাগান বানিয়েছি এর মধ্যে ঝরনা প্রবাহিত করেছি যেন তারা এর ফল খেতে পারে" (সূরা ইয়াসিন ৩৬ : ৩৪)। আরব উপজাতীয় (Tribal) লোকজন তাদের শত্রুর মালিকানাধীন খেজুর গাছ বিশেষ করে পুরুষ গাছগুলো কেটে ফেলতো। এ ধরনের খারাপ আচরণে মুসলমানদেরও নিরুৎসাহিত করা হতো। এ ধরনের বৃক্ষ নিধনকে অত্যন্ত গর্হিত কাজ বলে বিবেচনা করা হতো। এমন কি যুদ্ধের সময়ও মুসলিম যোদ্ধাদের নির্দেশ দেয়া থাকতো নিরপরাধ মানুষের ক্ষতি করা এবং সবুজ গাছপালা কাটা থেকে বিরত থাকতে (ফারুকী, ১৯৮৯)। হিন্দু, বৌদ্ধ ও খৃস্টানসহ অন্যান্য ধর্মীয় বিধানগুলি প্রয়োজনীয় শিক্ষা সংস্কারের মাধ্যমে সব ধর্মের জনগোষ্ঠীর মূল্যবোধকে উন্নত ও সমুন্নত করা যেতে পারে।

www.nagorikpathagar.org

জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের জন্য কতিপয় সুপারিশ

বাংলাদেশের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের সুপারিশ ও উদ্যোগগুলোর মধ্যে রয়েছে সুন্দরবন ও টাংগুয়ার হাওরকে World Heritage হিসেবে ঘোষণা দেওয়া। তবে এসব এলাকায় কি ধরনের সংরক্ষণ কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে এ বিষয়ে সময়োপযোগী ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা যেতে পারে। এ ক্ষেত্রে সরকারের আরো দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টি প্রয়োজন রয়েছে যাতে দেশের উদ্ভিদ ও প্রাণীবৈচিত্র্যের ভবিষ্যতে বিলুপ্তি রোধ করা যায়। বিশেষ করে দুষ্প্রাপ্য প্রজাতিগুলিকে নিশ্চিত বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা করা যায়, সেজন্য অবিলম্বে নিম্নোক্ত কার্যকর ব্যবস্থাদি গ্রহণ করা যেতে পারে।

(ক) নীতি নির্ধারণী মহলে দেশের প্রাণী ও উদ্ভিদ সম্পদের বিলুপ্তির হারকে চিহ্নিত করতে হবে। অবিলম্বে জৈব-সম্পদের বিলুপ্তির হারকে রোধের কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের পদক্ষেপ নিতে হবে।

(খ) সমাজের সকল স্তরের জনগণকে জীব সম্পদের অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা সংক্রান্ত গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে। এ জন্যে লিফলেট, প্যাম্পলেট, পোস্টার এবং সকল প্রকার গণমাধ্যমে ধারাবাহিকভাবে বিজ্ঞপ্তি প্রচার এবং স্লোগান প্রচার করতে হবে।

(গ) অবৈধভাবে প্রাণী হত্যা, উদ্ভিদের বিনষ্টকারীদের আইন প্রণয়ন ও এর কার্যকর প্রয়োগের মাধ্যমে প্রতিরোধ করতে হবে। পাশাপাশি মূল্যবান সম্পদের সংরক্ষণ বৃদ্ধির সহায়ক কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করতে হবে।

(ঘ) সরকারি এবং বেসরকারি উদ্যোগে সাধারণ জনগোষ্ঠিকে প্রাণী ও উদ্ভিদ সম্পদ সংরক্ষণে সংগঠিত করতে হবে। এ সম্পদ সংরক্ষণে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে জনগণকে অংশগ্রহণ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করতে হবে। এক্ষেত্রে ছাত্র-সমাজ, স্কুল, মাদ্রাসা ও সমাজসেবামূলক সকল প্রতিষ্ঠান এবং সকল প্রকার সংস্থাকে সম্পৃক্ত করা যেতে পারে।

(ঙ) উদ্ভিদ ও প্রাণীসম্পদ শুধু বাংলাদেশের সম্পদ নয়। এ পৃথিবীর বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর সম্পদ। তাই এ সম্পদ আন্তর্জাতিক সকল সংস্থার এবং প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় প্রশিক্ষণ এবং উন্নয়ন কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা যেতে পারে।

(চ) প্রকৃতি সংরক্ষণে সাংস্কৃতিক মূল্যবোধকে জাগিয়ে তোলার জন্য সকল ধর্মীয় চেতনা এবং এর তাৎপর্য তুলে ধরে গণসচেতনতা সৃষ্টি করা যেতে পারে।

উপসংহার ঃ

খাদ্য নিরাপত্তা একটি রাষ্ট্র তথা সকল মানবগোষ্ঠীর জন্য সমানভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। এ ক্ষেত্রে খাদ্যচক্রের ভারসাম্য রক্ষার জন্য প্রয়োজন জীববৈচিত্র্যকে যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা আবশ্যক। বর্তমান অবস্থার প্রেক্ষাপটে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উদ্যোগের শেষ নেই। আমাদের অভাব শুধু ব্যক্তিগত ও প্রাতিষ্ঠানিক দায়বদ্ধতা ও এর কার্যকারিতার। এজন্যে আন্তর্জাতিক, জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে নীতিমালা ও উদ্যোগগুলোর মূল্যায়ন ও পর্যালোচনার

www.nagorikpathagar.org

প্রয়োজন। তাছাড়া প্রয়োজন রয়েছে সর্বস্তরের জনগণের অংশগ্রহণ। এ ক্ষেত্রে দুটি বিষয় পর্যালোচনা করা গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমতঃ তাদের সম্পৃক্ততা ও সুবিধাপ্রাপ্তির বিষয় এবং প্রাকৃতিক সম্পদের টেকসই ব্যবস্থাপনা হলে তাদের কি লাভ এবং টেকসই না হলে তারা কি ধরনের মারাত্মক ঝুঁকির সম্মুখীন হতে পারে সে বিষয়ে সচেতন করা। দ্বিতীয়তঃ তৃণমূল পর্যায়ে জনগোষ্ঠীকে সম্পৃক্তকরণের মাধ্যমে জীববৈচিত্র্যের মতো সম্পদের সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা। এ ক্ষেত্রে অংশীদারিত্ব ব্যবস্থাপনায় তাদের সম্পৃক্ত করা যেতে পারে। উপরোক্ত কার্যক্রমের পাশাপাশি ব্যক্তিগত জীবনে ধর্মীয় ও সামাজিক মূল্যবোধকে গণসচেতনতার মধ্যে জাগিয়ে তুলে তাদের ব্যক্তিগত আচরণকে আরো দায়িত্বশীল করে তোলা।

www.nagorikpathagar.org

তথ্যসূত্র ঃ

Miler, G T (1993), An Introduction to Environmental Science Living in the Environment Words worth publishing company, Belniont California

Md Abdul Quader Foqee (1993) Al-Bi'ya Muskeluha Qudayaha wa Himayatuha Minat-Talaus Ruatu Islamia. Egypt

Dr. Ali Ali Sukri (1995) Al Bi'ya Min Manzure Islam, Egypt.

Dr. Anwarul Kabir (1998) Quda Al-Bi'ya Min Manjure-Islami, Unpublished Manuscript, Darul Ehsan University, Bangladesh.

A.R. Agwan (1997). Islam and the Environment Synergy Book International, Kuala Lumpur, Malaysia.

Seyyed Hossein Nasr (1978). An Introduction to Islamic Cosmological Doctrines, Thames and Hudson Ltd. 1978, U.K. Great Britan

Towards Sustainable Development: The National Conservation Strategy of Bangladesh (1999), National Conservation Strategy (NCS) Implementation Project-1, Ministry of Forest and Environment, Government of Bangladesh.

Management Plan for Tanguar Haor (1997), National Conservation Strategy (NCS) Implementation Project-1, Ministry of Forest and Environment, Government of Bangladesh.

A.R. Agwan (1997). Islam and the Environment, Synergy Book International, Kuala Lumpur, Malaysia.

Seyyed Hossein Nasr (1978). An Introduction to Islamic Cosmological Doctrines, Thames and Hudson Ltd. 1978, U.K. Great Britan

UNEP, Global Assessment: Summary for Policy Makers, Cambridge, 1995, p6.

MOEF (2008), Bangladesh Climate Change Strategy and Action Plan 2008. Ministry of Env. & Forest Govt. of Bangladesh, Dhaka, Bangladesh

Md. Asadullah Khan, Beleaguered Biodiversity, The Daily Star, November 10, 2000.

Dr. Niaz Ahmed Khan & Dr. Md. Millat-e-Mustafa' The State of Forestry in Bangladesh The Bangladesh Observer, September, 16, 2000.

Jesmul Hassan Eco-Parks : Threat to Ecology and Habitat, Holiday 23 November, 2001.

শামছুর রহমান ঃ দৈনিক জনকণ্ঠ, ২৩শে জুন, ২০০০

কাজী মাহমুদ, দৈনিক যুগান্তর, ৫ই মে, ২০০০

www.nagorikpathagar.org

আবুল কাশেম ভুইয়া, দৈনিক যুগান্তর, ৫ জুলাই ১৯৯৯

ইলিয়াস খান, দৈনিক জনকণ্ঠ, ২৫ শে জুন, ২০০০

এম এ খালেক, দৈনিক ইত্তেফাক, ১৫ জুলাই, ১৯৯৯

লায়লা দোলন, দৈনিক যুগান্তর, ৩০ শে জুন, ২০০০

অলিউল্লাহ নোমান, দৈনিক ইনকিলাব, ১৭ জুন, ২০০০

ড. মোস্তাইন বিল্লাহ, দৈনিক যুগান্তর, ১৭ই নভেম্বর ২০০০

এ জেড এম শামসুল আলম (১৯৯২), ইসলামে বৃক্ষরোপণ, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়

দেবনাথ, রণজিৎ কুমার (রনো) ১৯৯৯ সুন্দরবন, সম্পদ ও পরিবেশ রক্ষায় করণীয়। সুন্দরবন জীববৈচিত্র্য প্রকল্প : এডিবি, রূপান্তর সুন্দরবন স্টাডি গ্রুপ।

ড. এ এইচ এম মোস্তাইন বিল্লাহ (২০০৪) : জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ নীতি ও নৈতিকতা : বাংলাদেশ প্রেক্ষিত বাংলাদেশ লোকপ্রশাসন পত্রিকা অষ্টম বর্ষ সংখ্যা কার্তিক ১৪১০।

ঔষধি উদ্ভিদের ব্যবহার (২০০৩) : সম্ভাবনা ও সমস্যা বিষয়ক কর্মশালা, জুলাই ২০০৩।

মাহমুদ শামসুল হক, "বিপর্যস্ত বন" দৈনিক জনকণ্ঠ, ২৪ নভেম্বর, ২০০০।

শংকর লাল দাস "চরাঞ্চলের খাস জমি" দৈনিক জনকণ্ঠ, ১৭ নভেম্বর, ২০০০।

ফখরে আলম " সুন্দরবনের মানুষ" দৈনিক জনকণ্ঠ, ১৭ নভেম্বর, ২০০০।

মোঃ মাহবুবুল আলম "প্রকৃতির মাঝে আধুনিকতা" দৈনিক যুগান্তর, ১৯ জানুয়ারি, ২০০১।

আমিনুল ইসলাম জুয়েল 'গোল্ডেন রাইস না সুইসাইড টেকনোলজি?' দৈনিক জনকণ্ঠ, ২১ জুলাই ২০০০।

মোঃ শওকত হোসেন "বৃক্ষ আল্লাহর তসবীহ পাঠ করে" দৈনিক যুগান্তর, ২৯ জুন ২০০১।

এম এ মোহিত "বন্যকুলের খাদ্য সংকট তীব্র" দৈনিক যুগান্তর, ২১ মে, ২০০৫।

মাহবুবুর রহমান সাকী "ঔষধি উদ্ভিদের ব্যবহার" সমস্যা ও সম্ভাবনা বিষয়ক কর্মশালা, ৬-৭ জুলাই ২০০৩

পরিবেশ পত্র "আমাদের ঔষধি উদ্ভিদ আমাদের সম্পদ" অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০০০।

আরশাদ আজিজ : ইলিশ ইলিশ, দৈনিক যুগান্তর, ১৬ এপ্রিল, ২০০৪।

ড. আলি নেওয়াজ (২০০৫) খনার বচন কৃষি ও কৃষ্টি, আফসার ব্রাদার্স, বাংলা বাজার, ঢাকা-১১০০।

www.nagorikpathagar.org

বৃক্ষরোপণ, দারিদ্র্য বিমোচন ও ধর্মীয় অনুশাসন

"তুমি যদি নিশ্চিত হও আগামীকাল কেয়ামত হবে, আর তোমার হাতে একটি গাছের চারা তা লাগিয়ে দাও। - আল হাদিস।

সার সংক্ষেপ

বৃক্ষ যেমন প্রকৃতির অলংকার পরজগতেও ইহা সুন্দর মনোরম পরিবেশে বসবাসের জন্য শোভা বৃদ্ধি করে। হযরত আদম (আঃ) স্বর্গ থেকে নিক্ষিপ্ত হয়ে অরণ্যে তার স্থান, আর সারা জনম আহার ঔষধ- সবকিছুর উৎসই বৃক্ষ। মৃত্যুর পরও ফুল দিয়ে কবরে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। এমনকি কবরের উপর গাছ থাকলে কবরের আযাবও লাঘব হয়। বৃক্ষ মানুষ সৃষ্টির উষালগ্ন থেকে মৃত্যুর পর পর্যন্ত সাথী। তাই এর পরিচর্যা অপরিহার্য -একথা ব্যাখ্যার প্রয়োজন রাখে না। এ প্রবন্ধে বাংলাদেশে বনায়নের বর্তমান অবস্থা ও উদ্যোগের বিষয় আলোকপাত করা হয়েছে। বৃক্ষ ও ঔষধি উদ্ভিদের গুণাবলী, পরিবেশ সংরক্ষণে বৃক্ষ এবং জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে বৃক্ষের তাৎপর্যের বর্ণনা রয়েছে। বৃক্ষ জীবনের অবিচ্ছেদ্য অবলম্বন- এ বিষয় তুলে ধরা হয়েছে বৃক্ষ জীবন ও এদেশের সংস্কৃতিতে। দারিদ্র্য বিমোচনে এর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার বাস্তব কাহিনী বলা হয়েছে। পরিশেষে বনায়নের নীতির কার্যকারিতা নিশ্চিত করার জন্য মানুষের সামাজিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধ সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করতে পারে। এ কথা প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয়েছে আলোচ্য অধ্যায়ে।

www.nagorikpathagar.org

সূচনা

কোন দেশের জলবায়ু ও প্রাকৃতিক পরিবেশ রক্ষায় বৃক্ষসম্পদের তাৎপর্য অপরিসীম। অন্যান্য সম্পদের ন্যায় বৃক্ষসম্পদ সম্প্রসারণ ও সংরক্ষণের বিষয়টি মানুষের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের ওপর নির্ভর করে। বিভিন্ন অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের ভিত্তিতেই একটি দেশের বনাঞ্চলের ও বনসম্পদের বৈশিষ্ট্য নির্ধারিত হয়ে থাকে। বাংলাদেশের জলবায়ু ও প্রাকৃতিক পরিবেশে বিভিন্ন বনসম্পদ গড়ে উঠার এবং সম্প্রসারণে প্রচুর সুযোগ ও সম্ভাবনা রয়েছে। প্রথাগতভাবে প্রতি বৎসর বিরাট অংকের অর্থ ব্যয়ে জাঁকজমকের সাথে বৃক্ষরোপণ উদযাপন করা হয়ে থাকে। নিঃসন্দেহে এসব প্রচারাভিযানের ফলে জনসাধারণের মাঝে অভূতপূর্ব চেতনা সৃষ্টি হয়েছে। সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি বিপুল আকারে বেসরকারি এবং ব্যক্তিগত উদ্যোগও পরিলক্ষিত হচ্ছে। এসব উদ্যোগের পেছনে যে বিরাট অংকের অর্থ ব্যয় হচ্ছে সে পরিমাণ আর্থিক ও সামাজিক সুবিধা অর্জন হয়েছে কি না এ বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ সমীক্ষা ও অর্থনৈতিক বিশ্লেষণভিত্তিক গবেষণার ভীষণ অভাব রয়েছে। প্রতি বৎসর যে পরিমাণ বনায়ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয় এবং তা বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়া হয় এর অর্ধেকও যদি সফল হতো তাহলে দেশের বনজ সম্পদ অন্তত দ্বিগুণ হয়ে যেতো। অর্থনৈতিক ও কারিগরি সীমাবদ্ধতা ছাড়াও এই কর্মসূচি ঈপ্সিত লক্ষ্য অর্জিত না হবার অন্যতম প্রধান কারণ প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনায় মূল্যবোধ ও নৈতিকতার অভাব যা তৃণমূল পর্যায়ে জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ ও সহযোগিতাকে নিশ্চিত করতে পারে।

এ প্রবন্ধে বৃক্ষসম্পদ সংরক্ষণে ধর্মীয় মূল্যবোধকে কিভাবে কাজে লাগানো যেতে পারে সে বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। বনসম্পদের এতসব আর্থিক, সামাজিক এবং পরিবেশ সংরক্ষণের গুরুত্ব থাকা সত্ত্বেও আমাদের দেশের মতো উন্নয়নশীল দেশের পক্ষে এ ব্যয়ভার বহন করা অত্যন্ত কঠিন কাজ। অন্যান্য দেশের মতো আমাদের দেশেও নতুন নতুন আইন প্রণয়ন করা হচ্ছে। প্রতি বৎসর নতুন নতুন প্রকল্প গ্রহণ করে অস্থায়ী ভিত্তিতে অলাভজনক খাতে বিপুল সংখ্যক জনশক্তি নিয়োগ করা হচ্ছে। অনুরূপভাবে অনুন্নয়ন খাতের মাথাভারী প্রশাসনের জন্য ব্যয় হচ্ছে বিরাট অংকের অর্থ। এসব প্রকল্পের অর্থে টেকসই (Sustainable) সম্পদ সৃষ্টি হয় কি না তা সমীক্ষা করে দেখার সুযোগ রয়েছে। এমতাবস্থায় দেশের আর্থিক সীমাবদ্ধতার কথা বিবেচনা করে প্রচলিত সামাজিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধকে যথাযথভাবে কাজে লাগানোর চেষ্টা করা যেতে পারে।

বাংলাদেশের প্রকৃতি ও বর্তমান অবস্থা

সবুজ শ্যামল বাংলাদেশের প্রকৃতি ক্রমান্বয়ে তার শ্যামল রূপ হারিয়ে বিবর্ণ হয়ে পড়ছে। পরিবেশ বিশেষজ্ঞদের মতে, একটি দেশের মোট আয়তনের ২৫% এলাকা বনভূমি থাকা প্রয়োজন। ১৯৫০ সালে এদেশের বনভূমির পরিমাণ ছিল ৩০%। স্বাধীনতা উত্তর এদেশের বনভূমি ছিল মোট আয়তনের ১৯ ভাগ মাত্র। স্বাধীনতার আটত্রিশ বৎসর পর এর পরিমাণ ১৬ ভাগ বলা হলেও প্রকৃত অবস্থা দাঁড়িয়েছে ৬ ভাগ মাত্র। অবশ্য সামাজিক বনায়ন ও

www.nagorikpathagar.org

বসতভূমি বনায়ন বেড়েছে উল্লেখযোগ্যভাবে। এত দ্রুত বনভূমি হ্রাস পাবার মূল কারণগুলো হচ্ছে, ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা বৃদ্ধি, অপরিকল্পিত নগরায়ন, খাদ্যোৎপাদনের জন্য আবাদি জমির চাহিদা এবং ঊর্ধ্বগতির জ্বালানির চাহিদা। বনজ সম্পদের এত দ্রুত হ্রাসের ফলে গ্রামীণ বনজঙ্গলের বন্যপ্রাণী বিলুপ্তপ্রায়। বনাঞ্চলের ব্যাপক হ্রাসের ফলে ইতোমধ্যে বিশ্বজলবায়ু পরিবর্তনের মারাত্মক প্রভাব বাংলাদেশেও পরিলক্ষিত হচ্ছে। শীত ও গ্রীষ্মের তীব্রতা মাত্রাতিরিক্ত বেড়েছে। ভূগর্ভের পানির স্তর নিচে নেমে যাচ্ছে। উজানের দেশগুলোতে বন নিধনের ফলে নিম্নভাগের দেশ বাংলাদেশের নদীগুলো বালু, পলি, পাথর কণা দ্বারা ভরাট হয়ে যাচ্ছে। চর পড়ে অনেক নদী ইতোমধ্যে মজে গিয়েছে। নদীগুলোতে মিষ্টি পানির চাপ কমে গিয়েছে। নদীগুলোতে মিষ্টি পানির চাপ কমে যাবার ফলে উপকূলীয় ভূভাগে লবণাক্ততা বাড়ছে। উপকূলীয় বনাঞ্চলে বৃক্ষ নিধনের ফলে এদের ঘনত্ব কমে যাচ্ছে। বৃক্ষ নিধনসহ অন্যান্য প্রাকৃতিক ভারসাম্যহীনতার সৃষ্টি হয়ে ঘূর্ণিঝড় ও সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস বাড়ছে। দেশের চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম, সিলেট, ময়মনসিংহ ও খুলনা এলাকায় বনাঞ্চল থাকলেও তা সে এলাকার ১২ থেকে ১৬ ভাগের বেশি নয়। অপরদিকে দেশের উত্তরাঞ্চলে বনভূমির পরিমাণ ২ ভাগের নিচে। সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে দেশে বনায়ন কর্মসূচি থাকলেও বৃক্ষসম্পদ আহরণের পরিমাণের তুলনায় বনায়নের পরিমাণ অতিসামান্য। ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, জাপান, থাইল্যান্ড, চীন, রাশিয়া ও বার্মায় দেশের বনভূমির পরিমাণ মোট আয়তনের ৬০ শতাংশেরও বেশি। আমেরিকায় এর পরিমাণ ৩৪ ভাগ এবং প্রতিবেশী ভারতেও তা ২৪ শতাংশ। বাংলাদেশে বনজ সম্পদের দ্রুত বিলুপ্তির উল্লেখযোগ্য কারণগুলো হচ্ছে: (ক) প্রচলিত আইনের যথাযথ প্রয়োগের দুর্বলতা (খ) অদক্ষ প্রশাসনিক ও বনজ সম্পদ ব্যবস্থাপনা (গ) স্বীয় দায়িত্ব পালনে উদাসীনতা (ঘ) সমাজে প্রভাবশালীদের ছত্রছায়ায় দুস্কৃতকারীদের দৌরাত্ম্য (ঙ) সামাজিক ও রাজনৈতিক অঙ্গীকার (Commitment) এর অভাব। এক্ষেত্রে মানুষের নৈতিকতা ও মূল্যবোধের অবক্ষয়ও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ-এ কথা অনস্বীকার্য।

প্রতি বৎসর বনায়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নে যে পরিমাণ প্রচেষ্টা ও অর্থ খরচ হয় (প্রতি গাছের/প্রতি একর) এবং যে পরিমাণ কাঙ্ক্ষিত আর্থিক সুবিধাদি অর্জিত হতে পারে এসব তথ্য জনগণের মধ্যে তুলে ধরতে পারলে বৃক্ষরোপণের মতো সামাজিক বিপ্লবকে অর্থনৈতিক কর্মসূচি হিসেবে অতিসহজেই রূপান্তর করা যেতে পারে। বিপুল অর্থ ব্যয়ে এবং অত্যন্ত আন্তরিক প্রচেষ্টার পরও এদেশে বৃক্ষরোপণের প্রত্যাশিত লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব হচ্ছে না কেন- এ বিষয়ে সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং নৈতিকতা ও মূল্যবোধের দিকটি বিশ্লেষণ করে দেখা দরকার।

বাংলাদেশে বনায়নের উদ্যোগ

বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিকে দেশের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের একটি গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি হিসেবে চিহ্নিত করে সরকার সামাজিক বনায়ন, থানা বনায়ন ও ফরেস্ট্রি সেক্টর নামে বিভিন্ন প্রকল্প

www.nagorikpathagar.org

বাস্তবায়ন করেছে। এ ছাড়া উডলট ফরেস্ট্রি, উপকূলীয় সবুজ বেষ্টনীসহ অন্যান্য বনায়ন কর্মসূচি অত্যন্ত জাঁকজমকভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে। এসব বাস্তবায়ন কর্মসূচির আওতায় উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে নার্সারি স্থাপন করা হয়েছে। এসব নার্সারি থেকে বিভিন্ন প্রজাতির ফলদ ও বনজ গাছের চারা সরবরাহ করা হয়ে থাকে যা প্রয়োজনের তুলনায় অত্যন্ত কম। এ লক্ষ্যে বন বিভাগ এবং বিভিন্ন এনজিও সংস্থায় বনায়ন সংক্রান্ত দক্ষ মানবসম্পদ সৃষ্টি হচ্ছে। এ বনায়ন কর্মসূচির আওতায় বাস্তবায়নাধীন বনসম্পদকে রক্ষার জন্য বিপুল অর্থ ব্যয় করেও তেমন সুফল পাওয়া যাচ্ছে না বলে প্রতীয়মান হয়।

গত এক দশকে বাংলাদেশ বন বিভাগ ১৭টি বিনিয়োগ প্রকল্প (Investment Project) বাস্তবায়ন করছে। এর মধ্যে চারটি কারিগরি প্রকল্প রয়েছে। এছাড়া বাংলাদেশ বনশিল্প সংস্থা ২টি এবং বাংলাদেশ বন গবেষণা প্রতিষ্ঠান একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে। দেশব্যাপী বনায়ন প্রকল্পটির নাম ছিল থানা বনায়ন ও নার্সারি উন্নয়ন প্রকল্প। এ প্রকল্পের অধীনে ১৯,৫৬২ হেক্টর উডলট, ৫১৪ হেক্টর কৃষিজ বন, ১,৩৪২ হেক্টর বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বাঁধের পাশে বনায়ন, ১৮,১০৮ কিঃমিঃ রাস্তার পাশে বনায়ন করা হয়েছে। ৮১.৪৬ লক্ষ চারা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে বিতরণ করা হয়েছে, ১,০৬৬ লক্ষ চারা জনগণের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়া ৩৪৫টি থানা নার্সারি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল (NCS, ১৯৯৯)।

অনুরূপভাবে উপকূলীয় সবুজ বেষ্টনী প্রকল্প নামে অন্য একটি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। এ প্রকল্পের অধীনে ১,৩০০ কিলোমিটার বাঁধ, ৬,৭২০ কিলোমিটার রোড ও রেল লাইনের ধারে বনায়নের পরিকল্পনা রয়েছে। এছাড়া ৫০০ হেক্টর এলাকায় পরীক্ষামূলক উপকূলীয় বনায়নসহ ২০০ লাখ চারা বসতবাড়ি এলাকায় বনায়নের জন্য বিনামূল্যে বিতরণের ব্যবস্থা রয়েছে। এ প্রকল্পে গণসচেতনতা ও প্রচারের জন্য ব্যাপক কর্মসূচি রয়েছে। ১৯৯১ সালের এপ্রিলে ঘূর্ণিঝড়ে উপকূলীয় বাঁধ পুনর্বাসন প্রকল্পের অধীনে ১,৯০১ হেক্টর বাঁধ এবং ৪,৭৩৭ হেক্টর উপকূলীয় বনায়ন করা হয়েছিল। অনুরূপ অন্য প্রকল্পগুলো হচ্ছে পার্বত্য চট্টগ্রাম বনায়ন, ভাওয়াল ন্যাশনাল পার্ক, নগর বনায়ন প্রকল্প, টপ্ডাইং সুন্দরী প্রকল্প। এসব সার্বিক কর্মকাণ্ড বাংলাদেশের বনায়নকে একটি সামাজিক আন্দোলনে রূপ দিয়েছে। এতো উদ্যোগ, এতো বিনিয়োগের পরও বনায়ন আশানুরূপ ও প্রত্যাশিত সুফল দিচ্ছে না কেন- এ বিষয়টি নিয়ে বিশদভাবে বিশ্লেষণ ও গবেষণার সুযোগ রয়েছে। এ গবেষণার বিষয়বস্তু ও বিচার্য বিষয়গুলো ব্যাপক ও বিস্তৃত হতে পারে, যেমন অর্থনৈতিক, সামাজিক, কারিগরি, নৈতিকতাবোধ সংক্রান্ত বিশ্লেষণ। যে পরিমাণ অর্থ এ প্রকল্পে বিনিয়োগ করা হয়েছে তার অর্থনৈতিক ও সামাজিক মুনাফা বিকল্প বিনিয়োগের তুলনায় বেশি কি না এসব প্রকল্পের মাধ্যমে যে পরিমাণ আয় ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়, এ অর্থ বিকল্প ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করলে তার চেয়ে অধিক আয় ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি হতো কি না তার তুলনামূলক বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। অনুরূপভাবে কারিগরি দিকগুলোও বিচার-বিশ্লেষণ করারও সুযোগ রয়েছে। অভীষ্ট লক্ষ্যার্জনে ব্যর্থতার কারণ হিসেবে নীতির বাস্তবায়নের পাশাপাশি নৈতিকতা ও মূল্যবোধের অভাবের বিষয়গুলোও পরীক্ষা করে দেখা যায়।

www.nagorikpathagar.org

বৃক্ষসম্পদের অর্থনৈতিক গুরুত্ব

এদেশে বৃক্ষসম্পদ জাতীয় অর্থনীতিতে জিডিপির প্রায় ৪ শতাংশ এবং কর্মসংস্থানে ২ শতাংশ অবদান রাখে। বৃক্ষসম্পদের চাহিদা ও ব্যবহার অত্যন্ত ব্যাপক ও বিস্তৃত। যেমন, কৃষি শিল্প, গৃহনির্মাণ, জ্বালানি এর মধ্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কাঠের ব্যবহারের মধ্যে জ্বালানী কাঠ, আসবাবপত্র, খুঁটি, নিউজপ্রিন্ট এবং প্লাইউড ইত্যাদি এর অন্তর্ভুক্ত। বাজার মূল্যের মাধ্যমে এসব অর্থনৈতিক গুরুত্ব নিরূপণ করা হয়ে থাকে। ভারতীয় কৃষি কলেজের অধ্যাপক টি.এন. দাস হিসাব করে দেখেছেন, একটি ৫০ বছর বয়সের গাছের সেবার আর্থিক মূল্য বাংলাদেশী মুদ্রায় প্রায় ২৫ লাখ টাকা হতে পারে।

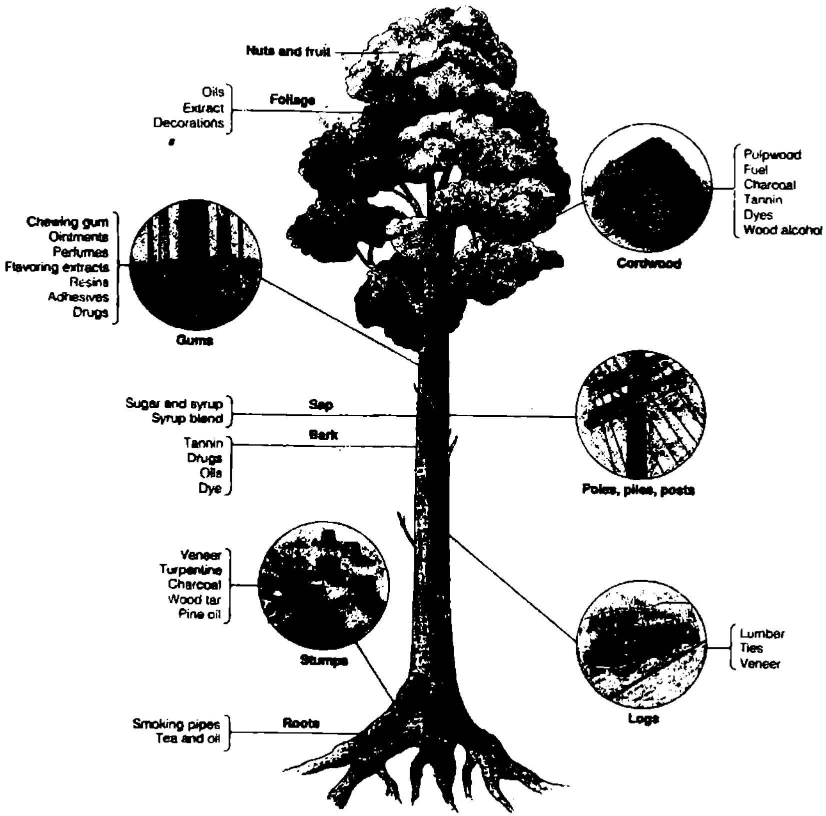

চিত্র ২.১ : গাছের অর্থনৈতিক মূল্যের বিভিন্ন দিক

উৎস : T. Miller, 1993

www.nagorikpathagar.org

টাকার অংকে মূল্যায়ন করা হয় না (তবে ইদানীং করা হচ্ছে) বৃক্ষসম্পদের এমন সেবাগুলো হচ্ছে ঃ পরিবেশ সংরক্ষণ, মাটির ক্ষয়রোধ, বায়ু পরিশোধন, প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা, জীববৈচিত্র্যের সংরক্ষণ, বন্য প্রাণীর আবাসস্থল, জমির উর্বরতা বৃদ্ধি, দরিদ্র ও উপজাতিদের আবাসস্থল সরবরাহ করা। বর্তমানে পৃথিবীর আধুনিক শহরগুলোয় গ্রিনবেল্ট ও অরণ্য বলয় সৃষ্টি করা হচ্ছে, যার ফলে এসব এলাকার আবাসিক ও অফিসের জন্য জায়গার দাম অত্যন্ত বাড়ছে। এ বিষয়ে আমাদের দেশের কতিপয় বৃক্ষ ও বনজ প্রজাতির অর্থনৈতিক গুরুত্বের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে।

চা রফতানিতে বৃক্ষের প্রভাব ঃ চা আমাদের দেশের অন্যতম রফতানি পণ্য। বৃক্ষ নিধনের ফলে ক্রমান্বয়ে চায়ের ঐতিহ্যগত ফ্লেভার কমে যাচ্ছে, হারিয়ে যাচ্ছে আন্তর্জাতিক বাজারে এর চাহিদা, বিনষ্ট হচ্ছে বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জনের সম্ভাবনাময় সুযোগ। গত (১৯৯৯-২০০০) অর্থ বৎসরে তার আগের অর্থ বৎসরের চেয়ে চা রফতানি অর্ধেকেরও নিচে নেমে গিয়েছিল। চা গাছের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য এবং চায়ের স্বাদ বৃদ্ধির জন্য শেড ট্রি বা ছায়াবৃক্ষ একান্ত অপরিহার্য। আমাদের দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে কাঠের চাহিদা দ্রুত বাড়ছে, তৎপরিপ্রেক্ষিতে মৌলভীবাজার জেলার শ্রীমঙ্গল, হবিগঞ্জ জেলার চুনারুঘাট, রশিদপুর, তেলিয়াপাড়া, নোয়াপাড়া প্রভৃতি এলাকায় স মিলের ব্যবসা জমজমাট হয়ে উঠেছে। এসব স মিলকে কেন্দ্র করে এক শ্রেণীর অসাধু কাঠ ব্যবসায়ী ফার্নিচার ব্যবসা জমজমাট করে তুলেছে। এসব অসাধু ব্যবসায়ীর সহযোগিতায় উজাড় হয়ে যাচ্ছে শেড ট্রি বা "ছায়াবৃক্ষ"। শুধু বিভিন্ন ব্যবসা কেন্দ্রেই নয়, চা বাগান এলাকার ভিতরে নতুন নতুন স মিল এবং ফার্নিচার দোকান গড়ে উঠেছে। ন্যাশনাল টি কোম্পানীর বাগানগুলোর দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সহযোগিতায় যেভাবে "ছায়াবৃক্ষ" নিধন হচ্ছে তাতে উদ্ভিদ বিজ্ঞানী ও চা বিশেষজ্ঞগণ আশংকা করেছেন, এ ধারা বন্ধ না হলে অতিদ্রুত চা বাগানগুলো ধ্বংস হয়ে যাবে। ফলে জাতীয় অর্থনীতিই শুধু মারাত্মক হুমকির সম্মুখীন হবে তাই নয়, দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ বিনষ্ট হওয়ার সাথে সাথে চা শিল্পও ধ্বংস হয়ে যাবে। এর ফলে বেকার বানিয়ে দেবে হাজার হাজার শ্রমিককে। প্রাকৃতিক সম্পদ বিপন্ন হবার সাথে সাথে প্রাকৃতিক পরিবেশের ওপরও মারাত্মক বিরূপ প্রভাব পড়বে। চা শিল্পের উন্নয়ন ও মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১৯৮০ সালে বিটিআরআই ১১৫ কোটি টাকা ব্যয়ে একটি প্রকল্প হাতে নিয়েছিল, যা ৫০% বিদেশি সাহায্য, ৫০% দেশীয় অর্থায়নে বাস্তবায়িত হয়েছিল। প্রকল্পের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল নতুন বাগান তৈরি ও পুরাতন বাগানে ছায়াবৃক্ষ লাগিয়ে বাগানকে আরো উন্নত করা। এ প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করতে গিয়ে বিভিন্ন বাগানকে মোটা অংকের ঋণ প্রদান করা হয়েছিল। কিন্তু বিভিন্ন সূত্রের তথ্য থেকে জানা যায় যে, দুর্নীতি, অবহেলা, উদাসীনতা এবং অদূরদর্শিতার জন্য এসব ছায়াবৃক্ষ সম্পদ সৃষ্টির প্রকল্প সফল হয়নি। এভাবে দেশের সর্বত্রই বনায়ন ও বনসম্পদ সৃষ্টির প্রকল্পগুলির অভীষ্ট লক্ষ্যার্জনের ব্যর্থতার কারণ মানুষের নৈতিক অবক্ষয়। আইন করে, পুলিশ দিয়ে এসব অধঃপতন থেকে রক্ষা করা অত্যন্ত ব্যয়বহুল ও

www.nagorikpathagar.org

কষ্টসাধ্য ব্যাপার। তাছাড়া নৈতিক অধঃপতন তো শুধু সাধারণ মানুষ বা সরকারি কর্মকর্তাদের মধ্যে সীমিত নয়। বড় বড় রাঘববোয়ালও এসব নৈতিকতা বিবর্জিত কাজের সাথে জড়িত যা অপ্রতিরোধ্য। সেজন্য সকল ধর্ম-বর্ণের লোকের মধ্যে ধর্মীয় মূল্যবোধ জাগিয়ে তুলতে পারলে প্রাকৃতিক সম্পদ সৃজন (বনসম্পদ) তার সংরক্ষণ যখন তাদের কাছে পুণ্যের কাজ বলে বিবেচিত হবে, তখন নৈতিক তাগিদে ও স্বউদ্যোগে তারা বৃক্ষরোপণ ও তা সংরক্ষণের কাজে ব্রতী হবে।

হৃদরোগ দমনে চায়ের ভূমিকা

ব্যক্তিগত জীবনে মানুষের ভালোমন্দ অভ্যাস থাকেই, এর মধ্যে অনেক অভ্যাস স্বাস্থ্যের জন্য সহায়ক এবং অনেক অভ্যাস স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর হয়ে থাকে। আমাদের দেশে চা পান এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য, এর উদ্দেশ্য থাকে রিলাক্স ও রিফ্রেশ অফ মাইন্ড অ্যান্ড বডি। কিন্তু সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা যায় যে, রিফ্রেশ অফ মাইন্ড এন্ড বডি ছাড়াও চা পান হৃদরোগ ও ক্যান্সারের জন্য অত্যন্ত সহায়ক, চিনি ছাড়া উপকারী। এন্টিঅক্সিডেন্ট উপাদান এসব উপকারী কাজে সহায়ক হয়। এ ক্ষেত্রে চিনি ছাড়া লিকার চা /কফি খাওয়ার জন্যই ডাক্তাররা পরামর্শ দিয়ে থাকেন।

এলার্জিজনিত হাঁপানি, জ্বর, ক্লান্তি এ ধরনের সমস্যার জন্য এক পেয়ালা চা বা কফিই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রতিকার দিতে পারে। দক্ষিণ কোরিয়ার বিজ্ঞানীরা কফির ওপর গবেষণা করে আশানুরূপ ফল পেয়েছেন বলে দাবি করেছেন। বিজ্ঞানীরা গবেষণা করে প্রমাণ করেছেন যে, কফিতে এন্টি এলার্জিক বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যা আক্রান্ত কোন কোষ থেকে নির্গত হিস্টামিন অপসারিত করে। বিজ্ঞানীরা আরো বিশ্বাস করেন যে, দৈনন্দিন জীবনে যে সাময়িক এলার্জি সৃষ্টি হয় সে ক্ষেত্রেও কফি উপকারে আসতে পারে। ইসরাইলি বিজ্ঞানী লেভি বলেন, ক্যাফেইন হিস্টামিন নির্গত হওয়ার বিষয়ে যে এনজাইমগুলো সম্পৃক্ত রয়েছে সেগুলোকে প্রতিরোধ করে। হাঁপানি চিকিৎসার জন্য ব্যবহৃত থিওফাইলাইন ঔষধটি একইভাবে প্রতিরোধক হিসেবে ক্রিয়া করে থাকে। লন্ডনের এলার্জি বিশেষজ্ঞ ফ্রেডপিয়াস অভিমত প্রকাশ করেন যে, ক্যাফেইনের চেয়ে বাজারে প্রচলিত ঔষধ বেশি কার্যকর। কারণ এখনো নির্ণয় করা হয়নি যে, কী পরিমাণ চা বা কফি পান করলে এর কতটুকু সুফল পাওয়া যাবে এবং এর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াই বা কি হবে।

বৃক্ষ ও উদ্ভিদের ঔষধি গুণাবলী

বিজ্ঞানের এ চরম উৎকর্ষের যুগে ঔষধ ও প্রসাধনী তৈরিতে বৃক্ষ ও উদ্ভিদের গুরুত্ব বাড়ছে সীমাহীনভাবে। মহান আল্লাহ্ তার সৃষ্টির ভারসাম্য রক্ষা করার লক্ষ্যে মানব কল্যাণের জন্য তার প্রকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন অফুরন্ত সম্পদ। এসব সম্পদের মধ্যে এমন উপাদান রয়েছে যা মানবদেহের কল্যাণের জন্য বিশেষ সহায়ক। আমাদের দেশের গ্রামে-গঞ্জে নিম গাছ ঔষধি গাছ হিসেবে আদিকাল থেকেই পরিচিত। এ গাছটি আমাদের বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধক হিসেবে কাজ করে। বিশেষ করে ঘা, গুটিবসন্ত, জলবসন্ত, হাম, ব্রণ ইত্যাদি রোগের ঔষধ হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে দীর্ঘদিন ধরে। এছাড়া সর্দি, কাশি, অরুচি, বদহজম, কৃমি, কফবমি ও প্রমেহ নাশ করে। নিমের তৈরি তেল মাথা ঠান্ডা রাখার জন্য, নতুন চুল গজানো ও বর্ধন করে এবং নিরাময় করে। নিমের ডালের দাঁতের মাজনে দাঁত সজীব রাখার, মুখের দুর্গন্ধ কমানোর, দাঁতের মাড়ি সুস্থ রাখার গুণাবলী আদিকাল থেকে অদ্যাবধি আমাদের গ্রামীণ সমাজে সমাদৃত। নিমের বাকল থেকে শক্তিবর্ধক টনিক তৈরি

www.nagorikpathagar.org

হয়। নিমের পাতা দিয়ে তৈরি মলম দ্বারা বিভিন্ন রোগের চিকিৎসা হয়। সম্প্রতি বিজ্ঞানীরা নিম দিয়ে গর্ভ নিরোধক স্পার্নিসাইডল ক্রিম তৈরি করেছেন যার কোন প্রতিক্রিয়া নেই। মোট কথা, আমাদের দেশীয় প্রজাতিসহ বিভিন্ন প্রজাতির নিম এতো উপকারী যে, তার পাতা, ফুল, ফল, ডাল, পাতা, শিকড় ও আঠা কোনটাই ফেলনা নয়। নিম গাছের কাঠ ও ডাল শক্ত, তাতে ভালো ফার্নিচারও তৈরি করা যায়। তাছাড়া বিভিন্ন উদ্ভিদ দিয়ে হালে তৈরি হচ্ছে ঔষধ, প্রসাধনী ও আয়ুর্বেদী নানা প্রকার চিকিৎসার ব্যবস্থা।

নিম গাছের উপকারিতা

আমাদের দৈনন্দিন জীবনে নিম গাছের বহুবিধ উপকারিতা রয়েছে। এ উপমহাদেশের মানুষ দাঁতকে শক্ত ও জীবাণুমুক্ত রাখার জন্য নিম গাছের ডাল দাঁত ব্রাশ হিসেবে হাজার বছর ধরে ব্যবহার করে আসছে। নিমে রয়েছে এমন কিছু উপাদান যা যে কোন জীবাণু সহজে ধ্বংস করতে পারে। তাছাড়া নিম রক্ত পরিষ্কারক, জীবাণুনাশক, চর্মরোগ, ব্রণ, কৃমি ও ক্ষত নিবারক হিসেবে কাজ করে এবং শরীরে জ্বালাপোড়া, এলার্জি, মুখের দুর্গন্ধ ও জন্ডিস প্রশমনে নিম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। নিম সাবান ও নিম টুথপেস্ট এখন দেশের সর্বত্র ব্যবহৃত হচ্ছে। সে জন্য নিমকে বলা হয় পৃথিবীর সেরা উদ্ভিদ।

সাধারণতঃ নিম গাছের পাতা, ছাল বা বাকল, ফুল, ফল বা বীজ এবং নিমের তেল আমাদের দেশের সর্বত্র ব্যবহৃত হচ্ছে। এই ভেষজ ঔষধ আমাদের অত্যন্ত উপকারী। যেমনঃ

* নিম পাতার গুঁড়া ৩৭৫ গ্রাম পানির সাথে মিশিয়ে খেলে অম্ল রোগের ও পেটের পীড়ার উপশম হয়।
* ১ গ্রাম নিম পাতার গুঁড়া সকালে খালি পেটে পানি দিয়ে খেলে ছোট কৃমি মরে যায়।
* নিম পাতার রস ২০-৩০ ফোঁটা একটু মধুর সাথে মিশিয়ে সকালে খালি পেটে খেলে জন্ডিস রোগ ভাল হয়।
* নিম পাতার রস ৫-৬ ফোঁটা দুধ বা পানিসহ খেলে বমি প্রশমিত হয়।
* কাঁচা নিম পাতার সাথে সামান্য কাঁচা হলুদ পিষে নিয়ে আক্রান্ত স্থানে প্রলেপ আকারে ৭-১০ দিন ব্যবহার করলে খোস-পাঁচড়া ও পুরনো ক্ষতস্থান ভাল হয়ে যায়।
* নিমের শুকনা পাতা চাল, গম, ডাল ও কাপড়-চোপড়ে পোকা প্রতিরোধে ব্যবহৃত হয়।
* ৪-৫ গ্রাম নিমের ছাল ১ কাপ গরম পানিতে রাতে ভিজিয়ে রেখে সকালে ছেঁকে খেলে পেটের অজীর্ণতা ভাল হয়।
* নিমের ছাল সিদ্ধ করে পানি খেলে ক্ষত শুকিয়ে যায়।
* নিম ফুল ভাজা খেলে রাতকানা রোগ উপশম হয়।
* নিম তৈল মাথায় মাখলে মাথা ধরা কমে যায়।
* নিম বীজ তৈল, সাবান, কসমেটিকস তৈরি ও পোকামাকড় নিবারণে ব্যবহৃত হয়।
* নিমের খইল ক্ষেতে ব্যবহার করলে পোকামাকড় হ্রাস করে ও সার হিসেবে কাজ করে।

তাছাড়া নিমের ছাল, ফুল, ফল ও তেলে বিভিন্ন ধরনের তিক্ত উপাদান যেমন- স্যাপেনিন, এলকালয়েড, নিমবিডিন, নিমিডল, নিম্বিনিন, ট্রাইটারপেনয়েড, সালানিন, জৈব এসিড, মেলিয়ানোন, নিম্বোলাইড, গ্লাইকোসাইড, ট্যানিন, মারগোসিন ইত্যাদি থাকে যা ঔষধ তৈরিতে রাসায়নিক উপাদান হিসেবে কাজ করে। এসব ভেষজ ঔষধ ব্যবহার করার ফলে একদিকে যেমন আমরা বিভিন্ন রোগ-বালাই থেকে রেহাই পাবো, অন্যদিকে বেশি দামে অ্যালোপ্যাথিক ঔষধ কেনা থেকে বিরত থেকে আর্থিকভাবেও লাভবান হতে পারবো।

www.nagorikpathagar.org

ঔষধ হিসেবে ব্যবহার ছাড়াও নিম গাছের কাঠ বিভিন্ন আসবাবপত্র তৈরিতে প্রচুর ব্যবহৃত হয়। নিমের গাছ অত্যন্ত শক্ত ও টেকসই। এই কাঠ দিয়ে ঘরের দরজা-জানালার চৌকাঠ, গরুর গাড়ির চাকা, জোয়াল, খাট ইত্যাদি তৈরি করা যায় যা আমাদের নিত্যদিনের ব্যবহার্য দ্রব্য হিসেবে উপকারে আসে। বর্তমানে বিভিন্ন প্রসাধনী সামগ্রী তৈরির ক্ষেত্রেও নিমের ব্যবহার সর্বাধিক। এছাড়া বিভিন্ন পোকামাকড় ও কীটনাশক ঔষধ তৈরির ক্ষেত্রে নিম প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হচ্ছে।

অনাদিকাল হতে বিভিন্ন রোগ নিরাময়ের ক্ষেত্রে নিমের বিভিন্ন অংশ অত্যন্ত কার্যকরী উপাদান হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। বর্তমানে বিজ্ঞানীরা নিমের বিভিন্ন অংশ নিয়ে ব্যাপক গবেষণা করে যাচ্ছেন। ইউনানী-আয়ুর্বেদিক ও হোমিও ঔষধ শিল্পে নিমের ছাল, পাতা, বীজ বা ফল প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হচ্ছে। এক পরিসংখ্যানে জানা যায়, এসব ঔষধ শিল্পে প্রতি বছর নিম ছাল, নিম বীজ ও নিম পাতা প্রায় ৫০০ টনের মতো ব্যবহৃত হচ্ছে।

একটা সময় ছিল যখন বাংলাদেশের আনাচে-কানাচে, শহর-বন্দরে বাড়ির আঙিনায় প্রচুর পরিমাণ নিম গাছ দেখা যেত। কিন্তু বর্তমানে গ্রামে-গঞ্জে নিম গাছ দেখা গেলেও শহরে নিম গাছের সংখ্যা অনেক কম। পরিবেশ দূষণমুক্ত রাখতে ও সুস্থ সাবলীল জীবনযাপন করতে হলে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে অত্যন্ত উপকারী বন্ধু এই নিম গাছ সংরক্ষণ করতে হবে। শহরে ও গ্রামে-গঞ্জে প্রতিটি বাড়ির আঙিনায় নিমের চারা রোপণ করতে হবে। এতে একদিকে যেমন এই নিম গাছ বিভিন্ন রোগ নিরাময়ে সহায়ক হবে অন্যদিকে অ্যালোপ্যাথিক ঔষধের ওপর নির্ভরশীলতা কমে যাবে এবং বিদেশে রপ্তানি করে বৈদেশিক মুদ্রাও অর্জন করা যাবে। বাংলাদেশের বন বিভাগ ইতিমধ্যে ৯টি উপকূলীয় বন বিভাগের ১২টি জেলায় নিম গাছের চারা রোপণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছে এবং অন্যান্য বন বিভাগেও নিম গাছের চারা উত্তোলন ও রোপণ কর্মসূচি অব্যাহত রয়েছে।

ক্যান্সার ঠেকাতে সীতাকে মাশরুম

নিম গাছের মতো অন্য একটি উদ্ভিদের গুণাবলীর কথা উল্লেখ করা যেতে পারে তা হল মাশরুম। আমাদের দেশে জনপ্রিয় না হলেও বিদেশে অত্যন্ত জনপ্রিয় সবৃজি। মাশরুম অন্যান্য দেশে উন্নত মানের হোটেল রেস্তোরাঁতে সবজি (Vegetable) হিসেবে এবং স্যুপে সর্বত্রই পরিবেশিত হচ্ছে। মাশরুমের একটি প্রজাতি "সীতাকে মাশরুম" হিসেবে সুপরিচিত। এর উদ্ভিদ তাত্ত্বিক (Botanical) নাম *Lentinus edodes (Berk) Sing.* সীতাকে নামটি জাপানি ভাষা থেকে এসেছে। জাপান, চীন, কোরিয়াসহ পূর্ব ইউরোপীয় দেশসমূহে এর উৎপাদন খাদ্য উপকরণ হিসেবে জনপ্রিয়। এক চায়নিজ ডাক্তার অভিমত প্রকাশ করেছেন যে "সীতাকে মাশরুম" কর্মশক্তি বৃদ্ধি করে, বিবিধ ঠাণ্ডাজনিত রোগ নিবারণ করে, রক্ত চলাচল বৃদ্ধি করে ও নিয়ন্ত্রণ করে। বহুবিধ রাসায়নিক পরীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে যে, সীতাকে মাশরুমে ভিটামিন ডি, ক্যান্সার এবং টিউমার প্রতিরোধী প্রোটিন লেনটিন্যান

www.nagorikpathagar.org

রয়েছে, যা ক্যান্সার বা টিউমার কোষকে ধীরে ধীরে মেরে ফেলে। সীতাকে মাশরুমে রয়েছে কোলেস্টরল নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রয়োজনীয় জৈব রাসায়নিক উপাদান। সীতাকে মাশরুমের চাষের জন্য প্রয়োজন কাঠের। জাপানে এক মিটার সাইজের কাঠের গুঁড়িতে ছিদ্র করে সীতাকে মাশরুমের স্পন ঢুকিয়ে দিয়ে বায়ু নিষ্কাশনযোগ্য ইনকিউবেশন রুমে রেখে দেয়া হয়। সম্প্রতি চীন থেকে সীতাকে মাশরুম এনে বাংলাদেশের সাভারে চাষ করার প্রচেষ্টা চলছে। এ ধরনের প্রজাতির চাষ বৃদ্ধি করে দেশে ও বিদেশে এর বাজার সৃষ্টি করে দেশের দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য কর্মসংস্থান এবং বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনসহ দেশের জাতীয় আয় বৃদ্ধি করার উদ্যোগ নেয়া যেতে পারে।

সাজনা ঃ জাদুকরী গাছ (Miracle Tree)

একটি পুরনো প্রবাদ "এই গাছ ৩০০ রোগ প্রতিরোধক"।

সাজনা পাতায় শর্করা ও চর্বি অত্যন্ত কম, অথচ ভিটামিন, মিনারেল ও লৌহ প্রচুর পরিমাণ বিদ্যমান। সাজনা খাদ্য হিসেবে অত্যন্ত পুষ্টিকর ও রোগ প্রতিরোধ শক্তি বাড়ায়। এ গাছের প্রত্যেকটি অংশই প্রয়োজনীয়।

শরীরের প্রতিদিনের চাহিদায় ১ টেবিল চামচ পাতার গুঁড়ায় (ছায়ায় শুকানো) ১৪% প্রোটিন, ৪০% ক্যালসিয়াম, ২৩% লৌহ এবং সব ধরনের ভিটামিন প্রচুর পরিমাণে থাকে।

পাতা ঃ পুষ্টি ও ঔষধি কাজে ব্যবহৃত হয়।

ডাঁটা ঃ পুষ্টি ও ঔষধি কাজে ব্যবহৃত হয়।

ফুল ঃ ঔষধ।

বীজ ঃ পানি পরিশোধন, ঔষধ, ভোজ্য তেল, প্রসাধন সামগ্রী ও লুব্রিকেন্ট হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

ছাল ঃ ঔষধ।

শিকড় ঃ ঔষধ।

আঠা ঃ ঔষধ।

প্রকৃতির ঔষধ ঃ সমগ্র পৃথিবীতেই এখন সাজনা প্রকৃতির ঔষধ হিসেবে কাজ করে।

পাতা ঃ ১। পাতার পেস্ট ঘষলে মাথা ব্যথার উপশম হয়।

২। অল্প কাটাছেঁড়ায় পাতার পুল্টিস লাগান।

৩। পোকামাকড়ের কামড় ও ক্ষতে লাগালে ভাল ফল পাওয়া যায়।

৪। পাতার রস ব্যাকটেরিয়া ও ছত্রাক আক্রান্ত ত্বকে লাগানো যায়।

৫। শুকনো পাতার চা গ্যাস্ট্রিক আলসার ও ডায়রিয়া রোধে সাহায্য করে।

৬। উচ্চ রক্তচাপ কমানোর জন্য ৫০ গ্রাম পাতা ও একটা পেঁয়াজবাটা সরিষার তেলে ভেজে প্রতিদিন ১ বার করে এইভাবে সাতদিন খেতে হবে। অথবা শুধু পাতা সরিষার তেলে ভেজে খেতে হবে ভালো না হওয়া পর্যন্ত।

৭। সাজনা যে কোনোভাবেই খান না কেন অপুষ্টি দূর করে প্রয়োজনীয় প্রোটিন ও আঁশ শরীরে সরবরাহ করে।

ফুল ঃ ফুলের রস মায়ের বুকের দুধ বাড়ায়। ফুলের রস মূত্রনালীর সমস্যা দূর করে।

ডাঁটা ঃ যকৃত, প্লীহা ভালো রাখে এবং বাতরোগ দূর করে। শরীরে প্রোটিনের মাত্রা বাড়ায়, ডায়রিয়া রোধ করে।

বিছার কামড় ঃ ছাল বেটে আক্রান্ত স্থানে লাগালে ব্যথা কমবে।

মচকানো ঃ ছাল বেটে পেস্ট তৈরি করুন। এই পেস্ট লাগিয়ে পাতলা পরিষ্কার কাপড়ের সাহায্যে ব্যান্ডেজ (হালকাভাবে) করুন অথবা পাতার রস চামচে করে গরম করুন এরপর হালকাভাবে ব্যথার জায়গায় মালিশ করুন দিনে ২ বার, এই ভাবে তিনদিন।

www.nagorikpathagar.org

দাঁতের ব্যথায় : সাজনা গাছের ছাল পানিতে সিদ্ধ করে ছেঁকে নিন। হালকা গরমে এই পানি দিয়ে কুলকুচা করুন ভালো না হওয়া পর্যন্ত।

অন্যান্য ব্যবহার :

* সাজনা পাতার রস ফসলি জমিতে স্প্রে করলে ফসলের উৎপাদন ২৫-৩০ শতাংশ বাড়ে।
* ছোট অবস্থায় ৪০ দিন বয়সী সাজনা গাছ মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিলে মাটির উর্বরা শক্তি বাড়ে।
* গবাদি পশু যেমন - গরুর দুধ উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য সাজনা পাতা অবিশ্বাস্যভাবে কাজ করে।
* সাধারণ খাদ্যে অভ্যস্ত গাভী যদি প্রতিদিন ৭ লিটার করে দুধ দেয়, সাজনা পাতা খাওয়ালে এর পরিমাণ হবে ১০ লিটার।

উৎস : প্রথম আলো ৫ জুন, ২০০৫।
BON AMI FOUNDATION, http://www.moringaoleifera.org/

জাতীয় ফল কাঁঠাল

কাঁঠালের তেমন সুনির্দিষ্ট জাত নেই। আমাদের দেশে কাঁঠালের বীজ থেকে বংশ বিস্তার করা হয় বলে অহরহ নতুন নতুন জাতের উদ্ভব হচ্ছে। ফলের গুণাগুণের ওপর ভিত্তি করে এ দেশের কাঁঠালগুলো দু'ভাগে ভাগ করা যায়।

চিত্র ২.২ : কাঁঠাল পুষ্টি সরবরাহে ও দারিদ্র্য বিমোচনে

খাজা : এ জাতের কাঁঠালের কাঁটাগুলো পাকা অবস্থায় অনেকটা মসৃণ হয় এবং কাঁঠালের গায়ের রং সবুজ থাকে। কোষ বড় আকৃতির এবং বীজ ছোট থাকে। তবে মিষ্টি কম এ কাঁঠাল গাছে পাকে না। দেরি করে গাছ থেকে কাটা হলে বীজ কোষের ভেতর গজায় এবং গজানো বীজের মান খাদ্য ও বংশবৃদ্ধিতে খারাপ হয়। খাজা জাতের কাঁঠাল পাকলেও কোষগুলো শক্ত থাকে। তবু এ জাতের কাঁঠাল মানুষ বেশি পছন্দ করে। এ জাতের কাঁঠাল সাধারণত মৌসুমের শেষ দিকে পাকে।

গালা : এ জাতের কাঁঠালের গাত্র বন্ধুর, রং লাল আভাযুক্ত নানা বর্ণের হয়। কাঁঠাল পরিপক্ব হলেও কাঁটাগুলো মসৃণ হয় না। কোষ মাঝারি থেকে ক্ষুদ্র আকারের হয়। কোষে রস বেশি, আঁশগুলো শক্ত থাকে। এতে আঁশ থেকে রস আলাদা করা যায়। কোষে খাদ্য উপযোগী অংশের তুলনায় বীজ বড় থাকে। সাধারণত কাঁঠালের ভেতর বীজ গজায় না। কোষ থেকে বীজ বের করার ৫-১০ দিনের মধ্যে লাগাতে হয়। অন্যথায় বীজের অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যেতে পারে। এ দু'জাতের কাঁঠাল ছাড়াও বেশকিছু কাঁঠাল গাছ পাওয়া যায় যাতে সারা বছরই কাঁঠাল হয় তবে ফলন কম। দেখা যায় একই গাছের বীজ থেকে বিভিন্ন স্বাদের

www.nagorikpathagar.org

বিভিন্ন আকারের বা গন্ধের কাঁঠাল হয়ে থাকে। বিভিন্ন প্রকৃতির হওয়ার জন্য পরাগায়নকেই দায়ী করা হয়। জাভা থেকে রুদ্রাক্ষী ও সিংহল থেকে সিঙ্গাপুরী কাঁঠাল অনেক পূর্বেই ভারতে চাষ হচ্ছে এবং ভারত থেকে ইতিপূর্বে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে এসেছে ও চাষ হচ্ছে। রুদ্রাক্ষী কাঁঠালের আকার গোলাকার, গায়ে কাঁটা কম প্রায় মসৃণ, স্বাদে তত মিষ্টি নয়। সিঙ্গাপুর থেকে আনা 'সিঙ্গাপুরী' জাতটি খুবই ভাল। গাছ লাগানোর আড়াই বছরের মধ্যেই গাছে ফল আসে। আকার আয়তন বাংলাদেশের কাঁঠালের মতোই। এ জাতের কাঁঠাল সেপ্টেম্বর-ডিসেম্বর মাসেও দেখতে পাওয়া যায়। এছাড়া ফলের সংখ্যা, আকার, স্বাদ, গন্ধ ইত্যাদি গুণের ওপর ভিত্তি করেও কাঁঠালের শ্রেণীবিন্যাস করা যেতে পারে। বাংলাদেশে বাছাই করে কাঁঠালের জাতের উন্নয়নের প্রচুর সম্ভাবনা ও প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। কাঁঠালের কাঠ ও ফল দুই-ই আমাদের দারিদ্র্য মোচনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। বৃক্ষরোপণে ফলদ বৃক্ষ লাগানোর ওপর গুরুত্ব দিয়ে বেশি করে কাঁঠাল গাছ লাগানো যেতে পারে। তাছাড়া গাছের আরো উপকারী দিকগুলো সংক্ষেপে বলা যায়, গাছের পাতা জীবজন্তুর উপাদেয় খাদ্য। ফলমূল পুষ্টি সরবরাহ, শরীর গঠন ও গ্রামীণ দারিদ্র্য বিমোচনে সহায়তা করে। গাছের কাণ্ড দিয়ে জ্বালানি, কয়লা, আসবাবপত্র, ঘরবাড়ি তৈরির উপাদান, রেলওয়ে স্লিপার, ইলেকট্রিক পুল, সেতু তৈরি করা যায়। কাগজের মণ্ড, পেন্সিল, খেলনা, তক্তা ইত্যাদিও তৈরি করা হয়।

পরিবেশ সংরক্ষণে বৃক্ষ

পরিবেশের মৌলিক উপাদানগুলো হচ্ছে বায়ু, পানি, মাটি, বৃক্ষ, বনজ সম্পদ, প্রাণীকুল ইত্যাদি। আল্লাহ প্রাকৃতিক এ পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার জন্য প্রত্যেকটি সম্পদকে আনুপাতিক হারে সৃষ্টি করেছেন যা থাকলে মানুষ তথা উদ্ভিদ প্রাণীকুল স্বাভাবিক ও সুস্থ অবস্থায় বসবাস করতে পারে। মানুষের অপরিণামদর্শী কর্মকাণ্ডের ফলেই প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট হয়, ফলে প্রতিবেশের বিপর্যয় (Ecological disaster) ঘটে। পৃথিবীর সমগ্র বায়ুমণ্ডলের ৯৯% পদার্থ ধারণ করে আছে ভূ-পৃষ্ঠ থেকে ১৯ মাইল উচ্চতার মধ্যে। সমগ্র বায়ুমণ্ডলের পদার্থসমূহের ওজন ৫.৫০০ ট্রিলিয়ন টন। সমুদ্র ভূ-পৃষ্ঠের উপরিভাগে শুকনো বায়ুতে রয়েছে ৭৪% নাইট্রোজেন, ২১% অক্সিজেন, ১% আর্গন ও ০.০৩% কার্বন ডাইঅক্সাইড, বাকি ৩.০৭% রয়েছে নিয়ন, হিলিয়াম, মিথেন, কার্বন মনোক্সাইডসহ অন্যান্য পদার্থ। মানুষের অপরিণামদর্শী কর্মকাণ্ড ছাড়াও প্রাকৃতিক কারণে এসব পদার্থে অনুপাত কম বেশি হয়ে থাকে অথবা কোন প্রকার বিষাক্ত পদার্থের অনুপ্রবেশের ফলে বায়ুমণ্ডল দূষিত হয়ে যায় যা উদ্ভিদসহ মানুষ বা প্রাণীকুলের জীবন ধারণের এবং বেঁচে থাকার জন্য প্রতিকূল অবস্থার সৃষ্টি হয়।

সাম্প্রতিককালে পরিবেশ বিপন্নকারী অন্যতম উপাদানগুলো হচ্ছে গ্রিনহাউস গ্যাসসমূহ। সেগুলোর মধ্যে রয়েছে কার্বন ডাইঅক্সাইড, মিথেন, কার্বন মনোক্সাইড, নাইট্রাস ক্লোরো ক্লোরো কার্বন (CFC)। শীতপ্রধান দেশে কাচের ঘর করে ট্রপিক্যাল গাছপালা বাঁচিয়ে

www.nagorikpathagar.org

রাখার জন্য গ্রিনহাউস তৈরি করা হয়ে থাকে। এ গ্রিনহাউসের মতই মহাশূন্য পার হয়ে বায়ুমণ্ডলের ভিতর দিয়ে সূর্যের আলো ভূপৃষ্ঠকে উত্তপ্ত রাখে। এ উত্তাপ আবার বিকিরিত হয়ে মহাশূন্যে ফিরে যায়। প্রকৃতিতে মানবসৃষ্ট কারণে কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ বৃদ্ধি পেলে সে তাপ আর বের হতে পারে না। ফলে পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেতে থাকে। বিজ্ঞানীরা এ প্রক্রিয়ার নামকরণ করেছেন গ্রিনহাউস প্রতিক্রিয়া। কার্বন ডাইঅক্সাইডের হ্রাস ও বৃদ্ধির ফলে পৃথিবীর তাপমাত্রার পরিবর্তন ঘটে, আর জীবজগতের জীবন ও অস্তিত্বকে প্রভাবিত করে।

ওজোন স্তরও পৃথিবীর পরিবেশ ও জীবজগতের অস্তিত্বের জন্য অন্য একটি অপরিহার্য উপাদান। পৃথিবীর ২০-৩০ কিলোমিটার উঁচুতে এই ওজোন গ্যাস থাকে সবচেয়ে বেশি। এ গ্যাসের কাজ হলো সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মিকে শুষে নেয়া। এ গ্যাসের তীব্রতার ফলে চর্মরোগসহ প্রাণী জীবনে মারাত্মক বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারবে। তাছাড়া সূর্যের তীব্র বেগুনি রশ্মি বৃদ্ধির ফলে উদ্ভিদজগতেরও মারাত্মক ক্ষতি হয়ে থাকে। রাসায়নিক কারখানা, ফ্রিজ, এয়ারকন্ডিশন, প্রসাধনী, ফোমসহ বিভিন্ন কারখানা থেকে সিএফসি ও ব্রোমাইডের মতো ট্রেস গ্যাস নিঃসৃত হচ্ছে, আর মারাত্মকভাবে ওজোন স্তরের ক্ষতি করছে। ১৯৯৭ সালে জাপানের কিয়োটোতে গ্রিনহাউস গ্যাসসমূহের নির্গমনের জন্য যুক্তরাষ্ট্র, জাপান এবং ইইসিভুক্ত দেশসমূহ একটি প্রটোকল স্বাক্ষর করে। এ প্রটোকলে তারা ১৯৯০ সালের গ্যাস মাত্রা থেকে ইইসিভুক্ত দেশগুলো ৮%, যুক্তরাষ্ট্র ৭% এবং জাপান ৬% কমাতে সম্মত হয়েছে। আমাদের মতো অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশে উপরোক্ত বিষাক্ত গ্যাস সৃষ্টির পরিমাণ অতিসামান্য। এ ক্ষেত্রে বিশ্ব পরিবেশ ও নিজেদের পরিবেশকে নির্মল ও সুস্থ রাখার সবচেয়ে সহজ উপায় ছিল বনাঞ্চল সৃষ্টি করা। কারণ প্রতি হেক্টর বনভূমি প্রতি বছর ৩৫০০-৪০০০ কেজি কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস শোষণ করে, অন্যদিকে ১,৭০০ কেজি অক্সিজেন গ্যাস সরবরাহ করে। ভারতীয় এক গবেষণা থেকে দেখা যায় যে, ১ টন ওজনের আম গাছ ৫০ বৎসরে যে পরিমাণ কার্বন ডাইঅক্সাইড শোষণ ও অক্সিজেন সরবরাহ করে তা যান্ত্রিকভাবে তৈরি করলে বাংলাদেশী মুদ্রায় তার খরচ হবে প্রায় ২০ লক্ষ টাকা।

আমাদের ঢাকা শহরের শব্দ দূষণের বিষয় ভিন্নভাবে আলোচনা করা যেতে পারে। গাছপালা ৮৫% শব্দকে শোষণ করে নিয়ে আমাদের এর ভয়াবহ কুফল থেকে রক্ষা করে। বিভিন্ন গবেষণায় আরো দেখা যায় যে, মাত্র কয়েক হেক্টর ছোট আকারের বৃক্ষরাজিও তার পার্শ্ববর্তী এলাকায় ৩-৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা কমাতে সহায়তা করে। তাই সুন্দর সুস্থ ও মনোরম পরিবেশে সুস্থ জীবনযাপনের এ আন্দোলনকে গতিশীল করার জন্য সামাজিক মূল্যবোধ জাগিয়ে তোলার পাশাপাশি ধর্মীয় অনুভূতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

মানুষ অবিবেচকের মতো বৃক্ষ নিধন করে যাচ্ছে। আজকের অর্থোপার্জনের লোভ এবং যান্ত্রিক প্রয়োজন মেটানোই তার কাছে বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। এতে ভবিষ্যতের পৃথিবী এবং ভবিষ্যতের মানুষ হুমকির সম্মুখীন হয়ে পড়ছে। বৃক্ষের পক্ষে আজ বিশ্বব্যাপী

www.nagorikpathagar.org

আন্দোলন আরো জোরদার হওয়া প্রয়োজন। বৃক্ষ নিধনের ক্ষেত্রে যদিও আমাদের মতো শিল্পে অনুন্নত দেশের চেয়ে শিল্প উন্নত দেশই তাদের চাহিদা মেটাতে জল্লাদের ভূমিকা নিয়েছে, তবু বৃক্ষের অভাবের ক্ষতিগ্রস্ত হবে আমাদের মতো অনুন্নত দেশ।

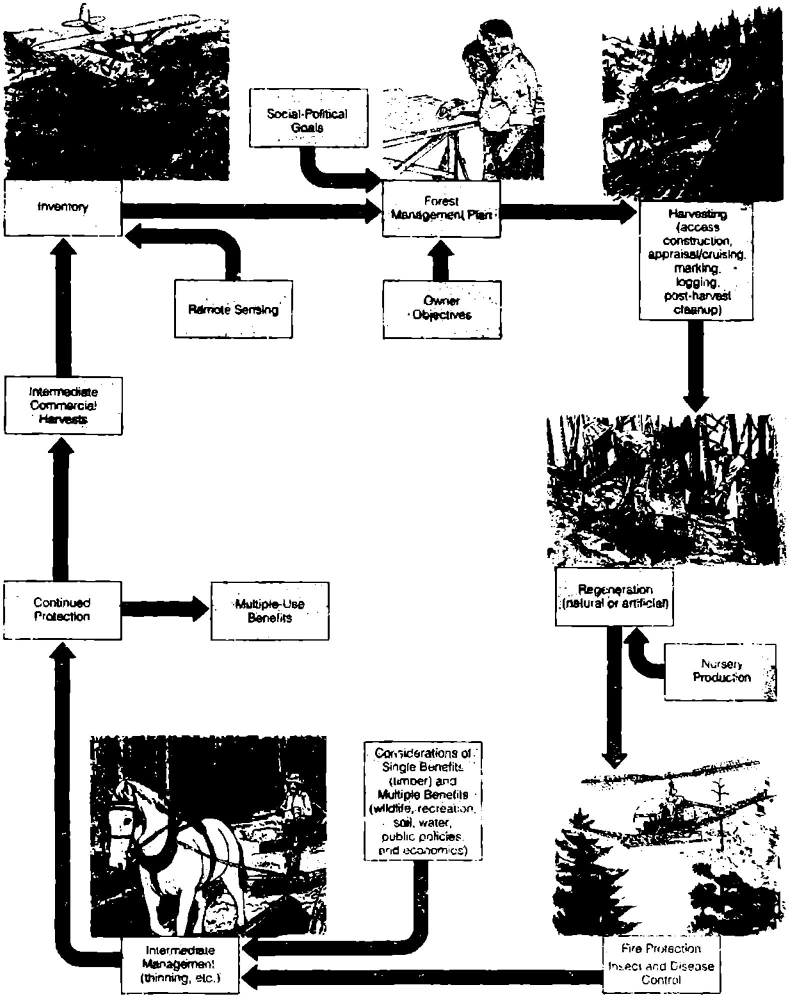

চিত্র ২.৩ : বন ব্যবস্থাপনা ও উৎপাদনশীলতা চক্র

উৎস : T. Miller, 1993

www.nagorikpathagar.org

প্রতি বছর পৃথিবী থেকে এক কোটি সত্তর লাখ হেক্টর জমির বৃক্ষ নিধন হচ্ছে। শুধু নিউ ইয়র্ক টাইমস পত্রিকার রোববার সংস্করণ প্রকাশ করতে ২৫ হেক্টর জমির বৃক্ষ নিধন করতে হয়। ১৯৮০ থেকে ১৯৯০ সালের মধ্যে এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে অরণ্য নিধনের পরিমাণ ১.২ শতাংশ। আজ থেকে একশ' বছর আগে বাংলাদেশে বৃক্ষের পরিমাণ ছিল এখনকার চেয়ে তিনগুণ বেশি। একটি দেশের পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য যে ন্যূনতম অরণ্যের প্রয়োজন আমাদের দেশে রয়েছে তার কয়েকগুণ কম। পৃথিবীর ৯৫ শতাংশ শুষ্ক ও উর্বর জমি মরুভূমিতে পরিণত হচ্ছে। বৃক্ষনিধন ও জমির অপব্যবহারের ফলে পৃথিবীর উপরের যে মাটির স্তর আছে তা অবিশ্বাস্য হারে অবক্ষয় হচ্ছে। এ মাটির স্তর তৈরি করতে পৃথিবীর লেগেছিল হাজার হাজার বছর, কিন্তু অরণ্য ধ্বংস হলে তা ক'বছরের মধ্যে অবক্ষয় হয়ে ভরে যাবে নদী, সমুদ্র। ফলে সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বেড়ে যাবে, নদীর গভীরতা কমে যাবে। দেখা দেবে ভয়াবহ বন্যা। এভাবে বৃক্ষ নিধন চলতে থাকলে, পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেলে সমুদ্রের পানি স্থলভাগ দখল করে নেবে। বলা হচ্ছে, দু'হাজার তিরিশ সাল নাগাদ বাংলাদেশের স্থলভাগের ৩০ শতাংশ সমুদ্রগর্ভে বিলীন হয়ে যাবে। আমরা রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ কর্মকর্তাদের ভাষণে-বক্তব্যে অহরহ শুনছি একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার কথা। কিন্তু সেই চ্যালেঞ্জের মধ্যে এই ভয়াবহ অশনি সংকেত আছে বলে শুনিনি (যুগান্তর, ৫ মে ২০০০)।

জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে বৃক্ষ

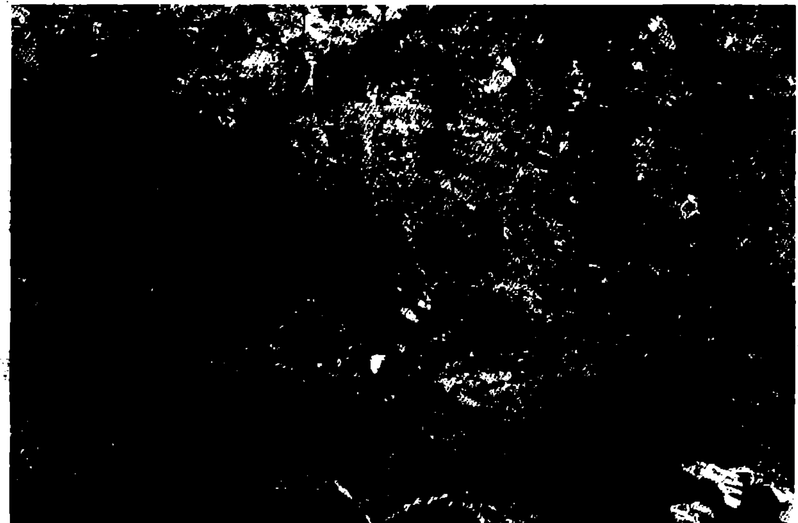

চিত্র ২.৪ : বৃক্ষ ও উদ্ভিদ জীববৈচিত্র্য
উৎস : T. Miller, 1993

www.nagorikpathagar.org

প্রাণের জন্য প্রয়োজন বৈচিত্র্য, যা প্রাণের সুষম বিকাশে সাহায্য করে। একটি অন্যটিকে ঘিরে পরস্পরের সাহায্য নেয়। একে অন্যকে ধরে থাকে এবং বিকশিত হয়। গাছপালা, লতাগুল্ম পরস্পর নির্ভরশীল। পরিবেশের প্রতিকূলতা মোকাবেলা করার জন্যও এরা একে অপরকে সাহায্য করে। বন্যপ্রাণী ও অন্যান্য অগণিত পশুপাখিসহ অসংখ্য প্রাণিজ ও উদ্ভিদ বৈচিত্র্য বনাঞ্চলে সংরক্ষিত থাকে। বিভিন্ন বৃক্ষলতা, অর্কিড, পোকামাকড় ইত্যাদিসহ অনেক জীববৈচিত্র্যের স্থায়ী অতিথিশালা হিসেবে ব্যবহৃত হয়। পৃথিবীতে ব্যবহৃত ঔষধের বিরাট অংশের উপাদান হচ্ছে বিভিন্ন প্রজাতির গাছ ও গুল্মলতা। অনেক বৃক্ষলতা প্রাকৃতিক সার ও কীটনাশক হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে। বনাঞ্চলের অভাবে বন্যপ্রাণী বিলুপ্ত হয়ে যায়। বন্যপ্রাণীর আবাসস্থল একমাত্র বনাঞ্চলেই হতে পারে। অমূল্য পাখিকুলকে প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য বন সম্পদ সংরক্ষণের কোন বিকল্প নেই। উপরোক্ত সুবিধাদি অর্জনের জন্য বিরাট অংকের অর্থব্যয়ে এত ব্যাপক আয়োজন সত্ত্বেও প্রত্যাশিত সুফল অর্জন না হওয়ার প্রধান কারণগুলো নিম্নরূপ ঃ

(ক) বৃক্ষরোপণে প্রয়োজনীয় জ্ঞানের অভাব যেমন গাছের প্রজাতি নির্বাচন, মাটির (Soil) গুণাবলী সম্বন্ধে সম্যক প্রায়োগিক ধারণা।

(খ) গাছের পরিচর্যা বিষয়ক জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা যেমন সময়মত প্রয়োজনীয় পানি, সারের ব্যবহার, প্রুনিং ও থিনিং (Thining) করা।

(গ) বৃক্ষসম্পদ সংরক্ষণ (Protection) করা যেমন বিনা প্রয়োজনে অথবা খেলার ছলে গাছ নষ্ট না করা। তাছাড়া সাধারণ মানুষের সামগ্রিক Silvicultural treatment এরও জ্ঞানের অভাব রয়েছে।

বন সম্পদ ও জ্বালানি শক্তি

চিত্র ২.৫ : বৃক্ষ গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর একমাত্র জ্বালানি উৎস

উৎস ঃ T. Miller, 1993

www.nagorikpathagar.org

বাংলাদেশের সনাতন জ্বালানির চাহিদা সরবরাহের চিত্র পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, প্রায় ৭৪ শতাংশ আসে কাঠ ও অন্যান্য উদ্ভিদজাত (Bio-mass) উৎস থেকে। বাকি ২৬ শতাংশ আসে তেল, গ্যাস ও বিদ্যুৎ থেকে। শুধু বৃক্ষ ও অন্যান্য বৃক্ষাবশেষ থেকে পাওয়া যায় মোট জাতীয় জ্বালানির প্রায় ১৬ শতাংশ।

ফরেস্ট মাস্টার প্ল্যানের হিসাব অনুযায়ী ১৯৯৩ সালে জ্বালানি কাঠের ঘাটতি ছিল মোট সরবরাহের ৩৪ ভাগ। ২০০৮ সালে এ ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়ায় ৪৬ শতাংশে। ২০১৩ সালে এ ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়াবে ৪১ শতাংশ। এক্ষেত্রে ধারণা করা হয়েছে, সরকারের বিভিন্ন গৃহীত কর্মসূচি সফল হবে। জনসংখ্যা বৃদ্ধি সীমিত থাকবে এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড আরো সম্প্রসারিত হবে (বিল্লাহ, ২০০৩)।

চাহিদা ও সরবরাহের মধ্যে ভারসাম্যহীনতার ফলে জ্বালানি কাঠের মূল্য উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ সমস্যা বৃদ্ধি পেতে থাকলে ব্যাহত হবে দারিদ্র্য বিমোচন ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন। তাই কাঠের বিকল্প ব্যবহারের মাধ্যমে পরিস্থিতির উন্নতি করতে হবে। এক্ষেত্রে বায়োগ্যাসের ব্যবহার অন্যতম। এছাড়া সৌরশক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদনের মাধ্যমে কাঠের যথা উদ্ভিদজাত উৎস (Bio-mass) এর ওপর চাপ কমানো যায়।

বৃক্ষ আল্লাহর তসবিহ্ পাঠ করে

সমগ্র জগতের স্রষ্টা ও প্রতিপালক আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন কোন কিছুকেই বৃথা সৃষ্টি করেননি। জগতের সব সৃষ্টিই আল্লাহর উদ্দেশ্য সাধনে সৃষ্টি হয়েছে। প্রত্যেক সৃষ্ট বস্তু বা বিষয়ের মধ্যেও আল্লাহ্ অভ্যন্তরীণ সম্পর্ক নির্ধারণ করেছেন। আল্লাহ্ বলেছেন, আমি পৃথিবীতে সবকিছুরই সঠিক ও সামঞ্জস্যপূর্ণ বিকাশ ঘটিয়েছি। (সূরাঃ জিহর আঃ ১৯)। আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে বৃক্ষ এক অনন্য সৃষ্টি। এর রয়েছে বহুমুখী গুরুত্ব বা তাৎপর্য। এখানে উল্লেখ্য যে, আল্লাহ মানুষকে তার সৃষ্টির মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা প্রদান করেছেন। আর জগৎ সংসারের সবকিছুই তিনি কোন না কোনভাবে মানুষের কল্যাণের জন্যই সৃষ্টি করেছেন। যেমন আল্লাহ্ বলেছেন, ... 'যিনি সুষম বিকাশ সাধন করেন ও পথনির্দেশ করেন এবং যিনি তৃণাদি উৎপন্ন করেন।' (মুঃ আলা, আঃ ৩-৪)। এ আয়াতে আল্লাহ্ প্রকৃতির ভারসাম্যের কথা উল্লেখ করেছেন।

এই ভারসাম্য টেকসই উন্নয়নের জন্য অত্যন্ত আবশ্যক। আমরা জানি মানুষ ও বৃক্ষের মধ্যেও বিদ্যমান রয়েছে এক গভীর সম্পর্ক ও পারস্পরিক নির্ভরশীলতা। বিশেষ করে মানুষ ও উদ্ভিদের পরস্পরের দেহপোযোগী সামগ্রীর জন্য একে অন্যের ওপর নির্ভরশীল। মানুষ কার্বন ডাইঅক্সাইড ত্যাগ করে (শ্বাস-প্রশ্বাসের সময়) এবং অক্সিজেন গ্রহণ করে। অন্যদিকে, উদ্ভিদ অক্সিজেন ত্যাগ করে এবং কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্রহণ করে। উদ্ভিদ ও পরিবেশ বিজ্ঞানীরা উদ্ভিদ নিধনকে অত্যন্ত ক্ষতিকর বলে তুলে ধরেন এবং বৃক্ষরোপণের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেন। পবিত্র কোরআনের উপরোক্ত উক্তিতে আমরা এই ভারসাম্যের দিক-নির্দেশনাই লাভ করি। আল্লাহ্ আরও বলেছেন, 'সূর্য ও চন্দ্র আবর্তন করে নির্ধারিত

www.nagorikpathagar.org

কক্ষপথে, তৃণলতা ও বৃক্ষরাজি মেনে চলে তারই বিধান। তিনি আকাশকে করেছেন সমুন্নত এবং স্থাপন করেছেন ভারসাম্য।' (সূরা আর রাহমান, আঃ ৫-৭)। বৃক্ষরাজি ও উদ্ভিদ আল্লাহর সৃষ্টির বৈচিত্র্য প্রকাশক। আল্লাহ সুনিপুণ স্রষ্টা, তিনি সৃষ্টি করেছেন বৈচিত্র্যময় উদ্ভিদ। আল্লাহ বলেছেন, 'আমি প্রচুর বারি বর্ষণ করি, অতঃপর আমি ভূমিকে প্রকৃষ্টরূপে বিদারিত করি এবং উহাতে উৎপন্ন করি শস্য, শাক-সবজি, জয়তুন, খেজুর এবং বহু বৃক্ষবিশিষ্ট উদ্যান।' (সূরাঃ আবাসা, আঃ ২৫-৩০)। আল্লাহর কী নৈপুণ্য! একই মাটি একই পানিতেই আমরা ভিন্ন ভিন্ন ফুল ও উদ্ভিদ জন্মাতে দেখি যাতে ভিন্ন ভিন্ন ফুল ও ফল ধরে। এ সবই মানুষের কল্যাণের জন্য। আল্লাহর কোন সৃষ্টিকেই অমর্যাদা করা উচিত নয়। তবে প্রয়োজন হল তাকে যথার্থভাবে কাজে লাগানো। বৃক্ষরাজির পরিকল্পিত উৎপাদন ও ব্যবহারের ওপরই মানুষের বহু কল্যাণ ও উপকার নিহিত রয়েছে। তাই ইসলাম বৃক্ষরোপণে উৎসাহিত করে। নবী করীম হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) বৃক্ষরোপণের প্রতি অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করেছেন। হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) বলেছেন, যদি জানো আগামীকাল কিয়ামত, তথাপিও আজ যদি হাতে কোন বীজ বা চারাগাছ থাকে, তা বপন কর। পরিবেশের স্বাভাবিক প্রয়োজন এবং সভ্যতার বিকাশের জন্য বৃক্ষরোপণ অত্যন্ত জরুরি। রাসূল (সাঃ) মক্কা বিজয়ের পর তাই নির্দেশ দিয়েছিলেন, নারীদের নির্যাতন কর না এবং বৃক্ষরোপণ কর। রাসূল (সাঃ) নিজে বৃক্ষরোপণ করে মানুষকে বৃক্ষরোপণে উৎসাহিত করে তুলেছেন। বৃক্ষরোপণকে তিনি ইবাদতের সঙ্গেও একাত্ম করে দেখেছেন। তিনি বলেছেন, প্রতিটি বৃক্ষ এবং তার অসংখ্য পাতা প্রতিনিয়ত আল্লাহর তসবিহ পাঠ করে, অতএব বেশি নেকি হাসিল করার জন্য বেশি করে বৃক্ষরোপণ কর। বস্তুত জগতের সব সৃষ্টিই আল্লাহর নিয়ম মেনে চলে এবং তাঁর মহিমা কীর্তন করে। এসবের মধ্য থেকে আল্লাহ মানুষকে এক ধরনের শিক্ষাও দিতে চেয়েছেন। আল্লাহ এসবের উদাহরণ দিয়ে পবিত্র কোরআনে বলেছেন যে, মানুষ কি তার আদেশ মানবে না? আল্লাহর সৃষ্ট বৃক্ষরাজি আল্লাহর নিয়ম মেনে চলে এবং আল্লাহর তসবিহ পাঠের অংশীদার হওয়া যায়। উপরোক্ত হাদিসে রাসূলে করীম (সাঃ) সে ইঙ্গিতই প্রদান করেছেন।

মানুষের জীবন-জীবিকার জন্য বৃক্ষ অতীব গুরুত্বপূর্ণ। বৈষয়িক প্রয়োজনেও তাই বৃক্ষরোপণ করা একান্ত দরকার। যে কোন ফল ও ফসল উৎপন্ন হলেই তা মানুষের জন্য কল্যাণ বয়ে আনে। এমনকি ওই ফল বা ফসল যদি উৎপাদনকারী বা প্রকৃত মালিক না-ও পায়, কেউ যদি চুরি করে নিয়ে যায় তাতেও সমাজের কারও না কারও প্রয়োজন পূর্ণ হয়। অর্থাৎ ওই ফল বা ফসল সর্বাবস্থায়ই অর্থনৈতিকভাবে মূল্যবান। ইসলাম এ বিষয়ে মানুষকে সান্ত্বনা প্রদান করেছে। নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, 'যদি কোন মুসলিম কোন ফলের গাছ লাগায় বা বাগিচা করে অথবা ক্ষেতে কোন শস্যের বীজ বপন করে, তা থেকে কোন মানুষ বা পশুপাখি যদি খায়, এমনকি যদি চোরেও চুরি করে নিয়ে যায় তবে ওই বৃক্ষের মালিক, বাগিচাওয়ালা বা ক্ষেতওয়ালা সদকার সওয়াব পাবে।' মোট কথা বিনা প্রয়োজনে বৃক্ষ কর্তন বা নিধনের

www.nagorikpathagar.org

জন্য জবাবদিহি করতে হবে। পক্ষান্তরে বৃক্ষরোপণ করে অধিক সদকায়ে জারিয়ার সোয়াব অর্জন করা যেতে পারে। তাই বৃক্ষরোপণের প্রতিটি সমস্যার বিষয়ে বিশদ বিশ্লেষণ ও আলোচনার সুযোগ রয়েছে।

বৃক্ষ ও জীবন

আল্লাহ এ পৃথিবীকে অত্যন্ত সুপরিকল্পিতভাবে তাঁর অসংখ্য মাখলুকাতের জন্য বাসোপযোগী করে সৃষ্টি করেছেন। একমাত্র মানব জাতিকেই 'আশরাফুল মাখলুকাত' হিসেবে গণ্য করে বাকি সব সৃষ্টি জীবকে মানব সেবায় ও মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। পৃথিবীতে এমন কোন জিনিস বাকি রাখেননি যা মানুষের কোন না কোন প্রয়োজনে লাগেনি। মানুষের জন্য এমনই একটি অত্যাবশ্যকীয় বিষয় হল বৃক্ষরাজি– যা আমাদের পরিবেশের গুরুত্বপূর্ণ একটি উপাদান। আমাদের চারপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা অসংখ্য উপাদান নিয়ে আমাদের পরিবেশ গঠিত।

পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় বৃক্ষের ভূমিকা অপরিসীম। তাই তো প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহর সৃষ্ট উদ্ভিদ, প্রাণী এবং অন্য সব প্রাকৃতিক উপাদানের প্রতি সদয় দৃষ্টি রাখতেন, অন্যদেরও সেভাবে আচরণ করার পরামর্শ দিতেন। মুহাম্মদ (সা.) অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে পড়তেন যখন তিনি দেখতেন যে, খরায় উদ্ভিদ শুকিয়ে যাচ্ছে, প্রাণিকুল তৃষ্ণায় কাতর হচ্ছে– আর এর জন্য তখন তিনি আল্লাহর কাছে পানি ও বৃষ্টি প্রার্থনা করতেন। এ প্রসঙ্গে হজরত আব্বাস (রা.)-এর বক্তব্য স্মরণযোগ্য। তিনি বলেন, 'মহানবী (সা.) সবুজ বৃক্ষ রোপণ করতে পছন্দ করতেন এবং বহমান জলধারা অবলোকন করতেন।' শুধু তাই নয়, গাছ লাগিয়ে সৃষ্টির সেবা করার জন্য মহানবী (সা.) তাঁর অনুসারীদের সব সময়ই অনুপ্রাণিত করতেন। তিনি বৃক্ষরোপণকে ইবাদত হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন এবং একে সদকায়ে জারিয়া হিসেবে চিহ্নিত করেছেন (বুখারি ও মুসলিম)। এছাড়াও মহানবী (সা.) যেমন বৃক্ষরোপণের প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন তেমনি তা সংরক্ষণের প্রতিও সমভাবে গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি যুদ্ধাবস্থায়ও বৃক্ষনিধন এবং ফসল বিনষ্ট করতে কড়াকড়িভাবে নিষেধ করতেন। এক ব্যক্তি একদা গাছের একটি পাতা ছিঁড়েছিলেন। তা দেখে রাসূল (সা.) বললেন, 'প্রত্যেকটি পাতা আল্লাহর মহিমা ঘোষণা করে।' এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন, 'এবং তৃণলতা ও বৃক্ষরাজি সেজদারত আছে।' (আর রাহমান : ৬)।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, গাছ মানুষের পরম বন্ধু। গাছ সৃষ্টির এক অনুপম সৌন্দর্য। বস্তুত তরুলতার সৌন্দর্য আল্লাহ নিজে কুদরতের হাতে গড়েছেন। সবুজ গাছপালা আমাদের জীবন ও জীবিকা। আল্লাহতায়ালা প্রতিটি বৃক্ষ, লতা-পাতা, ফল ও ফুলকে যে বিশেষ কাজ এবং মানুষের উপকারের জন্য সৃষ্টি করেছেন, তারা অনবরত সে কাজ করে যাচ্ছে এবং নিজ নিজ কর্তব্য পালন করে মানুষের উপকার সাধন করে যাচ্ছে। কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয়, মানুষ আজ নির্বিচারে বৃক্ষনিধনে মেতে ওঠায় বিশ্বের উষ্ণতা দিন দিন বাড়ছে এবং পরিবেশ তার ভারসাম্য হারাচ্ছে। একটার পর একটা প্রাকৃতিক

www.nagorikpathagar.org

দুর্যোগ লেগেই আছে। অতএব, আমাদের নিজেদের প্রয়োজনেই বৃক্ষনিধনের পরিবর্তে ব্যাপক বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি গ্রহণ করা দরকার। তাই প্রত্যেক সচেতন নাগরিকের উচিত আল্লাহর এ অশেষ অনুগ্রহকে হেলায় উপেক্ষা না করে প্রত্যেকের সাধ্যানুযায়ী বৃক্ষরোপণ ও পরিচর্যা করা। তাহলেই ইসলামের দাবি অনুযায়ী মানব জাতিকে নির্মল, সুন্দর, উপভোগ্য ও দূষণমুক্ত ভারসাম্যপূর্ণ পরিবেশ উপহার দেয়া সম্ভব।

বৃক্ষ জীবন, সাহিত্য এবং এ দেশের সংস্কৃতি

মানুষের জীবনের সব কর্মকাণ্ডের এবং অনুভূতির প্রতিফলন ঘটে সাহিত্যে, যা চিরন্তন ও অকৃত্রিম। বৃক্ষ ও অরণ্যের সঙ্গে আদি মানুষের মিলন অতি আদিকালের। প্রাচীন সাহিত্যের প্রায় সর্বত্রই এর ছোঁয়া রয়েছে। এ বিষয়ে মজিদ মাহমুদের "বৃক্ষ জীবন ও কবিতা" প্রবন্ধটিতে বৃক্ষ ও সাহিত্য সম্বন্ধে নিখুঁত চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। তাঁর প্রবন্ধে তিনি বলেন, উদ্ভিদকে কেন্দ্র করেই মানুষের জীবন আবর্তিত। মানুষ পৃথিবীতে আসার আগেই উদ্ভিদ এই ধরণীকে মানুষের বাসযোগ্য করে গড়ে তুলেছিল। মায়ের মতো উদ্ভিদ বসুধার বুকে জমা করেছিল স্তন্য। মানুষ উদ্ভিদের স্তন্যে লালিত, মানুষকে তাই উদ্ভিদপায়ী প্রাণী বলা যায়। পৃথিবীতে মানুষ আসার আগেই উদ্ভিদ মানুষের শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য বাতাস তৈরি করেছিল। প্রতিটি পল্লবকে অম্লজান তৈরির কারখানায় রূপান্তর করেছিল। মানুষের নিঃশ্বাসে নিঃসৃত কার্বনকে শুষে নেয়ার ব্যবস্থা করেছিল। উদ্ভিদ ছাড়া পৃথিবীতে জীবনের কোন অস্তিত্ব নেই। উদ্ভিদকে সংহার করেই আমরা জীবনধারণ করি। একার্থে উদ্ভিদই আমাদের জীবনদান করে।

সৃষ্টির রহস্যেই নন্দন উদ্যানের বৃক্ষই মানুষকে প্রথমে পৃথিবীতে জীবনের পথে আহবান করেছিল। তাকে জ্ঞান দান করেছিল। দিয়েছিল সৃষ্টি এবং প্রজননের ধারণা। তাই গন্ধম ভক্ষণের অপরাধে তাকে স্বর্গ ত্যাগ করতে হয়েছিল। কিন্তু বৃক্ষ মানুষকে ত্যাগ করেনি। এই গ্রহে প্রাণী জগতে হয়তো বহু বিবর্তন ঘটেছে কিন্তু বৃক্ষহীন পৃথিবীতে প্রাণের অস্তিত্ব কখনও ছিল বলে মনে হয় না।

সভ্যতার ক্রমবিকাশে পৃথিবীতে মানুষের অভিযাত্রার সবচেয়ে বড় পর্যায় শিকার যুগ থেকে কৃষি যুগে প্রবেশ করা। কৃষি যুগ মানে বৃক্ষ যুগ। অনন্ত সম্ভাবনার যে যুগের কখনও অবসান হবে না। মানুষ ব্যাধের পোশাক ছেড়ে যখন থেকে কৃষকের পোশাক পরেছে তখন থেকেই মানুষ মূলত অস্তিত্বের শঙ্কামুক্ত হয়েছে। উদ্ভিদ আমাদের এভাবে পরিবেষ্টন করে আছে যে, আমরা কখনও এর আলাদা অস্তিত্ব অনুভব করতে পারি না। বৃক্ষ জীবনের এক অমিত সম্ভাবনার নাম। প্রাণীর ত্বকের নিচে মূলত একটিই প্রাণী। তাকে হত্যা করলে ওখানেই তার চূড়ান্ত অবসান। কিন্তু একটি গাছ কাটার পর তার শিকড় থেকেও আরেকটি গাছ জন্মলাভ করে এবং মানুষ যখন কৃষি সংস্কৃতিতে প্রবেশ করেছে তখন থেকে তার মরণের বোধও কমে গেছে। মানুষ তখন থেকে বোধ করতে শুরু করেছে মানুষ ঠিক কোন একক মানুষ নয়, মানুষ জীবন বৃক্ষের এক একটি শাখা, মরণের মধ্য দিয়ে যার সম্পূর্ণ অবসান হয় না। যিশু যখন

www.nagorikpathagar.org

বলেন, 'আমি আঙ্গুর কুঞ্জ, তোমরা তার লতা' তখন আমরা বুঝতে পারি জীবনের পারস্পরিক সম্পর্কের প্রতি গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে। কৃষি সংস্কৃতি মানুষকে স্মরণ করে দিয়েছে, মানুষও মাটির উদর থেকে উৎপন্ন। পৃথিবী আমাদের মা, আমরা এই ধরিত্রী মাতার সন্তান। এই মাটির নির্যাস থেকে যেমন আমরা উৎপন্ন, তেমনি প্রতিটি প্রাণী, বৃক্ষরাজি এমনকি একটি ক্ষুদ্র ঘাসকেও গভীর মমতায় জন্মদান করেছে এই বসুমাতা। একই মায়ের সন্তানদের মধ্যে যেমন বিভিন্ন লিঙ্গ এবং বর্ণেও পার্থক্য থাকে তেমনি ধরণী মাতার সন্তানদের মধ্যেও কেউ মানুষ, কেউ প্রাণী আবার কেউ বৃক্ষ কিংবা উদ্ভিদ নামে পরিচিত। সুতরাং এই উদ্ভিদকুল আমাদের ভাই, আমাদের বোন। তাদের জীবনের সঙ্গে আমাদের জীবন এক গভীর সম্পর্কে আবদ্ধ।

বৃক্ষ ও অরণ্যের সঙ্গে আদি মানুষের প্রাণের মিলন ঘটেছিল, প্রাচীন সাহিত্যের প্রায় সর্বত্র তার নিদর্শন ছড়িয়ে রয়েছে। প্রাচীন সাধক ও কবিরা নাগরিক ছিলেন না। অরণ্যের আত্মার মধ্যে ছিল তাদের বসবাস। বৈষ্ণব সাহিত্যে কদম্ব ও তমাল বৃক্ষের মাহাত্ম্য লক্ষ্য করা যায়। কদম্ব ও তমাল ছাড়া বৈষ্ণব সাহিত্য অচল, রাধা-কৃষ্ণের প্রেম অসম্পূর্ণ থেকে যায়। তমাল বৃক্ষের রং ধারণ করে তমাল কৃষ্ণের তুল্যমূল্য লাভ করেছে। অনেক বৃক্ষের সঙ্গে ধর্মীয় অনুভূতিও ছড়িয়ে আছে বিশেষ করে ভারতবর্ষে। কোন কোন ধর্মে বড় বৃক্ষকে আজো পূজা করে থাকে। ইসলামের নবীও বৃক্ষরোপণ ও বৃক্ষের যত্নের প্রতি অত্যধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। যদিও ভারতবর্ষের মতো মরুভূমিতে গাছ ছিল না তবু গাছের প্রতি ছিল তার অসম্ভব মায়া। তিনি গাছ লাগানোকে বলেছেন অবিশ্বর পুণ্য কর্ম, মানুষ মরে গেলেও যার সুফল ভোগ করবে। একটি গাছ লাগানোর কারণে একজন মানুষ তার কৃত অপরাধ থেকে মুক্তি পেতে পারে। কিন্তু কেউ যদি শত্রুতা করে কোন বৃক্ষ নিধন করল তবে সে ধ্বংস হয়ে গেল। এই পাপ কোন পয়গম্বরকে হত্যার চেয়েও বেশি। কোন মুসলমান মারা গেলে তার কবরের উপর সজীব কোন বৃক্ষ পুঁতে দেয়া হয়। জীবন্ত বৃক্ষ মৃত মানুষের জন্য দোয়া করতে থাকে। এই যে ধারণা, যার গুরুত্ব অপরিসীম।

তিরিশের দশকে বাংলা কবিতায় যে আন্দোলন হয়েছিল তার সঙ্গে আধুনিক নাগরিক মনের সংঘাতটি বড় হয়ে উঠেছিল। কিন্তু সেখান থেকেও বৃক্ষ কিংবা প্রকৃতি কবিদের হৃদয় থেকে তিরোহিত হয়নি। বরং অন্য মাত্রায় তা প্রকাশিত হয়েছে। যদিও বৃক্ষকে ধ্বংস করেই নগর গড়ে উঠেছে। তিরিশের প্রধান কবি জীবনানন্দ দাশ তো প্রকৃতির সঙ্গেই অন্তরীণ হয়েছিলেন। বৃক্ষের নিবাস দেখে কবি হৃদয় হাহাকার করে উঠেছিল। বৃক্ষের নিবাস হলে মানুষের ধ্বংস অনিবার্য। জীবনানন্দ দাশ বলেছেন-

বড় বড় গাছ কেটে ফেলছে তারা/ এইসব উঁচু উঁচু গাছ আমার ইচ্ছা লালন করেছিল/ আমার দেহের ভেতর রক্তাক্ত কাঠের গন্ধ;/ আমার মনের শহরেও সভ্যতার মতো শূন্যতা;/ আমি দিনের আলোয়/ কিংবা নক্ষত্র যে আভা আনে রাতের পরে রাতে/ এই মৃত গাছগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকি।'

www.nagorikpathagar.org

তিরিশের সর্বাধিক নাগরিক কবি বলে পরিচিত অমিয় চক্রবর্তী গাছ নিয়ে একাধিক কবিতা রচনা করেছেন। নগর জীবনের সংকট থেকে মুক্তির জন্য তিনি বৃক্ষের সাধনার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তিরিশের পরবর্তী কবিরাও একইভাবে বৃক্ষ বন্দনা করেছেন। সম্প্রতি সত্তর দশকের কবি নাসির আহমেদ 'বৃক্ষমঙ্গল' নামে একটি সম্পূর্ণ কাব্যগ্রন্থ রচনা করেছেন।

কবিরা বৃক্ষ নিয়ে প্রেমের চেয়ে কিছু কম কবিতা লেখেননি। কিন্তু বৃক্ষ নিয়ে আজকের উপলব্ধি আলাদা। আজকে প্রাণের তাগিদে, মানব সভ্যতার প্রয়োজনে বৃক্ষের পক্ষে অবস্থান নিতে হচ্ছে। বৃক্ষের পক্ষে না দাঁড়ালে খুব শিগগিরই মানব অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়বে।

এ কথা সর্বজন স্বীকৃত যে, বৃক্ষকে কেন্দ্র করেই মানুষের জীবন আবর্তিত। এ পৃথিবীতে মাটি, মানুষ (প্রাণী), উদ্ভিদ-এ ত্রিভুজের বৃত্তের মধ্যেই রক্ষিত স্বতন্ত্র জীবন, বৃক্ষ ছাড়া পৃথিবীতে জীবনের কোন অস্তিত্ব সম্ভব নয়।

> বৃক্ষের অভিযোগহীন জীবন, যে জীবনের লক্ষ্য ছাড়িয়ে যাওয়া, অন্যের জন্য জীবন উৎসর্গ করার যার একমাত্র ব্রত অন্যের উপকার করা। প্রাচীন সাহিত্যে বিশেষ করে ভারতবর্ষের সাহিত্যে ধর্ম ও জ্ঞান সাধনার ক্ষেত্রে অরণ্য ও বৃক্ষের এক আলাদা অবস্থান ছিল। বৃক্ষ ও অরণ্যকে কেন্দ্র করে ভারতীয় জীবনের ধর্ম ও সংস্কৃতি। বৃক্ষ নেই তো বিদ্যা ও ধর্ম নেই। ভারতীয় জীবনের এক প্রধান সাধনা ছিল অরণ্যের কাছে ফিরে যাওয়া। তৈরি হয়েছে বানপ্রস্থের বিধান। প্রাচীন সাহিত্যেও বৃক্ষের এক আলাদা ব্যক্তিত্ব রয়েছে। উদ্ভিদ ও মানুষ পাশাপাশি জড়াজড়ি করে বাস করেছে। কালীদাসের অভিজ্ঞান শকুন্তলাতে আমরা এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ পাই। উদ্ভিদ আর কণ্বমুনির আশ্রমের বাসিন্দাদের আলাদা করে চেনা যায় না। শকুন্তলা ও তার প্রিয়ংবেদাঅনসূয়া সখিরা বৃক্ষের মমতায় লালিত হয়েছে। শকুন্তলা যখন পতিগৃহে যাত্রা করেছেন তখন কণ্বমুনি, 'তপোবনতরুদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে সন্নিহিত তরুগণ! যিনি তোমাদের জলসেচ না করিয়া, কদাচ জলপান করিতেন না; যিনি, ভূষণ প্রিয়া হইয়াও, স্নেহবশত কদাচ তোমাদের পল্লবভঙ্গ করিতেন না, তোমাদের কুসুম প্রসবের সময় উপস্থিত হইলে যাহার আনন্দের সীমা থাকিত না; অদ্য সেই শকুন্তলা পতিগৃহে যাইতেছেন, তোমরা সকলে অনুমোদন কর।'... 'শকুন্তলা কহিলেন, তাত! বনতোষিণীকে সম্ভাষণ না করিয়া যাইব না! এই বলিয়া তিনি বনতোষিণীর নিকটে গিয়া কহিলেন, বনতোষিণী! শাখাবাহু দ্বারা আমায় স্নেহভরে আলিঙ্গন করো; আজ অবধি আমি দূরবর্তিনী হইলাম। অনন্তর, অনসূয়া ও প্রিয়ংবেদাকে কহিলেন, সখি! আমি বনতোষিণীকে তোমাদের হস্তে সমর্পণ করিলাম।' (শকুন্তলাঃ বিদ্যাসাগর)

রবীন্দ্রনাথ বৃক্ষ নিয়ে, অরণ্য প্রকৃতি নিয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ কাব্যগ্রন্থ রচনা করেছিলেন। যার নাম দিয়েছিলেন বনবাণী (১৯২৬)। এ গ্রন্থের ২০টি কবিতাই তিনি লিখেছিলেন বৃক্ষ সম্পর্কে। এ কাব্যগ্রন্থের ভূমিকার অংশটি ছিল নিম্নরূপ ঃ

> "আমার ঘরের আশেপাশে যে সব বোবা বন্ধু আলোর প্রেমে মত্ত হয়ে আকাশের দিকে হাত বাড়িয়ে আছে তাদের ডাক আমার মনের মধ্যে পৌঁছিল। তাদের ভাষা হচ্ছে জীবন জগতের আদিভাষা, তার ইশারা গিয়ে পৌঁছায় প্রাণের প্রথম স্তরে; হাজার হাজার বছরের ভুলে যাওয়া ইতিহাসকে নাড়া দেয়; মনের মধ্যে যে সাড়া উঠে সেও ওই গাছের ভাষায় - কথার কোন স্পষ্ট মানে নেই, অথচ তার মধ্যে বহু যুগযুগান্তরের ভাষা গুনগুনিয়ে উঠে।"

www.nagorikpathagar.org

তিনি শুধু ভাববিলাসী বৃক্ষ প্রেমিক ছিলেন না, প্রকৃতি প্রেমিক হিসেবে তিনি বৃক্ষ সম্পর্কে কবিতা লেখার পাশাপাশি বৃক্ষ সংখ্যা সম্প্রসারণের জন্য বৃক্ষরোপণেও সচেষ্ট ছিলেন। বৃক্ষরোপণ উৎসবকে উৎসাহিত ও সফল করার লক্ষ্যে তিনি বহু গানও রচনা করেছেন।

কাজী নজরুল ইসলাম বিপ্লবী কবি হলেও তার রোমান্টিক কাব্য মানস ছিল। তিনি বাতায়ন পাশে গুবাক তরুর সারি নামে একটি অনিন্দ্য সুন্দর কবিতা রচনা করেছিলেন। কবি-প্রেয়সী এবং কবি জীবনের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা হয়ে উঠেছে গুবাক বৃক্ষের সুখ-দুঃখ। কবি নজরুল গুবাক বৃক্ষে মানবত্ব আরোপ করেছেন। তার বৃক্ষ ছিল অনুভূতিশীল। কবি বৃক্ষের সুখোবাণী শুনতে না পারলেও হৃদয়ের বাণী শুনতে পান।

কালীদাসের প্রকৃতি প্রেম ও প্রীতির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের এক অপূর্ব মিল ও ঐক্য ঘটেছিল। রবীন্দ্রনাথের বনবাণী ছাড়াও তার অসংখ্য লেখায় ছড়িয়ে রয়েছে অরণ্য-প্রকৃতি বিষয়ে হিরন্ময় কৃচি। ১৮৭৬ সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পিতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বোলপুরের বৃক্ষের ভুবন ডাঙ্গায় জমি কিনে যে আশ্রম তৈরি করেছিলেন তা আজ "শান্তিনিকেতন" নামে খ্যাত। বৃক্ষরোপণ আশ্রমবাসীদের নিয়মিত ও অনিবার্য কাজ ছিল। বৃক্ষরোপণের এসব কর্মকাণ্ডই সম্ভবত রবীন্দ্রনাথকে শৈশবকাল থেকে বৃক্ষ প্রেমিক করে তুলেছিল। তিনি তার "বৃক্ষবন্দনা" কবিতায় বৃক্ষকে আদিপ্রাণ হিসেবে অভিহিত করেছেন। জীবনের জন্য বৃক্ষের গুরুত্ব কত অপরিহার্য এ ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বিজ্ঞানও এ চিরন্তন সত্যকে তিনি নির্ভুলভাবে প্রমাণ করেছে। বৃক্ষবন্দনা কবিতায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন :

অন্ধ ভূমিগর্ভ হতে শুনেছিল সূর্যের আহবান
প্রাণের প্রথম জাগরণে, তুমি বৃক্ষ আদিপ্রাণ
আপনার পুত পুষ্প ফুটে অনন্ত যৌবনা করি
সাজাইলে বসুন্ধরা।

বৃক্ষ শুধু জীবনের জন্যই একান্ত অপরিহার্য নয়, বৃক্ষ প্রকৃতির অলংকারও বটে। তাই চিত্ত বিনোদনের জন্য মানুষ অরণ্যের কাছে ছুটে যায়। এ প্রসঙ্গে কবি শামসুর রাহমান বলেছেন, বৃক্ষবিহীন পৃথিবীকে কল্পনা করলে মনে হবে পুষ্প এবং পত্রবিহীন শাখা-প্রশাখা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা একটি মৃত বৃক্ষের মতো। যার মধ্যে কোন সৌন্দর্য পাওয়া যাবে না, বৈচিত্র্য থাকবে না। বর্ষা সজল মায়াময় স্নিগ্ধরূপ মানুষের কাব্য মনকে ভরে তোলে। বিভিন্ন ঋতুতে বিভিন্ন প্রকার ফুল ফোটে, প্রকৃতিকে মনোরম সাজে সাজিয়ে তুলে। তাই বর্ষাকালের দৃশ্য সম্পর্কে কবি বলেন ঃ

এসেছে বরষা ওগো নব অনুরাগিণী
কেতক কেশবে কেশপাশ কর সুরভি
ক্ষীণ কটিতটে গাঁথি লয়ে পরো করবী
কদম্বরেণু বিছাইয়া দাও শয়নে
অঞ্জন আঁকো নয়নে

www.nagorikpathagar.org

আমাদের অপরূপা প্রকৃতি বর্ষার বারিধারা ছোঁয়ায় অজস্র ফুল ফোটে। বর্ষার সিক্ত বাতাসে সেই মিষ্টি মধুর ঘ্রাণ আমাদের মনকে বিমোহিত করে তোলে। আমাদের সংস্কৃতিতে ফুলের ব্যবহার হয় অঙ্গসজ্জায়, গৃহসজ্জায়, সংবর্ধনায়, মনোরঞ্জনের জন্য ও সুস্থতা কামনায় রোগীকে ফুল বা ফুলের তোড়া উপহারে। এ সবকিছু বৃক্ষের অবদান। তাই সাহিত্যে যে ফুল ও অরণ্য নিয়ে এত উপমা, এত রসের যোগান দেয়া হয়েছে এর পেছনে বৃক্ষ ও উদ্ভিদের বৈচিত্র্যের অবদান অনস্বীকার্য। কবি জীবনানন্দ দাশ এদেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য নিয়ে লিখেছেন- "বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি, তাই আমি পৃথিবীর রূপ খুঁজিতে চাই না আর"।

গাছ মানুষের শ্রেষ্ঠ বন্ধু

আমেরিকার এসেক্স পার্ক কমিশনের পক্ষ থেকে এক পার্কে বৃক্ষের মিনতি বলে একটি প্রচারপত্রে বৃক্ষের জবানিতে লেখা রয়েছে, "আমি তোমাদের শীতকালে উত্তাপ আর গ্রীষ্মকালে ছায়া দেই। আমার ফল খেয়েই তোমরা পথের ক্লান্তি ও তৃষ্ণা নিবারণ করে থাক। তোমাদের মাথার উপর ঘরের চাল ধরে রাখি। তোমাদের টেবিল, চেয়ার, বিছানা, লাঙল, শিশুর দোলনা এমনকি কফিন সবই আমা হতে তৈরি। আমিই যোগাই নয়ন শোভন পুষ্প ও খাদ্য। আমার একটিই অনুরোধ, তোমরা কাছে এসো কিন্তু আমার ক্ষতি করো না।" (দৈনিক জনকণ্ঠ ২৩ জুন ২০০০)।

বৃক্ষ যদি কথা বলতে পারতো তাহলে আমাদের প্রতি বোধহয় এভাবেই করুণ মিনতি জানাতো। গাছের নীরব কান্না শুনি না বলেই বৃক্ষের প্রতি আমাদের কোন মমতা জন্মে না। গাছ আমাদের পরম সুহৃদ। জন্ম থেকে শুরু করে কবরবাসী হওয়া পর্যন্ত গাছ আপন মমতায় মানব সন্তানকে আগলে রাখে। গাছ ছাড়া মানুষ এক মুহূর্তও বাঁচতে পারে না। অথচ এই গাছের প্রতি মানুষের আচরণ কতই না নিষ্ঠুর। মানুষের অবিবেচনাপ্রসূত উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের ফলে মূল্যবান বৃক্ষসম্পদ আজ উজাড় হবার পথে। প্রতিবছর পৃথিবীর ১৫ মিলিয়ন হেক্টর বনভূমি ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। অপরিকল্পিতভাবে বৃক্ষ নিধনের ফলে পৃথিবীব্যাপী তাপমাত্রা বৃদ্ধিসহ মরুময়তার আশংকা বেড়েই চলেছে। বৃক্ষ নিধনের ফলে পৃথিবীর তাপমাত্রা দ্রুত বাড়ছে। এভাবে তাপমাত্রা বাড়তে থাকলে জমাট বাঁধা বরফ গলে গিয়ে ২০-২৫ বছরের মধ্যে বাংলাদেশ, মালদ্বীপসহ বিভিন্ন দেশের উল্লেখযোগ্য এলাকা পানির নিচে তলিয়ে যাবে। গাছ মানুষের জন্য শুধু ফল ও কাঠ সরবরাহ করে তা নয়, আমাদের জীবনধারণের জন্য অত্যাবশ্যকীয় উপাদান অক্সিজেন গাছ হতেই আসে। গাছ একটি নির্দিষ্ট প্রক্রিয়ায় অক্সিজেন ত্যাগ করে এবং মানুষের ছেড়ে দেয়া বিষাক্ত কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্রহণ করে। এভাবে গাছ বায়ুমণ্ডলকে মানুষ ও জীবজন্তু বসবাসের উপযোগী রাখে। গাছই হচ্ছে অক্সিজেন সরবরাহের একমাত্র প্রাকৃতিক উৎস। কাজেই গাছের সাহচর্য ব্যতীত মানুষ এক মুহূর্তও টিকে থাকতে পারে না। প্রতি হেক্টর বনভূমি দৈনিক ৬৫০ কেজি অক্সিজেন বাতাসে ছেড়ে দেয় এবং একই সাথে ৯০০ কেজি কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্রহণ করে। এছাড়া ৩৬ টন ধুলা-ময়লা নির্গমনে সহায়তা করে। ভারতীয় একজন গবেষক তার রিপোর্টে উল্লেখ করেছেন যে, একটি ফলবান বৃক্ষ যদি ৫০ বছর বাঁচে তাহলে তার জীবদ্দশায় ফল, কাঠ, গোখাদ্য, অক্সিজেন প্রভৃতি আকারে যে অবদান রাখে তার অনুমিত আর্থিক মূল্য ২৩ লাখ টাকারও বেশি। বাতাসের মাঝে বসবাস করে মানুষ যেমন বাতাসের মূল্য বুঝে না, তেমনি আমরা গাছের দয়ায় জীবনধারণ করেও গাছের মর্যাদা বুঝি না। আমরা যদি গাছের গুরুত্ব বুঝতাম তাহলে কোন গাছে কুঠারের আঘাত হানার সময় আমাদের হাত কেঁপে উঠতো। দৈনিক ইত্তেফাক, ১৫ জুলাই, ১৯৯৯।

www.nagorikpathagar.org

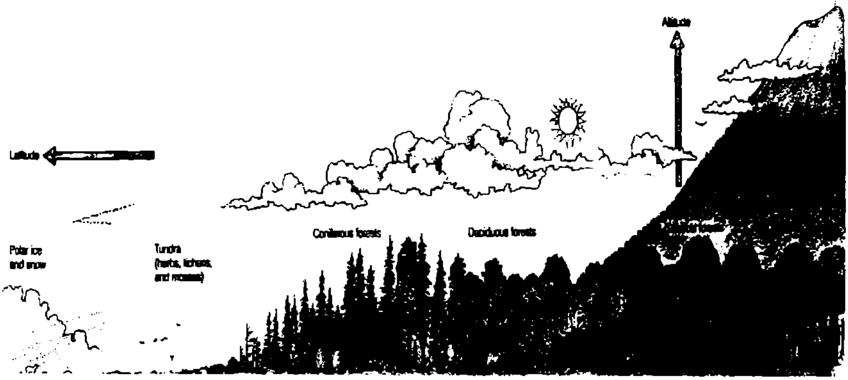

চিত্র ২.৬ : বিভিন্ন স্তরের উচ্চতায় আবহাওয়ার তারতম্য ও নানা প্রজাতির বৃক্ষ
উৎস ঃ T. Miller, 1993

পবিত্র ইসলামে মনোরম বেহেস্তের বর্ণনাকালেও সুদৃশ্য ও বিচিত্র বৃক্ষরাজি এদের ফল-ফুল, নদী ও ঝর্নার অপূর্ব সৌন্দর্যের কথা বর্ণনা করা হয়েছে। এক কথায় এ নশ্বর পৃথিবীতেও বৃক্ষ যেমন প্রকৃতির অলংকার পর জগতেও সুন্দর মনোরম পরিবেশে স্থায়ী বসবাসের জন্যও বৃক্ষরাজিসমৃদ্ধ বেহেস্ত মানব গোষ্ঠীর বসবাসের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। ইসলামসহ বহু ধর্মের অনুভূতি বৃক্ষের সঙ্গে জড়িয়ে আছে। আমাদের আদি পিতা-মাতা হযরত আদম (আঃ), হাওয়া (আঃ) বেহেস্ত বা স্বর্গ থেকে নিক্ষিপ্ত হয়ে তাদের আশ্রয় হয়েছিল অরণ্যে। সে বৃক্ষের ফল-মূলই ছিল তাদের খাদ্যের উৎস। তাদের লজ্জা নিবারণের জন্যও ব্যবহৃত হতো গাছের পাতা। প্রযুক্তির শীর্ষস্থানে পৌঁছার পরও মানব সভ্যতা বিকাশের জন্য বৃক্ষের ওপর নির্ভরশীলতা ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে ক্রমাগতভাবে।

এবাদত উপাসনার কথা বলতে গেলেও বৃক্ষ/বনের প্রয়োজনীয়তার কথা বলে শেষ করা যাবে না। হিন্দু সম্প্রদায়ের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ রামায়ণ ও মহাভারত ছাড়াও বেদ এবং উপনিষদে বহুবার অরণ্যের বিভিন্ন দিকের বিষয় তুলে ধরা হয়েছে। সীতার বনবাস কিংবা রামায়ণের মহাভারত অরণ্যকে ঘিরেই। যুগ যুগ ধরে আর্য, মুনি, ঋষিরা অরণ্যে ও বন-জঙ্গলে ধর্ম সাধনা করে বেড়িয়েছেন। বিশ্বনবী মুহাম্মদ (সাঃ) হেরা পর্বতের নির্জন স্থানে আল্লাহর সাধনায় নিয়োজিত ছিলেন, অরণ্য সৃষ্টির প্রধান উৎস পাহাড়ে। স্বর্গবাসের আনন্দের উপভোগ্য সব উপকরণ ও উদ্ভিদ অরণ্যকেই ঘিরে।

বৌদ্ধ ধর্মে অশ্বথ বৃক্ষের স্থান সবার উপরে। কারণ বৌদ্ধদেব যে গাছের নিচে বসে প্রার্থনা করে সিদ্ধিলাভ করেছেন সে গাছটি প্রকৃতপক্ষে একটি প্রাচীন অশ্বথগাছ। তাই যেখানে বৌদ্ধ মঠ ছিল সেখানে অশ্বথ গাছসহ অন্যান্য বৃক্ষ রোপণ ছিল অত্যাবশ্যক ও বাধ্যতামূলক। প্রাচীনকালেও গাছ কাটার বিষয়ে আমাদের সমাজে অনেক প্রাচীন সংস্কার মেনে চলার প্রথা রয়েছে। যেমন পুরানো গাছ কাটলে সে লোকটিকে জ্বীনে ধরবে বা মারা যেতে পারে। মূল কথা, এসব সংস্কার তখন বৃক্ষ নিধনকে নিরুৎসাহিত এবং বৃক্ষ সংরক্ষণকে উৎসাহিত

www.nagorikpathagar.org

করেছে। গবেষকরা আর্য সভ্যতাকে অরণ্যকেন্দ্রিক সভ্যতা বলে অভিহিত করেছেন। তাই অরণ্য থেকে তাদের গ্রন্থের নামকরণ করা হয়েছিল "আরণ্যক"।

আমাদের উপমহাদেশের গভীর অরণ্য ছিল যা প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ পুরাণেও উল্লেখ রয়েছে। কবি শামসুর রাহমান তার এক প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন যে, পুরাণে ৯টি প্রাচীন বনের কথা উল্লেখ রয়েছে সেগুলো হলো, দণ্ডকারণ্য, সৈন্ধব, কাব্রজঙ্গল, নৈমিষা, উৎপথ, অরণ্য পুষ্কর, জম্বুবাগ, হিমালয় ও উপলবৃত অরণ্য। এসব বনে বন্যপ্রাণীর বর্ণনাসহ রামের বনবাস ইত্যাদি নিয়ে অনেক সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে যেমন নৈমিষা অরণ্যে এক সময় ৬০ হাজার সাধু-সন্ন্যাসী বাস করতেন বলে ইতিহাসে বিবরণ রয়েছে।

বনায়ন সংক্রান্ত আইন ও বিধিবিধান

বৃটিশ শাসনামলে এ দেশে বন ও বনজ সম্পদ সংক্রান্ত আইন করা হয়েছিল রাজস্ব আহরণের জন্য। স্বাধীনতা উত্তর মূলতঃ প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণের প্রতি গুরুত্ব দেয়া হয়। এ সংক্রান্ত পরিচ্ছন্ন আইন ও বিধিবিধান যা রয়েছে বেশির ভাগই করা হয়েছে আশি ও নব্বই দশকের দিকে। বনসম্পদ সংরক্ষণে বিভিন্ন আইন ও বিধানের বাস্তবায়ন দিক পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, পর্যাপ্ত গণসচেতনতা, প্রাতিষ্ঠানিক অবকাঠামো ও নেটওয়ার্ক এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক অঙ্গীকারের অভাবেই এগুলোর যথাযথ বাস্তবায়ন সম্ভব হচ্ছে না। বনসম্পদ সংরক্ষণ সংক্রান্ত যেসব আইন, বিধি ও ম্যানুয়াল দ্বারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ব্যবস্থাপনা করা হয় সেগুলোই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন করে থাকে। যা নিম্নে উপস্থাপন করা হল :

১। দি ফরেস্ট অ্যাক্ট, ১৯২৭
২। দি ফরেস্ট (অ্যামেন্ডমেন্ট) অ্যাক্ট, ১৯৯০
৩। দি ফরেস্ট (অ্যামেন্ডমেন্ট) অ্যাক্ট, ২০০০
৪। জাতীয় বননীতি, ১৯৯৪
৫। বাংলাদেশ কাঁকড়া রপ্তানি নীতিমালা, ১৯৯৮
৬। বাজালি বাঁশ রপ্তানি নীতিমালা, ১৯৯৯
৭। দি আটিয়া ফরেস্ট (প্রটেকশন) অর্ডিন্যান্স, ১৯৮২
৮। করাতকল (লাইসেন্স) বিধিমালা, ১৯৯৮
৯। ইট পোড়ানো (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ১৯৮৯
১০। ইট পোড়ানো (নিয়ন্ত্রণ) (সংশোধন) আইন, ১৯৯২
১১। ইট পোড়ানো (লাইসেন্স) বিধিমালা, ১৯৮৯
১২। বাংলাদেশ ওয়াইল্ডলাইফ (প্রিজারভেশন) (অ্যামেন্ডমেন্ট) অ্যাক্ট, ১৯৭৪
১৩। দি ইস্ট পাকিস্তান প্রাইভেট ফরেস্ট অর্ডিন্যান্স, ১৯৫৯
১৪। দি ইস্ট পাকিস্তান প্রাইভেট ফরেস্ট ম্যানেজমেন্ট রুলস, ১৯৫৯
১৫। দি চিটাগাং, কক্সবাজার অ্যান্ড কুমিল্লা ফরেস্ট ট্রানজিট রুলস, ১৯৫৯

www.nagorikpathagar.org

১৬। দি ইস্ট পাকিস্তান জেনারেল ফরেস্ট ট্রানজিট রুলস, ১৯৬০
১৭। দি চিটাগাং হিলট্র্যাক্টস ফরেস্ট ট্রানজিট রুলস, ১৯৭৩
১৮। দি ঢাকা ফরেস্ট ট্রানজিট রুলস, ১৯৫৯
১৯। দি ময়মনসিংহ ফরেস্ট ট্রানজিট রুলস, ১৯৫৯
২০। দি দিনাজপুর অ্যান্ড রংপুর ফরেস্ট ট্রানজিট রুলস, ১৯৫৪
২১। দি সিলেট ফরেস্ট ট্রানজিট রুলস, ১৯৫১
২২। রুলস ফর দি কন্ট্রোল অফ দি ট্রানজিট অফ টিম্বার অ্যান্ড আদার ফরেস্ট প্রডিউস অ্যান্ড রুলস ফর দি মেজারমেন্ট অ্যান্ড রেজিস্ট্রেশন অফ বোটস ফর ট্রানজিট ইন দি সুন্দরবন ফরেস্ট ডিভিশন
২৩। ফরেস্ট ম্যানুয়াল।

প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণে মালিকানা

এ প্রবন্ধের অন্যতম প্রধান আলোচ্য বিষয় হচ্ছে বৃক্ষসম্পদ সংরক্ষণে নৈতিকতার বিষয় আলোকপাত করা। বনায়নকে সামাজিক আন্দোলনে রূপদান করতে ব্যর্থতার প্রধান কারণ হলো সম্পদের মালিকানার বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি করার অভাব। এ দেশে একনিষ্ঠার সাথে বনায়ন করলে ভবিষ্যতে এ সৃষ্ট বনসম্পদের মালিক হবে সরকার, এ আতঙ্ক কাজ করছে সাধারণ মানুষের মাঝে। দেশে যত বনায়ন কর্মসূচি সরকারি উদ্যোগে নেয়া হয়েছে তার পূর্ণ কৃতিত্ব হচ্ছে সরকারি কর্মকর্তাদের। যে কোন প্রাকৃতিক সম্পদ উন্নয়ন ও সংরক্ষণের কর্মকাণ্ডের দায়িত্ব সরকারের, তার সুবিধাও সরকার পাবে। এ ক্ষেত্রে দেশে বনায়ন সফল হলো কি না হলো এ বিষয়ে জনগণ ও সরকারি কর্মকর্তাদের কোন মাথাব্যথা নেই। এমতাবস্থায় প্রাকৃতিক সম্পদ সৃষ্টি এবং সংরক্ষণের বিষয়ে স্বতঃস্ফূর্ততা বা তাদের নিজস্ব তাগিদ বা কোন উদ্যোগ নেই। উল্লেখিত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে প্রাকৃতিক সম্পদ সৃজন সংক্রান্ত সামাজিক বিপ্লবের স্লোগানের সাথে নব সৃষ্ট সম্পত্তির মালিকানার বিষয়ে পরিচ্ছন্ন আইনের বিধান সহজ ভাষায় বোঝার মতো করে জনগণের মধ্যে প্রচার করে সচেতনতা সৃষ্টি করা অত্যাবশ্যক।

মালিকানা বিষয়টি স্পষ্ট করে ধর্মীয় নৈতিকতার কথা উল্লেখ করলে তা আরো কার্যকরী হতে পারে। তাহলো প্রতিটি ধর্মীয় বিধানেই বিধৃত রয়েছে প্রাকৃতিক সম্পদ যেমন গাছের প্রতি মানুষের কি ধরনের আচরণ করা উচিত। ইসলাম ধর্মে বিভিন্ন নবীসহ অন্যান্য ধর্মেও ঋষি মনীষীরা বৃক্ষসম্পদের প্রতি যেভাবে সদাচরণ করেছেন এবং এ সম্পদ সংরক্ষণের বিষয়ে যেসব উপদেশ দিয়ে গেছেন আমাদের দায়িত্ব সেগুলো অনুসরণ করা। কেননা প্রত্যেক ধর্মেই তার ধর্ম যাজকদের উপদেশ এবং তাদের ব্যক্তিগত আচরণে তা অনুসরণ পুণ্যের কাজ বলে আবশ্যক মনে করা হয়। প্রতিটি ধর্মের নৈতিকতা ও মূল্যবোধকে জাগিয়ে তুলতে পারলে বিরাট অংকের টাকা খরচ করে অথবা বিরাট সংখ্যক পাহারাদার নিয়োগ করে বন

www.nagorikpathagar.org

সংরক্ষণের কোন প্রয়োজন হবে না। তাছাড়া আমাদের দেশের মতো বাজেট সংকট (Budget constraint) অর্থনীতিতে ধর্মপ্রাণ মানুষকে স্বল্প খরচে সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, মসজিদ, মন্দিরে বনায়নের মতো কর্মসূচি বাস্তবায়নে ধর্মীয় মূল্যবোধের শিক্ষা দেয়া যেতে পারে। ধর্মীয় মূল্যবোধের সাথে সম্পত্তির মালিকানার বিষয়টি স্পষ্ট করে তুলে ধরতে পারলে বনায়ন একটি সফল সামাজিক বিপ্লব হতে পারে, এ কথা অনেকটা নিশ্চিত বলে আশা করা যেতে পারে।

সামাজিক বনায়ন ও অংশীদারিত্বমূলক সুবিধা

বন বিভাগ সামাজিক বনায়নে অংশীদারিত্বমূলক লভ্যাংশ বন্টন চুক্তিনামা স্বাক্ষর করেছে বিভিন্ন এলাকায়। সামাজিক বনায়নের আওতায় সৃজিত বাগানের উপকারভোগীদের স্বার্থ রক্ষার জন্য অংশীদারিত্বমূলক লভ্যাংশ বন্টন চুক্তিনামা প্রবর্তন করা হয়েছে নব্বই দশকের শুরুতে। সরকারি বনভূমিতে বনায়নের ক্ষেত্রে বন অধিদপ্তর ও উপকারভোগীদের মধ্যে অংশীদারিত্বমূলক লভ্যাংশ বন্টন চুক্তিনামা (PBSA) স্বাক্ষরিত হয়। যখন প্রান্তিক ভূমিতে বনায়ন করা হয় তখন ভূমি মালিক সংস্থা, বন অধিদপ্তর ও উপকারভোগীদের মধ্যে অংশীদারিত্বমূলক লভ্যাংশ বন্টন চুক্তিনামা (PBSA) স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তিনামায় প্রত্যেক পক্ষের দায়িত্ব উল্লেখ করা থাকে। এই চুক্তিনামার মাধ্যমে উপকারভোগীদের অধিক সময়ের সম্পৃক্ততা নিশ্চিত করা হয়। অংশীদারিত্বমূলক লভ্যাংশ বন্টন চুক্তিনামা কর্মসূচির Tenurial স্থায়িত্বশীলতা নিশ্চিত করে।

লভ্যাংশ বন্টন হার

অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে সৃজিত বাগানের আবর্তকাল পূর্ণ হওয়ার পর বৃক্ষ কর্তন করা হয় এবং কর্তিত বৃক্ষ হতে লব্ধ আয় এপেক্স বডি কর্তৃক অনুমোদিত অংশীদারিত্বমূলক লভ্যাংশ বন্টন চুক্তিনামা অনুযায়ী নিম্নবর্ণিত হারে বন্টন করা হয় ঃ

(ক) বন অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন বনভূমির উডলট ও কৃষি বনের ক্ষেত্রে-

১) বন অধিদপ্তর	৪৫%
২) উপকারভোগীগণ	৪৫%
৩) বৃক্ষরোপণ তহবিল	১০%

(খ) শাল কপিচ বনভূমি সংরক্ষণ ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে-

১) বন অধিদপ্তর	৬৫%
২) উপকারভোগীগণ	২৫%
৩) বৃক্ষরোপণ তহবিল	১০%

(গ) বন অধিদপ্তর ব্যতীত অন্য কোন সরকারি বা সংবিধিবদ্ধ সংস্থার মালিকানা বা দখলি স্বত্বাধীন ভূমিতে সৃষ্টি স্ট্রিপ বাগানের ক্ষেত্রে-

www.nagorikpathagar.org

১) বন অধিদপ্তর	১০%
২) ভূমির মালিকানা বা দখলি স্বত্বাধিকারী সংস্থা	২০%
৩) উপকারভোগীগণ	৫৫%
৪) স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদ	৫%
৫) বৃক্ষরোপণ তহবিল	১০%

ছাঁটাইকৃত ডালপালা, বন প্রথম পাতলাকরণ (Thinning) কালে কর্তিত বৃক্ষ, ফলদ বৃক্ষের ফল এবং উৎপাদিত কৃষি ফসল সম্পৃক্ত উপকারভোগীগণ ভোগ করছেন।

বাগান কর্তন এবং অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে লভ্যাংশ বন্টন

বর্তমানে কমিউনিটি ফরেস্ট্রি প্রকল্প এবং থানা বনায়ন ও নার্সারি উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় সৃজিত বাগান ফরেস্ট্রি সেক্টর প্রকল্পের আওতায় আহরণ/কর্তন করা হচ্ছে। উপকারভোগীদের প্রাপ্য লভ্যাংশ অংশীদারিত্বমূলক লভ্যাংশ বন্টন চুক্তিনামা অনুযায়ী বিতরণ করা হচ্ছে।

অংশীদারিত্বমূলক সামাজিক বনায়ন ও দারিদ্র্য বিমোচন

দারিদ্র্য বাংলাদেশের একটি প্রধান সমস্যা। গ্রামাঞ্চলে দরিদ্রতার প্রকট আরো বেশি। সরকার দ্রুত দারিদ্র্য নিরসনের জন্য গ্রামের উন্নয়নের ওপর জোর দিয়েছে, যেখানে অধিকাংশ দরিদ্র লোক বসবাস করে। বনজ সম্পদ আমাদের দেশের অর্থনীতিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ২০০১-২০০২ অর্থবছরে জিডিপি (GDP)-তে এর অবদান ছিল শতকরা ২ ভাগ এবং দেশের মোট জনসংখ্যার শতকরা ২ ভাগ ফরেস্ট সেক্টরের সাথে জড়িত ছিল।

১৯৯৯-২০০৩ পর্যন্ত ফরেস্ট্রি সেক্টর প্রকল্পের অধীনে ৫,০৭৯.৪১ হেঃ উডলট বাগান, ১,৫৯৬.৯৬ হেঃ কৃষিবন বাগান, ২,৮৯৬.৮৯ কি.মি. স্ট্রিপ বাগান এবং ৪০ হেঃ চর বাগান কর্তন পূর্বক পুনরায় বাগান সৃজন করা হয়েছে। সর্বমোট বিক্রয়লব্ধ অর্থ ৭০৪.৭৫ মিলিয়ন টাকা এবং ২৩,৫৬১ জন উপকারভোগী/অংশগ্রহণকারী তাদের লভ্যাংশ হিসাবে পেয়েছেন ৩০৮ মিলিয়ন টাকা। উপকারভোগীগণ তাদের লভ্যাংশ পেয়ে অত্যন্ত উৎসাহিত হয়েছেন। ফরেস্ট্রি সেক্টর প্রকল্পের আওতায় প্রকল্প চলাকালে ১১,৩৩৪.০০ হেঃ উডলট বাগান, ২,৫০৪.০০ হেঃ কৃষিবন বাগান এবং ৫,৭৯২.০ কি:মি: স্ট্রিপ বাগান চূড়ান্ত কর্তন এবং পুনঃবনায়ন করা হবে। হাজার হাজার অংশগ্রহণকারী তাদের লভ্যাংশ দ্বারা নিজেদের আয় বৃদ্ধি করে জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি করতে সক্ষম হচ্ছে।

ঢাকা বন বিভাগের আওতায় অংশীদারিত্বমূলক বনায়ন করে সফল হয়েছেন এমন কয়েকজন উপকারভোগীর বর্ণনা নিম্নে দেয়া হল। এসব সার্থক সামাজিক বন কর্মসূচির জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত বহন করছে। সামাজিক বনায়নের সাফল্যের বিষয়ে আজ সবাই আশাবাদী। সচেতনতা সৃষ্টির ফলে সৃজিত বনে গাছ কাটতে এলাকার জনগণ ও সমাজের দায়িত্বশীল জনগোষ্ঠীর

www.nagorikpathagar.org

আপত্তি রয়েছে। বনায়নের ক্ষেত্রে কোথাও স্বয়ংসম্পূর্ণ বিধান নেই। এ ক্ষেত্রে বিভিন্ন ব্লকে সৃজিত বাগানকে বিভক্ত করে প্রতি বৎসর আহরণ ও বনায়নের কর্মসূচি করে নিয়মিত বনায়ন ও আহরণ করলে সম্পূর্ণ কর্তন (Clear felling) এর প্রয়োজন হবে না। তাতে বন্যপ্রাণীর আবাসস্থলও নষ্ট হবে না।

(ক) জনাব মোঃ জাফর আলী শিকদার, কালিয়াকৈর উপজেলার কাচিঘাটা রেঞ্জের জাথিলা বিটের অন্তর্গত এলাকায় বাস করেন। তিনি থানা বনায়ন ও নার্সারি উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ১৯৯১ সনে সৃজিত কৃষি বন বাগানের উপকারভোগীদের একজন। বাগানটি কর্তনপূর্বক পুনঃবনায়ন করা হয়েছে। গত জুলাই ১০, ২০০১ ইং সনে কর্তিত বনজ দ্রব্যের বিক্রয়লব্ধ অর্থ হতে তিনি তাঁর অংশ হিসেবে ১,২২,৪০০.০০ (এক লক্ষ বাইশ হাজার চারশত) টাকা পেয়েছেন। তিনি একজন ভূমিহীন দরিদ্র লোক। তিনি পৈতৃক সূত্রে বসতবাড়ির জন্য মাত্র ১৫ শতাংশ অনুর্বর জমির মালিক। তার কোন ফসলী জমি নেই। তিনি প্রাপ্ত লভ্যাংশ হতে ৭০,০০০.০০ (সত্তর হাজার) টাকা বিনিয়োগ করে ১২০ (একশত বিশ) শতাংশ ফসলী জমি লিজ নিয়েছেন। তাঁর পরিবারে ৬ (ছয়) জন সদস্য। তিনি বর্তমানে সংসারের চাহিদা মিটিয়ে কিছু পরিমাণ ধান বিক্রি করতে সক্ষম। তিনি প্রাপ্ত লভ্যাংশের একটা অংশ দিয়ে একখানা ঘর নির্মাণ করেছেন এবং বাকি অংশ দিয়ে জমি চাষের জন্য একজোড়া গরু কিনেছেন ও মেয়ের বিয়ের খরচ নির্বাহ করেছেন। এখন তিনি মোটামুটি সচ্ছল। জনাব মোঃ জাফর আলী শিকদার দ্বিতীয় আবর্তের বাগান হতে প্রচুর লাভবান হবেন বলে আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করেন।

(খ) শ্রী খোকন চন্দ্র বর্মণ একজন আদিবাসী। তিনি কাচিঘাটা রেঞ্জের জাথিলা বিটে ১৯৯০ সনে সৃজিত কৃষিবন বাগানের একজন উপকারভোগী। তিনি একজন ভূমিহীন। তিনি পরিবার-পরিজন নিয়ে বন বিভাগ কর্তৃক বরাদ্দকৃত কৃষিবন বাগানের প্লটে বসবাস করেন। তাঁর প্লটের কর্তনকৃত গাছের বিক্রয়লব্ধ অর্থ হতে তিনি গত জুলাই ১০, ২০০১ ইং সনে ৯৮,৫৯০.০০ (আটানব্বই হাজার পাঁচশত নব্বই) টাকা পেয়েছেন। তিনি প্রাপ্ত লভ্যাংশের একটা অংশ দিয়ে ৩০ (ত্রিশ) শতাংশ জমি লিজ নিয়েছেন এবং বাকি টাকা দিয়ে বসবাসের জন্য দুটি ঘর নির্মাণ করেছেন। তাঁর আর্থিক অবস্থার এখন উন্নতি যথেষ্ট হয়েছে। বাগান ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে তিনি অদূর ভবিষ্যতে আরও লাভবান হবেন বলে আশা করেন।

(গ) আমেনা খাতুনের স্বামীও জাথিলা বিটে ১৯৯০ সনে সৃজিত কৃষি বন বাগানের উপকারভোগী ছিলেন। স্বামীর মৃত্যুর পর উত্তরাধিকার সূত্রে তিনি উপকারভোগী হন। মূলতঃ তিনি ভূমিহীন। তিনি বন বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত প্লটের এক অংশে বাস করেন। দুই কন্যা ও এক পুত্র নিয়ে তার সংসার। বাগান হতে আহরণকৃত বৃক্ষের বিক্রয়লব্ধ অর্থ হতে তিনি লভ্যাংশ হিসেবে পেয়েছেন ৫১,৭৫০.০০ (একান্ন হাজার সাতশত পঞ্চাশ) টাকা। উক্ত অর্থের আংশিক অর্থ দিয়ে তিনি ৬০ শতাংশ জমি লিজ নিয়ে বিনিয়োগ করেছেন। উক্ত জমি হতে তিনি যে ধান পান তা তাঁর পরিবারের সারা বৎসরের খাদ্যের চাহিদা মেটাতে যথেষ্ট। তিনি ৫,০০০.০০ (পাঁচ হাজার) টাকা তার বিবাহিত কন্যাকে দিয়েছেন এবং ৩,০০০.০০ (তিন হাজার) টাকা প্রতিবেশীদের ধার শোধ করেছেন। অতীতে জীবিকা অর্জনের জন্য তাকে অন্যের বাড়িতে কাজ করতে হত আর এখন তিনি তার পরিবারের দেখাশোনা করেন। তিনি সুন্দর ভবিষ্যতের প্রত্যাশী।

উৎসঃ Participatory Forestry Newsletter, Bulletin 2 June 2004.

তাই কবি বলেছেন, "নবীর শিক্ষা করো না ভিক্ষা মেহনত করো সবে।"

অংশীদারিত্বমূলক বনায়নের স্থায়িত্বশীলতা

স্থায়িত্বশীলতা যে কোন প্রকল্প কার্যক্রমের সাফল্যের চাবিকাঠি। স্থায়িত্বশীলতা ব্যতীত উন্নয়ন কার্যক্রমের লক্ষ্য বাস্তবায়িত হয় না। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে অংশীদারিত্বমূলক

www.nagorikpathagar.org

বনায়ন কার্যক্রম নিম্নলিখিত বিষয়গুলির জন্য স্থায়িত্বশীল হতে পারে।

অংশীদারিত্বমূলক বনায়ন জনগণকে সম্পৃক্ত করে বনায়নে কার্যক্রম জাতীয় বননীতি (১৯৯৪) এবং ফরেস্ট্রি সেক্টর মাস্টার প্ল্যান (১৯৯৫) এর অন্তর্নিহিত ধারণার সাথে সম্পর্কিত করা। এদেশে অংশীদারিত্বমূলক বনায়ন কার্যক্রমের জন্য রাজনৈতিক অঙ্গীকার রয়েছে। সে কারণে বাংলাদেশে অংশীদারিত্বমূলক বনায়ন কার্যক্রম স্থায়িত্বশীল হবে। অংশীদারিত্বমূলক বনায়ন কার্যক্রমের আওতায় সৃজিত বাগানের সার্বিক রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা করা সরকারি প্রতিষ্ঠান হিসেবে বন অধিদপ্তরের দায়িত্ব। নতুন বন বাগান সৃজন, বাগানের রক্ষণাবেক্ষণ এবং পরিপক্ক বন বাগানের কর্তন/আহরণ স্বাভাবিকভাবে অব্যাহত থাকবে।

দেশে সামাজিক এবং অংশীদারিত্বমূলক বনায়ন কার্যক্রমকে উৎসাহ ও সহায়তা প্রদানের উদ্দেশ্যে বন আইন-১৯২৭ কে ২০০০ সালে সংশোধন করা হয়েছে। ইতোমধ্যে সামাজিক বনায়ন বিধিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে। বন আইন ও সামাজিক বনায়ন বিধিমালা অংশীদারিত্বমূলক বনায়ন কার্যক্রমকে সহায়তা প্রদান করবে এবং এই কার্যক্রমের স্থায়িত্বশীলতাও নিশ্চিত করবে।

সরকার ও দাতা সংস্থার ঋণ থেকে প্রাপ্ত অর্থ দ্বারা উন্নয়ন বাজেটের আওতায় অংশীদারিত্বমূলক বাগান উত্তোলন করা হয়। শুধু সরকার কর্তৃক বরাদ্দ অর্থ দ্বারা অংশীদারিত্বমূলক বনায়নকে স্থায়িত্বশীল করা সম্ভব নয়। সরকারি অর্থ বরাদ্দের ওপর নির্ভরশীলতা কমানোর জন্য চূড়ান্ত কর্তন হতে প্রাপ্ত অর্থের শতকরা ১০ ভাগ নিয়ে ট্রি ফার্মিং ফান্ড (TFF) গঠন করা হয়েছে। অংশগ্রহণকারীদের দ্বারা TFF পরিচালিত হচ্ছে। ধারণা করা হয় যে, TFF পুনঃবনায়নের ৫০% ব্যয় বহন করবে এবং বাকি ৫০% ব্যয় প্রকল্প বহন করবে।

যদি TFF ৫০% ব্যয় বহন করতে না পারে সেক্ষেত্রে অংশগ্রহণকারীগণ স্বতঃপ্রবৃত্ত শ্রমের দ্বারা অবশিষ্ট অংশটুকু পূরণ করবে। তাই আশা করা যাচ্ছে যে, উপকারভোগীদের শ্রম এবং TFF অংশীদারিত্বমূলক বনায়ন কার্যক্রমকে স্থায়িত্বশীল করবে।

বাগানের উপকারভোগীদের নিয়ে "স্থানীয় জনসাধারণের সংগঠন Local Cmmunity Organization (LCO)" তৃণমূল পর্যায়ে একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান যা বাগান উত্তোলন, রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার জন্য দায়িত্বশীল থাকে। বন অধিদপ্তর এবং বেসরকারি সংস্থা (NGO) কর্তৃক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে Local Community Organization (LCO)কে শক্তিশালী করা হচ্ছে। অংশীদারিত্বমূলক বনায়ন কার্যক্রমের স্থায়িত্বশীলতার জন্য "স্থানীয় জনসাধারণের সংগঠন-(LCO)" কে আরো শক্তিশালী করতে পর্যায়ক্রমে উদ্যোগ নেয়া যেতে পারে।

বৃক্ষরোপণে ধর্মীয় বিধান ও সামাজিক সচেতনতা

আমাদের দেশের প্রতিটি মানুষই অত্যন্ত ধর্মপ্রাণ। এদেশে হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান প্রতিটি ধর্মের লোকজনই নিজ নিজ ধর্মের প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল। প্রতিটি ধর্মের লোকজনই

www.nagorikpathagar.org

তাদের ধর্মীয় অনুশাসন ও আচার অনুষ্ঠানে ব্রত। তাই বৃক্ষরোপণ ও বনসম্পদ সংরক্ষণে বিভিন্ন ধর্মের অনুশাসন ও বিধানগুলো তাদের মধ্যে তুলে ধরা যেতে পারে। এ ক্ষেত্রে প্রতিটি ধর্মপ্রাণ মানুষ বৃক্ষরোপণ ও তা সংরক্ষণ ধর্মের কাজ বা পুণ্যের কাজ বলে মনে করবে। ধর্মীয় মূল্যবোধের পাশাপাশি বৃক্ষরোপণ ও সংরক্ষণ করার অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক সুবিধাগুলো তুলে ধরতে পারলে বনায়নের ক্ষেত্রে বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাবে। ধর্মীয় মূল্যবোধ ও চেতনার মাধ্যমে সংরক্ষণ খরচ কমাতে পারলে এ কর্মকাণ্ড হবে নিঃসন্দেহে একটি লাভজনক অর্থনৈতিক কর্মসূচি, যার দীর্ঘস্থায়িত্বের বিষয়ে কেউ প্রশ্ন তুলতে পারবে না। এমন সুফল কর্মসূচি নিশ্চিত করতে পারলে প্রাকৃতিক ভারসাম্য দারিদ্র্য বিমোচন, অর্থনৈতিক অগ্রগতি ও সামাজিক নিরাপত্তাও নিশ্চিত হবে। এক্ষেত্রে কোরআন-হাদিসের আলোকে আল্লাহর মানুষ ও পৃথিবী সৃষ্টির উদ্দেশ্য পর্যালোচনা করা যেতে পারে। আল্লাহ এ পৃথিবীতে মানুষকে তার খলিফা করে সৃষ্টি করেছেন। মানব জাতির কল্যাণ ও অগ্রগতির জন্যই তিনি এ জগতের সব কিছু সৃষ্টি করেছেন। তার সব সৃষ্টিকে তিনি মানব জাতির কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন। তাই পবিত্র কোরআনে বর্ণিত রয়েছে - "পৃথিবীতে তিনি সমস্ত সৃষ্টিই মানব কল্যাণের জন্য বানিয়েছেন। তাতে সকল প্রকারের বিপুল পরিমাণ সুস্বাদু ফল রয়েছে, খেজুর গাছ রয়েছে, এর ফল আবরণে আচ্ছাদিত রকম বেরকমের শস্য, এতে ভুষি ও দানা হয় (সুরা আর রহমান ৫৫ঃ১০)। উপরোক্ত আয়াতে বৃক্ষরাজির সৃষ্টির উদ্দেশ্য স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যা মানুষ ও প্রাণীকুলের খাদ্য সরবরাহ করে। তাই এ বৃক্ষসম্পদ সংরক্ষণ ও পরিচর্যা করা মানব জাতির জন্য একান্ত অপরিহার্য, এর বিপরীত কোন কর্মকাণ্ড করার অর্থ হল আল্লাহর সৃষ্টি বিধান লঙ্ঘন করা এবং আল্লাহর সাথে নাফরমানি করা।

অন্য এক আয়াতে পৃথিবী এবং বৃক্ষরাজি সৃষ্টি এদের সংরক্ষণের তাৎপর্য প্রসঙ্গে বলা হয়েছে। "আমরা জমিনকে বিস্তৃত করে সৃষ্টি করেছি। পাহাড় গড়ে দিয়েছি, এতে সব জাতের উদ্ভিদ যথাযথভাবে মাপা জোখা পরিমাপ সহকারে সৃষ্টি করেছি। জীবিকার উপকরণ সংগ্রহ করে দিয়েছি তোমাদের জন্যও, আর সেই অসংখ্য সৃষ্টির জন্যও যাদের রিযক দাতা, তোমরা নও" (সূরা হিজর ১৫ঃ১৪-১৫)। বৃক্ষসম্পদ বন্যপ্রাণীর আবাস সরবরাহ এবং Life support to ecosystem হিসেবে এর গুরুত্ব অপরিহার্য। তাই বিনা প্রয়োজনে বৃক্ষ নিধনের অর্থ হল মানব জাতির এবং প্রাণীকুলের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত রিযকের ক্ষতিসাধন করা। এ আয়াতে ইঙ্গিত করা হয়েছে, গাছপালা ও বৃক্ষলতার মাধ্যমে তিনি তার সৃষ্টিজগতের রিযক সরবরাহ করেছেন। এ রিযকের ক্ষতিসাধনের অধিকার কারো নেই। মানুষ আল্লাহর খলিফা হিসেবে এ সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ ও সংরক্ষণ করা তার বাধ্যতামূলক দায়িত্ব।

এ পৃথিবীকে সুন্দরভাবে বসবাসযোগ্য এবং পরিচ্ছন্ন পরিবেশ সৃষ্টি করার জন্য আল্লাহ প্রাণী জগতের বিভিন্ন উপাদান সৃষ্টি করেছেন, তার মধ্যে গাছ একটি। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কোরআনে স্পষ্ট ঘোষণা করা হয়েছে- "যিনি আকাশমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন, তা থেকে

www.nagorikpathagar.org

তোমাদের জন্য পানি বর্ষণ করবেন, যা পান করে তোমরা পরিতৃপ্ত হও। এর মধ্যে বৃক্ষসম্পদও রয়েছে যা প্রাণীকুলের রিযক হিসেবে ফল দেয়" (সূরা নহল ১৬:১০)। সৃষ্টির এ ধারাকে অব্যাহত রাখা প্রসঙ্গে এবং গাছপালার জন্য, উৎপাদন এবং জীবন সম্বন্ধে উল্লেখ করে পবিত্র কোরআনে উল্লেখ রয়েছে, "তিনিই সব রকমের ফল ফলাদি জোড়া জোড়া সৃষ্টি করেছেন, তিনিই দিনের উপর রাতকে আবর্তিত করেছেন। এ সমস্ত জিনিসেই বহু বড় নিদর্শন রয়েছে তাদের জন্য যারা চিন্তাভাবনা করে কাজ করে (সূরা রাদ ১৩:৩)।

আল্লাহ্ তার খলিফাকে কৃষি, শিল্প এবং বাণিজ্যের মাধ্যমে সম্পদ সৃষ্টি করে নিজেদের প্রয়োজন মিটানোর জন্য দায়িত্ব প্রদান করেছেন। আর এ সুফল লাভ করার জন্য মানব জাতিকে সার্বক্ষণিক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। এ প্রচেষ্টার সুফল পেতে হলে এ কর্মসূচি সুসমন্বিত ও সুপরিকল্পিত হতে হবে। তারই অংশ হিসেবে বাংলাদেশে প্রতি বৎসর গণচেতনা সৃষ্টি করার জন্য সরকারি বেসরকারি এবং ব্যক্তিগত উদ্যোগে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়ে থাকে। এসব উদ্যোগ নিঃসন্দেহে অত্যন্ত সময়োপযোগী পদক্ষেপ। এসব উদ্যোগ এবং প্রচেষ্টাকে উৎসাহিত করে পবিত্র কোরআনে বর্ণিত রয়েছে, "হে নবী (সাঃ) লোকদের বল তোমরা কাজ কর; আল্লাহ্ তোমাদের তার রাসুল (সাঃ) এবং মুমিনগণের কাজ লক্ষ্য করবেন"(সূরা তওবা ৯:১০৫)। মানুষ ও জ্বীনকে আল্লাহ্ একমাত্র তার এবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছেন। এছাড়া প্রতিটি বৃক্ষলতাও আল্লাহর তসবিহ্ করে, পবিত্র কোরআনে উল্লেখ রয়েছে- "এবং তারকা ও গাছপালা সেজদায় অবনত" (সূরা আর রহমান ঃ ৫৫ঃ৬)। অনুরূপ অন্য একটি আয়াতেও বলা হয়েছে- "জমিন ও আসমানে যত পরিমাণ জানদার মখলুক রয়েছে আর আছে যত ফেরেস্তা সবই আল্লাহর সামনে সেজদায় অবনত"(সূরা নহল ১৬ঃ৪৯)। তাই এ কথা সন্দেহাতীতভাবে বলা চলে যে, বৃক্ষ তথা সব প্রাণীকুল আল্লাহ্ তসবীহ্ করায় নিয়োজিত, এক্ষেত্রে প্রশ্ন জাগে- যথার্থ প্রয়োজন ব্যতীত বৃক্ষ নিধন ও প্রাণী হরণ করা কি পাপ নয়।

বৃক্ষ নিধনের প্রতি নিষেধাজ্ঞা দিয়ে হাদিসে বলা হয়েছে- "সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য ব্যতীত গাছের একটি পাতাও ছিঁড়বে না। বাড়ির আঙিনা পরিষ্কার রাখার জন্য, বাগানের সৌন্দর্যের জন্য গাছ ছাঁটাই করা যেতে পারে। চিকিৎসার উদ্দেশ্যে গাছ বা গাছের পাতাকে ব্যবহার করা যেতে পারে। কিন্তু খেলার উদ্দেশ্যে, অপ্রয়োজনে গাছের একটি পাতাও ছেঁড়া যাবে না" (বোখারী আল আদাব আল মুযাররাফ)।

ফুল, পাখি এবং প্রকৃতির অন্যান্য অধিবাসী প্রভুর সুবিচার ও সুবিন্যস্তভাবে আত্মপ্রকাশ করে, যেন প্রতিটি প্রাণী পূর্ণভাবে বেড়ে উঠতে পারে এবং জীবনের পূর্ণতা লাভ করতে পারে (ফারনান্দেজ, ১৯৯১)। তাই লক্ষ্য করা যায় যে, ক্রিসমাসট্রিকে এ ধর্মের লোকজন নিজ বাড়ীর আঙ্গিনায় কত যত্ন করে লালন পালন ও বড় করে এবং বড়দিনের অনুষ্ঠানে কিভাবে সাজিয়ে রাখে। অনুরূপভাবে, হিন্দু ধর্মসহ অন্যান্য ধর্মেও পূজা অর্চনার উপকরণ হিসেবে গাছকে ব্যবহার করা হয়। বৌদ্ধ ধর্মেরও শিক্ষা জীবজগতের গুরুত্ব অপরিসীম। এ ধর্মে

www.nagorikpathagar.org

জীব হত্যা অপুণ্যের কাজ বলে বিবেচিত। জোরাওস্টারের অনুসারীগণ বলে থাকেন, "প্রতিটি ফুল এক একটি ফেরেস্তার ন্যায়"।

ফুলের কদর

ফুলের কদরের শেষ নেই, নবাগত শিশুকে স্বাগত জানানো থেকে মৃত্যুর পর কবরেও শ্রদ্ধা জানানো হয় সর্বত্র। কিছুকাল আগেও আমাদের দেশে ফুলের বাণিজ্যিক চাষ ছিল না। ফুলের ব্যাপক ব্যবহার সমৃদ্ধ করেছে আমাদের সংস্কৃতি ও মূল্যবোধকে। সম্প্রসারিত করেছে বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ড, সুযোগ সৃষ্টি করেছে কর্মসংস্থানের ও দারিদ্র্য বিমোচনের। তাই ফুলের কদর বেড়েছে অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে। অফিসের টেবিলে ছোট একটি ফুলদানীতে একটি গোলাপ নিজেকে যেমন উৎফুল্ল রাখে তেমনি অভিভূত করে দর্শনার্থীদের ও অফিসের অন্য সহকর্মীদের।

ফুল ছিল প্রকৃতির একান্তই একার। এখন তা হয়ে যাচ্ছে মানুষের। খুব সকালে আমাদের বাগানে কেউ ফুল নিতে আসুক আর না আসুক, নিজে ঘুম থেকে উঠেই দেখা হচ্ছে ফুল। আর টবের ফুল বলেই নাক সিটকানোর দিন আর নেই। তাহলে কি 'নিশিপদ্ম'-কে ফোটার জন্য এতো তোয়াজ করতে হয়। টবের বাগানে শুধু নিশিপদ্ম কেন, ফুটছে গোলাপ, রজনীগন্ধা, কখনও কখনও বেলি। হয়তো কোনও বিলাসী মানুষ ঘরের ভিতর ও এমনকি অনেকেই ছোট জলাশয়ে জলপদ্মও ফুটিয়ে তুলেছেন। টবের বাগান এখন আর নাগরিক জীবনে বিলাসিতা নয়, প্রয়োজন। স্ট্যাটাস বজায় রাখার প্রয়োজনে ফুল দিয়ে ড্রয়িং সাজানো তো হালে আধুনিক ফ্যাশন হয়ে দাঁড়িয়েছে সর্বত্রই, যা উন্নত রুচিরই পরিচয় ঘটে।

গাড়ি বা রিকশা আটকে গেছে জ্যামে। হাঁসফাঁস করছে মানুষ। ঘামে ও উদ্বিগ্নে। হঠাৎ এগিয়ে এলো ফুল হাতে একজন কিশোরী। দশটা তাজা গোলাপ দাম মাত্র দশ টাকা। সহজে একজন কিনে নেয় আপনজনের জন্য এমনকি নিজের ডেস্কে রেখে দেয়া যায়, যে আসছে সেই প্রশংসায় ঝলমল করছে।

ফুল নেই কোথায়? সকালের শুরু থেকে জীবনের শুরুতেই। বান্ধবীর মেয়ে হয়েছে, কাপড়-জামার সঙ্গে সেই মেয়েও পেয়ে গেল এক গুচ্ছ ফুল। আর মৃতপ্রায় যে রোগী তার মুখেও চাঁদের মতো সরু হাসি ফোটাতে পারে ফুল। বিয়ের গেটে, বিশেষ করে হলুদের গেটেও ফুলের ঝালর আর হলুদের মণ্ডপ তো ফুল ছাড়া ভাবাই যায় না আজকাল। কনে বউয়ের কানে দোলে হলুদ গাঁদার ফুল মাথার মুকুট বাহুচিতা। আর কনের গলার ভালবাসার ফুলের মালা। এমন যে বেহুলা, যার কপালে বিয়ের রাতে বৈধব্য লেখা হয়, তার বাসর ঘরও ফুলে ফুলে ছেয়েছিল। হালে নারীর ফুলপ্রীতি আরও বেশি বেড়েছে সর্বত্র। তাই ফুল দিয়ে সাজানো নেই এমন ঘাটে বসে কোন পুরুষ কোন নারীর হাত ধরার সাধ্যও নেই। তাই ফুলেরই জয়জয়কার।

সবকিছু ছাপিয়ে গেছে– গাড়ির গায়ে যখন ফুল ফুটেছে। আগে বিয়ের গাড়ি সাজাতে হতো- রাংতা, ঝালর এমনকি আকসান দিয়ে। আর এখন শুধুই ফুল। শুধু ফুলের গায়ে ঝুলে আছে ছোট একটু সিল্কের 'নট' কিংবা নেট। আর বর বধূর গায়ে ঝরছে ফুলের পাপড়ি।

এতো গেল শুধু বিয়ের কথা। ফুল নেই কোথায়? কবিরা কবিতা পড়বে- সেই দাওয়াতের চিঠিতেও ফুল। কার্ডের পাশে খুব ছোট করে লেখা থাকে ফুল আনতে ভুল যেন না হয়। যে আসরে কিংবা আবৃত্তিকার সবার হাতে, টুকটুকে গোলাপ কিংবা রজনীগন্ধা। জন্মদিনের অনুষ্ঠানে কেকের দিকেই নজর বেশি সবার। দেখি তো কেমন হল কেকটা- কতটা উঁচু, ওজন কেমন কিংবা ডিজাইন। কিন্তু কেকের পাশেই যখন উঁকি দেয় এক থোকা ফুল তখন কেকের 'হ্যাপি বার্থ ডে' ডিজাইনও হেরে যায় গোলাপ, রজনীগন্ধা কিংবা ক্রিসেন পিসামের কাছে। 'ম্যারেজ ডে'-এর ডিনার টেবিলে সুস্বাদু খাবারের পাশে সুবাস ছড়ানো ফুল অতিথির মন কেড়ে নেয়। গোলাপ শুধু সুবাস ছড়ায় না, মানুষকে সুবাসিতও করে। গোলাপের পাপড়ি পানিতে ভিজিয়ে রেখে সেই পানি মুখে দিলেও রূপ চাঁদের মতো খোলতাই হবে। জবা ফুল বেটে মাথায় দিলে গরম মাথা ঠাণ্ডা হবে। কালো চুলের ঢল নামবে। ফুলকে আর ফ্যালনা ভাবা যায় না। ফুল এখন সব্যসাচী। অনেক কাজের কাজী। তবে সবচেয়ে বড় কাজ তুমি ফুলের মতো সুন্দর এর চেয়ে বড় উপমা আর নেই (যুগান্তর, ৩০ জুন, ২০০৮)।

পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মতো আমাদের দেশেও শ্রদ্ধা নিবেদনের উপকরণ হিসেবে ব্যবহৃত হয় ফুল। এভাবে যে কোন ধর্ম ও সংস্কৃতির দিক বিশদভাবে আলোচনা করলে দেখা যাবে, গাছপালা, ফল-ফুল ইত্যাদির ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক তাৎপর্য অপরিসীম। ধর্মীয় এসব অনুভূতি

www.nagorikpathagar.org

ও সংস্কৃতিকে আমাদের সমাজে তুলে ধরতে পারলে বৃক্ষরোপণ ও এর পরিচর্যা সব ধর্মের মানুষের কাছে নৈতিক ও পুণ্যের কাজ বলে বিবেচিত হবে। ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সব মানুষ গাছের পরিচর্যা পুণ্যের কাজ বলে বিবেচনা করতে শিখলে আর শ্রদ্ধার্ঘ হিসেবে ফুল ব্যবহৃত হলে, বিভিন্ন শাকসবজির সুফল সম্বন্ধে সাধারণ মানুষ অবগত হলে নিঃসন্দেহে গাছপালা, ফলমূল ও ফুলের চাষ বৃদ্ধি পাবে।

উপসংহার

অর্থনৈতিক ও সামাজিক গুরুত্বের পাশাপাশি এভাবে ধর্মীয় অনুভূতি ও প্রতিষ্ঠিত সংস্কৃতির যথাযথ ব্যবহার করে মরুময়তার আতঙ্ককে সবুজ বিপ্লবে পরিণত করা যেতে পারে। এ পর্যায়ে বৃক্ষরোপণে ধর্মীয় মূল্যবোধকে তুলে ধরার জন্য নিম্নোক্ত সুপারিশ রাখা যেতে পারে। প্রথমতঃ ইমাম প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে এ বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। প্রতিটি মসজিদ মন্দিরে ধর্মীয় গুরুরা খোতবা / আলোচনার মাধ্যমে এ মূল্যবোধকে তুলে ধরতে পারেন। ইসলামী ফাউন্ডেশন পরিবেশের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তুলে ধরে মসজিদের জন্য খোতবা অন্তর্ভুক্ত করতে পারে। তাতে প্রতিটি প্রাকৃতিক সম্পদের সংরক্ষণ ও ব্যবহার সম্বন্ধে মুসলমানদের ভূমিকা সম্বন্ধে আলোকপাত থাকতে পারে। দ্বিতীয়তঃ স্কুল মাদ্রাসার সিলেবাসের ধর্মীয় শিক্ষার সাথে বিজ্ঞান শিক্ষার সমন্বয় করে পাঠ্যসূচি পুনর্গঠন করা যেতে পারে। প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এবং বাড়ির আঙিনায় ছাত্রছাত্রীদের জন্য প্রদর্শনী খামার তৈরি করা যেতে পারে। এসব প্রদর্শনী খামারের সব পরিচর্যার এবং সংরক্ষণের কাজ করবে ছাত্রছাত্রীরা। এ ক্ষেত্রে বাড়ির আঙিনার খামারের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব পালনে মা-বাবাও নিজ সন্তানকে হাতে-কলমে শিখাতে পারেন। তৃতীয়তঃ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলি নিজ নিজ এলাকায় বিভিন্ন সংস্থার রাস্তার ধারে বনায়নে সহায়তা করতে পারেন। এভাবে ধর্মীয় মূল্যবোধকে পুঁজি করে দেশের সবুজ বিপ্লব সফল করে অর্থনৈতিক অগ্রগতি ত্বরান্বিত করা যেতে পারে।

www.nagorikpathagar.org

সহায়ক গ্রন্থপুঞ্জি ঃ

National Conservation Strategy (NCS) (1999), Ministry of Environment and Forest, Government of Bangladesh.

Billah, AHM Mustain (2007), Fuelwood Energy and Environmental concern in Bangladesh, Edited by M. Faizul Islam, Syed Saad Andaleeb, University Press Limited, Dhaka, Bangladesh

Billah, AHM Mustain (2003), Green Accounting : A Tropical Experience, Palak Publishers, Dhaka

Forest Department (2004), Participatory Forestry Newsletter Bulletine, 2 June, 2004

Billah A. H. Mustain (2001) Tree Plantation - A virtue, স্মরণিকা জাতীয় বৃক্ষরোপণ অভিযান ও বৃক্ষমেলা ২০০১, বন বিভাগ।

Agwan, A. R. (1997) Islam and the Environment, Synergy Book International, Malaysia

Yasin Duttun (1999) Natural Resource in Islami Jesus College, Oxford, UK

Yasin Duttun (1999) The Environemntal Crists of Our Time : A Muslim Response, University of Edinburgh, UK

Yasin Duttun (1996) Faiths and the Environment, Middlesex University, London

Ali Ali Sukri (1995), Al-Bia Min Manjur Islami, Egypt

Abdul Qader Fakhi (1993), Al-Bia Masakeluha, Wa kazayaha wa Mamayatuha Misattalayuse, Egypt.

দৈনিক ইত্তেফাক, ১৫ জুলাই, ১৯৯৯

দৈনিক যুগান্তর, ৫ মে, ২০০০

দৈনিক যুগান্তর, ২৯ জুন ২০০১

দৈনিক যুগান্তর, ৩০ জুন ২০০৮

আতিকুল আজম (২০০১), স্মরণিকা জাতীয় বৃক্ষরোপণ অভিযান ও বৃক্ষমেলা ২০০১, বন বিভাগ।

তৌহিদুর রহমান "সজনে বিস্ময়কর গুণী বৃক্ষ" দৈনিক প্রথম আলো, জুন, ২০০৫।

মজিদ মাহমুদ "বৃক্ষ জীবন ও কবিতা "দৈনিক যুগান্তর ৫ মে, ২০০০।

ইলিয়াস খান "ক্রমেই বৃক্ষশূন্য হয়ে পড়ছে রাজধানী" দৈনিক জনকণ্ঠ ২৫ জুন, ২০০০।

অলিউল্লাহ নোমান "উজাড় হয়ে যাচ্ছে শেডট্রি কমছে উৎপাদন" দৈনিক ইনকিলাব, ১৭ জুন, ২০০০।

কৃষিবিদ শেখ মোঃ বখতিয়ার "পরিবেশ দূষণে মারাত্মক প্রতিক্রিয়া : বৃক্ষের ভূমিকা।"

শামছুর রহমান "বৃক্ষের জন্য" দৈনিক জনকণ্ঠ ২৩ জুন ২০০০।

এ জেড এম শামছুল আলম : ইসলামে বৃক্ষরোপণ, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়।

খায়রুল ইসলাম "কাঁঠাল কাহিনী" দৈনিক যুগান্তর ২৮ জুন, ২০০২।

www.nagorikpathagar.org

তৃতীয় অধ্যায়

প্রাণী সম্পদ সংরক্ষণ

"ওহে জগৎবাসী, জগতে আল্লাহর সৃষ্ট প্রাণীজাতির প্রতি সদয় হও; স্বর্গবাসীও তোমাদের প্রতি দয়াশীল হবেন" (তিরমিযী)*,

সারাংশ

প্রকৃতির কোন কিছুই বৃথা সৃষ্টি করা হয়নি। আমি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং তাদের মধ্যে কোন কিছুই ক্রীড়াচ্ছলে সৃষ্টি করিনি (সূরা দুখান আয়াত ৩৮)। সৃষ্টির প্রতিটি উপাদানের প্রধানত দুটি তাৎপর্য রয়েছে। প্রথমত সব সৃষ্টিই সৃষ্টিকর্তার পবিত্রতা ঘোষণা করে। "তুমি দেখ না যে, আকাশমণ্ডলী এবং পৃথিবীতে যারা আছে এবং উড্ডীয়মান বিহঙ্গকুল আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে। প্রত্যেকেই জানে তাঁর ইবাদতের ও পবিত্র ঘোষণার পদ্ধতি এবং ওরা যা করে আল্লাহ্ সম্যক অবগত।" (সূরা নূর আয়াত ৪১) দ্বিতীয়ত সৃষ্টির সকল উপাদান মানব গোষ্ঠীর কল্যাণের জন্য নিয়োজিত প্রত্যক্ষভাবে অথবা পরোক্ষভাবে, আল্লাহ্ তোমাদের কাজে নিয়োজিত রেখেছেন পৃথিবীর সব বস্তু (সূরায়ে হজ্জ, আয়াত ৬৫)।

এ পৃথিবী মানুষের ও সকল প্রাণীর আবাসস্থল। আর যত ধরনের প্রাণী পৃথিবীতে বিচরণশীল এবং যত ধরনের পাখি ডানা মেলে বেড়ায় তারা সবাই তোমাদেরই মত একেকটি শ্রেণী (সূরা আনআম আয়াত ৩৮)। এতে স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয়, এ পৃথিবীতে বাঁচার অধিকার সবারই সমান। এর দুটি তাৎপর্য রয়েছে, যে প্রাণীকে মানব কল্যাণের ও সেবার জন্য তৈরি করা হয়েছে, তাকে সে সেবায় নিয়োজিত হতেই হবে। পক্ষান্তরে প্রকৃতির এসব সৃষ্টির কোনটির ধ্বংস, বিনাশ, ক্ষতি অথবা অপচয় হলে সৃষ্টির বিশাল নেটওয়ার্কের ভারসাম্যহীনতা সৃষ্টি হবে এবং প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঘটবে।

উপরোক্ত অবস্থার প্রেক্ষাপটে প্রাণী সম্পদের অর্থনৈতিক গুরুত্ব, বিশেষত পশু পালনের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সাফল্য কথা আলোচনা করা হয়েছে। প্রাণী সম্পদের সাংস্কৃতিক গুরুত্ব আলোচনা করতে গিয়ে এদের তিনটি উপকারিতার কথা আলোচনা করা হয়েছে (১) প্রাকৃতিক ভারসাম্য (২) চিত্তবিনোদন ও(৩)প্রাত্যহিক ব্যবহার। এরা পারস্পরিক প্রতিরোধ ও সমতার ভিত্তিতে বসবাস করছে, যেমন সুন্দরবনের বাঘ ও হরিণের মধ্যে ভারসাম্য রয়েছে।

আমাদের মৎস্যসম্পদের কথা আলোচনা করলে দেখা যাবে, মৎস্যসম্পদ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য অপরিহার্য। এ সম্পদ পুষ্টির জন্য অত্যাবশ্যক, অথচ অপরিকল্পিত আহরণের ফলে তা আজ মারাত্মক হুমকির মুখে। বন্যপ্রাণীর উপকারিতার শেষ নেই। অথচ এর আবাসভূমি সংরক্ষণ ও পরিচর্যার কথাতো দূরের কথা, এদের প্রতি আমাদের আচরণ অত্যধিক নিষ্ঠুর। বহুকাল থেকে বহু আইন ও নীতি রচিত হয়েছে কিন্তু এসব সম্পদ সংরক্ষণের কেউ নিশ্চয়তা দিতে পেরেছে কি? তাই আজ খুঁজতে হবে সমস্যার উৎস কোথায়? প্রথমতঃ দারিদ্র্য, যা নিরসনে প্রয়োজন শিক্ষা ও অবকাঠামো তৈরি। দ্বিতীয়তঃ মূল্যবোধ, যার জন্য প্রয়োজন গণসচেতনতা ও জনগণের অংশগ্রহণ। রাজনৈতিক সংগঠন, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের সম্মিলিত প্রচেষ্টাই এ উদ্যোগকে সফল করতে পারে।

www.nagorikpathagar.org

ভূমিকা

প্রকৃতির সৃষ্টির রহস্য একটু চিন্তা করলে অতিসহজেই অনুমান করা যায় এর বৈচিত্র্য ও তাৎপর্য। সুন্দর প্রকৃতি মানব মনকে সব সময় আনন্দ দেয় এবং প্রফুল্ল রাখে। কিন্তু আমাদের মতো ঘনজনবসতি ও উন্নয়নশীল দেশের জন্য সর্বত্রই প্রকৃতি মারাত্মক বিপর্যয়ের সম্মুখীন, যা প্রকৃতি কার্যনে ও মানব সৃষ্ট কার্যনে হতে পারে। পরিবেশ বিপর্যয়ের জন্য দারিদ্র্যকে প্রধান কারণ হিসেবে বলা হলেও আনুষঙ্গিক অন্যান্য কারণ বিশ্লেষণ ও বিবেচনায় আনা প্রয়োজন। যেমন দারিদ্র্য ছাড়াও আমাদের রয়েছে উপযুক্ত শিক্ষা ও নৈতিকতার অভাব, বিশেষত ধর্মীয় মূল্যবোধ যা মানুষের রিপুকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যায়, ধরিত্রীর অজস্র প্রাকৃতিক সম্পদের মধ্যে প্রাণী সম্পদের গুরুত্ব অপরিসীম বিশেষত খাদ্যচক্রে এর অর্থনৈতিক তাৎপর্য, সামাজিক গুরুত্ব এবং সাংস্কৃতিক মূল্যবোধও বহুবিধ। এতো উদ্যোগ ও প্রচেষ্টার পরও এ সম্পদের অবক্ষয় ও বিলুপ্তি ঘটছে অতিদ্রুত, যা এ ধরিত্রীর প্রতিবেশগত ভারসাম্যহীনতার জন্য মারাত্মক হুমকি স্বরূপ। এ জন্যে আমাদের দেশসহ পৃথিবীর অনেক দেশেই নানামুখী উদ্যোগ ও কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু আশানুরূপ সুফল আসছে না অনেকে ক্ষেত্রেই। এসব বিবেচনায় এজেন্ডা ২১এর নীতি অনুসরণে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধকে যথাযথ ব্যবহার করার জন্য সর্বোপরি প্রচেষ্টা চলছে। আমাদের মত Transitional economy-তে অনিয়ম, আইন-শৃঙ্খলার অবনতি ও নীতি ভঙ্গের বিষয়টি নিত্যনৈমিত্তিক বিষয়। এক্ষেত্রে সুন্দর সুন্দর আইন ও নীতি থাকলেও এদের প্রয়োগ অত্যন্ত দুর্বল। কারণ বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, দারিদ্র্য ছাড়াও মানুষের লোভ, লালসা ও নৈতিক অবক্ষয়ের জন্য আইনের শাসন ক্রমশই দুর্বল হয়ে যাচ্ছে। তাই সামাজিক বিশ্লেষণে দেখা যায়, মানব জাতির সভ্যতার সোপান নৈতিক মূল্যবোধ, বিশেষত ধর্মীয় মূল্যবোধ জাগিয়ে তোলা আমাদের একান্ত প্রয়োজন। এদেশের নানাবিধ আইন ও নীতির প্রয়োগের পাশাপাশি সামাজিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধ প্রাণী সম্পদ সংরক্ষণে অনেক সহায়ক হতে পারে বলে আলোচ্য প্রবন্ধটিতে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

মহান আল্লাহর এক বিশেষ নেয়ামত হিসেবে আমরা পেয়েছি এ সুন্দর পৃথিবী ও এর মনোরম পরিবেশ। এ ধরিত্রীর পরিবেশ ভারসাম্য রক্ষায় প্রাণী সম্পদের গুরুত্ব অনন্য ও অপরিসীম। এ সম্পদ সংরক্ষণের ক্ষেত্রে জনমানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন ও সর্বোপরি অর্থনৈতিক উন্নয়নে এর তাৎপর্য অনেক। এ ক্ষেত্রে সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও রহস্যের বিষয় আলোচনা করা যেতে পারে। আল্লাহর সৃষ্টির প্রতিটি উপাদানই পরিমিতভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে। সৃষ্টির কোন বস্তুই কোন অবস্থাতেই বিনা প্রয়োজনে সৃষ্টি করা হয়নি, বরং প্রতিটি প্রাণীকে আল্লাহর সৃষ্টির গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে তৈরি করা হয়েছে। জীববৈচিত্র্যের প্রতিটি প্রাণী ও এর প্রজাতি তার নিজস্ব গুণের এবং বৈশিষ্ট্যের ভিন্নতাও রয়েছে। কোন

www.nagorikpathagar.org

প্রাণীর প্রজাতি একবার যদি বিলুপ্ত হয়ে যায় তা চিরদিনের জন্য হারিয়ে যায়। এ প্রাকৃতিক সম্পদের প্রধান কাজ হল মানবকুলের জন্য খাদ্য সরবরাহ করা। এ খাদ্যচক্র সম্বন্ধে পবিত্র কোরানে উল্লেখ রয়েছে, "অতঃপর এতে উৎপাদিত করেছি শস্য, আঙ্গুর, তরিতরকারী জয়তুন, খেজুর, ঘন সন্নিবেশিত বাগিচা আর রকম বেরকমের ফল ও উদ্ভিদ খাদ্য। এ খাদ্য সৃষ্টি করেছি তোমাদের জন্য এবং তোমাদের চতুষ্পদ জন্তুর জীবিকা সামগ্রীরূপে" (সুরা আবাসা ৮০:২৭-৩২)। উল্লেখ্য, জীবিত ও মৃত উভয় অবস্থাতেই প্রাণীর গুরুত্ব অনস্বীকার্য যেমন গরুর গোবর এবং এমনকি মৃত প্রাণীর ধ্বংসাবশেষও গাছপালার জন্য সার হিসেবে ব্যবহৃত হয়। বিভিন্ন প্রাণীর চামড়া, চুল দিয়ে শীত বস্ত্র ও অন্যান্য অনেক প্রয়োজনীয় সামগ্রী তৈরি হয়। প্রাণী সম্পদ ঔষধ, প্রসাধনী, গোশত, দুধ ও মধুসহ আরো অনেক ধরনের খাদ্য সামগ্রীর যোগান দেয়। প্রাণীকুলের নিজস্ব বৈচিত্র্য ও সৃষ্টিজগতে অবদান রাখার জন্য তাদের বিশেষ ভূমিকাও রয়েছে। যেমন অনেক প্রাণী মানুষের খাদ্য উপকরণ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। কোন প্রাণী বাহন হিসেবে এবং কোন প্রাণী প্রকৃতির সৌন্দর্য বৃদ্ধির উপকরণ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। পবিত্র কোরানে উল্লেখ রয়েছে, "জমিনের উপর বিচরণশীল কোন জন্তু এবং বাতাসে ডানার সাহায্যে উড়ন্ত কোন পাখি দেখ, এরা তোমাদের মতই বিভিন্ন জাতি প্রজাতি" (সুরা আন-আম ৫ঃ ৩৮)। পবিত্র কোরানে প্রাণীকুলকে মানুষের অর্থনৈতিক কল্যাণে সৃষ্টি ও নিয়োজিত করা হয়েছে বলে উল্লেখ রয়েছে (৬ঃ১৪২; ১৬ঃ৬ এবং ৪০ঃ৮০) যেমন "খোদাই গৃহপালিত জন্তুদের মধ্যে এমন জন্তুও সৃষ্টি করেছেন যা যাত্রী বহন ও ভার বহনের কাজে ব্যবহৃত হয় এবং যা খাদ্য ও বিছানার প্রয়োজন পূর্ণ করে" (সুরা আন-আম ৬ঃ১৪২)। প্রাণী সম্পদের সব সেবাই মানব কল্যাণে নিবেদিত ও নিয়োজিত। পশুপাখি এবং সকল প্রাণীই আল্লাহর নির্দেশিত পন্থায় কতক পশু আমরা পরিবহন কাজে ব্যবহার করি, কতক কৃষি কাজে এবং কতক পশু/পাখির মাংস দুধ আমরা খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করি। আল্লাহর এ অবারিত নেয়ামত প্রসঙ্গে পবিত্র কোরানেও উল্লেখ রয়েছে, "তারা কি দেখে না তাদের দ্বারা নিজ হাতে চতুষ্পদ জন্তু সৃষ্টি করেছি। অতঃপর তারাই এগুলোর মালিক অর্থাৎ ব্যবস্থাপনা করবে। আমি এগুলো তাদের হাতে অসহায় করে দিয়েছি (সেবায় নিয়োজিত)। ফলে এদের কতক তাদের বাহন এবং কতক তারা ভক্ষণ করে। তাদের জন্য চতুষ্পদ জন্তুর মধ্যে অনেক উপকারিতা ও কল্যাণ রয়েছে। তবু কেন তারা শুকরিয়া আদায় করে না" (ইয়াসিন ৩৬:৭১-৭৩)।

আল্লাহর বিশেষ নেয়ামত প্রাকৃতিক সম্পদ তথা প্রাণী সম্পদ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার অভাবে মানবকল্যাণের ব্যাঘাত ঘটতে পারে, সেজন্য মানুষকেই মহান প্রভুর কাছে জবাবদিহি করতে হবে। এ প্রসঙ্গে হাদিসে বলা হয়েছে, কিয়ামত দিবসে আল্লাহ মানুষকে বলবেন, আমি কি তোমাকে চক্ষু, কর্ণ, সম্পদ এবং সন্তান দান করিনি? এবং চতুষ্পদ জন্তু এবং শস্য ক্ষেত তাদের আওতাধীন করে দেইনি? এবং এগুলোর রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব তোমাদের ওপর ছেড়ে দিয়েছি। অতঃপর তুমি কি আজকের দিবসে সাক্ষাৎ ঘটার ব্যাপারে ভেবেছিলে?

www.nagorikpathagar.org

বান্দা বলবে, না। আল্লাহ বলবেন ঃ "তুমি যেভাবে আমাকে ভুলে গিয়েছিলে আজ আমি তোমাকে সেভাবেই ভুলে যাব" (তিরমিজী)।

প্রাণীর মৃত্যুর পর এর হাড়, চোয়াল কোন কিছুই ফেলনা নয় এবং বর্জ্য বলে তাচ্ছিল্য করার কোন কারণ নেই। আমাদের জ্ঞানের সীমাবদ্ধতার জন্য এগুলোকে সম্পূর্ণভাবে অর্থনৈতিক সম্পদ হিসেবে ব্যবহার করতে পারছি না। তবে সম্প্রতিকালে ঔষধ তৈরির জন্য এসব বিদেশে রফতানি করা হচ্ছে। আমাদের দেশে ব্রয়লার শিল্প অত্যন্ত বিকাশমান। এজন্যে পোল্ট্রি ফিড অতিমূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয়ে আমদানী করা হয়ে থাকে। ফলে আমাদের দেশে প্রাণীর হাড় দিয়ে পোলট্রিফিডস তৈরি করা হচ্ছে। কিছু কিছু ঔষধ কোম্পানি এসব হাড় কেনার ফলে এসব হাড় এখন অর্থনৈতিক সম্পদে পরিণত হয়েছে। ঢাকা শহরের মাতুয়াইল এবং মৃধাবাড়ী এলাকায় Bone Factory স্থাপন করা হয়েছে। এসব ফ্যাক্টরির মালিকরা জানান, তারা কসাইখানা, কসাই এবং টোকাইদের কাছ থেকে এসব হাড় (Bone) ক্রয় করে থাকেন। কাঁচা হাড় সাধারণত প্রতিমণ ৮০ থেকে ১০০ টাকা দরে বিক্রি হয়। প্রসেস করা হাড়ের মূল্য প্রতিমণ ১৭০ থেকে ১৮০ টাকা। তাদের প্রতিটি ফ্যাক্টরিতে প্রায় ৩০ জন লোক কাজ করে। প্রতিদিন তাদের মজুরি হিসেবে খরচ হয় ৬০-৮০ টাকা। এসব সম্পদকে টেকসই ও সমৃদ্ধ করার দায়িত্ব মানুষের। উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষাপটে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক গুরুত্ব বিবেচনা ছাড়াও ধর্মীয় নৈতিকতা বোধে প্রাণী সম্পদ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন দিক এ প্রবন্ধে আলোচনা করা হয়েছে।

প্রাণী সম্পদ সংরক্ষণের অর্থনৈতিক গুরুত্ব

বাংলাদেশের মতো কৃষিপ্রধান দেশে গৃহপালিত পশুসম্পদের গুরুত্ব কারো অজানা নয়। চাষাবাদের জন্য আমাদের দেশের কৃষকদের বেশির ভাগই গো-মহিষের ওপর নির্ভরশীল। তাছাড়া দুধ, ডিম ও মাংস ইত্যাদির জন্য আমাদের গৃহপালিত প্রাণীর ওপর নির্ভর করতে হয়। বন্য প্রাণীর অর্থনৈতিক গুরুত্ব ডলারে হিসাব করলে বেশ বিরাট বলে প্রমাণিত হবে নিঃসন্দেহে।

এমনকি পশু, পাখি ও মৎস্যসম্পদের অর্থনৈতিক গুরুত্বের তালিকা করতে গেলে বিরাট হয়ে যাবে। মোটামুটি একটি ধারণা দেয়ার জন্য এখানে সংক্ষিপ্তভাবে এ বিষয়ে উপস্থাপন করা হল। পশু বিশেষ করে গোসম্পদ, মহিষ, ঘোড়ার মতো গৃহপালিত জীবজন্তু এ দেশের কৃষিকাজের জন্য একান্ত অপরিহার্য। স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সরবরাহে গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়াসহ হাঁস-মুরগী ও অন্যান্য পশুপাখির দুধ, ডিম ও মাংস সরবরাহ করে এ দেশের জনগোষ্ঠীর পুষ্টির চাহিদা মেটায়।

পশুসম্পদের কোন কিছুই নিস্প্রয়োজনীয় নয়, যেমন চামড়া, হাড়, এমনকি এদের গোবরও বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক কাজে ব্যবহৃত হয়। উল্লেখ্য, গোবর বায়োগ্যাস ও জ্বালানি উৎপাদনে প্রধান উপকরণ হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। তাছাড়া এসবের বর্জ্য (Slurry) দিয়ে পরিবেশবান্ধব জৈব সার তৈরি করা যাচ্ছে।

www.nagorikpathagar.org

বিভিন্ন জীবজন্তুর হাড় দিয়ে অত্যন্ত জটিল রোগের নানা প্রকার ঔষধ তৈরি করা হয়ে থাকে। বিভিন্ন কীটপতঙ্গ পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় ভীষণ তাৎপর্যপূর্ণ। সময়ের তাগিদে এগুলোকে চিহ্নিত করা এবং এ বিষয়ে সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টি করা অত্যাবশ্যক।

হাঁস, মুরগী ও অন্যান্য পাখিকুল এদেশের দারিদ্র্য বিমোচনে (স্বাস্থ্য ও পুষ্টি) আয় বর্ধনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এক সমীক্ষায় দেখা যায় যে, গ্রামীণ ৮৬% মহিলা কম /বেশি মুরগী পোষে তাদের আয় বর্ধন করে থাকে। তাছাড়া বাচ্চাদের পুষ্টি যোগানে হাঁস/মুরগীর ডিম ও বিভিন্ন পাখির ডিম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদেয়।

বর্তমান সময়ে পশু প্রতিপালন শুধু স্বতন্ত্রভাবে দুধ, মাংস ও ডিম উৎপাদনের জন্য লাভজনক ব্যবসা নয় বরং আত্মকর্মসংস্থান ও দারিদ্র্য বিমোচনে এর গুরুত্ব অনস্বীকার্য। স্বল্পমূল্যে ও অপ্রাতিষ্ঠানিক ক্ষেত্রে অতিসহজেই দারিদ্র্য বিমোচনে সফল কর্মসূচি গ্রহণ করা যায়।

বৈদেশিক মুদ্রা আয়, জ্বালানি সাশ্রয় ও আখ উৎপাদনে পশুসম্পদের অবদান অনস্বীকার্য। বর্তমানে বাংলাদেশের কর্মক্ষম জনশক্তির প্রায় ২৫.৬ শতাংশ প্রত্যক্ষভাবে এবং প্রায় ৫০ শতাংশ খণ্ডকালীনভাবে পশুপাখি প্রতিপালনের ওপর নির্ভরশীল। এর মধ্যে মহিলা শ্রমের পরিমাণ সংখ্যাগতভাবে প্রায় ৪১ শতাংশ। দেশে বর্তমান সময়ে দুধ, মাংস ও ডিমের উৎপাদন যথাক্রমে প্রায় ১৭৪০ হাজার মেট্রিক টন, ৭৪০ হাজার লক্ষ মেট্রিক টন ও ৪১০ কোটি। ১৯৯১-৯২ সালে জনপ্রতি দৈনিক দুধ, মাংস ও ডিমের প্রাপ্যতা ছিল যথাক্রমে ২১ মিলিঃ ১১ গ্রাম ও .০৫টি। বর্তমানে এ প্রাপ্যতা বৃদ্ধি পেয়ে যথাক্রমে ৩৫ মিলিঃ, ১৪.৫ গ্রাম ও ০.০৭৮ এ উন্নীত হয়েছে। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল কর্তৃক আগামী ২০১০ সাল নাগাদ দুধ, মাংস ও ডিম উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে যথাক্রমে ৩৯০৯.০ হাজার মেঃটন, ২৬০৯.০০ হাজার মেঃটন এবং ৯১৮.০০ কোটি।

পশুজাত পণ্যের উৎপাদনের এ লক্ষ্যমাত্রা বর্তমান উৎপাদনের তুলনায় বেড়েছে গড়ে প্রায় তিনগুণ। জাতি গঠনে পশুসম্পদ খাতে উন্নয়নের মাধ্যমে পুষ্টি ঘাটতির কোন বিকল্প নেই। তাছাড়া গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আয় বৃদ্ধি, আত্মকর্মসংস্থান, দারিদ্র্য বিমোচন ও সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পশুসম্পদ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে।

আমরা জানি পাখি, সরীসৃপ এবং ব্যাঙ পোকামাকড়, কীটপতঙ্গ খেয়ে জীবন ধারণ করে। যেসব প্রাণী পোকামাকড় ফসলের মারাত্মক ক্ষতিসাধন করে বন্য প্রাণীরা এমন সব পোকামাকড় খেয়ে ফসলকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করে অধিক ফসল উৎপাদনে সহায়তা করে থাকে। বন্য পশু পাখির পালক, চামড়া, শিং ইত্যাদি প্রচুর মূল্যে বিদেশি রপ্তানি করে বৈদেশিক মুদ্রাও অর্জন করা যেতে পারে। বিষাক্ত সাপের বিষ থেকেও মূল্যবান ঔষধ তৈরি করা হয়ে থাকে। তাছাড়া বন্য প্রাণী মানুষের বিনোদনের উপকরণ হিসেবে মানুষকে আনন্দ দিয়ে থাকে। সারা সপ্তাহ বা মাসাধিককাল মানুষ কর্মক্লান্ত হয়ে যখন প্রকৃতির কাছে ফিরে যায়; অনাবিল প্রশান্তি লাভ করে অভয়ারণ্যে এবং জাতীয় উদ্যানে বন্য প্রাণীর ছোটাছুটি

www.nagorikpathagar.org

দেখে। শুধু তাই নয়, বিদেশি পর্যটকরাও সুন্দরবনের রয়েল বেঙ্গল টাইগার এবং পার্বত্য বন্যহাতি দেখতে ছুটে আসে। নদীমাতৃক দেশ বাংলাদেশ, এখানে হাওর, বাঁওড়, খাল-বিলে বিভিন্ন প্রজাতির মাছ রয়েছে। কথিত আছে 'মাছে ভাতে বাঙালি'। যথাযথ সংরক্ষণের অভাবে সহজলভ্য পুষ্টি থেকে বঞ্চিত হচ্ছে এদেশের স্বল্প আয়ের মানুষ। জাতীয় ঐতিহ্য এবং সহজ প্রাপ্য এ সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণ না করলে পুষ্টির অভাবে জনস্বাস্থ্য মারাত্মক হুমকির সম্মুখীন হয়ে পড়বে।

শহরের জলাশয়গুলিও দিন দিন বেদখল হয়ে যাচ্ছে। শুধু তাই নয়, পৌর ও শিল্প আবর্জনা ফেলে বিষাক্ত করে তুলছে আমাদের নদীর পানি এবং বিপন্ন করে দিয়েছে বুড়িগঙ্গা নদীর জলজ প্রাণী। অর্থনৈতিক জরিপ ছাড়া এ সম্পদের প্রকৃত ক্ষতির পরিমাণ ডলারে/টাকায় নিরূপণ করা অত্যন্ত কঠিন কাজ। দেশের টেক্‌সই উন্নয়ন ও পরিবেশ ভারসাম্য রক্ষায় প্রয়োজন যথাযথ পরিকল্পনা প্রণয়ন ও এর বাস্তবায়ন। আর এজন্য দরকার হবে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নির্ণয় ও সর্বস্তরের জনগণকে সচেতন ও পশুপালনের মাধ্যমে কর্মসংস্থান জাতীয় অর্থনীতিতে অবদানের বিষয় সম্পৃক্তকরণ। বিশ্বায়ন ও ইলেকট্রোনিক্সের যুগে প্রাণীর উপকারিতা ও প্রয়োজনীয়তার বিবরণ দিয়ে শেষ করা যাবে না। এ বিষয়ে পবিত্র কোরানেও উল্লেখ রয়েছে। চতুস্পদ জন্তুকে তিনি সৃষ্টি করেছেন। এতে তোমাদের শীতবস্ত্রের উপকরণ আছে, কিছু সংখ্যককে তোমরা আহার হিসেবে ব্যবহার করে থাক। এদের দ্বারা তোমাদের সম্মান হয়। এরা তোমাদের বোঝা বহন করে এক শহর থেকে অন্য শহর পর্যন্ত। যেখানে তোমরা প্রাণান্তকর পরিশ্রম ব্যতীত পৌঁছাতে পারতে না। নিশ্চয়ই তোমাদের প্রভু তোমাদের প্রতি অত্যন্ত সহানুভূতিশীল ও দয়ালু। তোমাদের আরোহণের জন্য এবং শোভা বর্ধনের জন্য তিনি ঘোড়া, খচ্চর ও গাধা সৃষ্টি করেছেন। আর তিনি এমন জিনিস সৃষ্টি করবেন যা তোমরা জান না। (সুরা আন্‌নহল ১৬ঃ ৫-৭)।

অনুরূপভাবে সুরা আন্‌নহলের ৬৬ আয়াতে পশুর দুধ মানব জাতির জন্য অমূল্য খাদ্য হিসেবে ব্যবহারের কথা বলা হয়েছে। এ জন্যে প্রতিটি আদম সন্তানকে এসব নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত। আর কৃতজ্ঞতার অর্থ হচ্ছে আল্লাহ নির্দেশিত বিবরণ অনুসারে এসব সম্পদ সংরক্ষণ, মানব জাতির কল্যাণের জন্য টেকসই ব্যবহার। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ সতর্ক করে বলেছেন যে, এ সম্পদের যথেচ্ছ ব্যবহার কিংবা নিধন পরিবেশের ভারসাম্যতা নষ্ট করতে পারে। তাই কোরআনে বলা হয়েছে, তাই আমি প্রতিটি বস্তুকে পরিমিতরূপে সৃষ্টি করেছি (সুরা আল ক্বামার ৫৪ঃ৪৯)। আল্লাহর সৃষ্টির প্রতি অবিচার করলে অর্থাৎ বিনা প্রয়োজনে অথবা অপরিকল্পিতভাবে প্রাকৃতিক সম্পদ নিধন করলে বিপর্যয় অনিবার্য এবং এর পরিণামও ভয়াবহ। "তাই সৃষ্টিকর্তা কঠোর হুঁশিয়ারি করে দিয়েছেন এবং পৃথিবীতে শান্তি স্থাপনের পর তোমরা অনর্থক বিপর্যয় সৃষ্টি করো না" (সুরা আল আরাফ ৭ঃ৮৫)।

পশুপালন ও কর্মসংস্থান ঃ সাফল্য কথা

ক) বগুড়া জেলার সান্তাহার নতুন বাজারের আবুল কালাম আজাদ আশির দশকের গোড়ার

www.nagorikpathagar.org

দিকে পারিবারিকভাবে সংকরায়নের মাধ্যমে উন্নতজাতের গাভী প্রজনন করেন। তাঁর খামারে গাভীর সংখ্যা ছিল ৪৭টি। সংকর জাতের ১টি ফ্রিজিয়ান গাভী থেকে দৈনিক ৩৪ লিটার দুধ পান। তাঁর খামারে বিভিন্ন গাভী থেকে দুধের পরিমাণ প্রতিদিন গড়ে ১৫৬ লিটার। প্রতি লিটার ২০ টাকা দরে বিক্রি করলে মাসে তার ২০X১৫৬X৩০ = ৯৩,৬০০ টাকা আয় হয়। মাসে বিভিন্ন খরচ বাদে ৬০% বাদ দিলে তার ৩৭,৪৪০ নেট আয় হয়ে থাকে।

খ) সিলেটের সোনার পাড়ার হোসেন আহম্মদ সিদ্দিকী ৪৮৫.৬ বর্গমিটার জমিতে একটি গো খামার স্থাপন করেন। উক্ত খামারে ১২টি উন্নত জাতের এবং ১৫টি সংকর জাতের গাভীসহ মোট ৪৭টি গবাদি পশু রয়েছে। দুধ উৎপাদন খামার থেকে তিনি বছরে আয় করেন ১০,৪৯,৪৮০ টাকা, ব্যয় হয় ৭,৫০,৬৮৫ টাকা এবং নেট লাভ হয় ২,৯৮,৭৯৫ টাকা।

গ) কিশোরগঞ্জের সেকান্দার নগরের সুরুজ মিয়া ৭২০টি হাঁস পালন করে তাঁর খামার থেকে ১,২০,০০০ ডিম উৎপাদন করে সাফল্যের সাথে তিনি আত্মকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে পেরেছেন। বছরে তার আয় হয় ১ লাখ ৩০ হাজার টাকা। এমনিভাবে গাভীপালন, গরু মোটাতাজাকরণ, ছাগল পালন, ব্রয়লার পালন প্রকল্প এবং হাঁস পালনের মাধ্যমে ব্যাপক আত্মকর্মসংস্থান ও পরিবারের অতিরিক্ত আয় বৃদ্ধি করার ব্যাপক সুযোগ রয়েছে। আমাদের অভাব শুধু উদ্যোগের এবং টেকসই ব্যবস্থাপনার। সেজন্য প্রয়োজন সচেতনতা সৃষ্টি করা ও যথোপযুক্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

গাভী পালন ঃ শহর বা গ্রামের বাড়ির আঙিনায় একটু খোলা জায়গায় অনায়াসে ২টি গাভী পালন করা যেতে পারে। এজন্যে সংকর জাতের গাভীই বেশি লাভজনক হতে পারে।

২টি দুধেল গাভী কিনতে খরচ হতে পারে ৬০-৭০ হাজার টাকার মতো। এদের ঘর নির্মাণ ও বিবিধ খরচ হতে পারে ২০-২৫ হাজার টাকা, যা গ্রাম ও শহরভেদে ভিন্ন হতে পারে। এজন্য ৮০-৯০ হাজার টাকার মূলধন প্রয়োজন হতে পারে। আনুমানিক দিনে ২০ কেজি করে দুধ পাওয়া গেলে তা পাইকারি ২০ টাকা করে বিক্রি করলে প্রতিদিন ৪০০ টাকা আয় হতে পারে।

চিত্র ৩.১ : গাভী পালন ও দারিদ্র্য বিমোচন

www.nagorikpathagar.org

দুধ বিক্রি করে মাসে ১২ হাজার টাকা আয় করলে, ৭ মাসেই মূল টাকা উঠে আসবে। প্রতিটি গাভীর জন্য দানাদার খাবার জন্য প্রয়োজন হতে পারে দুধ আহরণকালে প্রতিদিন ৪ কেজি করে ২৪০ দিন এবং দুধ না দেয়া অবস্থায় প্রতিদিন দেড় কেজি করে ১২৫ দিন। দানাদার খাবার পেছনে বছরে আনুমানিক খরচ হবে ১৭-২০ হাজার টাকা। ব্যাংকের মাধ্যমে মূলধন সংগ্রহ করে গাভী পালন করার ব্যাপক সুযোগ রয়েছে। প্রয়োজন শুধু উদ্যোগ ও সদ্ব্যবহারের। গাভী কিংবা বাছুরের দৈনিক খাবারের তালিকা, পরিচর্যা, কৃত্রিম প্রজনন, রোগ প্রতিরোধ বিষয়ে স্থানীয় নিকটস্থ পশুপালন অফিস ও পশু চিকিৎসালয় থেকে সহায়তা পাওয়া যেতে পারে। পশুপালন দপ্তর ও চিকিৎসালয় কতটুকু তৎপর হবে তা নিশ্চিত করে বলা কষ্টকর। কারণ তাদের বাজেটের সীমাবদ্ধতা, প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ও যন্ত্রপাতির অভাব রয়েছে। স্থানীয় চাহিদা থাকলে সরকারি সুযোগ-সুবিধার পাশাপাশি ব্যক্তিগত উদ্যোগে আরো সুবিধাদি গড়ে উঠতে পারে।

গরু মোটাতাজাকরণঃ গরু মোটাতাজাকরণ কর্মসূচি লাভজনক এবং আত্মকর্মসংস্থানের নিশ্চয়তা দিতে পারে। এ জন্যে প্রয়োজন হতে পারে ২০-৩০ হাজার টাকা পুঁজির। ৬ মাস বয়সের ১০টি সংকর জাতের বাছুর কিনে এ প্রকল্প হাতে নেয়া যায়। এদের ঘর নির্মাণের জন্য আনুমানিক খরচ হতে পারে ৬-৭ হাজার টাকা। এদের খাবার জন্য প্রয়োজন সবুজ ঘাস ও ইউরিয়া দ্বারা প্রক্রিয়াজাতকৃত খাদ্য। এভাবে এক বৎসর লালন-পালন করতে পারলে প্রতিটি গরুর দাম হতে পারে প্রায় দশ হাজার টাকা।

চিত্র ৩.২ : যশোরের আব্বাস আলীর রাজস্থানী খাসি

ছাগল ও হাঁস-মুরগি পালন ঃ গ্রামীণ অর্থনীতিতে আদিকাল থেকে বাড়ির মহিলারা বাড়তি আয়ের জন্য ছাগল পালন ও হাঁস-মুরগি পালন করছে। হালে এ চর্চা বিলীন হয়ে যাচ্ছে। এর কারণ হয়তো মূলধনের অভাব। মাইক্রোক্রেডিট কর্মসূচিতে গৃহকর্মসংস্থান বৃদ্ধির জন্য পরিবারের ছোট বড় সকল সদস্যের নানাবিধ অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত রাখার জন্য ঋণ ও এ সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদানের ব্যবস্থা রাখা যেতে পারে। এ ক্ষেত্রে প্রতিটি গ্রামে একটি আদর্শ খামারবাড়ি প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেয়া যেতে পারে।

কবুতর বার মাসে তের জোড়া ঃ মৎস্য ও পশুসম্পদ তথ্য দপ্তর এ ধরনের একটি প্রকল্প হাতে নিয়েছে। তাতে মাসে অতিসহজে ৩০০ থেকে ৪০০ টাকা আয় করা যেতে পারে।

www.nagorikpathagar.org

১০ জোড়া কবুতর নিয়ে এ ধরনের প্রকল্প শুরু করা যেতে পারে। কবুতর সাধারণত গম, মটর, খেসারি, ধান ও চাল খেয়ে থাকে। গ্রামের বাড়িতে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে কোন খাবার দিতে হয় না। কবুতরের ঘর বানানোও সহজ এবং অতিঅল্প খরচে করা যায়। কবুতর পালনে এক ধরনের আনন্দ রয়েছে, বিশেষ করে শিশুদের জন্য। কবুতর অসুস্থ হলে পার্শ্ববর্তী পশু হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য পরামর্শ নিতে হবে।

প্রাণী সম্পদের অর্থনৈতিক গুরুত্বের কথা লিখে শেষ করা যাবে না। সৃষ্টির কোন বস্তুই বিনা প্রয়োজনে সৃষ্টি করা হয়নি। প্রয়োজন শুধু মানুষের মেধা, প্রজ্ঞা ও ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে এদের অর্থনৈতিক ব্যবহার নিশ্চিত করা, যা মানব কল্যাণকে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করতে সহায়ক হবে। এ ক্ষেত্রে আমাদের দেশে সম্প্রতি আধুনিক পদ্ধতিতে মাছের চাষ ও ব্রয়লার পালন প্রকল্প নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য সাফল্য হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। ইতিমধ্যে ব্রয়লার, ঝিল-পুকুরে মাছ চাষ, লোনাপানিতে চিংড়ি চাষ উদ্যোগগুলো অর্থনীতিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছে।

উৎস : সাপ্তাহিক বিচিত্রার (সাপ্তাহিক বিচিত্রা ২৬ নভেম্বর ১৯৯৩) একটি জরিপের কতিপয় অভিজ্ঞতার বিবরণী।

প্রজাতি সংরক্ষণ ও নূহ (আঃ) এর নৌকা

প্রাণী সম্পদ সংরক্ষণের ইতিহাস বহু পুরানো। হযরত নূহ (আঃ) এর মাধ্যমে আল্লাহর নাফরমানদের ধ্বংস করার কাহিনী ইসলামে অত্যন্ত সুপরিচিত ঘটনা। নূহ (আঃ) এর জাহাজের বর্ণনা পৌরাণিক কাহিনীতেও জানা যায়, সেখানে অসংখ্য জীবনের অস্তিত্বের কথা বলা হয়েছে। কাহিনী থেকে আমাজান ও কঙ্গো দ্বীপের অস্তিত্বের কথাও জানা যায়। এরূপ কয়েকটি দ্বীপে প্রাচীন প্রাণীগুলোর কিছু কিছু অস্তিত্বও রয়েছে। যদিও বর্তমান প্রেক্ষিতে পৃথিবীর মোট ভূখণ্ডের মাত্র ৬ শতাংশ ভূ-ভাগ ব্যাপী এ এলাকা। বলা হয়, এ অঞ্চলে বিশ্বের মোট প্রজাতির ৫০ শতাংশের অস্তিত্ব রয়েছে। অন্য একমতে বলা হয়েছে, এর সংখ্যা ৯০ শতাংশ হতে পারে। বোর্ণিও বৃষ্টিবহুল বনাঞ্চলের ১৫ হেক্টর এলাকায় নূহ (আঃ)-এর যুগের প্রাচীন দ্বীপগুলোর কিছু অস্তিত্ব পাওয়া যায়, যেখানে অসংখ্য উদ্ভিদ প্রজাতি রয়েছে। জাতিসংঘের পরিবেশ বিষয়ক প্রোগ্রামের সাবেক নির্বাহী মোস্তফাকে তোলাবা উপরের তথ্য জানিয়েছেন। একইভাবে উত্তর আমেরিকার মোট পাখি প্রজাতিগুলোর মধ্যে পানামা অঞ্চলেই সাতশ প্রজাতির পাখি রয়েছে। এছাড়া সমগ্র ইউরোপের নদীগুলোতে যত প্রজাতির মাছ রয়েছে একমাত্র আমাজানে এর দশগুণ বেশি প্রজাতির মাছ রয়েছে। দুর্ভাগ্যজনক হচ্ছে বর্তমান পরিবেশ অবক্ষয়ের পরিস্থিতিতে নূহ (আঃ)-এর প্রতিবেশ তত্ত্বকে দুর্বল করে দিয়েছে। মোট কথা গাছপালা ধ্বংস হয়ে বিভিন্ন প্রাণীর অস্তিত্ব আজ বিপন্ন হয়ে পড়েছে।

হযরত নূহ (আঃ)-এর জাহাজ কাহিনীর তত্ত্ব অনুসারে গরীব গ্রীষ্মমণ্ডলীয় দেশগুলোই আজ এ দুরবস্থার শিকার। বৈষম্যমূলক শিল্পায়ন ও বিশ্বের প্রযুক্তির বিস্ফোরণের ফলে পৃথিবী আজ দ্বিধা বিভক্ত। দরিদ্র দেশগুলো থেকেই জাপান, ইউরোপ, উত্তর আমেরিকায় বিভিন্ন ফল, মাছ, গাছ রফতানি হচ্ছে। সারা বিশ্বের মোট ঔষধ শিল্পের এক-চতুর্থাংশই গ্রীষ্মমণ্ডলীয় গাছপালা থেকে উৎপাদন করা হয়। গ্রীষ্মমণ্ডলীয় অঞ্চলের দুর্লভ প্রজাতির উদ্ভিদ ও প্রাণী প্রজাতির ব্যবহার এখনো দরিদ্র দেশগুলো তেমনভাবে জানতে পারেনি। এভাবে মানুষের অজান্তে অগণিত জীববৈচিত্র্য বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে ক্রমান্বয়ে (সাপ্তাহিক বিচিত্রা, ১৪ জানুয়ারি, ১৯৯৪)।

আল্লাহর সৃষ্টির ঊষালগ্ন থেকেই জীববৈচিত্র্যকে সংরক্ষণের জন্য বিশেষভাবে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। এ জন্য দায়িত্ব দেয়া হয়েছে মানুষকেই, আল্লাহর খলিফা হিসেবে। কেননা আল্লাহ তার নবী নূহ (আঃ)-কে জীব-বৈচিত্র্য সংরক্ষণের জন্য মানুষের পাশাপাশি এসবের প্রতি যত্ন নেয়ার জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন। তদানুসারে তিনি ব্যবস্থাও গ্রহণ করেছিলেন। এসব ঘটনা থেকে সহজেই শিক্ষা নেয়া যায় প্রাণী সম্পদ সংরক্ষণ ঐচ্ছিক নয় বরং মানবজাতির কল্যাণের জন্য বাধ্যতামূলক।

www.nagorikpathagar.org

প্রাণী সম্পদ সংরক্ষণে সাংস্কৃতিক গুরুত্ব

বন্য পশুপাখি আমাদের প্রভূত উপকার করে থাকে এবং এদের উপকারিতা তিনটি বিষয়ে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে যেমন (১) প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা (২) চিত্ত বিনোদন এবং (৩) প্রাত্যহিক ব্যবহার। গাছ-গাছালি, পশুপাখি এবং কীটপতঙ্গ প্রাকৃতিক পরিবেশের অন্যতম উপাদান। এরা পারস্পরিক প্রতিরোধ এবং সমতার ভিত্তিতে বাস করছে। একটির অভাব বা সংখ্যাস্বল্পতা সমগ্র পরিবেশের জন্য হুমকি স্বরূপ এবং প্রাকৃতিক ভারসাম্যের বিরূপ পরিবর্তন ঘটায়। যেমন বাঘ সুন্দরবনে প্রধানতঃ হরিণ, বন্যশূকর এবং বানর ইত্যাদি খেয়ে জীবন ধারণ করে। অপর পক্ষে হরিণ, বন্যশূকর এবং বানর ঘাস, লতা-পাতা, ফুল-ফল, শিকড় ইত্যাদি খেয়ে থাকে। উপরোক্ত তিনটির যে কোন একটির অভাব হলে সুন্দরবনের বর্তমান অবস্থার পরিবর্তন ঘটবে। কারণ বাঘ না থাকলে হরিণ, বন্যশূকর এবং বানরের সংখ্যা অত্যধিক হারে বেড়ে যাওয়ার ফলে গাছ-গাছালির ওপর প্রভাব পড়বে। অন্যদিকে হরিণ না থাকলে বাঘ তার খাদ্যাভ্যাস দ্রুত পরিবর্তন করতে না পারলে আপনা-আপনি বিলোপ হয়ে যাবে। অধিকাংশ পাখি কীটপতঙ্গের ওপর নির্ভরশীল, যার ফলে মানুষ গাছগাছালি ও শস্য কীটপতঙ্গের ব্যাপক উপদ্রব থেকে রক্ষা পাচ্ছে। তাই প্রাকৃতিক উপায়ে শস্যকে রক্ষার উদ্দেশ্যে এসব পক্ষীকূলকে ব্যবহার করতে পারলে একদিকে যেমন পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা হবে অন্যদিকে কীট বিনাশক ঔষধ আমদানি খাতে কোটি কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা বেঁচে যাবে এবং পরিবেশও বিশুদ্ধ থাকবে। গুইসাপ এবং সাপ পরস্পরের ওপর নিয়ন্ত্রণ ছাড়াও ইঁদুর ও কীটপতঙ্গ খেয়ে পরিবেশের ভারসাম্য এবং জমির ফসল রক্ষা করে, ব্যাঙের উপকারিতাও তদ্রূপ। এরা পোকামাকড় খেয়ে ফসল রক্ষা করে। বাংলাদেশ কৃষিপ্রধান দেশ, তাই কীটপতঙ্গ এবং ইঁদুরের উপদ্রব থেকে ফসল রক্ষার জন্য সাপ, গুইসাপ এবং পাখির ভূমিকা প্রতিবেশ সংরক্ষণ ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে অপরিহার্য বিধায় এদের সংরক্ষণ একান্ত প্রয়োজন।

বন্য পশুপাখি শুধু সম্পদ নয়, আমাদের জাতীয় ঐতিহ্যও বটে। সুন্দরবনের বাঘ এবং বাংলাদেশের আনাচে-কানাচে অগণিত পশু-পাখি পর্যটকদের অন্যতম আকর্ষণ। তাই এ সম্পদকে সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে পর্যটন খাতে প্রচুর আয়বর্ধন ও বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের সুযোগ রয়েছে। কেনিয়া পর্যটনের উদ্দেশ্যে বন্য পশু-পাখির সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বৎসরে ১২৫ কোটি টাকা আয় করছে। বন্য পশু-পাখির চামড়া, শিং, দাঁত ও অন্যান্য অংশ বিলাস দ্রব্য এবং ঔষধ প্রস্তুত করার জন্য ব্যবহৃত হয়। পৃথিবীতে বন্য প্রাণীর চামড়ার ওপর নির্ভর করে বহু শিল্প কারখানা গড়ে উঠেছে। পাখি এবং তৃণভোজী প্রাণীর গোশত মানুষের প্রিয় খাদ্য।

www.nagorikpathagar.org

পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় পাখি

প্রকৃতিতে বিভিন্ন রূপে পাখি ঃ মানুষের কাছে প্রিয় প্রাণীদের মধ্যে পাখি অন্যতম। পাখি প্রকৃতির বিস্ময়কর সুন্দর সৃষ্টি। বৈচিত্র্যময় রূপ, কণ্ঠ আর স্বভাবের গুণে এই প্রাণীরা মানুষের কাছে উপভোগ্য। পাখির সৌন্দর্যে মানুষের মন হয় মোহিত। আদিম মানুষ পাখির সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে পাহাড়ের গুহায় এঁকেছিল তার ছবি। পৃথিবীর সব প্রাচীন সভ্যতায় পাখির বিভিন্ন রকম উপস্থিতি লক্ষণীয়। কখনো স্থাপত্যশৈলীতে, কখনো চিত্রকলায়, কখনো সাহিত্যের উপমায় পাখির বিভিন্ন রূপ প্রস্ফুটিত হয়েছে। ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় - প্রাচীন মিসরের আদিবাসীদের মৃত্যুর দেবতার চেহারা ছিল বাজ পাখির মতো। তাদের জ্ঞান ও চিত্রলিপির দেবী থোতের মুখও ছিল আইবিস পাখির মতো। সিন্ধু সভ্যতার অন্যতম নগরী মোহেঞ্জোদারোতে প্রাপ্ত আসবাবপত্রে ছিল পাখির বিভিন্ন অংকিত চিত্রমালা। প্রাচীন চৈনিক, গ্রীক এবং অন্যান্য সভ্যতারও পাখির নানা রকম বর্ণনা পাওয়া যায়।

চিত্র ৩.৩ : প্রকৃতির হাওড়ে অতিথি পাখি

যুগে যুগে নানা দেশে পাখিদের নিয়ে রচিত হয়েছে বৈচিত্র্যময় কত গল্প, গান, লোককাহিনী আর উপকথা।

পৃথিবীর সব ধর্মগ্রন্থে কম বেশি বিভিন্ন পাখির প্রসঙ্গ এসেছে। আল-কোরআনে আবাবিল, হুদ, কবুতর প্রভৃতি পাখির বিভিন্ন ঘটনার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। বিশাল এই পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র কম বেশি রয়েছে পাখির আনাগোনা। সমতল ভূমি, অরণ্য, পার্বত্যময় ভূ-ভাগ, উত্তপ্ত বালুময় মরুভূমি, তুষারাবৃত মেরু অঞ্চল, জলমগ্ন বিস্তীর্ণ অঞ্চলে পাখিরা নিশ্চিত মনে বিচরণ করে। তবে সর্বত্র সবাই ঘুরে বেড়ায় না। অঞ্চলভিত্তিক পাখিদের মধ্যে পার্থক্য দেখা যায়। ভূ-প্রকৃতি, জলবায়ু এবং পরিবেশ অনুসারে নানা রকম পাখি বিভিন্ন অঞ্চলে বাস করে।

দুনিয়ায় নানা রকম পাখির ভিড়। সবার মধ্যেই ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য দেখা যায়। কারো পালকের বাহার মনোমুগ্ধকর, যেমন ময়ূরপাখি। কারো আছে দীর্ঘ সুন্দর পুচ্ছ, লম্বা পায়ের অধিকারী যেমন সাদা বক। কারো ঠোঁট দেখলে আশ্চর্য না হয়ে পারা যায় না, যেমন সারস পাখি। আবার কিছু প্রজাতির মাথায় আছে সুন্দর ঝুঁটি। কিছু পাখির তেমন রূপ নেই কিন্তু আছে

www.nagorikpathagar.org

চমৎকার গানের গলা, যেমন আমাদের গ্রামবাংলার কোকিলের ডাক ভীষণ মনোমুগ্ধকর। এদের মধ্যে কেউ মাটির ওপরেই ঘুরে ফিরে কাটিয়ে দেয় সমস্ত জীবন। কেউ নিশ্চিন্ত গগনবিহারী। আবার কয়েকটি প্রজাতির পাখির পানি না হলে চলে না। জলাশয়ের আশেপাশে বিচরণ করে তারা। রাতের আঁধারে দেখা যায় কিছু পাখিকে আমাদের দেশের, হাওর, বাঁওড় নদীগুলো শীতের রাত পাখির কলরবে মুখরিত থাকে। পাখিদের মধ্যে কেউ নির্দিষ্ট খাদ্য না পেলে কিছুই মুখে তুলবে না। আবার কেউ সর্বভুক - যা পায় তা খেয়েই খুশি থাকে। যেমন আমাদের দেশের কাক ও শালিক।

জীব বিজ্ঞানীদের মতে, বর্তমান পৃথিবীতে প্রায় ৮,৬০০ প্রজাতির পাখি আছে। ভারতীয় উপমহাদেশে প্রায় ১২০০ প্রজাতির পাখি দেখা যায়। আর শুধু বাংলাদেশে অন্ততঃ ৫২৫ প্রজাতির পাখি বিচরণ করে বলে বিজ্ঞানীরা মনে করেন। আয়তন অনুযায়ী বাংলাদেশের পাখির সংখ্যা কম নয়। গঠন ও ক্রমবিবর্তনের মূল প্রকৃতি অনুসারে পৃথিবীর সব পাখিকে ২৭টি প্রধান শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। এই গ্রুপের মধ্যে আছে ১৫৫টি গোত্র (Family)।

উড়ন্ত পাখি দেখতে অপূর্ব, বিশেষত যখন দূরদিগন্তে ঝাঁক বেঁধে উড়ে তখন মনে হয় প্রশিক্ষিত সেনাবাহিনীর দল অত্যন্ত সুশৃঙ্খলভাবে তাদের গন্তব্যের দিকে এগিয়ে চলছে। পাখি সাধারণতঃ উপরে-নিচে ডানা ঝাপটিয়ে শূন্যে উড়ে। উপরে-নিচে পাখা সঞ্চালনের মাধ্যমে খুব দ্রুত পালকগুলোকে মুচড়ে দিয়ে বাতাসকে পেছনের দিকে ঠেলে দেয়। এভাবেই পাখি বাতাস কেটে এগিয়ে চলে। উড়ার সময় দিক পরিবর্তন করার জন্য পাখি তার লেজকে আঁকিয়ে-বাঁকিয়ে ব্যবহার করে। যেমন করে বৈঠার সাহায্যে নৌকার দিক পরিবর্তন করা হয়। ডানার গড়ন ও পালকের বিন্যাস পাখিকে বাতাসে ভেসে থাকার জন্য সাহায্য করে। বিমানের ডানার মত পাখির ডানার উপরের তল বাঁকানো এবং নিচের দিক সমতল। আসলে পাখির ডানার গড়ন নকল করেই বিমান তৈরি করা হয়েছে। ডানা সামনের দিক একটু মোটা তারপর সেখান থেকে পিছনের দিক ধীরে ধীরে ঢালু হয়ে গেছে। সৃষ্টির এই মহিমার কথা পবিত্র কোরআনেও বলা হয়েছে। "তারা কি লক্ষ্য করে না তাদের মাথার উপর উড়ন্ত পক্ষীকুলের প্রতি, পাখা বিস্তারকারী পাখা সংকোচনকারী, আল্লাহই তাদেরকে স্থির রাখেন। তিনি সর্ববিষয়ই পর্যবেক্ষণ করেন" (সুরা মুলক ৬৭:১৯)।

গাছ ও অরণ্যের মাঝেই পাখির মূল আবাসস্থল। আশির দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত এ দেশে প্রচুর বন জঙ্গল ছিল, প্রচুর পাখিও দেখা যেত বনজঙ্গলে এবং বিভিন্ন হাওর-বাঁওড়ে। জনসংখ্যা ও দারিদ্র্য বৃদ্ধির ফলে জ্বালানি ও কাঠের চাহিদা দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে, এর ফলে মারাত্মকভাবে দেশের অরণ্য ও বৃক্ষরাজি হ্রাস পেয়েছে। পক্ষান্তরে আধুনিক কৃষি পদ্ধতি সম্প্রসারণের ফলে অধিক সার এবং পোকামাকড় মারার জন্য ইনসেকটিসাইড ব্যবহৃত হচ্ছে। প্রবহমান দূষিত জলাধার, দেশের হাওর-বাঁওড়গুলিকে মারাত্মকভাবে দূষিত করে দিয়েছে। মোট কথা বৃক্ষ নিধন, জলজ দূষণের ফলে এ দেশের পাখির আবাসস্থল ও প্রজনন

www.nagorikpathagar.org

ভূমি দ্রুতগতিতে কমে যাচ্ছে। আমাদের দেশের ভাটি এলাকার হাওরগুলোতে বিশেষত টাঙ্গুয়ার হাওর, হাকালুকি হাওরে প্রতি বৎসর শীতের মৌসুমে অগণিত পাখি আসে। এসব পাখি শৌখিন পাখি শিকারীদের হাতে মারা পড়ে। আইন প্রয়োগ করে দরিদ্র শিকারীদের নিবারণ করা গেলেও শৌখিন শিকারীগণকে আইনের আওতায় নিয়ন্ত্রণ করা একেবারেই দুঃসাধ্য।

হুতোম পেঁচা ঃ পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় পাখির ভূমিকাকে সহজভাবে উপস্থাপন করার জন্য আমাদের গ্রামাঞ্চলে সহজলভ্য কয়েকটি পাখির ভূমিকার কথা বর্ণনা করলে তা স্পষ্ট হয়ে যাবে। সাধারণভাবে আমাদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বহীন পাখি "হুতোম পেঁচা"। পরিবেশ সংরক্ষণে তার ভূমিকার কথা শুনলে অনেকেই অবাক বোধ করতে পারে। ইঁদুর আমাদের দেশের ধান ফসলের জন্য একটি মারাত্মক ক্ষতিকর প্রাণী, যা থাইল্যান্ডের মতো পৃথিবীর অন্যান্য অনেক দেশে অনেক সময় ইঁদুরের প্রাদুর্ভাব একটি জাতীয় সমস্যা। একটি পেঁচা প্রতি রাতে দুই থেকে তিনটি ইঁদুর খায়। পক্ষী গবেষকরা হিসাব করে দেখেছেন, একটি পেঁচা যে পরিমাণ ইঁদুর খায় তাতে বৎসরে এক লাখ বিশ হাজার টাকার শস্য রক্ষা হয়।

দাঁড় কাক ঃ পেঁচার মতো অনুরূপ আরেকটি গুরুত্বহীন পাখি কাক। দাঁড় কাক তো ইদানীং আর নেই। এতো প্রতিকূলতার মাঝে পাতি কাক অন্তত ঢাকার বুকে বহাল অবস্থায় রয়েছে। এর ব্যাখ্যা এও হতে পারে যে, ঢাকা শহরে আবর্জনা, উচ্ছিষ্ট ইত্যাদি অধিক বলে কাকের বংশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। কাকের বংশ বৃদ্ধি পেয়েছে বলেই তারা ঢাকা শহরের আবর্জনা কমানোতে সহায়ক ভূমিকা রাখতে পারছে। তবে ক্রমাগত রাসায়নিক আবর্জনা বৃদ্ধি পাচ্ছে বলে কাকের প্রজনন হার আগামীতে আরো কমে যাবে।

আমাদের দেশের গ্রামের দিকে তাকালে দেখা যায় যে, সদ্য চাষকৃত ক্ষেতে বিভিন্ন ধরনের পোকামাকড় যা ফসলের জন্য ক্ষতিকর, এগুলো গো-শালিক, গাং-শালিকের দল খেয়ে ফসলের মারাত্মক ক্ষতি থেকে রক্ষা করে। চড়ুই পাখি দেখতে অত্যন্ত ছোট আকারের হলেও তারা দলে ভারি। চাষকৃত ক্ষেত এবং ফসলের ক্ষেতের নানা প্রকার পোকামাকড় খেয়ে চাষীদের ফসল মারাত্মক ক্ষতি থেকে রক্ষা করে।

বর্তমানে আধুনিক চাষাবাদের ফলে পোল্ট্রি ফিড হিসেবে নির্বিচারে প্রচুর পরিমাণ শামুক ঝিনুক আহরণ করার ফলে জলচর পাখিদের দিন দিন খাবারের মারাত্মক ঘাটতি দেখা দিচ্ছে। স্বভাবতঃ এসব পাখিকে মাছের ওপর নির্ভর করতে হচ্ছে। এতে করে প্রাণীর স্বাভাবিক খাদ্যচক্র বিঘ্নিত হচ্ছে। এর সামগ্রিক ক্ষতির প্রভাব এসে পড়েছে মানুষের স্বাস্থ্য ও খাদ্যের সরবরাহের ওপর। মাছ মানুষের জন্য অত্যন্ত সুলভ ও সস্তা পুষ্টি, যার সরবরাহ কমে গেলে মানুষের স্বাস্থ্যের ওপর প্রভাব ফেলবে। বিশেষত অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশে এভাবে জীব-বৈচিত্র্য রক্ষার স্বার্থে মানুষের কল্যাণের জন্যই পাখির খাদ্য গ্রহণ প্রক্রিয়াটাকে সংরক্ষণ ও নির্বিঘ্ন রাখা আমাদের সবার জন্য একান্ত আবশ্যক।

www.nagorikpathagar.org

জরিপ চালিয়ে উপাত্ত সংগ্রহ করে টাকার অংকে হিসাব করেও দেখানো যেতে পারে পাখি প্রাকৃতিক ভারসাম্য ও মানুষের সুন্দর পরিবেশ রক্ষায় কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। আমাদের দেশের বিচিত্র পাখির সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে বিভিন্ন ভূমিকা রয়েছে। গবেষণার মাধ্যমে এদের গুরুত্বগুলো আরো বিশদভাবে আলোচনা ও ব্যাখ্যা করার সুযোগ রয়েছে। এসব আলোচনা ও বিশ্লেষণের পাশাপাশি এ দেশের ধর্মপ্রাণ মানুষের কাছে প্রাণী সংরক্ষণে নিজ নিজ ধর্মীয় মূল্যবোধগুলোকে আরো জাগিয়ে তোলা যায়। এর ফলে তাদের আত্মা পরিশুদ্ধ হবে এবং প্রাণীর প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়া তাদের কাছে ধর্মীয়ভাবে একান্ত আবশ্যক বলে মনে হবে। এ প্রসঙ্গে প্রাণীকুলের প্রতি সদয় হওয়ার বিষয়ে একটি হাদিস উল্লেখ করা যেতে পারে। "হে জগৎবাসী, জগতের আল্লাহর সৃষ্ট জীবিত প্রাণীর প্রতি সদয় হও; জান্নাতবাসীও তোমাদের প্রতি দয়াশীল হবেন" (তিরমিজি)।

বাংলাদেশে অতিথি পাখি

আমাদের দেশের স্থানীয় পাখির মতো অতিথি পাখিদেরও প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষায় গুরুত্ব অপরিসীম। প্রচণ্ড শীতে নিজ আবাসস্থল যখন বাসোপযোগী থাকে না, খাদ্য ও আশ্রয়ের চরম সঙ্কট দেখা দেয় তখন শীতপ্রধান দেশের পাখিরা একটু উষ্ণতা, আর্দ্রতা ও আরামদায়ক স্থানে হাজার হাজার কিলোমিটার রাস্তা পাড়ি দিয়ে আমাদের দেশে চলে আসে। আদিকাল থেকে শীতকালে লাখো পাখি আমাদের দেশে আসার রেওয়াজ রয়েছে। বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেছেন, পরিবেশ পরিবর্তন হবার ফলে বিভিন্ন বাহ্যিক প্রাকৃতিক শক্তির সংবেদনশীল প্রোটোপ্লাজমের নাড়া, জন্মগত নিয়ম প্রভৃতি কারণে শীতপ্রধান দেশের পাখি দেশান্তরিত হয়ে উষ্ণ এলাকায় আসে। এক তথ্যে বলা হয়েছে, পাখিদের আবির্ভাব দক্ষিণ গোলার্ধেই, তবে খাদ্যের প্রাচুর্য ও অন্যান্য অনুকূল পরিবেশের কারণে তারা এ দিকে চলে আসে। বিজ্ঞানীরাও প্রমাণ করেছেন যে, পাখিদের প্রথম আবির্ভাব যেখানেই হোক না কেন খাদ্য ও পরিবেশগত কারণেই তারা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সুবিধাজনক বিভিন্ন স্থানে চলে যায়। আমাদের দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলেও এসব পাখি ৬/৭ মাসের জন্য শীতের শুরুতেই আসতে শুরু করে এবং আশ্রয় নেয় বিভিন্ন হাওর-বাঁওড় ও জলাশয়ে।

চিত্র ৩.৪ ঃ বাংলাদেশে আগত অতিথি পাখি

www.nagorikpathagar.org

অতিথি পাখিদের প্রতি বছর নিয়মিত আসা-যাওয়ার বিবর্তনের মাধ্যমে আস্তে আস্তে বংশগত ধারায় পরিণত হয়ে গিয়েছে। তাই বাচ্চা পাখিরাও নির্দিষ্ট সময়ের পর বুঝতে পারে তাদের একটি সময়ের পর দেশান্তর হতে হবে। অবিশ্বাস্য হলেও সত্য যে, ২০০০ কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে অতিথি পাখিরা এদেশে আসে। বিশেষজ্ঞদের মতে, বাংলাদেশে প্রায় ৬০০ প্রজাতির পাখি রয়েছে। হিমালয়, সাইবেরিয়া, ফিলিপিন্স, অস্ট্রেলিয়া, চীন, রাশিয়া, তিব্বত প্রভৃতি এলাকায় তীব্র শীতের প্রকোপে এরা প্রতি বৎসর আমাদের দেশে আসে।

বাংলাদেশে যে সব জায়গায় অতিথি পাখি আসে সেগুলো হচ্ছে মিরপুর চিড়িয়াখানা, মিরপুর ক্যান্টনমেন্টের পাশের লেক, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস, ঢাকার পিলখানা, বালুচরা, মহেশখালী দ্বীপ, নিঝুম দ্বীপ, চর ওসমান, শাহীবাণীচর, সন্দ্বীপ, হাতিয়া দ্বীপ, চরপিয়া, ডালচর, মৌলভীবাজার, জোনাকচর, চরভাটা, শিবালয়, কমলাপুর, হালহাওর, চর কুকড়ি-মুকড়ী, বুড়িগঙ্গা, আগুনমুখা, গলাপিচা, খেপুপাড়া, কুয়াকাটা, ঘাটিভাঙ্গা, কলাদিয়া, চরণদ্বীপ, হোয়াইকিং, শাহপুরীর দ্বীপ, মনপুরা, সোনারচর, চরনিজাম, চর মানিক, চরহিযাল, চর মনতাজ, উড়িরচর, বয়ারচর, মধুপুরলেক ও জঙ্গল, মুক্তাগাছার বৌয়াবিল, বড়বাইসা বিল, নেত্রকোনার কলমাকান্দা হাওর, কিশোরগঞ্জ হাওর, সুনামগঞ্জের টাঙ্গুয়ার ও হাকালুকি হাওর প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য (জনকন্ঠ ১৪ আগস্ট ২০০০)।

শীতকালে যেসব পাখি আমাদের দেশে আসে তার মধ্যে উল্লেখ্যযোগ্য হচ্ছে, বালিহাঁস, চখাচখি, রাজহাঁস, মানিকজোড়, গাং কবুতর, নারুন্দী, চীনা হাঁস, নাইরাল ল্যাঙ্গি, ভোলাপাখি, হারিয়াল, পিয়াংচীনা, কবালী, জেনজি, গ্রামওয়াস, প্লোভায় এবং বারহেড অন্যতম। এসব পাখি যখন শীতের দেশ থেকে আসে তখন পালক থাকে না। আমাদের দেশে এসে অনুকূল আবহাওয়ায় অল্প কিছুদিনের মধ্যে তাদের পালক গজায় এবং তাদের আসল ও প্রকৃতরূপে সজ্জিত হয়ে যায়।

আমাদের দেশে অতিথি পাখিদের নিরাপদ আবাসস্থল রক্ষায় সমস্যার কোন অন্ত নেই। এর প্রধান কারণের মধ্যে একটি দারিদ্র্য। অভাবী মানুষ অবাধে রাতে জাল ও বিভিন্ন ফাঁদ পেতে পাখি শিকার করে নিজেদের আহারের সংস্থান করে থাকে। দরিদ্র লোকদের বিকল্প অর্থনৈতিক কর্মসূচি দিয়ে পাশাপাশি আইনের যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করলে অভয়ারণ্যকে অনেকটা নিরাপদ করা সম্ভব হতে পারে। সমস্যা যাদেরকে নিয়ে তারা হল এ দেশের শৌখিন পাখি শিকারী। তাদের কোন আইনে বাধা দেয়া বর্তমান আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটে অত্যন্ত কঠিন ও দুঃসাধ্য ব্যাপার। দিন দিন অভিজাত শৌখিন শিকারীদের সংখ্যা বাড়ছে। পক্ষান্তরে পাখির সংখ্যা ও তাদের অভয়ারণ্যের সংখ্যা সংকুচিত হয়ে আসছে অতিদ্রুত। এমতাবস্থায় আমাদের ধর্মীয় শিক্ষা ও নৈতিকতা বৃদ্ধির জন্য গণসচেতনতা সৃষ্টি করা যেতে পারে অত্যন্ত কার্যকরভাবে। অভিজাত পাখি শিকারীদের মাঝে নৈতিক শিক্ষার পাশাপাশি ধর্মীয় শিক্ষার আলো দিতে পারলে নিঃসন্দেহে তাদের মধ্যে আল্লাহর সৃষ্টির প্রতি কি আচরণ করা উচিত তা তাদেরকে ভাবিয়ে তুলবে।

www.nagorikpathagar.org

প্রকৃতির সুন্দরতম সৃষ্টি পাখি

মহান আল্লাহর এক সুন্দরতম সৃষ্টি পাখি। পবিত্র কোরআন ও হাদিসে পাখি প্রসঙ্গে বিভিন্নভাবে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করা হয়েছে। বিচিত্র পালক ও সুমধুর কন্ঠের জন্য সেই আদিকাল থেকেই মানুষ পাখির প্রতি আকৃষ্ট। তাইতো মানুষ পছন্দ করে পাখিকে। আল্লাহ স্বয়ং পাখি পছন্দ করেন, এমনকি নবীগণও পাখি পছন্দ করতেন। প্রিয় নবী হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) পাখি সংরক্ষণ ও পাখির প্রতি দয়া প্রদর্শনের উপদেশ দিয়েছেন। পবিত্র কোরআনে হযরত ইব্রাহীম, হযরত ইউসুফ, হযরত সোলায়মান, হযরত দাউদ এবং হযরত ঈসা (আঃ) এর জীবনে পাখি সম্পর্কে ঘটনার উল্লেখ রয়েছে।

পাখিকে আল্লাহও পছন্দ করেন বলেই পবিত্র কোরআনে বিভিন্ন ক্ষেত্রে পাখির ভূমিকাকে তিনি তুলে ধরেছেন। পবিত্র কোরআনে আসমানে পাখির সমাজ থাকার কথা ও পাখিকে কিভাবে আকাশে উড়ন্ত রাখা হয়- এ ব্যাপারে লক্ষণীয় বিষয় উপস্থাপন করা হয়েছে। আল্লাহ বলেন, 'ভূপৃষ্ঠে বিচরণশীল এমন জীব নেই অথবা নিজ ডানার সাহায্যে এমন কোন পাখি উড়ে না যা তোমাদের মতো একটি সমাজ। স্বীয় প্রতিপালকের দিকে তারা সবাই সমবেত হবে' (সূরা আন-আম, আয়াত-৩৮)। 'তারা কি উড়ন্ত পাখি দেখে না? এগুলো আকাশের শূন্যগর্ভে সহজে বিচরণ করে। আল্লাহ তাদেরকে সেখানে স্থির রাখে, নিশ্চয়ই এতে বিশ্বাসীদের জন্য নিদর্শনাবলী রয়েছে'। (সূরা নাহল ২৬, আয়াত-৭৯)।

চিত্র ৩.৫ ঃ প্রকৃতির দৃষ্টিনন্দন সৃষ্টি

পাখি বিজ্ঞানীদের একটি গবেষণার বিষয় হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। এছাড়া পাখির গোশত, ডিম ও পালকের ব্যাপক ব্যবহার রয়েছে সভ্যতার বিভিন্ন শোভাবর্ধনে। আল্লাহ পবিত্র কোরআনে পাখির উড্ডয়ন সম্পর্কে তার কুদরতের কথা উল্লেখের পাশাপাশি পাখি আল্লাহর ইবাদতে মশগুল, তা-ও উল্লেখ করেছেন। 'উড়ন্ত পক্ষীকুল তাদের পাখা বিস্তার করে আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে। প্রত্যেকেই তার যোগ্য ইবাদত এবং পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণার পদ্ধতি জানে।' (সূরা আন-নূর, আয়াত-৪১)।

পাখি সুন্দর বলেই আল্লাহর রাস্তায় শাহাদাৎ বরণকারীদের রূহ তিনি বেহেস্তে সবুজ পাখি রূপে অবস্থান করাবেন। সেই সবুজ পাখিরা বেহেস্তের গাছে গাছে ফল খাবে, উড়ে বেড়াবে এবং বেহেস্তের ঝরনার পানিতে খেলা করবে। আল্লাহ বেহেস্তবাসীদের নানা ধরনের পাখির গোশত দিয়ে আপ্যায়ন করাবেন। মহানবী হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) বলেছেন, 'কোন

www.nagorikpathagar.org

মুসলমান যদি জমিতে কোন গাছ রোপণ করে বা ক্ষেতে কোন শস্যের আবাদ করে আর তা থেকে উৎপন্ন ফল-শস্য কোন পাখি, মানুষ বা পশু ভক্ষণ করে তবে তা হবে সাদকা বা দান, আর এ জন্য সে সওয়াব প্রাপ্ত হবে। নিষ্পাপ শিশুরাও মৃত্যুর পর বেহেস্তের সুন্দর পাখি হিসেবে বিচরণ করবে।

হাজারো মাখলুকাতের মধ্যে পাখি একটি এবং এই পাখির মধ্যেই বিজ্ঞানীদের মতে রয়েছে ১৬ লাখ ৩৪ হাজার প্রজাতি। বিচিত্র বর্ণ, আকৃতি, স্বভাব ও উপকারিতার দিক থেকে পাখিকে নানা গোত্রে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রাণী জগতে পাখি ক্ষুদ্র আকৃতির হলেও পাখির মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন রহস্যময় ও মূল্যবান উপাদান যা বর্তমান বিজ্ঞানের যুগে গবেষণার বিষয়। আল্লাহ নিজেই পাখিকে তাঁর পরীক্ষার উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করেছেন। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) মৃত্যুর পর পুনর্জীবন সম্পর্কে আল্লাহর কাছে ব্যবহারিক দৃষ্টান্ত প্রত্যক্ষ করার ইচ্ছা পোষণ করলে আল্লাহ পাখি দিয়েই তা প্রমাণ করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন, 'যখন ইব্রাহীম বলল, হে আমার পালনকর্তা, আমাকে দেখাও, কেমন করে তুমি মৃতকে জীবিত করবে। আল্লাহ বললেন, তুমি কি বিশ্বাস কর না? হযরত ইব্রাহীম (আঃ) বলল, অবশ্যই বিশ্বাস করি, কিন্তু দেখতে চাইছি এজন্য যাতে অন্তরে প্রশান্তি লাভ করতে পারি। আল্লাহ বললেন, তাহলে চারটি পাখি ধরে নাও। পরে সেগুলোকে নিজের পোষ মানিয়ে নাও। তারপর সেগুলোর দেহের একেকটি অংশ বিভিন্ন পাহাড়ের উপর রেখে দাও। তারপর সেগুলোকে ডাক, তোমার কাছে সেগুলো দৌড়ে চলে আসবে' (সূরা বাকারা, ২ঃ২৬০)।

আল্লাহর নির্দেশ মতো হযরত ইব্রাহীম চারটি পাখি পোষ মানিয়ে পরে তাদের গোশত, হাড় ও পালক টুকরো টুকরো করে বিভিন্ন পাহাড়ের উপর রেখে দিলেন এবং যখন তাদের ডাক দিলেন তখন পাখিগুলো দৌড়ে তাঁর কাছে চলে এলো। এ ঘটনায় আল্লাহ পাখিকে ব্যবহার করেছেন পাখির প্রতি মানুষের সম্পর্কের কারণেই। কাবা শরীফ আক্রমণে আব্রাহামের হস্তিবাহিনী যখন প্রবল শক্তি নিয়ে এগিয়ে আসছিল, তখন আল্লাহ আবাবিল নামে একটি ক্ষুদ্রাকৃতির পাখির মাধ্যমেই হস্তিবাহিনীকে প্রতিরোধ করলেন। সেই আবাবিল পাখির ঝাঁক ক্ষুদ্র হলেও সেদিন বোমারু বিমানের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে হস্তিবাহিনীকে পাথর নিক্ষেপ করে নিশ্চিহ্ন করে ধুলায় মিশিয়ে দেয়। আল্লাহ কাবা শরীফ রক্ষায়ও পাখিকে ব্যবহার করেন। হযরত ঈসা (আঃ) মাটি দিয়ে পাখির প্রতিকৃতি তৈরি করতেন এবং তাতে ফুঁ দিলে তা উড়ে যেত। আল্লাহর হুকুমে হযরত ঈসা (আঃ)-এর এটা ছিল একটি অলৌকিক শক্তি। এক্ষেত্রেও পাখির ব্যবহার আকর্ষণীয় ও গুরুত্ব বহন করে। আল্লাহ পাখিকে শুধু সৌন্দর্যই দেননি, পাখিকে বিশেষ জ্ঞান ও বুদ্ধি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। হযরত সোলায়মান (আঃ) হুদহুদ নামে এক পাখিকে তার বুদ্ধিমত্তার জন্য তার কাছে রাখতেন। হুদহুদ পাখি তাকে বিভিন্ন বিষয়ে তথ্য প্রদান করে অবহিত করত। বিশেষ করে ভূ-পৃষ্ঠের বিভিন্ন স্থানের পানির গভীরতা সম্পর্কে নবীকে তথ্য প্রদান করত। এ ব্যাপারে ক্ষুদ্র হুদহুদ পাখি অভিজ্ঞ ছিল। হযরত সোলায়মান (আঃ) পাখিদের ভাষা বুঝতেন এবং পাখিরাও তার ভাষা বুঝতো।

www.nagorikpathagar.org

আধুনিক যুগেও পাখিকে যে কোন ভাষা শিক্ষা দিলে পাখি সে ভাষায় কথা বলতে সক্ষম। পাখি তার আবাস ভূমি থেকে কয়েক হাজার মাইল দূরে গিয়ে আবার সেখানে ফিরে আসতে পারে তার বুদ্ধিমত্তার কারণেই, যা মহান আল্লাহ্‌ প্রদত্ত। বিজ্ঞানীরা দীর্ঘকাল গবেষণা করে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, পাখিরা ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে বিভিন্ন অঞ্চলের আবহাওয়ার সূক্ষ্ম উপাদান অনুভবে সক্ষম। পৃথিবীর ম্যাগনেটিক ও মাধ্যাকর্ষণ ক্ষেত্রে, বাতাসের গতিবেগ এমনকি বায়ু চাপের পরিবর্তন পাখিরা বুঝতে পারে। কোন কোন পাখি অতি ভায়োলেট রশ্মি দেখতে পায় এবং ইনফ্রাসাউন্ড শুনতে পায় যা মানুষের পক্ষে দেখা ও শোনা সম্ভব নয়। জটিল ইন্দ্রিয়ের সমন্বিত প্রয়োগ পাখিদের হাজার মাইল দূর থেকে ফিরে আসতে দিক ও স্থান সম্পর্কে নির্ভুল ধারণা দিতে পারে। কবুতর একটি সুপরিচিত পাখি, পত্রবাহক হিসেবে এ পাখির খ্যাতি রয়েছে। দু'হাজার বছর আগে রোমানরা সংবাদ আদান-প্রদানে কবুতর ব্যবহার করত। ১২ শতাব্দীতে ইরাকে রাজকীয় পত্র বহনে কবুতর ব্যবহৃত হতো। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে কবুতরের মাধ্যমেই গোপন খবর প্রেরণ করা হতো। অনেক দূরত্ব অতিক্রম করে পত্র বহনে সক্ষম কবুতর রয়েছে ২৮৯ ধরনের। বিজ্ঞানীদের ধারণা, পাখিদের অনুভূতিকে ব্যবহার করে মানুষ ভূতাত্ত্বিক ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ অনেকটা এড়াতে সক্ষম হতে পারে। হযরত সোলায়মান (আঃ) ও হুদহুদ পাখির কার্যকলাপ মূলত আল্লাহ্‌ প্রদত্ত পাখির প্রজ্ঞা ও অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগানো। পাখির আকাশে উড্ডয়ন মানুষকে আকাশযান তৈরিতে উদ্বুদ্ধ করেছে। অপরদিকে পাখির গোশত, হাড় টুকরো করে পুনঃসংযোজনের সেই হযরত ইব্রাহিম (আঃ) এর ঘটনা আধুনিক শল্য চিকিৎসার ক্ষেত্রে একটি সূত্র বলে ধারণা করা হয়। পাখিদের স্থান পরিবর্তন, ফিরে আসা একটি নির্ধারিত সময়ে হয়ে থাকে, যা আল্লাহ্‌ প্রদত্ত। এটা তাদের স্নায়ুতন্ত্রের কাজ।

পাখির স্মরণ শক্তি ও শ্রবণ শক্তি অত্যন্ত প্রখর। পাখির শ্রবণ ক্ষমতা ১০০ থেকে ১২ হাজার ৮শ' এইচ জেট কম্পনাংক পর্যন্ত। এছাড়াও পাখিরা অতি উচ্চে এবং অতি দূরত্বে অবিরাম উড়তে সক্ষম। আধুনিককালে প্রশিক্ষণ বিমান ১ থেকে ৩ হাজার ফুট উপরে এবং

চিত্র ৩.৬ ঃ প্রাণী ও মাতৃস্নেহ

চিত্র ৩.৭ ঃ প্রকৃতির অপূর্ব সৃষ্টি

www.nagorikpathagar.org

এয়ারবাস অথবা যাত্রী ও মালবাহী বৃহদাকার বিমান ১০ থেকে ১৫ হাজার ফুট উপর দিয়ে উড়ে যায়, অথচ পাখি এর চেয়েও বেশি উপরে উঠতে সক্ষম। ১৯২১ সালে এভারেস্ট অভিযানকারীদের অন্যতম ব্রিটিশ সদস্য ড. ওলাটস্টেন প্রায় ২৫ হাজার ফুট উপরে পাখি দেখতে পান। সারস ও বককে সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে ২০ হাজার ফুট উপরে হিমালয় পার হতে দেখা গেছে। ১৯৬২ সালে ২১ হাজার ফুট উঁচুতে মার্কিন বিমানের সঙ্গে একটি বুনো হাঁসের ধাক্কা লেগেছিল। পাখিরা লাগাতার আকাশে উড়তে পারে। এজন্য তাদের খাদ্য ব্যবস্থাও অদ্ভুত। দক্ষিণ মেরু অঞ্চলের পাখি অ্যালবাট্রোস মাসের পর মাস অবিরাম উড়তে পারে। দিনে এ পাখির গতি ৪৮০ কিলোমিটার। এরা বছরে অন্তত একবার পুরো পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে। উত্তর আমেরিকার রকি পাহাড়ে বাসা তৈরি করে ঈগল, ডিম পাড়ার পর ঈগলেরা আমেরিকার স্থলভাগ অতিক্রম করে আটলান্টিক সাগর পাড়ি দিয়ে ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জ, রাশিয়া মঙ্গোলিয়া, ইউরোপ ও উত্তর প্রশান্ত মহাসাগরের উপর দিয়ে আবার সেই ডিমের পাহাড়

চিত্র ৩.৮ ঃ পাখি ও প্রকৃতি

চিত্র ৩.৯ ঃ পাখি ও পক্ষিপ্রেমী

রকিতে ফিরে আসে। প্রতি বছর মেরু অঞ্চলের গাঙচিল ১৪ হাজার মাইল এলাকা অতিক্রম করে আলাস্কা থেকে দক্ষিণ মেরু পর্যন্ত উড়ে যাতায়াত করে। সাইবেরিয়ার সোনালি বাটন পাখি ৩ থেকে সাড়ে ৩ হাজার কিলোমিটার পথ না থেমেই একবারে উড়ে যায়।

আধুনিক বিশ্বে পাখি পালন, সংরক্ষণ ও বাণিজ্যিক উৎপাদন ব্যাপকতা লাভ করছে। হাঁস-মুরগি, কবুতর, কোয়েল পাখিসহ বিভিন্ন পাখির খামার গড়ে উঠছে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে। এ থেকে প্রাপ্ত ডিম, গোশত, পালক অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে খাদ্য হিসেবে পাখির ডিম, গোশতের চাহিদা ক্রমেই বাড়ছে। আল্লাহর সুন্দরতম এ সৃষ্টি পাখি প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় রাখতেও বিশেষ অবদান রাখছে। অতিথি পাখিদের আগমন কোন দেশের ক্ষতি করে না, বরং তাদের আগমন প্রাকৃতিকভাবে উপকারী। পাখি পালন, সংরক্ষণ অতি জরুরি। মহানবী (সাঃ) পাখি সংরক্ষণের বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেছেন। একদা এক সাহাবী একটি পাখির বাসা থেকে পাখির বাচ্চা নিয়ে আসেন, এতে পাখির মা তার বাচ্চার পিছু ছুটে আসে। এ ঘটনায় মহানবী (সাঃ) মর্মাহত হন। তিনি তাৎক্ষণিক বলেন, 'পাখির বাচ্চা পাখির বাসায় রেখে আস।' অর্থাৎ পাখির নিরাপত্তা দিয়ে তা সংরক্ষণ করা উচিত। আল্লাহর সব সৃষ্টি মানুষের খেদমতে, তবে অবশ্যই

www.nagorikpathagar.org

খেয়াল রাখতে হবে যেন সেই সৃষ্টির অপব্যবহার না হয়। তাই সবার উচিত পাখিকে শান্তিতে বিচরণ করতে দেয়া। কারণ, আন্তর্জাতিক অঙ্গনে শান্তির প্রতীকই হচ্ছে পাখি (মোহাম্মদ মাহবুবুল আলমঃ যুগান্তর ১৮ অক্টোবর ২০০২)।

প্রাণী জগতের আবাসভূমি বাংলাদেশ

পদ্মা, ব্রহ্মপুত্র, মেঘনা, যমুনা এ চারটি নদীর অববাহিকায় গড়ে উঠেছে এ সবুজ-শ্যামল বাংলাদেশ। মধুপুর ভাওয়ালের গড়, পার্বত্য এলাকা ও সিলেটসহ সর্বত্র গভীর বন জঙ্গলে ঘেরা ছিল এদেশ। নদীগুলোর অজস্র শাখা-প্রশাখা, জলভূমি, চরাঞ্চল দ্বীপ, ব-দ্বীপে পর্যাপ্ত পানি, বৃষ্টি এবং পলল ছিল বলেই অতি সহজে গাছ-পালা গজিয়ে উঠত। প্রাচীনকাল থেকেই ভূমিজ ফসলের সমারোহে বাংলা এলাকা সমৃদ্ধ থাকায় সহজে ঘনবসতি এলাকা সত্ত্বেও সবুজ শ্যামলের কোন অভাব ছিল না। ফলে নদীতে যেমন জলজ প্রাণী তেমনি বন জঙ্গলেও ভরপুর ছিল পশুপাখিতে। চতুর্দশ শতাব্দী থেকেই সবুজ বাংলার প্রকৃতি পরিবেশের ভাঙচুর শুরু হয় দ্রুত নগরায়নের প্রয়োজনে : সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত তা আরো বিস্তৃত হয়। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষের দিকে মধ্য ও উত্তর বাংলায় দ্রুত নগরায়নের কর্মকাণ্ড সম্প্রসারণ অব্যাহত থাকে। পর্তুগীজদের অত্যাচারে প্রায় একশ বছরের মত সময়কাল দক্ষিণ বাংলার জনজীবন বিপন্ন হয়ে যায় এবং আবার জঙ্গলে পরিণত হয়ে যায় এসব এলাকা। ইতিহাস পর্যালোচনায় দেখা যায়, প্রকৃতপক্ষে এসব এলাকায় জনবসতি গড়ে উঠতে শুরু করে ইংরেজ শাসনামলে। এ দেশের বন ধ্বংস করার প্রক্রিয়া মূলত শুরু হয় ইংরেজ আমলেই। শিল্প বিপ্লবের পর বৃটিশ ইউরোপিয়ান শিল্প কারখানাগুলোর কাঁচামাল সরবরাহের উৎস হিসেবে ভারতবর্ষ ছিল বড় যোগানদাতা। নতুন নতুন চাষের জমি আবিষ্কারের নামে নির্বিচারে নিধন করা হয়েছে এ দেশের বন জঙ্গল। মূলত বিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে উপমহাদেশের প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট হতে শুরু করে। দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় চাষাবাদের জমি সম্প্রসারণ করার প্রয়োজন হয়ে দাঁড়ায়। তার সাথে যান্ত্রিক চাষাবাদের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করার চেষ্টা করা হচ্ছে। উন্নয়নের লক্ষ্যে দ্রুত অবকাঠামো গড়ে উঠেছে সর্বত্র। ফলে বনভূমিতে বসবাসরত জীবজন্তু, পশুপাখি তাদের আবাস হারিয়েছে। পাকিস্তানি শাসনামল থেকে নগরায়ন ও কৃষি উৎপাদনের নামে নতুন উপসর্গ হিসেবে আসে নাইট্রোজেন, বিভিন্ন প্রকার কেমিক্যাল সার, অতি বিষাক্ত এন্ড্রিন, ফলিডল ডিডিটি কীটনাশক। বিগত তিন চার দশকের অপরিকল্পিত কীটনাশক প্রয়োগের ফলে বিপুল পরিমাণ পাখি, মাছ ও জীবজন্তু এ দেশ থেকে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে।

উন্নত দেশগুলোতে কীটনাশক যখন পোকামাকড় ও জীবজন্তুর জন্য অনিষ্টকারী হয়ে দেখা দেয় তখন থেকেই সেসব দেশের বিজ্ঞানীরা নজর দেয় প্রতিবেশ ব্যবস্থাপনায় (Ecological Management) তা কি করে দক্ষ করা যায়। চীন দেশে কমিউনিটি চাষাবাদ যখন তুঙ্গে ছিল, তখন পোকা দমনের জন্য পাখির সংখ্যা বাড়ানো হয়েছিল।

www.nagorikpathagar.org

আমাদের গ্রামীণ সমাজেও চাষীরা ফসল ক্ষেতে পাখি বসার জন্য লাঠি রাখতো। এগুলোতে দিনের বেলায় কাক, শালিক, বুলবুলি বসতো। রাতের বেলায় পেঁচারা ইঁদুর ধরার জন্য বসতো। অন্যান্য দেশে মাকড়সা, গুবরে পোকা, শিকারী পাখি বা স্তন্যপায়ী পশু এমনকি ভীমরুলের প্রজাতি বাড়ানো হয়। আমাদের দেশে বন্যপ্রাণী ধ্বংস হয়ে যাবার অন্য কারণ গ্রামাঞ্চলসহ সংরক্ষিত বনাঞ্চলে বড় বড় গাছ ধ্বংস করে ফেলা। জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে নির্মাণ সামগ্রী, আসবাবপত্র ও জ্বালানি চাহিদা মিটাতে গিয়ে প্রকৃতির ভারসাম্যের এ ভয়াবহ দুরবস্থা।

প্রকৃতিতে একটি বড় গাছ নিজেই একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রতিবেশ বস্তু (Ecosystem)। গ্রামাঞ্চলে সালিশ বসার জন্য বা ক্লাবঘর এখনো বট গাছ বা বড় গাছের নিচেই গড়ে ওঠে। এসব বড় গাছের তলায় কেঁচো, পিঁপড়ে, গুবরে পোকারা বাসাও বেঁধেছে। এদেরকে খাবার জন্য আছে সাপ, ইঁদুর ও সহস্রপদী বিছের দল। গাছের পাতা থেকে কাণ্ড পর্যন্ত বেয়ে আছে সুড়সুড়ি, ডেয়ো আর বিষাক্ত অজস্র পিঁপড়ের দল। তাছাড়া রয়েছে বাবল পোকা, টুনটুনি বিভিন্ন জাতের ট্রি ক্রিপার পাখির দল। গাছের ডালে বাসা বাঁধে বিভিন্ন পাখি। মরাডাল খুঁড়ে বাসা বাঁধে কাঠ ঠোকরা, টিয়ে পাখি। গাছের পাতায় বাসা বাঁধে বিভিন্ন প্রকার ঘাস ফড়িং জাতীয় পোকা এবং টুনটুনি জাতীয় পাখির দল। গাছের মাঝখানে আবার বিভিন্ন জাতীয় পাখির আবাসস্থল। প্রাইমেট জাতীয় উল্লুক, ম্যাকক জাতীয় বাঁদর, লাজুক বাঁদরদের এ জায়গা খুবই পছন্দনীয়। সবার উপরে স্থান নেয় ঈগল, শিকারী পাখি থেকে শুরু করে শকুন ও দাঁড় কাঁকরা। এমনিভাবে সহজেই চিন্তা করা যায় সবুজ বাংলাদেশে কি করে গড়ে উঠেছিল প্রাণী জগতের আবাসস্থল।

বাংলাদেশের প্রাণী সম্পদের বিবরণ

বাংলাদেশ বৈচিত্র্যপূর্ণ প্রাণীর আবাসস্থল মূলতঃ পার্বত্য চট্টগ্রাম, সিলেটের পাহাড়ি অঞ্চল এবং সুন্দরবন এলাকায় সীমাবদ্ধ। বনভূমি থেকে জ্বালানি কাঠ আহরণের ফলে কৃষি এবং শিল্প কার্যক্রমের ফলে বনভূমি ও বন্য প্রাণীর সংখ্যাও ক্রমান্বয়ে মারাত্মকভাবে সংকুচিত হয়ে আসছে। শীতকালে প্রায় দুইশত প্রজাতির যাযাবর পাখি এদেশে আসে। নির্বিচারে শিকারের ফলে ক্রমান্বয়ে এদের আগমন নিরুৎসাহিত হচ্ছে। তদুপরি চামড়া ও পশমযুক্ত চামড়ার জন্য বন্য প্রাণী শিকার করা হয়। বাংলাদেশ বন বিভাগ ১৯৮৩ সালে দশটি অভয়ারণ্য, চারটি জাতীয় পার্ক এবং একটি গেইম রিজার্ভসহ মোট পনেরটি এলাকাকে বন্য প্রাণী সংরক্ষণ এলাকা হিসেবে ঘোষণা করেছে। সুন্দরবন ও কক্সবাজার উপকূলীয় ম্যানগ্রোভ বনরাজি এলাকা বিভিন্ন পশুপাখির ও মাছের প্রজনন ক্ষেত্র। ব্যাপক বৃক্ষ নিধন ও উপকূলীয় এলাকায় পরিবেশ দূষণ হচ্ছে, ফলে বিভিন্ন প্রাণীর বিরাট মূল্যবান প্রজনন ক্ষেত্রের দ্রুত কার্যকারিতা হারাচ্ছে।

www.nagorikpathagar.org

বিচিত্র প্রাণীর প্রকারভেদ ও সংখ্যা

শরীরের আকৃতি, চলাফেরা, প্রজনন প্রক্রিয়া ইত্যাদি বিভিন্ন গুণাবলী ও কার্যাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে প্রাণীকুলকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা হয়েছে।

স্তন্যপায়ী প্রাণী: তাদের কার্যাবলী ও শরীরের বৈশিষ্ট্যের পরিপ্রেক্ষিতে শ্রেণীকরণ করে বলা হয়েছে, যে সব প্রাণী মায়ের দুধ খায়, গায়ে লোম আছে তাদেরকে স্তন্যপায়ী প্রাণী বলে। এসব প্রজাতির সংখ্যা মানুষসহ প্রায় চার হাজারের মতো।

উভচর প্রাণী : শরীরের গঠন এবং আবাসস্থলের বৈশিষ্ট্যের পরিপ্রেক্ষিতে কিছু প্রাণী রয়েছে যাদেরকে উভচর প্রাণী বলা হয়, যারা মেরুদণ্ড নিয়ে জন্মায় আবার প্রয়োজনে স্থলে আসে। তাদের তিন হাজার প্রজাতি রয়েছে যেমন ব্যাঙ, কচ্ছপ ইত্যাদি।

সরীসৃপ প্রাণী: আবাসস্থল, রক্তের ও চামড়ার বৈশিষ্ট্যের পরিপ্রেক্ষিতে শ্রেণীকরণ করা হয়েছে। যে প্রাণীর শরীরের রক্ত ঠাণ্ডা, চামড়া খসখসে তাদেরকে সরীসৃপ প্রাণী বলে, কিন্তু তারা সবসময় স্থলভাগে জন্মে। এসব প্রাণীর প্রজাতির সংখ্যা প্রায় ৬ হাজার যেমন- সাপ, টিকটিকি ও গুইসাপ।

যুক্তপদী : অনুরূপভাবে মাছের প্রজাতির মোট সংখ্যা ২১ হাজার। মাছ ও পাখি ডিম ফুটায়, তবে পাখিরা পৃথিবীর মুক্ত আলো বাতাসে ঘুরে বেড়ায়। ওদের সুন্দর পাখা দিয়ে মুক্ত আকাশে উড়তে পারে। এদের প্রজাতির সংখ্যা হলো ৮ হাজার। যুক্তপদী এদের বৈশিষ্ট্য হলো ওদের পায়ে অনেক জোড়া আছে। আর গায়ে আছে শক্ত আবরণ। এদের প্রজাতির সংখ্যা প্রায় ৮ লাখ। যেমন- চিংড়ি, কাঁকড়া ইত্যাদি।

কম্পোজ: যাদের দেহ নরম উপরের খোলস শক্ত, তবে তাদের কোন মেরুদণ্ড নেই। ওদের প্রজাতির সংখ্যা ১ লাখ। যেমন- শামুক, ঝিনুক ইত্যাদি। (গোলাম আকবর, দৈনিক ইনকিলাব ২১শে মে ২০০০)।

ওয়ার্ল্ড ওয়াচ ইনস্টিটিউট ৯০ দশকের বিপদাপন্ন নির্বাচিত জীব প্রজাতির এক বিবরণীতে উল্লেখ করেছে যে, সাম্প্রতিক বছরগুলোতে উভচর প্রাণীগুলোর আশংকাজনক হারে বিলুপ্তি ঘটছে। নিউজিল্যান্ডের জলাভূমি কমে যাওয়া এবং নতুন প্রজাতির আগ্রাসনে সেখানকার অদ্ভুত ব্যাঙ প্রজাতির সংখ্যা ইতিমধ্যে অর্ধেকে নেমে এসেছে। জীববিজ্ঞানীদের মতে, ইউরোপীয় দেশগুলোয় ক্রমবর্ধমান ব্যাঙের চাহিদা বাড়াতে ভারতীয় উপমহাদেশে বড় জাতের ব্যাঙ প্রজাতির অস্তিত্ব মারাত্মকভাবে হুমকির সম্মুখীন। পাখি প্রজাতির পরিসংখ্যানের বিষয় বলা হয়, বিশ্বের পাখির সংখ্যা কমে অথবা বিলুপ্ত হয়ে বর্তমানে এক-চতুর্থাংশে এসে দাঁড়িয়েছে। তেমনি মাছের সংখ্যাও মারাত্মকভাবে কমে এসেছে।

মৎস্যসম্পদ সংরক্ষণ ও দারিদ্র্য বিমোচন

বাংলাদেশের জনগণের শতকরা ৮০ ভাগ প্রোটিন আসে মৎস্যসম্পদ থেকে। এ দেশের মিষ্টি পানির মাছ বেশি জনপ্রিয়। মাছ বাংলাদেশের খাদ্যগত আমিষের প্রধান। পশুর সার্বিক আমিষের ৮৫ শতাংশের বেশি সরবরাহ আসে মৎস্যসম্পদের মাধ্যমে। মৎস্যসম্পদ মোট

www.nagorikpathagar.org

জাতীয় উৎপাদনে বিভিন্নভাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। সার্বিক জাতীয় আয়ের ৪.৭ শতাংশ কৃষি জাতীয় আয়ে ৬.৯ শতাংশ রফতানি আয়ের ১১ শতাংশ আসে এ সেক্টর থেকে (আহমেদ ও আলী ১৯৯৬)। মৎস্যজীবী, বণিক, পরিবহনকারী মোড়কজাতকারী ইত্যাদি বিভিন্ন পেশায় ২ লক্ষাধিক লোক এ সেক্টরে নিয়োজিত রয়েছে। চল্লিশ ও পঞ্চাশ দশকে এদেশের জনসাধারণের প্রাত্যহিক খাদ্য তালিকায় পশুজ আমিষের ৯৫ শতাংশ পূরণ করতো মাছ। এ সংখ্যা ১৯৯০ সালের পূর্বে ছিল ৮০ শতাংশ। বর্তমানে মাথাপিছু পঞ্চাশজন আমিষ গ্রহণের ৭১ শতাংশ মাছভিত্তিক। নদী ও জলাভূমি মাছ চাষের অবারিত সুযোগসন্ধানী এবং মাছের প্রাকৃতিক আবাস। আঞ্চলিক পর্যায়ে চীন ও ভারতের পরই তৃতীয় স্থানে রয়েছে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ মৎস্য উৎপাদন। দেশের মাছের সামগ্রিক উৎপাদনে ৫২.২ শতাংশ অবদান সৃষ্টিকারী অভ্যন্তরীণ মৎস্য সংগ্রহ আজো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলছে। অভ্যন্তরীণ চাষকৃত মাছের সার্বিক বার্ষিক উৎপাদন ২৩.৩ শতাংশ। অপরদিকে সামুদ্রিক মাছ উৎপাদন ২৪.৫ শতাংশ (আহমেদ ও আলী ১৯৯৬)। কৃষি জমি সম্প্রসারণের ফলে হাওর-বাঁওড় এলাকা কমে যাচ্ছে, ফলে মাছের প্রজনন ও উৎপাদন ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে। বাংলাদেশের মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত এক সমীক্ষায় উল্লেখ করা হয়েছে, দেশে আহরিত মৎস্যসম্পদের সরবরাহ লক্ষণীয়ভাবে নিম্নগামী প্রবণতা ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে। মাছ, কাঁকড়া ও কচ্ছপ সংগ্রহের বিশ্বপর্যায়ের রেকর্ড ১৯৮৯ সালে ৯.৯৬ কোটি মেট্রিক টন থেকে হ্রাস পেয়ে ১৯৯৬ সালে ৯.৫২ কোটি মেট্রিক টনে দাঁড়িয়েছে (আহমেদ ১৯৯৯)। তাছাড়া ১৯৮৮, ১৯৯৮, ২০০০ ও ২০০৪ সালের মারাত্মক বন্যার ফলে দেশের বিভিন্ন স্থানে ব্যাপক হারে মাছের উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে। চিংড়ি মাছ রফতানি করে বাংলাদেশ বিরাট অংকের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করতো, তা-ও ক্রমান্বয়ে কমে যাচ্ছে। এ দেশের গরিব মানুষের জন্য মাছই একমাত্র বিনামূল্যে/সস্তা প্রোটিন। এখনো এ দেশের গ্রামাঞ্চলে সাধারণ মানুষ ডোবা ও নিচু এলাকায়, রাস্তার ধারে নদী-নালা এবং সরকারি জলাশয়ে বিনামূল্যে মাছ শিকার করে থাকে। এ দেশে অবাধে মাছ শিকারের প্রথা বহু প্রাচীন যা অদ্যাবধি চালু রয়েছে কারণ, নদী-নালা, হাওর-বাঁওড়, বিল, নদীর মোহনা ও সাগরের মাছকে Common Property বলা হয়, যেখানে সাধারণ মানুষের অবাধ প্রবেশাধিকার রয়েছে। সরকারি ব্যবস্থাপনায় জলমহালগুলি ইজারা দেয়া হয়ে থাকে সর্বোচ্চ দরপত্রদাতাকে।

আর ইজারাদার নির্বিচারে আহরণ করে ছোট, বড়, পক্ক, অপরিপক্ক এবং ডিমওয়ালা মাছ। যার ফলে অতিদ্রুত বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে অনেক প্রজাতির মাছ। মিষ্টি পানির অতি সুস্বাদু মহাশোল, নানিদ মাছ দুটি আজকাল গল্পের উপকরণ মাত্র। এমনকি হালে মাছের পোনা ছাড়া হলেও প্রজাতির বৈচিত্র্য তো আর থাকছে না। মাছের প্রজাতির বৈচিত্র্য বিলুপ্তির ফলে মানুষের জন্য প্রোটিনসহ অন্যান্য প্রাণীর খাদ্যচক্র মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এ ক্ষেত্রে ছোট মাছের উপকারিতা ও উপযোগিতা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

www.nagorikpathagar.org

আমাদের দেশের মাছের বাজারের বেশিরভাগ হচ্ছে ছোট মাছ যা, দেশের বেশির ভাগ জনসংখ্যার চাহিদা পূরণ করে যেমনঃ টেংরা, পুঁটি মাছ, খলিসা, ভেদর, মলা, ঢেলা, গুলশা, কাজলী ইত্যাদি। উপরোক্ত মাছে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন এ রয়েছে। এক গবেষণায় দেখা যায়, এক গ্রাম মলার টিস্যুতে ২০০ মিলিগ্রাম আইইউ ভিটামিন "এ" রয়েছে (জাফরী ও আহমদ ১৯৯৮)। ছোট মাছ আমাদের নিম্ন আয়ের মানুষের ভিটামিন "এ" ও ক্যালসিয়ামের চাহিদা পূরণ করে। অন্য এক গবেষণায় দেখা যায়, ১০০ গ্রাম ভক্ষণযোগ্য মলা মাছে ১৮.১৯ গ্রাম প্রোটিন, ২.৪৯ গ্রাম চর্বি, ৩.১৯ গ্রাম কার্বোহাইড্রেট, ১১০ মিলিগ্রাম ক্যালসিয়াম, ১ গ্রাম আয়রন, ১৫ মিলিগ্রাম ভিটামিন সি পাওয়া যায়। পক্ষান্তরে ১০০ গ্রাম কার্পে ১৬.৬ গ্রাম প্রোটিন, ০.৮-২.৪৯ গ্রাম চর্বি, ২.৯-৪.৪৯ গ্রাম কার্বোহাইড্রেট পাওয়া যায়।

দুর্ভাগ্য হলেও সত্য যে, আমাদের দেশে অধিক জনসংখ্যার চাহিদা মিটাতে অতিমাত্রায় মাছ আহরণ করা হয়ে থাকে। বন্যা নিয়ন্ত্রণের ফলে এবং অবকাঠামো উন্নয়নের ফলে অতিমাত্রায় বাঁধ নির্মাণ করে মাছের চলাচলের পথ বন্ধ করে দেয়া হচ্ছে প্রতিনিয়ত। অধিক ফসল ফলানোর নামে অপরিকল্পিতভাবে জৈব সার ও কীটনাশক ব্যবহার করা হচ্ছে। অধিক খাদ্যোৎপাদনের জন্য জলাভূমিগুলোতে চাষাবাদ করাতে মাছের আবাসস্থল বিনষ্ট হয়ে যাচ্ছে। কলকারখানার বর্জ্য ফেলে জলাশয়ের পানি দূষিত করা হচ্ছে। উপকূলীয় এলাকায় লবণাক্ততা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে পলিমাটি, সেডিমেন্ট ও বালুরাশি দিয়ে দেশের নদীগুলো এবং জলাশয়গুলোর গভীরতা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

এ দেশের জাতীয় অর্থনীতিতেও মৎস্যসম্পদের গুরুত্ব অপরিসীম। এক পরিসংখ্যানে দেখা যায়, প্রায় ১.৩ মিলিয়ন লোক প্রত্যক্ষভাবে এ সেক্টরের বিভিন্ন পেশায় সরাসরি নিয়োজিত। অপ্রত্যক্ষভাবে ১২ মিলিয়ন লোক এ সেক্টরে জীবিকা নির্বাহের জন্য বিভিন্নভাবে সম্পৃক্ত। ফ্রোজেন চিংড়ি, মাছ, মৎস্যোৎপাদিত বিভিন্ন প্রডাক্ট এ দেশের রফতানি সামগ্রীর তৃতীয় স্থান দখল করে আছে। ১৯৯৮-৯৯ অর্থবৎসরে মৎস্য ও কৃষি খাতের জাতীয় আয়ে (GDP) অবদান রাখে ২২.৫১ শতাংশ, এর ৫.৯৩ শতাংশ অবদান রেখেছে মৎস্যসম্পদ। মাছ এখনো দেশের প্রাণীভিত্তিক মোট প্রোটিনের ৬০ শতাংশ সরবরাহ করে (আনোয়ার ২০০০)।

ক্যাপচার ফিশারি (Capture Fishery) গত তের বৎসরে বহু জলাশয়ের (Inland Water) মৎস্য উৎপাদন ১৯৮৩-৮৪ এর ৪ লাখ ৭১ হাজার টন থেকে ১৯৯৬-৯৭ সালে ৬ লাখ টন বেড়েছে। এর বার্ষিক গড় উৎপাদনের হার ছিল ১.৫ শতাংশ। সামুদ্রিক পানির (Marine Water) মৎস্য উৎপাদন বেড়েছিল ১৯৮৩-৮৪ সালে ১ লাখ ৬৪ হাজার টন থেকে ১৯৯৬-৯৭ সালে ২ লাখ ৭৪ হাজার টন। চাষ করা উৎপাদিত মৎস্য (Culture Fishery) আবাদ করা চাষের মাছের পরিমাণও বৃদ্ধি পেয়েছে উল্লেখযোগ্যভাবে। গত ১৯৮৩-৮৪ সালে ১১৭,০০০ টন থেকে বেড়ে ১৯৯৬-৯৭ সালে এর উৎপাদন দাঁড়িয়েছে

www.nagorikpathagar.org

৪৩২,১৩৫ টন। বার্ষিক গড় উৎপাদনের হার দাঁড়িয়েছিল গত ১৩ বৎসরে প্রায় ১০.৬ শতাংশে এবং সার্বিক মোট উৎপাদনের গড় দাঁড়ায় ৩.৫ শতাংশের মতো।

আবাদ মৎস্য চাষের মধ্যে উপকূলীয় এলাকায় চিংড়ি চাষের ভূমিকা বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। চিংড়ি চাষ ১৯৮৩-৮৪ সালে ৭ হাজার ৫ শত টন থেকে ১৯৯৬-৯৭ সালে ২৪ হাজার টনে বেড়েছে। উপকূলীয় এলাকায় চিংড়ি মাছের উৎপাদন উক্ত সময়ের মধ্যে ৬৪ হাজার হেক্টর থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১ লাখ ৪৫ হাজার হেক্টরে দাঁড়িয়েছে। এ কথা সত্য যে, চিংড়ি চাষ আমাদের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে বিরাট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। কিন্তু উপকূলীয় এলাকায় নানা প্রাকৃতিক কারণে অথবা অপরিকল্পিত উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের ফলে পরিবেশের যে অপূরণীয় ক্ষতি হতে পারে তা পর্যালোচনা করে দেখা প্রয়োজন। উপকূলীয় এলাকায় প্রান্তিক চাষী নিজেদের জমি চিংড়ি চাষী মহাজনদের কাছে লিজ দিয়ে নিজেরা অন্যত্র দিনমজুর হিসেবে কাজ করে। লিজ মেয়াদকালে তাদের নিজেদের জমি তাদের ব্যবহারের অধিকার থাকে না। লিজ মেয়াদ শেষ হলে এসব অবক্ষয় (destroyed) অনুর্বর জমিতে আর কোন কৃষিকাজ করা সম্ভব হয় না। ফলে প্রান্তিক চাষী ক্রমান্বয়ে স্থায়ী ভূমিহীনে পরিণত হয়। এভাবে অপরিকল্পিতভাবে চিংড়ি চাষের ফলে প্রাণী ও উদ্ভিদের খাদ্যচক্রও মারাত্মকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। যার ফলে মানবকুল ও প্রাণীকুল মারাত্মক প্রতিকূল পরিবেশের সম্মুখীন হতে পারে। এ ক্ষেত্রে সুষ্ঠু পরিকল্পনা এবং দীর্ঘ মেয়াদি ব্যয়-সুবিধা নিরিখে (Cost-Benefit) বিশ্লেষণ একান্ত আবশ্যক, কোন অবস্থাতেই দীর্ঘ মেয়াদি পরিবেশ ধ্বংসের মূল্য যেন স্বল্পমেয়াদি বৈষয়িক সুবিধার চেয়ে বেশি না হয়।

বাংলাদেশের বিপন্নপ্রায় মাছের কথা

বিজ্ঞানীরা মনে করেন পৃথিবীতে বিশ হাজার প্রজাতির মাছ রয়েছে। এর মধ্যে বাংলাদেশে রয়েছে ৭৩৫ রকমের মাছ। বাস্তবে বাংলাদেশে উল্লিখিত সংখ্যক প্রজাতির মাছ আর বর্তমানে নেই। মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানীরা ৪৩টি বিলুপ্তপ্রায় মৎস্য প্রজাতিকে তিন ভাগে ভাগ করেছেন ঃ (ক) মারাত্মকভাবে বিপন্ন প্রজাতির মাছ, (খ) বিপন্ন প্রজাতি ও (গ) বিপন্ন হওয়ার পথে। বাংলাদেশে মারাত্মকভাবে বিপন্ন প্রজাতির মাছগুলো হচ্ছে নন্দিনা, মহাশোল, বাঘআইড়, সরপুঁটি, পিপলাশোল, চেওয়া ও নাপিত মাছ। বিপন্ন প্রজাতির মাছগুলোর মধ্যে রয়েছে ২৫ প্রজাতির মাছ যেমন গনিয়া, কালিবাউস, পাবদা, গজার, গুলশা, এলং, খয়রা, ঢেলা, রাণীমাছ, খোকশামাছ, বোয়াল, শিং, শালবাটা, গাং মাগুর, বাচা, পাঙ্গাশ, গাত্তা, গুজি, আইড়, রিটা, টেংরা, চিতল, বাইম, মেনি (ভেদা), কই এবং রাঙ্গা চান্দা। সর্বশেষে বিপন্ন হওয়ার পথে ১০টি মাছ হচ্ছে ঃ বাটা, বামোস, তিতপুঁটি, কুইচা, মধুপাবদা, কাজলি, আইড়, বিশপাতা, কলি ও তারাবাইম। IUCN এর Country Representative ডঃ আইনুন নিশাত এক সাক্ষাৎকারে উল্লেখ করেছেন, বাংলাদেশে মোট ২৫৯ প্রজাতির মাছ রয়েছে। বর্তমানে এর মধ্যে ৫৪ প্রজাতির মাছ বিলুপ্তির পথে। তন্মধ্যে ৬০ প্রজাতির মাছ সম্বন্ধে পর্যাপ্ত উপাত্ত নেই। বিলুপ্তির কারণ হিসেবে তিনি উল্লেখ

www.nagorikpathagar.org

করেছেন পানি দূষণ, জলাধার বিপন্ন, প্রজনন স্থান বিপন্ন, নদী ভরাট, কীটনাশক ঔষধ ব্যবহারের প্রতিক্রিয়া এবং রাক্ষুসে মাছ চাষের প্রসার।

বাংলাদেশে বিপন্নপ্রায় ইলিশ

ইলিশ আমাদের জাতীয় মাছ। মিষ্টি পানির সবচেয়ে সুস্বাদু মাছ ইলিশ আজ প্রায় বিপন্ন। ইলিশ অতি দ্রুত গতিসম্পন্ন এনড্রোমাস যাযাবর বা ভ্রমণশীল মাছ। বর্ষাকালে সমুদ্র যখন উত্তাল হয়ে উঠে, তখন ইলিশ মাছের পক্ষে সেখানে জীবন ধারণ করা সম্ভব নয়। নিরাপদ স্থানে আশ্রয় ও প্রজননের জন্য বঙ্গোপসাগর থেকে প্রধানত মেঘনা, পদ্মা এবং প্রদেয় শাখা নদীগুলো দিয়ে চলতে থাকে। ইলিশ মাছ ডিম ছাড়ে আগস্ট মাস থেকে নভেম্বর মাসের ভিতর। প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে ইলিশ মাছ ডিম পাড়ে মিঠা পানিতে। ইলিশের রেণু জাটকায় পরিণত হতে সময় লাগে ৩-৬ মাস। অতি মাত্রায় মৎস্য আহরণের ফলে ৫ শতাংশের বেশি জাটকা সাগরে ফিরে যেতে পারে না, প্রায় ৯৫ শতাংশ মাছ ধরা পড়ে জেলেদের হাতে।

ইতিহাসে - সাহিত্যে ইলিশ

মাছে-ভাতে বাঙালির পাতে কোন যুগে, কোন মাহেন্দ্রক্ষণে ইলিশের সুপ্রিয় সংযোগ ঘটেছিল তা নিশ্চিত করে বলার উপায় নেই। প্রাচীন সংস্কৃতে ইলিশকে বলা হয়েছে 'ইল্লিশো'। নীহার রঞ্জন রায় বাঙালির ইতিহাসে (আদিপর্ব) ইলিশ প্রসঙ্গে প্রাচীন স্মৃতিশাস্ত্র প্রণেতা জীমূতবাহনের উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন, 'প্রাণিজ ও উদ্ভিজ্জ তৈল বা চর্বির তালিকা দিতে গিয়ে জীমূতবাহন ইলিশ মাছের তৈলের উল্লেখ ও বহুল ব্যবহারের কথা বলিয়াছেন। মনে হয়, আজিকার দিনের মতো প্রাচীন কালেও ইলিশ মাছ বাঙালীর অন্যতম প্রিয় খাদ্য ছিল এবং ইলিশের তৈল নানা প্রয়োজনে ব্যবহৃত হইত। দ্বাদশ শতকে সর্ব্বানন্দ তার 'টীকাসর্ব্বস্ব'তে মাছের নিন্দা করলেও সেখানে উল্লেখ রয়েছে 'ইল্লিশা' মাছের। মধ্যযুগের সাহিত্যে বাংলা ও বাঙালী গ্রন্থে মুহাম্মদ আবদুল জলিল সে যুগের রন্ধন প্রণালী এবং মাছের যে তালিকা দিয়েছেন তাতে ইলিশ ছিল অন্যতম। দ্বিজবংশী বদন দাসের মনসামঙ্গল কাব্যে সে বর্ণনা এমন, ইলিশ তলিত করে বাচা ও বাঙ্গআ। /শউলের খণ্ড ভাজে আর শউল পোনা ॥ /বড় বড় ইচা মৎস্য করিল তলিত।/রিঠাপুঠা ভাজিলেক তৈলের সহিত ॥ এ ছাড়াও ইলিশ পাওয়া যাবে পদ্মপুরাণ, চণ্ডীমঙ্গল ও ভারতচন্দ্রের রচনায়। আধুনিক যুগের সাহিত্যেও ইলিশ-বন্দনার কমতি নেই। সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের ইলশে গুড়ি ইলশে গুড়ি ছড়া থেকে শুরু করে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কুবের মাঝির ইলিশ কাহিনী কালজয়ী হয়ে আছে পদ্মা নদীর মাঝি উপন্যাসে।

ইলিশের উৎপাদন ও অর্থনীতি

ইলিশের বিস্তার বিপুল অঞ্চলজুড়ে হলেও সবচেয়ে বেশি ইলিশ ধরা পড়ে বঙ্গোপসাগরের উপকূল এলাকা বাংলাদেশ, মিয়ানমার ও ভারতে। মৎস্য অধিদপ্তরের হিসাব মতে, সারা বিশ্বে ইলিশ ধরা পড়ে অর্থাৎ এর উৎপাদন চার থেকে পাঁচ লাখ মেট্রিক টন। এর মধ্যে মিয়ানমারে এক থেকে সোয়া লাখ মেট্রিক টন। ভারতে ৫০ থেকে ৬০ হাজার মেট্রিক টন এবং আমাদের দেশে আড়াই লাখ মেট্রিক টন। শতকরা হিসেবে আমাদের দেশেই ধরা পড়ে মোট ইলিশের ৫০-৬০ শতাংশ। এ কারণে অনিকেত হলেও ইলিশে আমাদের অধিকার একচেটিয়া এবং তা আমাদের জাতীয় মাছ।

ইলিশ একক প্রজাতি হিসেবে সবচেয়ে বেশি উৎপাদিত। মৎস্য অধিদপ্তর সূত্রে জানা গেছে, দেশের বার্ষিক মৎস্য উৎপাদনের ১৩ শতাংশই ইলিশ। টাকার অঙ্কে মূল্য পাঁচ হাজার কোটি। জিডিপিতে

www.nagorikpathagar.org

ইলিশের অবদান শতকরা ১ ভাগ। প্রতি বছর ইলিশ রপ্তানি করে আয় হয় ১০০ কোটি টাকার বেশি। গত ২০০৭-০৮ অর্থ বছরে ইলিশের উৎপাদন ছিল দুই লাখ ৯০ হাজার মেট্রিক টন। দেশের ৪০টি জেলার ১৪৫টি উপজেলায় প্রায় সাড়ে চার লাখ জেলের জীবিকা ইলিশনির্ভর। এদের শতকরা ৩২ ভাগ সার্বক্ষণিক এবং ৬৮ ভাগ মৌসুমি ইলিশ ধরে থাকে। এ ছাড়া জাল, নৌকা তৈরি, পরিবহন, বিপণন, সংরক্ষণসহ ইলিশ নিয়ে নানা কাজে কর্মসংস্থান হয়েছে দেশের ২০ থেকে ২৫ লাখ মানুষের। ইলিশ শিকারি জেলের সংখ্যায় এগিয়ে আছে বরিশাল বিভাগ।

ইলিশের কত কাঁটা

ফুলের রানী গোলাপেও কাঁটা আছে। কাঁটা আছে মাছের রাজা ইলিশেও। এ নিয়ে আক্ষেপও আছে অনেকের। তা থাক। কিন্তু কত কাঁটা আছে ইলিশে? সে হিসাবও বের করেছেন ইলিশপ্রেমী বাঙালি। এক কেজি ওজনের একটি ইলিশে কাঁটার সংখ্যা অন্তত নয় হাজার। আকার-প্রকারভেদে ইলিশের কাঁটা ১০ হাজার পর্যন্ত হয়ে থাকে। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন শেফ কলকাতার মার্কোপোলো রেস্তোরাঁর অমিতাভ চক্রবর্তীর কাছ থেকে পাওয়া কাঁটার হিসাব দিয়েছেন খ্যাতিমান সাহিত্যিক শংকর তাঁর বাঙালির খাওয়া দাওয়া গ্রন্থে। এই ১০ হাজার কাঁটা নিয়ে যারা বিরক্ত, সেই বাঙালিদের স্মরণ করিয়ে দেওয়া যেতে পারে, কাঁটা ছিল বলেই বাঙালির পাতে এখনো ইলিশের দেখা মিলছে। নয়তো ডলার-পাউন্ড-ইউরোর দাপটে বাগদা-গলদা চিংড়ির মতো সব ইলিশ চলে যেত জাপান, আমেরিকা, ইউরোপের সাহেবদের কিচেনে। ইলিশের কাঁটাকে কায়দায় আনতে না পেরে কাঁটার আঘাতে অপঘাতে মৃত্যুর ভয়ে ইলিশ থেকে তাঁরা সরিয়ে রেখেছেন তাঁদের কাঁটা চামচ। কাঁটার যে কল্যাণকর দিকও আছে, ইলিশের কাঁটা তার প্রমাণ হয়ে আছে বাঙালির জন্য।

বিলুপ্তির পথে ইলিশ

যে ইলিশ নিয়ে আমাদের এত গর্ব, এত আত্মতৃপ্তির সেই ইলিশ কি আজ নিঃশেষিত হয়ে যাচ্ছে? এমন এক আশঙ্কা কিছুটা হলেও দেখা দিয়েছে সত্যি সত্যি। মৎস্য অধিদপ্তর ১৯৮৩ সাল থেকে ইলিশের ওপর যে নিবিড় পর্যবেক্ষণ চালিয়ে আসছে তাতেই এই আশঙ্কার বিষয়টি ধরা পড়েছে। এতে দেখা গেছে, বর্তমানে সমুদ্র থেকে ইলিশ আহরণের পরিমাণ ১৯৮৩ -৮৪ সালের তুলনায় চারগুণ বেড়েছে। অথচ হ্রাস পেয়েছে নদ-নদী থেকে অভ্যন্তরীণ ইলিশ আহরণের পরিমাণ। অভ্যন্তরীণ নদ-নদীতে পরিবেশ দূষণ, সাঁকো, সড়ক ও বাঁধ নির্মাণের ফলে পলি জমে নদীর নাব্যতা কমেছে এবং ইলিশের প্রজনন ক্ষেত্র, বিচরণ ক্ষেত্র ও আবাস ধ্বংস হয়েছে। পদ্মায় এখন ইলিশ পাওয়াই যায় না। অভ্যন্তরীণ ইলিশের যোগান কমে যাওয়া ও সমুদ্রে ইলিশের আহরণ বাড়ার ফলে ইলিশের আরও গভীর সমুদ্রের দিকে সরে যাওয়ার ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে। ইলিশ যদি আরও গভীর সমুদ্রসীমার বাইরে চলে যায়, তবে অন্য দেশ ইলিশ আহরণের সুবিধা পাবে। আর আমরা হারিয়ে ফেলব আমাদের স্বাদের ইলিশ। কাজেই এখনই প্রয়োজন দূরদর্শী উদ্যোগ নেওয়ার। (উৎস : আশীষ উর রহমান, প্রথম আলো, ২৫ জুলাই, ২০০৯)

ইলিশ অত্যন্ত পুষ্টিসমৃদ্ধ মাছ, এতে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে প্রোটিন, ভিটামিন, খনিজ লবণ ও লিপিড। ইলিশ মাছে রয়েছে ভিটামিন এ ও ডি। ভিটামিন এ রাতকানা রোগ প্রতিরোধ করে, ভিটামিন ডি শিশুদের রিকেট রোগ হতে রক্ষা করে। খনিজ যেমন ফসফরাস দাঁতের জন্য এবং ক্যালসিয়াম হাড়ের পুষ্টির জন্য অত্যন্ত আবশ্যক। সোডিয়াম, পটাসিয়াম ও লৌহ শরীর বৃদ্ধি এবং মানসিক বিকাশের জন্য সহায়ক। ইলিশের মধ্যে এ পদার্থগুলি রয়েছে প্রচুর পরিমাণ। বাংলাদেশের মোট মৎস্য চাষ উৎপাদনে ইলিশের যোগান প্রায় ৩০ শতাংশ। কিন্তু ইলিশ আহরণের মাত্রার হার এমন দ্রুতগতিতে বাড়ছে যা ১৯৯১ সালে ছিল ০.৫২, ১৯৯৫

www.nagorikpathagar.org

সালে ০.৫৫, ১৯৯৬ সালে ০.৫৬ এবং ১৯৯৯ সালে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ০.৫৭। বিগত বছরগুলোর প্রতি বছর আহরণের গড় ছিল ১ লাখ ৮ হাজার থেকে ১ লাখ ৯০ হাজার টন। বর্তমানে তা দাঁড়িয়েছে প্রায় ৩ লাখ মেট্রিক টনে। বিজ্ঞানীরা আশংকা করছেন, জাটকা আহরণের ফলে বর্তমানে উৎপাদন বাড়ছে, ভবিষ্যত বংশবিস্তার সংকুচিত হয়ে আসছে। তাই আমাদের শুধু আজ খেলেই হবে না, কাল কি খাবো সে বিষয় চিন্তায় রাখতে হবে। তা না হলে অদূর ভবিষ্যতে আমাদের সমুদ্র ও নদীগুলি ইলিশশূন্য হয়ে যাবে। জাটকা ধরা নিষিদ্ধ করা হলেও তা বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা এখনো সম্ভব হয়নি। এজন্য নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয় এবং দারিদ্র্য উভয়ই দায়ী। তাই সকল দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি, গণশিক্ষা ও গণপ্রচারের মাধ্যমে মূল্যবোধের বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে। সে সাথে প্রচলিত নীতি ও আইন কানুনের যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করা অত্যন্ত প্রয়োজন।

পশুসম্পদ

প্রাণী সম্পদের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ হল পশুসম্পদ, যা সরাসরি কৃষি উপকরণ ও উপার্জনের সাথে সম্পৃক্ত। আমাদের দেশের জাতীয় আয়ের শতকরা ৫ ভাগ আসে পশুপালন খাত থেকে। গরু, মহিষ, ছাগল, হাঁস-মুরগির ভূমিকা এ ক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তবে আমাদের দেশে পশু পালন করে আয়ের সুযোগ ক্রমান্বয়ে সংকুচিত হয়ে যাচ্ছে। কারণ ক্রমশঃই চারণভূমি সীমিত হয়ে আসছে, স্থানীয় এবং আন্তর্জাতিক বাজারে পশু খাদ্যও দিন দিন ব্যয়বহুল হয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশের অর্থনীতিতে গৃহপালিত পশুসম্পদের গুরুত্ব অত্যন্ত ব্যাপক। আমাদের মতো কৃষিপ্রধান দেশে আধুনিক চাষাবাদ চালু হলেও গ্রামবাংলার গরিব কৃষকরা এখনো লাঙ্গল দিয়েই চাষাবাদ করে। সার হিসেবে তারা গরু, মহিষের গোবর এবং হাঁস, মুরগির বিষ্ঠা প্রয়োগ করে থাকে। আবার ধান মাড়ানোর জন্য গরু, মহিষ ব্যবহার করে থাকে। প্রাচীনকাল থেকে গরুর গাড়ি, মহিষের গাড়ি, ঘোড়া যানবাহন হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। পশুসম্পদের বিরাট অংশ ব্যবহৃত হয় মাংস ও দুধ সরবরাহের কাজে। তাই পশু পালনে মাংস সরবরাহ, দুধ সরবরাহের কাজে বহু সংখ্যক লোকের কর্মসংস্থানও হয়েছে। গরু, মহিষের গোবর দিয়ে এ দেশের জ্বালানি সংকট নিরসনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এমতাবস্থায় পশুসম্পদের গুরুত্বকে এদেশে খাটো করে দেখার সুযোগ নেই। কৃষি উৎপাদনের জাতীয় আয়ে (Gross value added in agriculture) পশুসম্পদের অবদান ১৯৮৭-৮৮ সালের ৭.৭ শতাংশ থেকে বেড়ে ১৯৯৭-৯৮ সালে ১৩ শতাংশ হয়েছে (বিবিএস ১৯৯৮)। আমাদের দেশের চাহিদার তুলনায় পশুসম্পদের বৃদ্ধির হার যথেষ্ট নয়। সাম্প্রতিক পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায় যে, বড় কৃষকরাই গড়ে দেশের বেশির ভাগ পশুসম্পদের মালিক।

www.nagorikpathagar.org

সারণী ৩.১ ঃ খামার সাইজ অনুসারে পরিবার প্রতি পশুপাখির সংখ্যা

ক্রঃ নং	খামার সাইজ	গরু	মহিষ	ছাগল	ভেড়া	পোল্ট্রি
১	অকৃষি পরিবার (.৫ একর এর নিচে)	১.৭০	২.২৮	২.৩৩	২.৪৭	৭.৬৮
২	ছোট খামার (.৫ - ২.৪৯ একর)	২.১৯	১.৮২	২.২৩	২.৭৫	৪.৫৮
৩	মধ্যম খামার (২.৫ - ৭.৪৯ একর)	৩.৫৬	২.২৯	২.২৮	২.২৩	১১.০৫
৪	বড় খামার (৭.৫ একর এর উপর)	৫.৭৭	৩.৩৪	৩.৫৮	৪.৬৪	১৭.৯০
	সবার গড়	২.৭৪	২.৪৯	২.৪৫	৩.৩৩	৯.৩৪

উৎস ঃ বিবিএস ১৯৯৮

বর্ণিত তথ্যানুসারে পশুসম্পদ ভিত্তিক উৎপাদনও বেড়েছে উল্লেখযোগ্য হারে। মাংস উৎপাদন ১৯৮৭-৮৮ সালে ০.৪১৪ মিলিয়ন মেট্রিক টন থেকে ১৯৯৪-৯৫ সালে ০.৫০৪ টনে দাঁড়িয়েছে।

পশুসম্পদের উৎপাদন

দেশের জনসংখ্যার চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে পশুসম্পদ বৃদ্ধি পেয়েছে, তার সাথে সঙ্গতি রেখে দেশে পশুসম্পদ এবং পশুসম্পদ ভিত্তিক বিভিন্ন উৎপাদন বাড়ানোর প্রচেষ্টা নেয়া হয়েছে। দেশের মোট মাংস, দুধ ও ডিম উৎপাদন বেড়েছে যথাক্রমে ১৯৮৭-৮৮ সালে ০.৪১৪, ১.৩০ মিলিয়ন মেট্রিক টন এবং ১২৯৩.৮৫ মিলিয়ন থেকে বেড়ে ১৯৯৪-৯৫ এ ০.৫০৪, ১.৪০০ মিলিয়ন মেট্রিক টন এবং ২৫৩৯.৬৯ মিলিয়ন মেট্রিক টনে দাঁড়িয়েছে। দেশের চাহিদার তুলনায় এ উৎপাদন খুবই অপ্রতুল বিশেষ করে মাথাপিছু ডিমের উৎপাদন দেশের চাহিদার তুলনায় ৫০% শতাংশেরও কম। পশুসম্পদ থেকে আমরা চামড়া পেয়ে থাকি। এর সরবরাহও বেড়েছে ১৯৯১-৯২ সালের ৬ শতাংশ থেকে ১৯৯৪-৯৫ সনে ১৮.৬১ শতাংশ (আহম্মদ ১৯৯৬)। বাংলাদেশের কৃষি উৎপাদনে গোবর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সার হিসেবে সর্বত্র ব্যবহৃত হচ্ছে। দেশের মোট গোবর উৎপাদনের পরিমাণ ১১.৬ মেঃ টন, এর প্রায় ৬৮ শতাংশ সার হিসেবে, ৩১ শতাংশ জ্বালানি, ১ শতাংশ অন্যান্য কাজে ব্যবহৃত হয়। পশুসম্পদ ভিত্তিক উৎপাদিত দ্রব্যের চাহিদা ও যোগানের চিত্র দেখলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, পশুসম্পদের গুরুত্ব আমাদের জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নে কত অপরিহার্য।

সারণী ৩.২ ঃ দুধ, মাংস ও ডিমের উৎপাদন ও চাহিদা

দ্রব্য	বাৎসরিক			প্রতিদিন মাংস মাছ	
	উৎপাদন	চাহিদা	ঘাটতি	চাহিদা	সরবরাহ
দুধ (মিঃ মেঃ টন)	১,৩৯২	১০.৮৫৯	৯.৪৬৭	২৫০ মিঃলিঃ	৩২.০৬ মিঃ লিঃ
মাংস (মিঃ মেঃ টন)	০.৪৮৯	৪.৬৯১	৪.২০২	১২০ মিঃ গ্রাম	১২.৫১ মিঃ গ্রাম
ডিম (মিঃ মেঃ টন)	১৪০৪.৪০	৯৯০০.৪০	৭৪৯৬	০.১৪৩	০.০৬৯

উৎস ঃ আলম, ১৯৯৬

www.nagorikpathagar.org

উপরোক্ত সারণী থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, বাংলাদেশের বর্তমান চাহিদা পূরণের জন্য পশুসম্পদ আরো বৃদ্ধি করতে হবে। কেননা মাথাপিছু দুধ ও মাংস এবং ডিম খাদ্য কমার ফলে দেশের জনগোষ্ঠী প্রয়োজনীয় খাদ্যোৎপাদন থেকে বঞ্চিত হবে, যার ফলে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে দেশের জনস্বাস্থ্য সর্বোপরি দারিদ্র্য বিমোচন চিত্র। তাই প্রতিটি সচেতন নাগরিককে পশুসম্পদ উৎপাদন বৃদ্ধিতে উদ্যোগী হতে হবে।

বিপন্ন রয়েল বেঙ্গল টাইগার

পাখির মতো পশুর গুরুত্বও কম নয়। রয়েল বেঙ্গল টাইগার আমাদের জাতীয় পশু। পৃথিবীর অনেক প্রান্তের লোকজনকে আমাদের দেশের পরিচিতি দিতে গিয়ে আমরা বলে থাকি আমরা "রয়েল বেঙ্গল টাইগারের" দেশের লোক। তাতে তারা অতিসহজেই আমাদের ভৌগোলিক অবস্থান, জাতীয় বৈশিষ্ট্যের কথা বুঝতে পারেন। কিন্তু আশংকা করা হচ্ছে, ডায়নোসরের মতো বাঘ একটি বিলুপ্ত প্রজাতি হয়ে যেতে পারে। ইতিমধ্যে IUCN-এর রেড বুকে এর নাম উঠেছে extinct (বিপন্ন) প্রজাতি হিসেবে। নব্বই দশকেও বিশ্বে প্রায় সাড়ে আট হাজার বাঘ ছিল। বর্তমানে এ সংখ্যা কমে সাত হাজারে দাঁড়িয়েছে। অথচ একশত বৎসর পূর্বে এর সংখ্যা ছিল এক লাখের মতো। বাংলাদেশে সুন্দরবনের রয়েল বেঙ্গল টাইগারের সংখ্যা ৩০০ থেকে ৪০০ এর মতো। পত্রিকায় প্রকাশ, সম্প্রতি এক সমীক্ষা চলাকালে দেখা গেছে যে, সুন্দরবনের বাঘের সংখ্যা বেড়েছে।

পৃথিবীতে এত শক্তিশালী ও প্রতাপশালী প্রাণীটির অস্তিত্ব বিপন্ন হবার পিছে কারণ মনুষ্য জাতির ধনলিপ্সা ও বিলাসিতা। প্রতি বৎসর পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে শত শত বাঘ শিকার হচ্ছে অবৈধভাবে। উদ্দেশ্য একটিই, বাঘের চামড়া ও হাড়। মাদক ও হেরোইনের ব্যবসার মতোই বন্যপ্রাণীর চামড়া ও হাড় ব্যবসার শক্তিশালী আন্তর্জাতিক চক্র রয়েছে।

পৃথিবীর অনেক দেশে বিভিন্ন সময়ে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা হানা দিয়ে এসব উদ্ধার করার চেষ্টা করলেও আশানুরূপ নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হচ্ছে না। ভারতীয় শীর্ষস্থানীয় প্রাণী সংরক্ষণবিদগণ আশংকা করছেন, এ অঞ্চলের বাঘ বিলুপ্ত হচ্ছে অত্যন্ত দ্রুত। এর উল্লেখযোগ্য একটি কারণ হচ্ছে বন্যপ্রাণীর চামড়া ও হাড়ের আকাশছোঁয়া মূল্য। চীন, জাপান, সিঙ্গাপুর, ভুটান, কোরিয়া এসব এলাকায় এসব সামগ্রীর ভীষণ চাহিদা রয়েছে। শুধু হাড়গোড় ও চামড়াই নয়, ভাল্লুকের গলব্লাডার ও বাঘের অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ চিকিৎসা ক্ষেত্রে ও অন্যান্য কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে।

বাংলাদেশের সুন্দরবনের বাঘের মৃত্যুর জন্য মাফিয়া চক্র ছাড়াও পরিবেশগত বিপর্যয় অনেকাংশে দায়ী। গঙ্গার পানির চাপ কমে যাওয়ার ফলে সুন্দরবনের লবণাক্ততা বৃদ্ধি পেয়েছে। অধিক লবণাক্ত পানি সেবনের ফলে অন্যান্য অনেক প্রাণীর মতো বাঘও মারা যাচ্ছে। প্রাকৃতিক ও পরিবেশগত বিপর্যের ফলে হরিণসহ অন্যান্য প্রাণীর সংখ্যা কমে যাওয়াতে বাঘের পর্যাপ্ত খাবারের অভাবে তাদের প্রজনন ক্ষমতা ও বংশ বিস্তার সীমিত হয়ে

www.nagorikpathagar.org

আসছে। এভাবেই বন্যপ্রাণীর সংখ্যা কমে আসছে, যার প্রভাব ধীরে ধীরে কর্মসংস্থান ও প্রাকৃতিক সম্পদের সীমাবদ্ধতার মাধ্যমে জাতীয় অর্থনীতিতে প্রতিফলিত হবে। তাই মানব কল্যাণের জন্য বন্য প্রাণীর (আল্লাহর সৃষ্টি) প্রতি মানব জাতিকে আরো সংবেদনশীল হতে হবে।

ভারতের রানথামপুর ন্যাশনাল পার্কে রয়েল বেঙ্গল টাইগার দেখতে গিয়ে প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন বলেছিলেন, ভারতে আমার দুটো জিনিস দেখার প্রচণ্ড ইচ্ছা ছিল। এক রয়েল বেঙ্গল টাইগার, দুই আগ্রার তাজমহল। প্রেমের অপূর্ব নিদর্শন নয়নাভিরাম তাজমহল দেখে অভিভূত হলেও ব্যথিত হয়েছিলেন রয়েল বেঙ্গল টাইগার দেখে। সারা বিশ্বই এ নিয়ে ভীষণ উদ্বিগ্ন। শুধু ভারতেই গত দশকে প্রতি বছরে ২/৩ টি বাঘ অবৈধভাবে নিধন করা হয়। চোরাচালানিদের নির্মম ব্যবসার ফলে অঞ্চলটিতে মাত্র সাড়ে তিন হাজার বাঘ রয়েছে। আজ এ প্রাণীটি বিপন্ন প্রজাতির তালিকাভুক্ত। পশ্চিমবঙ্গ, মহারাষ্ট্র, উত্তর প্রদেশ, মধ্য প্রদেশ থেকে পুলিশ গত তিন মাসে ২৫টি বাঘের চামড়া, ৩২০টি চিতাবাঘের চামড়া, ১০ টন হরিণের শিং, বাঘ ও চিতার হাড়-গোড়, নখ, দাঁত ১৮০ কেজি উদ্ধার করে। বন্যপ্রাণী আইনের ব্যবহার থাকা সত্ত্বেও অসাধু ও অনৈতিক ব্যবসায়ী ও চোরাচালানিরা মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। সৃষ্টির কোন সদস্য বিলুপ্ত হলে মানবজাতির কল্যাণ ব্যাহত হতে পারে- এ নিয়ে তাদের কারো কাছে কোন দায়বদ্ধতা নেই, মাথাব্যথাও নেই। বিপন্ন প্রজাতির প্রাণীর ব্যবসা-বাণিজ্য সংক্রান্ত জাতিসংঘ সংস্থাও এ আশংকা ব্যক্ত করেছে। বাঘ শিকারের চক্রটি মারাত্মক শক্তিশালী হলেও অজেয় নয়। আইন প্রয়োগকারীরা শুধু ছিঁচকে শিকারী ও পাচারকারীদের ধরতে পারে। চক্রের মূল শক্তিশালী খেলোয়াড়গণ পর্দার অন্তরালেই থেকে যায়। এদের রয়েছে বিস্তৃত নেটওয়ার্ক। যেমন ভারতে বাঘ হত্যার দায়ে ৭ ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হলেও শীর্ষস্থানীয় এগারজন আইনজীবী তাদের পক্ষে দাঁড়িয়ে যান। এক্ষেত্রে অনৈতিক মুনাফার মনোভাব ও অস্পষ্টতাই বেশি কাজ করে (উৎস : যুগান্তর ১৬ মে, ২০০০)। এ জন্যেই সর্বস্তরের জনগণের মধ্যে মূল্যবোধ, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় চেতনা ও অনুভূতিকে জাগিয়ে তোলার জন্য সবাইকে আত্মসংযমী করে তুলতে হবে।

বাংলাদেশের বিলুপ্ত বন্য প্রাণীর বিবরণ

আইইউসিএন এর ১৯৯১ সালের এক প্রতিবেদনে উল্লেখ রয়েছে, বাংলাদেশে ৮৫০-৯০০ প্রজাতির বন্য প্রাণী রয়েছে। এদের মধ্যে ১২০ প্রজাতির স্তন্যপায়ী, ৫৮০ প্রজাতির পাখি, ১৩০ প্রজাতির সরীসৃপ এবং ২০ প্রজাতির উভচর প্রাণী। ৫৮০ প্রজাতির পাখির মধ্যে আবার প্রায় ২০০ প্রজাতির পাখি শীতকালে পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গা থেকে শীতের প্রকোপ থেকে বাঁচার জন্য এবং খাদ্যের সন্ধানে এ দেশে আসে।

বাংলাদেশের অনুকূল আবহাওয়া ও উর্বর ভূমিতে সর্বত্রই প্রাণীকুলের বাসোপযোগী। উপ-মহাদেশের পুরানো তথ্য পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, গত শতাব্দীতে এ দেশে প্রায় ১৮টি প্রজাতির বন্য প্রাণী বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে। অনেক প্রজাতির অবস্থা উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ

www.nagorikpathagar.org

থেকে সংকীর্ণ ছিল। পরবর্তীতে বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে এরা বিলীন হয়ে যায়। এদের মধ্যে রয়েছে মিঠা পানির কুমির, গোলাপি হাঁস, বর্মী ময়ূর, বৃহৎ হাড়গিলা, রাজশকুন ও বেঙ্গল করিকেনসহ পাঁচটি পাখি, ৩টি গণ্ডার, নীলগাই, বুনো মহিষ, বনগাই, ব্যান্টিং ২টি হরিণ প্রজাতি, নেকড়ে বাঘ ও দুই প্রজাতির বন বিড়ালসহ ১২টি স্তন্যপায়ী প্রাণী, সুন্দর আবাসিক গোলাপি হাঁসটি আসাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে বাস করতো। প্রফেসর জাকের হোসেনের মতানুসারে বাংলাদেশ থেকে গত শতাব্দীতে দু'শতাংশ বন্যপ্রাণী বিলুপ্ত হয়েছে। এদের মধ্যে কমপক্ষে ৭০ প্রজাতির বন্যপ্রাণী বিংশ শতাব্দীর শেষ প্রান্তে বিপদসংকুল অবস্থায় আছে। এদের ৪০টি (৫%) লুপ্তপ্রায় অবস্থায় বিরাজ করছে। এ বিলুপ্তির বর্তমান ধারা অব্যাহত থাকলে মোট ১১টি স্তন্যপায়ী প্রজাতি, ১৬ প্রজাতির পাখি, ৬/৭ প্রজাতির কচ্ছপ এবং অজগরসহ ১২ প্রজাতির সরীসৃপ মোট প্রায় ৪০ প্রজাতির প্রাণী একবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে লুপ্ত অথবা প্রায় লুপ্ত হয়ে যাবে। এছাড়াও আরো ৩০টি প্রজাতি মারাত্মক সংকটে পড়বে। এসব বিলুপ্তির কারণগুলো অতি সহজেই অনুমেয়। প্রথমতঃ আমাদের দেশের প্রচলিত আইনের প্রয়োগে দুর্বলতা। দ্বিতীয়ত ঃ অভয়ারণ্যগুলোর যথাযথ সংরক্ষণের অভাব। অভয়ারণ্য সাধারণত মানব বসতিশূন্য এলাকা হতে হয়, যেখানে গবেষণা কর্ম ছাড়া মানুষের যাতায়াত সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। সে এলাকার উদ্ভিদ, প্রাণী ও অজৈব পরিবেশ সম্পূর্ণভাবে ধরা ছোঁয়ার বাইরে থাকবে। কিন্তু আমাদের অভয়ারণ্য ও জাতীয় পার্কগুলোতে লোক-বসতি এবং লোকজনের যাতায়াতে তেমন কোন বাধা নেই। রমনা পার্ক ও সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে এক সময় বিভিন্ন প্রজাতির পাখি দেখা যেতো। পাখির কলরব ছিল মনোমুগ্ধকর। দুর্ভাগ্য হলেও সত্য, পহেলা বৈশাখের অনুষ্ঠানে বিরাট জনস্রোত ছাড়াও যেভাবে দোকান ও যানবাহনের অবাধ প্রবেশ এবং আবর্জনা নিক্ষেপ করতে দেখা গেছে, তাতে কোন প্রাণীই নিরাপদ বোধ করার কথা নয়। এভাবে ধোঁয়া, আবর্জনা এবং মানুষের ভিড়ের চাপ অব্যাহত থাকলে উদ্ভিদকুলের অস্তিত্বও বিপন্ন হয়ে যাবে। এজন্য প্রয়োজন প্রাণী সম্পদের টেকসই (Sustainable) ব্যবস্থাপনা।

প্রফেসর জাকের হোসেনের মতে, দেশী প্রজাতির উদ্ভিদ যেভাবে বিপন্ন হয়ে যাচ্ছে, বিদেশী প্রজাতির মনোকালচার বন সৃষ্টি হলে, এ দেশের প্রাণীদের খাদ্য চেইনে মারাত্মক ব্যাঘাত ঘটতে পারে। সুন্দরবন এলাকাসহ বিভিন্ন গভীর বনাঞ্চল এলাকায় তেল গ্যাস আহরণের উদ্যোগ নেয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এসব বিষয়ে বনাঞ্চল, প্রাণী, ফল ও পরিবেশ ধ্বংস ভারসাম্যের বিষয়ে লক্ষ্য না রাখলে, প্রকৃতি এ দেশের জন-জীবন ও অর্থনীতিতে মারাত্মক ধস নেমে আসবে। সিলেটের মাগুরছড়া ও হরিপুরের গ্যাস খননকূপ যে তিনটি নিদারুণ অগ্নিকাণ্ডের দুর্ঘটনা ঘটেছে, তা থেকে শিক্ষা নেবার এখনই উপযুক্ত সময়।

প্রাণী সম্পদ সংরক্ষণে সামাজিক তাৎপর্য

আমাদের সমাজে বাঘ, হরিণ ও বিভিন্ন প্রকার ময়না পাখি পোষা বিরাট সামাজিক পর্যায়ের বিষয় বলে বিবেচিত হয়। উচ্চবিত্ত পরিবারের মানুষ উন্নত জাতের গো মহিষ পুষে থাকে।

www.nagorikpathagar.org

এদের সংখ্যাধিক্য তাদের সামাজিক মর্যাদা ও আত্মসম্মান বৃদ্ধি করে থাকে। বৃহত্তর ময়মনসিংহ ও সিলেট এলাকায়, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার ও নোয়াখালী এলাকায় উচ্চবিত্ত কৃষকদের ৫০/৬০ ও শতাধিক গরু/মহিষের পাল থাকে। দক্ষিণাঞ্চলের ম্যানগ্রোভ এলাকায়, সিলেটের চা বাগান এলাকায় এসব গোসম্পদ সরকারি বাগানের জন্য বিরাট আপদ বলে বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় প্রতিবেদন প্রকাশ হয়ে থাকে। এসব অভিযোগ মন্ত্রণালয় পর্যায়েও হয়ে থাকে। প্রতিকার হয়ে থাকে খুবই কম। কারণ কোন কোন ক্ষেত্রে তারা রাজনৈতিক দলের বড় নেতা অথবা সরকারি দায়িত্বে বড় পদমর্যাদার গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব।

হাঁস-মুরগির খামার ঃ হালে পোল্ট্রি ইন্ডাস্ট্রি বাংলাদেশে ব্যাপকভাবে সম্প্রসারিত হচ্ছে। বাণিজ্যিকভাবে এ শিল্প দ্রুত সম্প্রসারিত হচ্ছে, যা অত্যন্ত লাভজনকও বটে। শুধু স্থানীয় চাহিদা নয়, আন্তর্জাতিক বাজারে রফতানি করে বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করছে সমাজের বিত্তবান ব্যবসায়ীগণ। দেশের প্রায় ১০ লাখ লোক বিভিন্নভাবে পোল্ট্রি ইন্ডাস্ট্রিতে বিভিন্নভাবে নিয়োজিত। গ্রামীণ পরিবারে মেহমান এলে মোরগ জবাই করে না খাওয়ালে এ মেহমানদারির গুরুত্বই থাকে না। তাছাড়া একেবারে গ্রামীণ পরিবারে আর কিছু না থাকলে একটি ডিম ভাজি করেও মেহমান বিদায় করা হয়ে থাকে।

বন্য প্রাণীর উপকারিতা

১৯৭৪ সনে বাংলাদেশে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইন জারি করা হয়েছে। এতে বন্য পশুপাখি ধরা, মারা ও বিক্রি করার ব্যাপারে বিধি নিষেধ রয়েছে। কিন্তু দীর্ঘ ত্রিশ বছরেও এ আইনের পুরোপুরি প্রয়োগ পরিলক্ষিত হচ্ছে না, তাছাড়া সময়োপযোগী সংশোধনীও আনা হচ্ছে না। এ জন্য দরকার দেশের আপামর জনসাধারণ এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সক্রিয় সহযোগিতা। তাই দেশের আপামর জনসাধারণ এবং সব আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যরা অবাধে বন্য পশুপাখি শিকারে নিজেরা বিরত থেকে এবং অন্যকে বিরত রেখে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইন প্রয়োগে সহায়তা করতে পারে।

মানব কল্যাণে প্রাণী সম্পদ সৃষ্টির রহস্য

সূরা হুদ-এর ৬৪-৬৫নং আয়াতে বলা হয়েছে, "আর হে আমার জাতি! আল্লাহর এ উষ্ট্রীটি তোমাদের জন্যে নিদর্শন, অতএব তাকে আল্লাহর জমিনে বিচরণ করতে দাও এবং তাকে মন্দভাবে স্পর্শ করবে না। নতুবা অতিসত্বর তোমাদেরকে আযাব পাকড়াও করবে। তবু তারা উষ্ট্রীকে হত্যা করিল আর ভয়ংকর গর্জন পাপিষ্ঠদের পাকড়াও করল। ফলে ভোর হতে না হতেই তারা নিজ নিজ গৃহসমূহে নিস্পন্দ ও নির্জীব পড়ে রইল।" আল কোরআন -সূরা হুদ ১১:৬৪-৬৭।

অশ্ব বা উষ্ট্রে আরোহণ করে যুদ্ধ করা প্রসঙ্গে বর্ণিত হয়েছে, "আল্লাহ বনি নবীর গোত্রের কাছ থেকে তার রাসূল যে ধন-সম্পদ "ফা'ই" (প্রত্যাবৃত্ত ধন) যে সম্পদ যুদ্ধ ব্যতীত হস্তগত করে দিয়েছেন, তজ্জন্যে তোমরা ঘোড়ায় কিংবা উটে চড়ে যুদ্ধ করনি।" আল কোরআন- সূরা

www.nagorikpathagar.org

হাশর ৫৯:০৬।

উপমা বা দৃষ্টান্ত হিসাবে 'উট' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে সূরা ৭৭:৩৩ আয়াতে। "জাহান্নামের অগ্নি বিশালাকায় স্ফুলিঙ্গ নিক্ষেপ করবে যা বিরাট অট্টালিকার ন্যায় মনে হবে। অতঃপর তা বিচ্ছিন্ন হয়ে ছোট ছোট খণ্ডে বিভক্ত হবে এবং খণ্ডগুলো পীত বর্ণ উষ্ট্র শ্রেণীর সমান হবে। ... যেন সে পীতবর্ণ উষ্ট্র শ্রেণী" ৭৭:৩৩। অনুরূপভাবে পরিব্যক্ত হয়েছে ... যখন পূর্ণ-গর্ভা উষ্ট্রী উপেক্ষিত হবে। ৮১:৪। অর্থাৎ কিয়ামতে দৃশ্য তাদেরকে উদাসীন করে দিবে।

এসব বিষয়ে সতর্ক থাক। অতঃপর ওরা তাঁর প্রতি মিথ্যারোপ করেছিল এবং উষ্ট্রীয় পা কর্তন (হত্যা) করেছিল ... ৯১:১৩-১৪।

উকুন ও ব্যাঙ এর উল্লেখ (সূরা আ'রাফে) দেখা যায় যে, হযরত মূসা (আঃ) এর সময় অভিশপ্ত ফেরাউন-এর উপর নিপতিত দুর্ভিক্ষ ও ফল ফসলের ক্ষতি প্রসঙ্গে বিশিষ্ট কয়েকটি জীবজন্তুর নাম উল্লেখ হয়েছে। এ জীবজন্তুগুলো বিভিন্নভাবে ফেরাউন সম্প্রদায়ের লোকদের জীবন অতিষ্ঠ করে তুলেছিল। সুতরাং আমি তাদের উপর পাঠিয়ে দিলাম, তুফান, পঙ্গপাল, উকুন, ব্যাঙ, রক্ত প্রভৃতি বহুবিধ নিদর্শন একের পর এক। তারপরও তারা গর্ব করতে থাকল। বস্তুতঃ তারা ছিল অপরাধপ্রবণ। আল কোরআন -৭:১৩৩।

পবিত্র কোরআনে অশ্বের বিষয় উল্লেখ রয়েছে। সূরা আনফাল, সূরা নাহল, সূরা বনি ইসরাঈল, সূরা সাদ ও সূরা জাফরে পবিত্র কোরআন-এ জেহাদে যুদ্ধোপকরণ হিসেবে অশ্ব বা ঘোড়ার প্রসঙ্গ বর্ণিত হয়েছে। ইসলামের শত্রু ও কাফেরদের মোকাবেলা করার জন্য অশ্ব প্রস্তুত করে রাখার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তৎকালীন সময়ে যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জাম হিসেবে অশ্ব এবং উষ্ট্র এক বিরাট ভূমিকা রাখে। আর প্রস্তুত কর তাদের সাথে যুদ্ধের জন্যে যা কিছু সংগ্রহ করতে পার নিজের শক্তি সামর্থ্যের মধ্য থেকে এবং পালিত ঘোড়া থেকে যেন প্রভাব পড়ে আল্লাহর শত্রুদের উপর এবং তোমাদের শত্রুদের উপর আর তাদের ছাড়া অন্যদের উপরও যাদেরকে তোমরা জান না, আল্লাহ তাদেরকে চেনেন। বস্তুতঃ তোমরা কিছু ব্যয় করবে আল্লাহর রাহে তা তোমরা পরিপূর্ণ ফিরে পাবে এবং তোমাদের কোন হক অপূর্ণ থাকবে না।" আল কোরআন-৮ঃ৬০।

অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ এবং শোভা সৌন্দর্য প্রসঙ্গে বর্ণিত হয়েছে "তোমাদের আরোহণের জন্যে এবং শোভার জন্যে তিনি ঘোড়া, খচ্চর ও গাধা সৃষ্টি করেছেন।" -আল কোরআন-১৬ঃ৮।

সূরা নাহলে ঃ মানুষের নিকট শিক্ষণীয় মৌমাছির গৃহ নির্মাণ পদ্ধতি এবং মানুষের নিকট উপকারী মৌমাছির উদরে নিঃসৃত রস (মধু) সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে বর্ণনা রয়েছে। -আল কোরআন-১৬ঃ৬৮-৬৯।

পাখি বিহঙ্গের উল্লেখ রয়েছে ঃ সূরা বাকারা, সূরা ইমরান, সূরা মায়েদা, সূরা আনআম, সূরা ইউসুফ, সূরা নাহল, সূরা নূর, সূরা নামল, সূরা সাবা, সূরা সাদ, সূরা মূলক ও সূরা ফীলে পবিত্র কোরআনের বহুস্থানে আল্লাহর নিদর্শন স্বরূপ পাখি বা বিহঙ্গকুলের কথা বর্ণনা করা হয়েছে। "তারা কি উড়ন্ত পাখিকে দেখে না? এগুলো আকাশের অন্তরীক্ষে আজ্ঞাধীন

www.nagorikpathagar.org

রয়েছে। আল্লাহ ছাড়া কেউ এদেরকে আগলে রাখে না। নিশ্চয়ই এতে বিশ্বাসীদের জন্যে নিদর্শন রয়েছে।" আল কোরআন-১৬ঃ৭৯।

হযরত সোলায়মান (আঃ) কে পাখির ভাষা শিক্ষা দেয়া প্রসঙ্গে উল্লেখিত হয়েছে, "সোলায়মান দাউদের উত্তরাধিকারী হয়েছিলেন। বলেছিলেন, হে লোকসকল আমাকে উড়ন্ত পাখিকুলের ভাষা শিক্ষা দেয়া হয়েছে। নিশ্চয় এটা সুস্পষ্ট শ্রেষ্ঠত্ব। সোলায়মানের সামনে তার সেনাবাহিনীকে সমবেত করা হল। জ্বীন, মানুষ ও পক্ষীকুলকে, অতঃপর তাদেরকে বিভিন্ন ব্যূহে বিভক্ত করা হল।"- আল কোরআন-২৭ঃ ১৬-১৭।

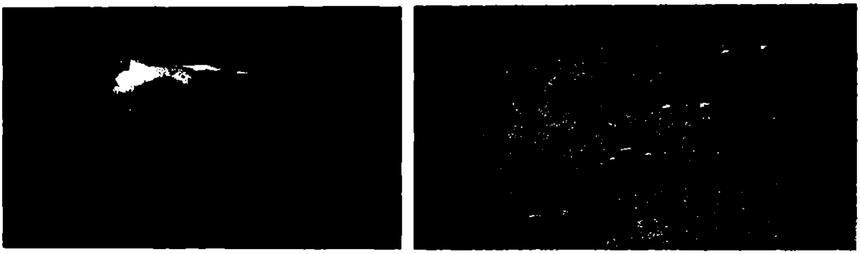

চিত্র ৩.১০ ঃ উড়ন্ত পাখিকুল পাখা বিস্তার করে আল্লার পবিত্রতা ঘোষণা করে

"তুমি দেখ না যে, নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যারা আছে তারা এবং উড়ন্ত পক্ষীকুল তাদের পাখা বিস্তার করতঃ আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে? (আল কোরআন-২৪ঃ৪১ ও সূরা মূলক ৬৭:৯১)।

পবিত্র কোরআনে সাপের বিষয়ও উল্লেখ রয়েছে, সূরা তা'হা ও সূরা নামলে ঃ হযরত মূসা (আঃ) এর মোজেজা হিসেবে সাপ। "হে মূসা, তোমার ডান হাতে ওটা কি? তিনি বললেন, এটা আমার লাঠি, আমি এর উপর ভর দেই এবং এর দ্বারা আমার ছাগপালের জন্যে বৃক্ষপত্র ঝেড়ে ফেলি এবং এতে আমার অন্যান্য কাজও চলে। আল্লাহ বললেন, হে মূসা তুমি ওটা নিক্ষেপ কর। অতঃপর তিনি তা নিক্ষেপ করলেন, অমনি তা সাপ হয়ে ছোটাছুটি করতে লাগল। আল্লাহ বললেন, তুমি তাকে ধর, ভয় করো না। আমি এখনই একে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে দিব।" আল কোরআন -সূরা ২০:২১।

"আপনি নিক্ষেপ করুন আপনার লাঠি। অতঃপর যখন তিনি তাকে সর্পের ন্যায় ছোটাছুটি করতে দেখলেন তখন তিনি বিপরীত দিকে ছুটতে লাগলেন এবং পেছনে ফিরেও দেখলেন না। হে মূসা, ভয় করবেন না। "আমি যে রয়েছি, আমার কাছে পয়গম্বরগণ ভয় করেন না।" আল কোরআন -সূরা ২৭:১০।

অজগরের কথা রয়েছে সূরা শু'আর ৩২ নম্বর আয়াতে। মোজেজা হিসেবে হযরত মূসা (আঃ) তাঁর লাঠি নিক্ষেপ করলে তৎক্ষণাৎ তা এক মারাত্মক অজগর হয়ে গেল। 'অতঃপর তিনি লাঠি নিক্ষেপ করলে মুহূর্তের মধ্যে তা সুস্পষ্ট অজগর হয়ে গেল।' আল কোরআন - সূরা ২৬:৩২।

www.nagorikpathagar.org

মাছির কথা পবিত্র কোরআনে আলোচিত হয়েছে। সূরা হাজ্বের ৭৩ নম্বর আয়াতে মূর্তি পূজার অসারতা প্রমাণ করার জন্য ক্ষুদ্রতর প্রাণী মাছিকে উপমা হিসেবে বর্ণিত হয়েছে। যেমন 'হে মানুষ একটি উপমা বর্ণনা করা হল অতএব, তোমরা তা মনোযোগ দিয়ে শোন, তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যাদের পূজা কর তারা কখনও একটি মাছি সৃষ্টি করতে পারবে না, যদিও তারা সকলে একত্রিত হয়। আর মাছি যদি তাদের কাছ থেকে কিছু ছিনিয়ে নেয় তবে তারা তার কাছ থেকে তা উদ্ধার করতে পারবে না। প্রার্থনাকারী ও যার কাছে প্রার্থনা করা হয় উভয়েই শক্তিহীন। আল কোরআন -সূরা ২২:৩।

এছাড়াও ছাগল-মেষের কথা রয়েছে সূরা আম্বিয়ায়। পিপীলিকার কথা রয়েছে সূরা নামল-এ। সূরা সাবা-র ১৪নং আয়াতে রয়েছে পোকার কথা। গাধার কথা উল্লেখ করা হয়েছে সূরা বাকারা, সূরা নাহল, সূরা জুমআ ও সূরা মুদাসসির'এ দুম্বার উল্লেখ রয়েছে সূরা সা'দ এর ২৩ নং আয়াতে। পতঙ্গের কথা রয়েছে সূরা কারীআ'র ৪নং আয়াতে। হস্তী শিরোনামে একটি সূরার নামকরণ করা হয়েছে সূরা ফীল-এ। কুকুরের কথা বলা হয়েছে সূরা আরাফ, সূরা কাহ্ফ-এ। মাকড়সার কথা রয়েছে সূরা আনকাবুত'এ ও মশার কথা রয়েছে সূরা বাকারায়। বাঘের কথা রয়েছে সূরা ইউসুফ-এর ১৩, ১৪, ১৭নং আয়াতে।

এছাড়াও সূরা আম্বিয়ায় উল্লেখ করা হয়েছে প্রাণবন্ত সবকিছু পানি থেকে সৃষ্ট, এর অর্থ আল্লাহ্ প্রত্যেক চলন্ত জীবকে পানির দ্বারা সৃষ্টি করেছেন। কাফেররা কি ভেবে দেখে না যে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর মুখ বন্ধ ছিল, অতঃপর আমি উভয়কে খুলে দিলাম এবং প্রাণবন্ত সবকিছু পানি থেকে সৃষ্টি করলাম। এরপরও কি তারা বিশ্বাস স্থাপন করবে না। আল কোরআন-২১:৩০।

আল্লাহ্ প্রত্যেক চলন্ত জীবকে পানি দ্বারা সৃষ্টি করেছেন। তাদের কতক বুকে ভর দিয়ে চলে, কতক দুই পায়ে ভর দিয়ে চলে এবং কতক চার পায়ে ভর দিয়ে চলে, আল্লাহ্ যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ সবকিছু করতে সক্ষম। আল কোরআন- ২৪:৪৫।

জীব ও প্রাণীকুলের প্রতি লক্ষ্য করলেই দেখা যায় যে, কিছু কিছু জীবজন্তু পেটের উপর ভর দিয়ে চলে যেমন - কেঁচো, সরীসৃপ, আবার অন্যান্য প্রাণী যেমন - মানুষ ও পাখি দুই পায়ের উপর ভর দিয়ে চলাফেরা করে। এসবই হচ্ছে আল্লাহর অপূর্ব সৃষ্টি-কৌশল। সমস্ত জীবকুলকে অন্তর্ভুক্ত করতে পবিত্র কোরআন-এ বহুস্থানে প্রায়শই শব্দ, দাউয়াব্বু বাহিমাতুন আনআম ব্যবহার ও প্রয়োগ করা হয়েছে। আল কোরআন-সূরা হাজ্ব ২২: ১৮, ২৮।

"তুমি কি দেখনি যে আল্লাহকে সেজদা করে যা কিছু আছে নভোমণ্ডলে, যা কিছু আছে ভূমণ্ডলে সূর্য, চন্দ্র, তারকারাজি, পর্বতরাজি, বৃক্ষলতা, জীবজন্তু ... এবং অনেক মানুষ' - আল কোরআন- ২২:১৮।

"যাতে তারা তাদের কল্যাণ স্থান পর্যন্ত পৌঁছে এবং নির্দিষ্ট দিনগুলোতে আল্লাহর নাম স্মরণ করে তার দেয়া চতুষ্পদ জন্তু জবেহ্ করার সময় এবং তোমাদের জন্য চতুষ্পদ জন্তুসমূহের মধ্যে চিন্তা করার বিষয় রয়েছে" -আল কোরআন-২৩:২১।

www.nagorikpathagar.org

"আল্লাহ তোমাদের জন্যে চতুষ্পদ জন্তু সৃষ্টি করেছেন; যাতে কোন কোনটিতে ভক্ষণ কর" আল কোরআন-৪০:৭৯। তিনি তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের জন্যে যুগল সৃষ্টি করেছেন এবং চতুষ্পদ জন্তুদের থেকে জোড়া সৃষ্টি করেছেন।" -আল কোরআন- ৪২:১১।

চতুষ্পদ জন্তুকে তোমাদের জন্য যানবাহনে পরিণত করেছেন। তোমাদের ও তোমাদের চতুষ্পদ জন্তুদের উপকারার্থে। -আল কোরআন-৭৯:৩৩।
উপরোক্ত আলোচনা থেকে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহর প্রাণী সৃষ্টির রহস্য ব্যাপক ও বিস্তৃত। তাই খলিফা হিসেবে মানুষেরই দায়িত্ব তাদের সংরক্ষণ ও যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করা।

প্রাণী সম্পদ সংরক্ষণে আইন ও নীতি

বাংলাদেশের আইন, নীতি ও প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনার সব বিষয়েই বৃটিশ Common Law থেকে উৎসারিত (Inheritance)। এ আইনে সরকার জনগণের পক্ষে সব প্রাকৃতিক সম্পদের সংরক্ষণের, ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করবে। এক্ষেত্রে প্রাকৃতিক সম্পদ বলতে বুঝায় seashore, coastal ecosystems, প্রবহমান পানিসম্পদ (flowing water), বনজ সম্পদ, বায়ু ও জীব-বৈচিত্র্য। আর এসব সম্পদের সুফলভোগী হবে দেশ ও সমাজের আপামর জনগোষ্ঠী। এ জন্যে সরকারের দায়িত্ব হচ্ছে এ বিষয়ে আইন, নীতি ও ব্যবস্থাপনা কৌশল প্রণয়ন। এ লক্ষ্যে সরকারের সুদূর প্রসারী লক্ষ্যে (vision) ও দেশে সাংস্কৃতিক ও আর্থ সামাজিক প্রেক্ষাপটগুলো বিবেচনায় রাখতে হবে। বিশ্বায়ন ও আন্তর্জাতিক জনগোষ্ঠীর সমঝোতার পরিপ্রেক্ষিতে টেক্সই উন্নয়ন, প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার ও ব্যবস্থাপনা পর্যালোচনার সুযোগ রয়েছে। স্বল্পমেয়াদি সুবিধা আহরণের পরিবর্তে দীর্ঘ মেয়াদি ও টেক্সই সম্পদ ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যেও (vision) কৌশল প্রণয়নের প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। তাই সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় মূল্যবোধ ও টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে এসব সংরক্ষণনীতি যথাযথ ব্যরহার কৌশল প্রণয়ন আবশ্যক হয়ে পড়েছে।

প্রাণী সম্পদ সংরক্ষণ

বাংলাদেশে বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ) আদেশ ১৯৭৩ Bangladesh Wildlife (Preservation) Order ১৯৭৩ বাংলাদেশের বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে ১৯৭৩ সালের ২৭ শে মার্চ রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ২৩ জারি করা হয়। এ আদেশ তাৎক্ষণিকভাবে সারা বাংলাদেশে কার্যকর করা হয়। ১৯৭৩ সালের জুলাই এ আদেশ The Bangladesh Wildlife (Preservation) (Amendment) Act, ১৯৭৩ (Act XVII of 1973) দ্বারা সংশোধন করতে বলা হয়। পরবর্তীতে আরো সংশোধনীসহ The Bangladesh Wildlife (Preservation) (Amendment) Act, ১৯৭৩ (Act XVII of 1974) প্রণয়ন করা হয়। এ আইনে ৪৮টি অনুচ্ছেদ, আইন রহিতকরণ সম্পর্কিত একটি সারণী এবং তিনটি তফসিল রয়েছে।

www.nagorikpathagar.org

প্রথম তফসিলের প্রথম অংশে সাধারণ পারমিটের মাধ্যমে যেসব বন্যপ্রাণী শিকার করা যায় তার তালিকা রয়েছে। দ্বিতীয় অংশে বিশেষ পারমিটের পরিপ্রেক্ষিতে যেসব বন্যপ্রাণী শিকার করা যায় তার তালিকা রয়েছে। এ অংশে আরো বলা হয়েছে যে, মানুষখেকো বাঘ (man eating tiger), পাগলা হাতি ইত্যাদির কারণে জনজীবন বিপন্ন হলে প্রধান বন্যপ্রাণী আদেশে (Chief Wildlife Order) তা শিকার করার ঘোষণা দিতে পারেন। দ্বিতীয় তফসিলে যেসব বন্যপ্রাণী বা ট্রফি আইনানুগ দখলে রাখার জন্য প্রত্যয়নপত্র প্রয়োজন তার তালিকা দেয়া হয়েছে। তৃতীয় তফসিলে সংরক্ষিত বন্যপ্রাণী (Protected animals) অর্থাৎ যা শিকার করা যায়, বধ করা যায় না, ধরা যাবে না তার পূর্ণাঙ্গ তালিকা দেয়া হয়েছে।

বন্যপ্রাণীর প্রতি আচরণের নিষিদ্ধ কার্যাবলী, এ আইনের আওতায় বন্যপ্রাণীদের প্রতি নিষিদ্ধ আচরণ সম্পর্কে অনুচ্ছেদ-৬ বর্ণনা দেয়া হয়েছে।

১ (ক) ১ ঃ বলা হয়েছে বন্দুক, বর্শা, বিস্ফোরক, মারণাস্ত্র বা অন্যান্য কিছু দ্বারা বন্যপ্রাণী শিকার করতে পারবে না;

১(ক)২ ঃ সেনাবাহিনী বা পুলিশ কর্তৃক স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র দিয়ে, আংশিক বা সম্পূর্ণ পঙ্গু করে বা রাসায়নিক পদার্থযুক্ত কোন মারণাস্ত্র দ্বারা কোন শিকারের প্রাণী শিকার করতে পারবে না;

১(খ)১ ঃ কোন ব্যক্তি যান্ত্রিক উপায়ে চালিত কোন শিকারের অনুসরণ করতে পারবে না বা যে কোন উদ্দেশ্যেই হোক ছত্রভঙ্গ করতে পারবে না;

১(খ)২ ঃ কোন ব্যক্তি শিকারের প্রাণীকে বধ করার জন্য বিষ বা অন্য কোন ক্ষতিকারক পদার্থ ব্যবহার করতে পারবে না;

১(খ)৩ ঃ কোন ব্যক্তি বিমান, মোটরযান, রেলগাড়ি, জলযান বা কোন প্রকার পরিবহন থেকে শিকারী পাখিকে গুলি করতে পারবে না;

১(খ)৪ ঃ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রাণীকে শিকার করা যাবে না;

১(গ) ১ ঃ প্রাণী শিকারের জন্য গর্ত, পরিখা অথবা গাছপালায় আগুন লাগিয়ে প্রাণী শিকার করা যাবে না।

১(গ) ২ ঃ বিমানের নিরাপত্তার জন্য প্রয়োজনে বিমানবন্দরে মোটরযান বা বিমানের দ্বারা কোন বন্যপ্রাণী বিতাড়ন করা অপরাধ বলে গণ্য হবে না।

বন্যপ্রাণীর আবাসস্থল (habitat) নিরাপদ রাখার লক্ষ্যে উক্ত আইনের অনুচ্ছেদ ১২ (১) বিধান করা হয়েছে সরকারি যথাযথ অনুমোদন ব্যতিরেকে বন্যপ্রাণী আমদানি অথবা আমদানির উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারবে না।

অনুরূপভাবে ১৩ (১) অনুচ্ছেদে বিধান রয়েছে যে, কোন ব্যক্তি এ আইনের প্রথম তফসিলে উল্লেখ নেই এমন কোন বন্যপ্রাণী রফতানি বা রফতানি করার উদ্যোগ নিতে পারবে না। বন্যপ্রাণীর আবাসস্থলকে নিরাপদ ও সংরক্ষিত রাখার লক্ষ্যে এ আইনে বিধান রয়েছে যে

www.nagorikpathagar.org

সরকার সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে কোন এলাকাকে অভয়ারণ্য হিসেবে ঘোষণা দিতে পারেন [অনুচ্ছেদ ২৩ (১)]। অভয়ারণ্যের নিষিদ্ধ কার্যাবলীর মধ্যে রয়েছে [২৬(২)] কোন ব্যক্তি -

(১) অভয়ারণ্যে প্রবেশ করতে বা বসবাস করতে পারবে না;
(২) অভয়ারণ্যে কোন জমি চাষ করতে পারবে না;
(৩) অভয়ারণ্যে কোন গাছপালা ক্ষতি বা ধ্বংস করতে পারবে না;
(৪) অভয়ারণ্যে বা অভয়ারণ্যের সীমার এক মাইলের মধ্যে কোন বন্যপ্রাণী শিকার বা বধ করতে পারবে না;
(৫) অভয়ারণ্যে বিদেশি প্রজাতির প্রাণী প্রবেশ করতে পারবে না;
(৬) কোন গৃহপালিত পশুকে প্রবেশ করাতে পারবে না বা এ ধরনের প্রাণীকে নিরুদ্দেশ রাখতে পারবে না;
(৭) অভয়ারণ্যের ভিতর বা মধ্য দিয়ে প্রবাহিত জীব প্রবাহকে দূষিত করতে পারবে না।

তবে, সরকার বৈজ্ঞানিক কারণে বা সৌন্দর্য উপভোগ বা দৃশ্যাবলীর উন্নয়নকল্পে যে কোন নিষেধ শিথিল করতে পারে। অভয়ারণ্য ঘোষণা করা ছাড়াও সরকার যে কোন এলাকাকে জাতীয় উদ্যান ঘোষণা করতে পারে অনুচ্ছেদ [২৩ (১)]। জাতীয় উদ্যানে নিষিদ্ধ কার্যাবলীর মধ্যে রয়েছেঃ

(১) জাতীয় উদ্যানের মধ্যে এবং এর এক মাইল সীমানার মধ্যে কোন বন্যপ্রাণী শিকার করা বা বধ করা যাবে না;
(২) বন্যপ্রাণীকে উৎপাত করা যাবে না বা প্রজনন স্থলকে বিঘ্নিত করা যাবে না;
(৩) গাছের ছাল ছাড়ানো, তৈল আহরণ বা পোড়ানো যাবে না;
(৪) খনিজ দ্রব্য আহরণ বা চাষাবাদ করা যাবে না;
(৫) জাতীয় উদ্যানের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত কোন জল প্রবাহকে দূষিত করা যাবে না;

তবে বৈজ্ঞানিক উপায়ে জনকল্যাণে বন্যপ্রাণীর সংরক্ষণে ক্ষতিকর নয় এমন কাজে যে কোন নিষেধ শিথিল করা যাবে। The animals slaughter (Restriction) and the meat control Act ১৯৫৭ (E. P Act VIII of 1957) আইনের অনুচ্ছেদ ৫(ক-খ) এ বর্ণনা করা হয়েছে যে, দুই বৎসর বয়সের নিচে ছাগল ও ভেড়া এবং তিন বৎসর বয়সের নিচে অন্যান্য মহিলা প্রাণীকে জবেহ্ করা যাবে না এবং এ বিষয়ে অনুমতিও দেয়া যাবে না। অনুরূপভাবে দুধ বা বাচ্চা দেয়ার ক্ষমতা থাকলে দশ বৎসর বয়সের নিচের প্রাণীকে জবেহ্ করা যাবে না। গর্ভবতী এবং দুধ দেয় এমন প্রাণীকেও জবেহ্ করা যাবে না।

The Society for the Prevention of Cruelty of Animals Ordinance, ১৯৬২ গৃহপালিত প্রাণীদের প্রতি আচরণ বিষয়ক সচেতনতা সৃষ্টির জন্য সমিতি গঠনের বিধান রয়েছে। উক্ত আইনের ৫ নং অনুচ্ছেদ (ক-খ) প্রাণীর প্রতি যথাযথ আচরণ ও যত্নশীল হওয়ার বিধান রয়েছে। এ বিষয়ে গণশিক্ষার ব্যবহারের কথা বলা হয়েছে।

www.nagorikpathagar.org

এ লক্ষ্যে প্রতি জেলায় জেলা প্রশাসকের নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠনের বিধান রয়েছে। নির্বাহী কমিটি গৃহপালিত পশুর আচরণ বিষয়ক সকল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। সরকার এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় বিধি প্রণয়ন করতে পারে। এ বিষয়ে আরো আইন রয়েছে যেমন ঃ Protection of Domestic Animal. The Cruelty Animals Act, ১৯২০ (Bengal Act No 1 of 1920) Control of Animals amongst Animals এর জন্য The Livestock Importation Act ১৮৯৮ (Act No. IX of ১৮৯৮).
The Glanders and Factory Act ১৮৯৯ (Act No. XII of ১৮৯৯) The Bengal Diseases of Animals Act, ১৯৪৪ (Bengal Act VI of ১৯৪৪).

এছাড়া, প্রাণী সংরক্ষণের ও ব্যবস্থাপনার জন্য অন্যান্য উল্লেখযোগ্য আইনগুলো হচ্ছে ঃ
The Private Fisheries Protection Act, ১৮৮৯.
The Protection & Conservation of Fish Act, ১৯৫০ with amendment of ২০০২, The Marine Fisheries ordinance, ১৯৮৩.

প্রাণী সম্পদ সংরক্ষণে উল্লেখযোগ্য বিধি ও নীতির মধ্যে রয়েছে;

Territorial water & Marine Zone Rules, 1971, Marine Fisheries Rules, 1983.
Land Management Mannuals, 1990
Environment Policy, 1992.
National Environment Management Action Plan (NEMAP) 1995.
New Agricultural Extension Policy, 1996.
National Fish Policy, 1999.
Land Use Policy, 2000.
সর্বোপরি এসব আইনের ও নীতির যথাযথ প্রয়োগ ও বাস্তবায়নের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক ও মানব সম্পদের অভাব রয়েছে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো অঙ্গীকার ও মূল্যবোধের অভাব।

উপকূলীয় অঞ্চল নীতি ২০০৫

প্রাণী সম্পদ সংরক্ষণের বিষয়টি বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে একেবারেই নতুন নয়। বিদ্যমান আইন, নীতি পর্যালোচনা করলে তা স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয় যে, শতাব্দীকাল আগে থেকেই প্রাণী সম্পদের পর্যাপ্ততা থাকা সত্ত্বেও এ সম্পদ সংরক্ষণে বহু আইন প্রণয়ন করা হয়েছিল। তবে ব্যবস্থাপনার উদ্যোগ ছিল এ কথা নিশ্চিতভাবে বলা গেলেও ব্যবস্থাপনা কতটুকু সুসমন্বিত ও টেকসই ছিল, তা পর্যালোচনা সাপেক্ষে মন্তব্য করা যেতে পারে।

প্রাণী সম্পদ ব্যবস্থাপনার উদ্যোগের ঐতিহ্য ধরে সাম্প্রতিককালেও ব্যাপক উদ্যোগ ও প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়েছে। তবে সাম্প্রতিক উদ্যোগগুলোতেও মারাত্মক সমন্বয়ের অভাব রয়েছে বলে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব হচ্ছে না। হালে প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা কৌশলেরও ব্যাপক বিবর্তন ঘটেছে। অতীতে প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবস্থাপনা ছিল

www.nagorikpathagar.org

আমলাতন্ত্রের নিয়ন্ত্রণে, গণসচেতনতা বৃদ্ধির ফলে সমাজের বর্তমানে শ্রেণীভেদ ব্যাপকভাবে হ্রাস পেয়েছে। মানুষ হিসেবে সর্বক্ষেত্রে সব মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সে প্রেক্ষাপটে টেকসই সম্পদ ব্যবস্থাপনায় তৃণমূল জনগোষ্ঠীর সম্পৃক্ততা নিশ্চিত করা অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। তাই সম্পদ ব্যবস্থাপনার প্রতি জনগোষ্ঠীর স্থানীয় সংস্কৃতি ও ধর্মীয় মূল্যবোধের আলোকে প্রচলিত আইন, নীতির প্রয়োগ কৌশল প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের উদ্যোগের ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন। অন্যথায় সব উদ্যোগ ও মাথাভারি প্রশাসনের প্রচেষ্টা মুখ থুবড়ে পড়বে। আর ধ্বংস হয়ে যাবে টেকসই উন্নয়নের বিকল্পহীন জ্বালানি শক্তি, এ দেশের প্রাণী সম্পদ। তাই প্রাকৃতিক সম্পদ টেকসই ব্যবস্থাপনায় তৃণমূল পর্যায়ে জনগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধকে আরো তীব্রতর করতে হবে। আর এসব মূল্যবোধকে প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনার অন্যতম মৌলিক উপাদান হিসেবে ব্যবহার করতে হবে।
তৃণমূল পর্যায়ে জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে ঐতিহ্যগত, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধকে সংগঠিত ও প্রতিষ্ঠিত করতে পারলে, নিঃসন্দেহে দেশের বর্তমান প্রাতিষ্ঠানিক সমন্বয়হীনতা কাটিয়ে উঠতে অনেক সহায়ক হবে। দেশের বর্তমান কাঠামোর মধ্যে সামাজিক সংগঠনগুলোকে ব্যবহার করে, মসজিদ-মাদ্রাসা, মন্দির, গির্জা বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান ও স্থায়ী সরকারি প্রতিষ্ঠান, প্রাথমিক স্কুল, মাধ্যমিক স্কুল ও মাদ্রাসার কারিকুলামে সম্পূর্ণ পরিবর্তন করে এসব প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের সামাজিক উদ্বুদ্ধকরণ কাজে লাগানো যেতে পারে। আমাদের উদ্যোগ রয়েছে, বর্তমানে অভাব শুধু সমন্বয় ও বলিষ্ঠ নেতৃত্বের।

প্রাণী সম্পদ সংরক্ষণে অন্যান্য ধর্ম

আল্লাহর সব সৃষ্টিই তার প্রভুর নির্দেশ প্রতিপালন করে এবং তার ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করে। জোরাস্টার (Zoraster) আহুরা মাজদা (Lord of life & wisdom) এর শিক্ষাদর্শ অনুসারে সারাবিশ্বই স্বর্গীয় বিধানে পরিচালিত হয়। অনুরূপভাবে ভেতিক (৩রধ) কনফিউসিয়ান (The way of heaven) অনুসারীদের একই অভিমত রয়েছে। তাই অন্যান্য ধর্মীয় বিধান অনুসারে সব প্রাণী এবং অপ্রাণী সৃষ্টিকর্তার প্রতিচ্ছবি ও ভালবাসা হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। প্রকৃতির প্রতিটি উপাদানই ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্য বহন করে, আর প্রতিটি মানুষকেই এসবের প্রতি যত্নশীল হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়। ইসলামী বিধান মতে আল্লাহর খলিফা হিসেবে মানুষের দায়িত্ব প্রকৃতিকে রক্ষা করা। Judaism এবং খৃস্টান ধর্মে প্রভু তার বিরাট সাম্রাজ্যের দায়িত্ব অর্পণ করেছেন মানুষের প্রতি একে সংরক্ষণ করার জন্য। এ ক্ষেত্রে তাকে সীমিত ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে যেমন মৃতকে সে আর জীবিত করতে পারবে না। তাই মানুষকে অন্যান্য সৃষ্টির ওপর কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে তবে এ ক্ষেত্রে কোন অবস্থাতেই প্রকৃতির বিধান ভঙ্গ করার কোন অধিকারই তার নেই। তাই প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষা করা সকল ধর্মাবলম্বীর জন্যই বাধ্যতামূলক। এসব ধর্মীয় নৈতিকতা আমাদের ধর্মপ্রাণ মানুষের সামনে তুলে ধরতে পারলে স্বল্প খরচে এবং নির্ঝঞ্ঝাটভাবে প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণে অত্যন্ত সহায়ক হবে।

www.nagorikpathagar.org

প্রাণী সম্পদ সংরক্ষণে ইসলামের বিধান

প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর মানুষের কোন মালিকানা নেই। মানুষের দায়িত্ব এ সম্পদকে সংরক্ষণ করা ও যথাযথভাবে ব্যবহার করা। এ ক্ষেত্রে সৃষ্টির উদ্দেশ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে মানুষের এবং জ্বীনের মতো তার সৃষ্টির প্রতিটি প্রাণীই তার তসবীহ্ করছে। এ বিষয়ে পবিত্র কোরআনে উল্লেখ রয়েছে "তার পবিত্রতা তো সাত আসমান ও জমিন আর সেই সমস্ত জিনিসই বর্ণনা করে যা আসমান ও জমিনের মধ্যে রয়েছে। সৃষ্টির এমন কোন জিনিসই এমন নেই যা তার প্রশংসা এবং তসবীহ্ করছে না (সুরা বনি ইসরাইল-১৭:৪৪)। পবিত্র কোরআনে অন্য আয়াতে উল্লেখ রয়েছে "তোমরা কি দেখ না, আল্লাহর সামনে সেজদায় অবনত রয়েছে যারা আসমানে অবস্থান করে, আর যারা জমিনে অবস্থান করে? সূর্য, চন্দ্র, তারকা, পাহাড়, গাছপালা জন্তু জানোয়ার এবং বহু সংখ্যক মানুষ" (সুরা হজ্জ-২২:১৮)।

আল্লাহ্ তার প্রাণী জগতের প্রতিটি প্রাণীকে বিচিত্রভাবে তৈরি করেছেন, তাদের একের অস্তিত্ব অন্যের ওপর অত্যন্ত নিবিড়ভাবে নির্ভরশীল। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কোরানে উল্লেখ রয়েছে- "জমিনের ওপর নির্ভরশীল জন্তু এবং বাতাসে ডানার সাহায্যে উড়ন্ত কোন পাখিই দেখ তারা তোমাদের মতোই বিচিত্র জাতি প্রজাতি" (সুরা আন আম-৬:৩৮)।

ইয়াদ ইবন আবদুস সালাম ত্রয়োদশ শতাব্দীর জুরিস্ট যাকে "স্কলারদের সুলতান" বলা হয়, তিনি বলেছেন, আল্লাহ্ তার সমস্ত সৃষ্টিকে একের পর এক নির্ভরশীল করে তৈরি করেছেন যেন এক প্রজাতি অন্য প্রজাতির কল্যাণে সহায়তা করতে পারে। প্রতিবেশ বিজ্ঞান (Ecological Science) এর খাদ্য চেইন (Food Web) দিকে তাকালে তা স্পষ্টভাবে বুঝা যায়। এ বিষয়ে সুরা আবাসা (৮০:২৭-৩২) বলা হয়েছে অতঃপর এতে উৎপাদিত করেছি শস্য, আঙ্গুর, তরিতরকারী, জয়তুন, ঘন সন্নিবেশিত আর রকম বেরকমের ফল ও উদ্ভিদ। এ খাদ্য সৃষ্টি করেছি তোমাদের জন্য এবং তোমাদের চতুষ্পদ জন্তুর জীবিকা সামগ্রীরূপে। চিত্রের সাহায্যে এ সম্পর্কটি অত্যন্ত স্পষ্টভাবে দেখানো হয়েছে।

চিত্র ৩.১১ : খাদ্যচক্র- এক প্রজাতি অন্য প্রজাতির ওপর নির্ভরশীলতা

আল্লাহর সৃষ্টির সব কিছুই মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত এ বিষয়ে কোরানের বিভিন্ন জায়গায় উল্লেখ রয়েছে। "তিনি তোমাদিগকে পবিত্র জিনিসসমূহের দ্বারা রেজক দান করেছেন (সুরা মোমেন ৪০:৬৪)। মানুষ ও প্রাণী এবং সামাজিক জীব হিসেবে তার অনেক জৈব ও পরিবেশগত চাহিদা রয়েছে, যেমন আলো বাতাস, পানি খাবার এবং আশ্রয় ইত্যাদি। এ পৃথিবীতে জীবন ধারণের জন্য মানুষের এসব সম্পদ ও প্রাণীর ব্যবহারের প্রয়োজন রয়েছে। মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব হিসেবে আল্লাহ তাকে বুদ্ধিমত্তা ও ইচ্ছা শক্তি দিয়েছেন, যা বিচার বিবেচনা করে প্রাকৃতিক সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করবে।

www.nagorikpathagar.org

প্রাণীকুলের প্রতি আচরণ

প্রাণীকুল মানব কল্যাণের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে, তাদের সব সেবা মানবজাতির জন্য নিয়োজিত। উপরন্ত তারা আল্লাহর তসবীহও করে। তাই তাদের প্রতি সংবেদনশীল আচরণ করা সবার জন্য বাধ্যতামূলক। পবিত্র কোরআনের ভাষা থেকেই আমরা জানি সকল প্রকার প্রাণীই আল্লাহর তসবীহ করে। তাই তাদের প্রত্যেকেরই বেঁচে থাকার অধিকার রয়েছে, আল্লাহর বিধান অনুসারে তাদের প্রতিটি দায়িত্ব যথাযথভাবে সম্পাদনের সুযোগ নিশ্চিত করতে হবে। এমতাবস্থায় কোন প্রাণীকে নির্মূল করে দেয়া অথবা নির্মূল হয়ে যেতে পারে এমনভাবে আচরণ করা যাবে না। যেমন শিকারীদের নির্বিচারে মাছ সম্পদ আহরণ করা অথবা নিছক আনন্দের জন্য প্রাণী হত্যা করা। এ বিষয়ে ইসলামী বিধানের তাৎপর্য হল জীববৈচিত্র্যকে সংরক্ষণ এবং জনকল্যাণের স্বার্থে যথাযথভাবে আহরণ ও ব্যবহার করা যাবে।

মহানবী (সাঃ) কে "সকল প্রাণী জগতের দয়ার ভাণ্ডার" (সুরা আম্বিয়া-২১ঃ১০৭) হিসেবে প্রেরণ করা হয়েছে। তার শিক্ষার আদর্শ সকল মানব জাতির জন্য করণীয় কিভাবে প্রাণীকুলের প্রতি আচরণ করতে হবে। তিনি বলেছেন, "পরম করুণাময় তোমাদের করুণা করেন, পৃথিবীবাসীকে তোমরা করুণা কর, স্বর্গবাসীও তোমাদের করুণা করবেন" (আবুদাউদ ও তিরমিজী)। তিনি মানব জাতিকে আরো উপদেশ দিয়েছেন, "নিজ দায়িত্বে প্রাণীকুলের প্রতি যত্নশীল হও। তিনি সতর্ক করিয়ে দিয়েছেন যদি কোন ব্যক্তির দায়িত্বহীনতার কারণে কোন প্রাণী অনাহারে মারা যায় আল্লাহ তাকে দোজখের আগুনে শাস্তি দিবেন" (বোখারী ও মুসলিম)। তিনি মানব জাতিকে আরো উপদেশ দিয়েছেন-সাধারণভাবে সকল প্রাণীকেই তার প্রয়োজনে সাহায্য করতে হবে। এ প্রসঙ্গে তিনি উল্লেখ করেছিলেন একটি তৃষ্ণার্ত কুকুরকে পানি পান করানোর জন্য এক ব্যক্তির সব পাপ আল্লাহ মাফ করে দিয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে তাঁকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, হে আল্লাহর নবী (সাঃ) প্রাণীদের প্রতি সদাচরণের জন্যেও কি কোন প্রতিদান আছে? তিনি প্রত্যুত্তরে বললেন, প্রতিটি প্রাণীর প্রতি সদাচরণের জন্যও পুরস্কার রয়েছে (বোখারী ও মুসলিম)।

খাদ্য চাহিদা মিটানোর জন্য মাছ এবং প্রাণী শিকার ইসলামে বৈধ, হাদিসে বলা হয়েছে, "যে ব্যক্তি কোন প্রাণীকে লক্ষ্যবস্তু হিসাবে এবং নিছক খেলার জন্য কোন প্রাণীকে ব্যবহার করে তিনি তাকে ভর্ৎসনা করেছেন" (বোখারী ও মুসলিম)। হাদিসে আরো উল্লেখ রয়েছে, "কোন প্রাণীকে জবেহ করতে গিয়ে সময় নেয়ার জন্য তিনি নিষেধ করেছেন"(বোখারী ও মুসলিম)। তিনি এ প্রসঙ্গে আরো পরামর্শ দিয়েছেন, "সবকিছু কল্যাণকর কাজ কর, তাই যখন কোন প্রাণী হত্যা কর, কল্যাণের লক্ষ্যে কর, যখন জবেহ কর তাও কোন কল্যাণের জন্য করবে। জবেহ করার অস্ত্রটিকে অত্যন্ত সুন্দরভাবে ধার করে নিবে, যেন জবেহটি অত্যন্ত সহজ হয়" (মুসলিম)।

মহানবী (সাঃ) পিঁপড়া পুড়িয়ে মারা নিষেধ করেছেন, এ প্রসঙ্গে তিনি উল্লেখ করেন এক নবীকে একটি পিঁপড়া কামড় দিয়েছিল এর জন্যে তিনি পিঁপড়ার বাসাসহ পিঁপড়ার দলটিকে

www.nagorikpathagar.org

পুড়িয়ে দিয়েছিলেন, এ কাজের জন্য আল্লাহ তাকে তিরস্কার করেছিলেন, "তোমাকে একটি মাত্র পিঁপড়া কামড় দিয়েছিল অথচ তুমি এ জন্যে পিঁপড়ার সম্পূর্ণ দলটিকে ধ্বংস করে দিয়েছো যারা আল্লাহর তসবীহ করাতে ব্যস্ত"(বোখারী ও মুসলিম)। খলিফা বিন ইসহাক এর মোকতাসারে (১৯১৯এ পৃষ্ঠা-১৬৬) উল্লেখ রয়েছে ইসলামে পশুকে যানবাহন হিসেবে ব্যবহারের বিধান রয়েছে। তবে তাদেরকে (পশু) তাদের সাধ্য অনুসারে বোঝা দিতে হবে। গৃহপালিত পশু এবং কাজের লোকদের প্রয়োজন মতো খাবার দিতে হবে। তাদেরকে নিজের সাধ্যাতিরিক্ত কাজ বা বোঝা দেয়া যাবে না। এ প্রসঙ্গে এক হাদিসে উল্লেখ রয়েছে মহানবী (সাঃ) একদিন একটি ভারবাহী উটের পাশ দিয়ে যাবার সময় দেখছিলেন বোঝার ভারে তার পিঠ পেটের সাথে মিশে গিয়েছে। তিনি উটটির প্রতি লক্ষ্য করে বললেন, "এসব নির্বাক প্রাণীদের বিষয়ে আল্লাহকে ভয় কর। তারা যখন সুস্থ তখন তাদের বাহন হিসেবে ব্যবহার কর। এদের প্রয়োজনীয় সামর্থ্য থাকা অবস্থায় বিশ্রাম দাও"। মহানবী (সাঃ) আরো বললেন, "তোমাদের প্রাণীর পিঠকে তোমাদের চেয়ারের মতো ব্যবহার করবে না" (আহমাদ হাকিম)। অন্য এক হাদিসে রয়েছে প্রাণীদের প্রতি আচরণ ও ব্যবহার যথাযথ হবে। রাসুল (সাঃ) বলেছেন, "একদা এক ব্যক্তি গাভীর পিঠে আরোহণ করলো। তখন গাভীটি বলে উঠলো আমাকে এজন্যে সৃষ্টি করা হয়নি। রাসূল (সাঃ) বললেন, আমি, আবু বকর এবং উমর এটাই বিশ্বাস করি (বুখারী)*।

ইসলাম কোন প্রাণীকে তার সামর্থ্যের বাইরে কোন কঠিন কাজে ব্যবহার করাকে সমর্থন করে না। এ প্রসঙ্গে অন্য এক হাদিসে উল্লেখ রয়েছে, "মহানবী (সাঃ) একদিন কোন এক আনসারীর কবরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, এমন সময় সেখানে একটি উট দেখতে পেলেন। উটটি মহানবী (সাঃ)-কে দেখে অত্যন্ত মায়াবী করে কান্না করতে লাগল এবং তার চোখ দিয়ে অশ্রুপাত হতে থাকলো। মহানবী উটটির কাছে গেলেন এবং তার চোখ মুছে দিলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন এ উটটির মালিক কে? মালিক মহানবী (সাঃ) এর কাছে বললেন, আমি এর মালিক। মহানবী (সাঃ) মালিককে বললেন প্রাণীদের বিষয়ে তোমাদের কি আল্লাহর কোন ভয় নেই। আল্লাহ যে প্রাণীকুলকে তোমাদের নেয়ামত হিসেবে প্রদান করেছেন সে আমার কাছে অভিযোগ করছে যে, তুমি তাদেরকে অত্যন্ত কঠিন কাজে ব্যবহার করছো, অথচ তাদেরকে খেতে দাও না (আহমাদ)। প্রাণীর প্রতি সুন্দর ও যথাযথ আচরণ না করার জন্য শাস্তি রয়েছে। যেমন একজন স্ত্রীলোককে দোজখের শাস্তি দেয়া হয়েছিল এ কারণে যে, সে একটি বিড়াল বন্দী করে রেখেছিল মৃত্যু হওয়া পর্যন্ত। সে তাকে খেতেও দেয়নি। পানিও পান করতে দেয়নি আর তাকে ছেড়েও দেয়নি যে সে বাইরে গিয়ে পোকামাকড় খাবে (বুখারী)।

অপর পক্ষে প্রাণীর প্রতি যথাযথ আচরণ করার বিষয়ে অন্য এক হাদিসে রয়েছে, "একজন দুশ্চরিত্র স্ত্রীলোক দেখতে পেল পিপাসার্ত মৃতপ্রায় একটি কুকুরকে প্রচণ্ড গরমের দিনে কুয়ার চারপাশে ঘুরতে এবং জিহ্বা দিয়ে মাটি চাটতে। অতঃপর স্ত্রীলোকটি কুয়াতে নেমে পানি তুলে পান করানোর কারণে আল্লাহ তাকে মাফ করে দিলেন (বুখারী)।

www.nagorikpathagar.org

মহানবী (সাঃ) প্রাণীর লড়াই যেমন মোরগের লড়াই, ষাড়ের লড়াই ইত্যাদি নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন কারণ নিছক আনন্দ ছাড়া এর কোন তাৎপর্য নেই। অন্য এক হাদিসে ঘোড়া, গরু ও মহিষের মতো প্রাণীকে পরিচিতির চিহ্ন রাখার জন্য গরম লোহা দিয়ে দাগ দেয়া ইসলামে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। যেমন একদিন মহানবী (সাঃ) একটি গাধাকে দেখলেন তার মুখে গরম লোহা দিয়ে দাগ দেয়া। তখন তিনি বললেন, "সে ব্যক্তিকে তিরস্কার, যে এ কাজ করেছে"। অন্য এক হাদিসে বলা হয়েছে, আল্লাহ আমাদেরকে প্রাণীর প্রতি দয়াশীল হওয়া বাধ্যতামূলক করেছেন। যদি প্রয়োজনে জবেহ করতে হয় তা উত্তম উপায়ে হতে হবে। মহানবী বলেছেন, "যে ব্যক্তি প্রাণীকে জবেহ করবে সে প্রাণীকে নিঃশ্বাস ত্যাগ করে ঠাণ্ডা হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে"। পাখি পরিবেশের জন্য অত্যন্ত উপকারী এবং অত্যন্ত অসহায় প্রাণী। এদের প্রতি সংবেদনশীল হবার বিষয়ে হাদিসে এসেছে, "যে ব্যক্তি বিনা প্রয়োজনে পাখি হত্যা করবে কিয়ামতের দিন তা এ বলে আল্লাহর কাছে অভিযোগ করবে যে, আল্লাহ, অমুক ব্যক্তি আমাকে অযথা হত্যা করেছিল, কোন ফায়দা লাভের জন্য হত্যা করেনি (নীসাঈ)।

হযরত উমর (রাঃ) একদিন দেখছিলেন এক ব্যক্তি একটি ছাগলকে পায়ে ধরে টেনে জবেহ করার জন্য নিতেছিলেন। তিনি বললেন, "ধ্বংস তোমাকে গ্রাস করেছে, তুমি যদি তাকে মৃত্যুর দিকে নিয়ে যাবে, তবে যথাযথভাবে নিয়ে যাও।" উমর বিন আঃ আজিজ (রাঃ) এক পত্রে সরকারকে নির্দেশ দিয়েছিলেন মানুষ যেন তাদের ঘোড়াকে বেত্রাঘাত না করে এবং ছুরাতে পিন না লাগায়। তিনি ট্রাফিক পুলিশ অফিসার এবং প্যাট্রোলিং দলকে নির্দেশ দিয়েছিলেন কেহ যেন ঘোড়া তাড়ানো বেতেতে লোহার পিন না লাগাতে পারে।

খলিফা উমর বিন আবদুল আজিজ যখন সিরিয়ার ছিলেন তখন দেখতে পেলেন মিশরীয় উট গুলিকে একহাজার পাউন্ড বোঝা দেয়া হয়েছিল। তিনি নির্দেশ দিয়েছিলেন কোন উটকে ছয়শত পাউন্ডের বেশি বোঝা দেয়া যাবে না। প্রাণী ও গবাদি পশুর প্রতি ব্যবহার, অধিকার ও সংরক্ষণের বিষয়ে ইসলামের বিশেষ বিধান রয়েছে। সেগুলো হলো এদের প্রতি দয়াশীল হওয়া যদিও এরা অসুস্থ, বয়োবৃদ্ধ এবং তাদের দ্বারা কোন প্রকার অর্থনৈতিক সুবিধাদি না পাওয়া যায়। তাদেরকে একসাথে এমনভাবে রাখা যাবে না যেন তারা আহত হয় অথবা তাদের হাড় ভেঙ্গে যায়। এদেরকে জবেহ করতে হলেও দয়ার সাথে করতে হবে, নিঃশ্বাস ত্যাগ করে ঠাণ্ডা না হওয়া পর্যন্ত তাদের চামড়া খোলা যাবে না বা হাড় ভাঙ্গা যাবে না। প্রাণীদের বাচ্চাদের তাদের চোখের সামনে জবেহ করা যাবে না। তাদেরকে আলাদাভাবে আরামদায়ক এবং বিশ্রামোপযোগী স্থানে থাকার ব্যবস্থা করতে হবে। প্রজনন প্রক্রিয়ার সময়ে তাদেরকে একত্রে রাখার ব্যবস্থা করতে হবে। এদেরকে শিকারের কাজে ব্যবহার করা যাবে না এবং গুলি করা যাবে না যেন হাড় ভেঙ্গে যায় (বিধানুযায়ী)। এমতাবস্থায় প্রাণীকুলের প্রতি আচরণ নিম্নোক্ত কারণে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচনা করা যেতে পারে। প্রথমতঃ প্রতিটি প্রাণী আল্লাহর সৃষ্টি হিসেবে তার মহিমাকে তুলে ধরে, এজন্যে পৃথিবীতে নিরাপদে বেঁচে থাকার সকল অধিকার রয়েছে। দ্বিতীয়তঃ আল্লাহর সকল সৃষ্টি মানবকল্যাণে

নিয়োজিত করা হয়েছে। তাই মানবকল্যাণের সর্বোত্তম পন্থায় শুধু তাদের ব্যবহার ও প্রয়োগ ইসলাম সমর্থন করে।

ইসলামসম্মত জবাই সর্বোত্তম - একটি বৈজ্ঞানিক প্রমাণ
আল সাদ্দাত বিন আউস (রাঃ) থেকে বর্ণিত মহানবী (সাঃ) বলেন, আল্লাহ্ সকল জিনিসের প্রতি দয়া দেখাতে বলেছেন, তাই হত্যা এবং জবাই করার সময় দয়ালু হও, তোমাদের ছুরিগুলো ধারালো রাখ- যেন শরীয়তসম্মত জবাই করা প্রাণীর কম কষ্ট হয়। জার্মানির হ্যানোবার বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক প্রফেসর স্কালজ এবং তার সহকর্মী ডঃ হাজিম ইলেকট্রোইমোফালোগ্রাম (EEG) এবং ইলেকট্রোকার্ডিওগ্রাম (ECG) এর সাহায্যে পরীক্ষা করে প্রমাণ করেছেন যে, ইসলামসম্মত জবাই-ই হচ্ছে সবচেয়ে বেশি মানবীয়। বন্দি অবস্থায় হঠাৎ বড় আঘাত (Captive bolt stunning- CBP method) পশুদের জন্য বেশি কষ্টদায়ক। এই ফলাফল অনেককেই হতবাক করেছে।

গবেষণার বিস্তারিত বর্ণনা

১। পরীক্ষায় সব পশুর মাথার খুলির (Skull) বিভিন্ন অংশে অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে বেশকিছু ইলেকট্রোড স্থাপন করা হয়েছিল যাতে করে এগুলো মগজ (brain) এর পৃষ্ঠে স্পর্শ অবস্থায় থাকে।

২। এই পশুদের সুস্থতার জন্য বেশ কয়েক সপ্তাহ সময় দেয়া হয়েছিল।

৩। কিছু পশুকে ধারালো ছুরি দ্বারা পশুর গলায় উভয় পাশের জুগুলার শিরা (Jugular veins) এবং ক্যারোটিড ধমনী (Carotid arteries) এবং সঙ্গে সঙ্গে ট্রাকিয়া এবং ইযোকাপোগ্রামকে দ্রুত কাটা হল যা কিনা হালাল পদ্ধতি।

৪। কিছু পশুকে বন্দি অবস্থায় হঠাৎ পিস্তলের (Pistol) সাহায্যে আঘাত করা হল যা কিনা পশ্চিমাদের মতে মানবীয় জবাই।

৫। গবেষণার সময় সব পশুর ইলেকট্রো-ইমোফালোগ্রাম EEG এবং ইলেকট্রোকার্ডিওগ্রাম ECG রেকর্ড করা হয় যাতে করে উভয় পদ্ধতিতে পশুর Brain এবং Heart-এর অবস্থা যাচাই করা যায়।

ফলাফল এবং সিদ্ধান্ত ঃ হালাল পদ্ধতি

১। ইসলামী জবাই পদ্ধতিতে প্রথম তিন সেকেন্ডে EEG এ কোন পরিবর্তন ঘটেনি যা কিনা জবাইয়ের পূর্বে ছিল, এতে করে বোঝা গেল জবাইয়ের সঙ্গে সঙ্গে কোন ব্যথা অনুভূত হয়নি।

২। পরবর্তী তিন সেকেন্ডে অচেতন অবস্থায় EEG-এর রেকর্ড সর্বোচ্চ অবস্থায় পৌঁছে কেননা বিপুল পরিমাণ রক্ত দেহ থেকে নিঃসরণ ঘটে।

৩। ঘটনার ছয় সেকেন্ড পরে EEG-এর রেকর্ড আবার শূন্যতে ফিরে আসে অর্থাৎ কোন ব্যথা অনুভূত হচ্ছে না।

৪। মগজের তথ্য শূন্যতে নেমে এলেও হৃৎপিণ্ডের গতিশীলতা ও সারাদেহে প্রচণ্ড খিঁচুনি চলতে থাকে। (স্পাইনাল কর্ডের প্রতিক্রিয়ার কারণে) এতে শরীর থেকে সর্বোচ্চ রক্ত অপসারিত হয়, ফলশ্রুতিতে ব্যবহারকারীদের জন্য স্বাস্থ্যসম্মত গোশত সরবরাহ করে।

www.nagorikpathagar.org

পশ্চিমাদের (Captive Bolt Stunning -CBP) পদ্ধতি

১। আঘাতের সঙ্গে সঙ্গে পশুগুলো অচেতন অবস্থায় থাকল

২। আঘাতের সঙ্গে সঙ্গে EEG তে প্রচণ্ড ব্যথার অনুভূতি দেখালো

৩। হালাল পদ্ধতিতে হৃৎপিণ্ডের গতিশীলতার কারণে শরীর থেকে যে সর্বোচ্চ রক্ত অপসারিত হয়েছিল, CBP Stuning পদ্ধতিতে আরও আগে হৃৎপিণ্ডের গতিশীলতা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। এতে করে শরীর থেকে যথেষ্ট রক্ত বের হতে না পেরে কিছু রক্ত গোশতে মিশে গিয়েছিল, যা কিনা ব্যবহারকারীদের জন্য তুলনামূলকভাবে অস্বাস্থ্যকর।

উপসংহার

বাস্তব অবস্থা পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, আইন ও নীতির বিধান অনেক দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা ও সংগঠনগুলির কার্যক্রমের মধ্যে যথেষ্ট সমন্বয় ও দায়িত্ব বাস্তবায়নের সীমাবদ্ধতা রয়েছে। প্রথমত আইন ও নীতিগুলো বেশির ভাগই বিদেশি পরামর্শক অথবা বিদেশি আদর্শে প্রশিক্ষিত পরামর্শক দ্বারা তৈরি করা হয়েছে। নিঃসন্দেহে এদেশে বেশিরভাগ আইন ও নীতি বৃটিশ শাসনামলের আইন থেকে উৎসারিত। ফলে বৃটিশ অথবা পশ্চিমা প্রভাবমুক্ত হওয়া সম্ভব হয়নি। কোন আইন ও নীতিই দেশের কৃষ্টি সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ ও বিভিন্ন ধর্মীয় চেতনার আলোকে তৈরি করা হয়নি। যা সামান্য উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে বাস্তবায়ন সহজ ও কম ব্যয়বহুল হতে পারতো। মানুষের হাজার বছর ধরে লালিত প্রথা ও মূল্যবোধের অবক্ষয় হলে আধুনিক পুলিশ, র‍্যাব ইত্যাদি এজেন্সি দিয়ে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয় না। ভিনদেশী চিন্তাচেতনায় আইনের শাসন করা আসলেই জটিল এবং ব্যয়বহুল ব্যাপার। যার ফলে আমাদের দেশে যে কোন বিষয়ের আইন ও নীতির বাস্তবায়ন পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে এর হাজারো প্রচেষ্টা থাকা সত্ত্বেও বাস্তবায়ন মোটেও সন্তোষজনক নয়। এ ক্ষেত্রে আইনের/নীতির বাস্তবায়ন কৌশলের স্থানীয় মূল্যবোধের স্পষ্টীকরণ থাকতে হবে। বিশেষত কোন সংস্থা বা সমাজের কোন শ্রেণীর নাগরিকের কতটুকু দায়িত্ব থাকবে এর ব্যাখ্যা থাকা উচিত। অবশ্য হঠাৎ করে এর ব্যাখ্যাও সম্ভব নয় এ জন্যে তৃণমূল পর্যায়ে সাধারণ জনগোষ্ঠীর সম্পৃক্ততা কর্মসূচিতে থাকবে। বাস্তব জীবনে নীতি বাস্তবায়নকালে যেসব সমস্যার উদ্ভব হবে নিজেদের অভিজ্ঞতা ও মূল্যবোধের আলোকে চিন্তা করলে ক্রমান্বয়ে এসবের ব্যাখ্যা বেরিয়ে আসবে। তাছাড়াও সেক্টরাল পলিসিগুলোর বেশিরভাগ ব্যাপক বিষয়াবলী বিবেচনায় আনা হয়নি বলে, আন্তসেকটরাল সমস্যাগুলো বাস্তবায়নে পরস্পর বিরোধী বলে প্রতীয়মান হয়।

এক্ষেত্রে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, পরিবেশ আইনের ধারা ৮(২) এ বিধান রয়েছে যে, পরিবেশ অবক্ষয় সংক্রান্ত জনগণের কোন অভিযোগ/অনুযোগ থাকলে তা জনগণের শুনানির মাধ্যমে সমাধান করা হবে। নিঃসন্দেহে এ বিধানটি একটি গতানুগতিক বিষয় থেকে ভিন্ন এবং গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন। দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য এ বিষয়ে প্রয়োগ পদ্ধতি এখন পর্যন্ত

www.nagorikpathagar.org

করা হয়নি কিভাবে তা বাস্তবায়ন করা হবে। এ ধরনের দুর্বল বিষয়গুলো পর্যালোচনা করে সমাধান করা হলে জনগণের ইচ্ছা এবং প্রচলিত জনপ্রশাসনের নীতি বাস্তবায়নের দুর্বলতাগুলো চিহ্নিত করা সম্ভব হতো। তাই নীতি ও আইনের সংঘাত এবং গ্যাপগুলো চিহ্নিত করতে হবে। সাম্প্রতিককালের জনগণকে সম্পৃক্তকরণ করে প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা পুরোনো দিনের আইনের সাথের অমিলগুলোতে সমন্বয় করতে হবে। প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনায় নীতি ও আইনগুলোতে স্থানীয়ভাবে সাংস্কৃতিক ও বিভিন্ন ধর্মীয় মূল্যবোধের প্রতিফল থাকতে হবে। Community Management Concept এ তৃণমূল পর্যায়ে স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনায় তাদের নিজস্ব মূল্যবোধের প্রতিফলন ও বাস্তবায়নে তৃণমূল পর্যায়ে জনগোষ্ঠীকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। এজন্যে মসজিদ, মন্দিরভিত্তিক গণসচেতনতা কার্যক্রম এবং পাঠ্যসূচিতে তৃণমূল পর্যায়ের বিভিন্ন মূল্যবোধের প্রতিফলন থাকতে হবে। সর্বোপরি রাজনৈতিকভাবে এসব চেতনা জাগিয়ে তোলার জন্য প্রতিটি রাজনৈতিক সংগঠনকে ও সুশীল সমাজকে সমন্বয়ের অঙ্গীকারবদ্ধ হতে হবে।

www.nagorikpathagar.org

গ্রন্থপুঞ্জি ঃ

Md. Anwarul (2000), Islam Recent Trends in Fisheries Sector of Bangladesh in a Changing Rural Economy of Bangladesh.

Raha. S.K. (2000). Development of Livestock Sector : Issues & Evidences in Changing Rural Economy of Bangladesh.

Towards Sustainable Development the National Conservation Strategy of Bangladesh (2000) NCS - Project -1, Ministry of Environment and Forest.

Add-al-Hamid (1997) Exploring the Islamic Environmental Ethics in Islam & the Environment.

Abubakar Ahmad Bakadar et al (1997) Islamic Principles for the Conservation of the Natural Environment.

Qamrul Islam Chowdhury (2000) Bangladesh State of Environment Report 1999.

Islamic Center for Pioria; Privesttp:/auction.yahoo.com/ (hyMvš—it 25†g 2001 ïµevi)|

Alam, J, (1995), Livestock Resources in Bangladesh - Present Status and future potential, University Press Ltd.

বুখারী, কিতাবু আহাদিসিল আম্বিয়া হাদিস নং ৩২২৩, মুসলিম কিতাবুল বিষয়ে ওয়াস-সিলা ওয়াল আদাব, হাদিস নং ৪১৬০।

বুখারী কিতাবু আহাদিসিল আম্বিয়া হাদিস নং ৩২২৩। মুসলিম কিতাবুল বিষয়ে ওয়াম মিলা ওয়াল আদাব হাদিস নং ৪১৬০। নীসাঈ কিতাবুদ দাহায়া হাদিস নং ৪৩৭০।

নীসাঈ কিতাব দাহায়া হাদিস নং ৪৩৭০।

মোঃ আশেক পারভেজ "ইসলামসম্মত জবাই সর্বোত্তম- একটি বৈজ্ঞানিক প্রমাণ" দৈনিক যুগান্তর ২৫ মে, ২০০১ ও ইসলামিক সেন্টার ফর পিওরিয়া ;

মোঃ মাহবুবুল আলম : আল্লাহর সুন্দরতম সৃষ্টি পাখি, দৈনিক যুগান্তর ১৮ অক্টোবর ২০০২।

শরীফ খান "পাখির জেলা বনাম আইন" দৈনিক ইত্তেফাক ২৬ আগস্ট, ১৯৯৯।

শাহেদ চৌধুরী "অতিথি পাখি" দৈনিক যুগান্তর ৭ ফেব্রুয়ারি, ২০০৩।

আকাজ উদ্দিন বিপ্লব "দশ বছর পর এ অঞ্চলে বাঘ থাকবে না" ১৬ মে, ২০০০।

শেখ সাইফুর রহমান "চামড়া শিল্প" বাস্তবতার শিখন্ড সন্ধান" দৈনিক জনকণ্ঠ, ২১ জুলাই ২০০০।

খসরু চৌধুরী "বাংলাদেশে লুপ্ত ও লুপ্তপ্রায় প্রাণী" বিচিত্রা ১৪ জানুয়ারি ১৯৯৪ প্রজাতি সংরক্ষণ।

কাজী জাকের হোসেন "পরিচর্যার অভাবে বিলীন হয়ে যাচ্ছে আমাদের দুর্লভ প্রাণী" দৈনিক ইনকিলাব ২৯ এপ্রিল ২০০০।

গোলাম আকবর "নানা রকম প্রাণী" দৈনিক ইনকিলাব ২১ মে, ২০০০।

www.nagorikpathagar.org

আজিজুর রহমান, "বিপন্ন ইলিশ" দৈনিক জনকণ্ঠ, ১১ ফেব্রুয়ারি ২০০০।

শামসুদ্দোহা চৌধুরী, "পাখ-পাখালির বাংলা" দৈনিক যুগান্তর ২০ ডিসেম্বর ২০০২।

পাখির ভুবন (মৎস্য-পশুসম্পদ বার্তা পৃঃ ৮) ডিসেম্বর, ১৯৯৩ : মানুষের কাছে প্রিয় প্রাণীদের মধ্যে পাখি অন্যতম।

দৈনিক যুগান্তর - ১৬ই মে, ২০০০

দৈনিক জনকণ্ঠ - ১৪ই জানুয়ারি, ২০০০

দৈনিক জনকণ্ঠ - ১৮ই আগস্ট, ২০০০

দৈনিক জনকণ্ঠ - ২৮শে নভেম্বর, ২০০০

দৈনিক জনকণ্ঠ - ১১ ফেব্রুয়ারি/২০০০ (বিপন্ন ইলিশ)

দৈনিক ইত্তেফাক - ডিসেম্বর/২০০০), ২৪৩ প্রজাতির মাছ বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে

দৈনিক ইত্তেফাক - ২৮শে নভেম্বর/২০০০।

দৈনিক ইত্তেফাক - ১ আগস্ট/২০০৮।

(সূত্র ঃ বিচিত্রা ১৪ই জানুয়ারি, ১৯৯৪)

www.nagorikpathagar.org

চতুর্থ অধ্যায়

উপকূলীয় পরিবেশ সংরক্ষণের নীতি ও নৈতিকতা

সারাংশ

পৃথিবীর জলভাগের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল উপকূলীয় এলাকা। খাদ্যচক্রের দিকে তাকালে অতিসহজে এর গুরুত্ব অনুধাবন করা যায়। তাছাড়া খাদ্যচক্র, পানি প্রবাহ ও জলবায়ুর পরিবর্তন এবং এসবের প্রতিক্রিয়ার উৎসও সমুদ্র ও উপকূলীয় এলাকা। এমতাবস্থায় এ গুরুত্বপূর্ণ উৎসকে সংরক্ষণ না করা হলে উন্নয়নের সব প্রচেষ্টাই ব্যাহত হবে। এ প্রবন্ধে পরিবেশ সংরক্ষণে উপকূলীয় অঞ্চলের সংরক্ষণের গুরুত্বের বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে এর অর্থনৈতিক গুরুত্বের কথা আলোচনা করা হয়েছে। এক্ষেত্রে বিশেষত বাংলাদেশের উপকূলীয় সম্পদ সংরক্ষণের অর্থনৈতিক তাৎপর্যের বিষয়ও উল্লেখ করা হয়েছে। প্রবন্ধটিতে উপকূলীয় পরিবেশ সংরক্ষণে সংশ্লিষ্ট নীতিমালার বাস্তবায়ন কর্মকৌশলের বিষয় তুলে ধরা হয়েছে। তাতে বলা হয়, এসব নীতিমালা বাস্তবায়নে জাতীয় ও সেক্টরাল লেভেলে সমন্বয়ের যথেষ্ট অভাব রয়েছে। এগুলো থেকে উত্তরণের জন্য প্রয়োজন সমন্বিত উদ্যোগ ও প্রচেষ্টা। তদুপরি মানব জাতির নৈতিকতা ও ব্যক্তিগত দায়িত্ববোধ সমন্বিত করতে হবে। তাহলেই এসব প্রচেষ্টার প্রত্যাশিত সুফল অর্জন করা সম্ভব হতে পারে।

www.nagorikpathagar.org

বাংলাদেশের উপকূলীয় ভূ-ভাগ বিবর্তনের ইতিহাস

ভূ-তত্ত্ববিদদের গবেষণা থেকে জানা যায় যে, বর্তমানে বাংলাদেশ মূলতঃ সমুদ্রের অগভীর বক্ষে অতি ধীর প্রক্রিয়ার নদীজ পলি-অবক্ষেপণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই গড়ে উঠেছে। অবশ্য দেশের প্রায় ২০ ভাগ ভূমি ভূ-তাত্ত্বিক এবং ভূ-গাঠনিক উত্থানের (Geological and Tectonical upliftment) মাধ্যমে পাহাড়ী ভূমি হিসেবে জেগে উঠেছে। বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের বৃহৎ হিমালয় পর্বত, মেঘালয়ের খাসিয়া-জয়ন্তি এবং গারো পাহাড়, উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের ছোট নাগপুর-রাজমহল পাহাড় এবং পূর্বাঞ্চলের ত্রিপুরা, লুসাই-নাগা এবং আরাকান-ইয়োমা পার্বত্যাঞ্চলের অসংখ্য ছোট বড় নদ-নদী বাহিত পলিমাটি আসছে। এসব পার্বত্যাঞ্চলের ক্ষয়িত ভূমির পলিমাটি বঙ্গোপসাগরে যুগ যুগ ধরে সঞ্চিত হয়ে ধীরে ধীরে দক্ষিণে বদ্বীপ গঠন প্রক্রিয়ায় বাংলাদেশ ও ভারতের পশ্চিমবঙ্গের উল্লেখযোগ্য ভূমির সৃষ্টি হয়েছে। বাংলাদেশের বৃহত্তর আন্তর্জাতিক নদী ব্রহ্মপুত্র, মেঘনা ও পদ্মা (গঙ্গা) দেশের দক্ষিণাঞ্চলের ক্রমান্বয়ে বদ্বীপ ভূমি গঠনে মুখ্য ভূমিকা পালন করে চলেছে। এ প্রক্রিয়া ৭০ লক্ষ থেকে আড়াই কোটি বছর পূর্ব পর্যন্ত সময়জুড়ে পরিব্যপ্ত।

বর্তমানে বাংলাদেশের উপকূলীয় অগভীর মহীসোপানে অসংখ্য ছোট এবং মাঝারী দ্বীপ, চর, মগ্নচড়া (off-shore Islands, coastal bar and submerged shoals) ইত্যাদি বদ্বীপীয় ভূ-খণ্ড জেগে উঠছে। একই সঙ্গে দেশের উপকূলীয়, মূল ভূ-ভাগও ক্রমান্বয়ে প্রবর্ধিত হয়ে ক্রমে দক্ষিণে গভীর সমুদ্রের দিকে অগ্রসর হয়ে জেগে ওঠা এসব নতুন এবং ভগ্ন পুরাতন দ্বীপাঞ্চলকে অঙ্গীভূত করে আয়তনে বেড়ে চলেছে। এভাবে বিগত মাত্র একশ বছরের ব্যবধানে বাংলাদেশ স্বীয় উপকূলাঞ্চলে প্রায় হাজার বর্গ কিঃ মিঃ-এর চেয়েও বেশি নতুন ভূমি লাভ করেছে। অথচ গত শতকে প্রচণ্ড ভাঙ্গনে বাংলাদেশের উপকূলীয় দ্বীপাঞ্চলে মোট ভূমির পরিমাণ ১৭৮০ সনের চেয়ে বেশ উল্লেখযোগ্য পরিমাণে কমে গিয়েছিল। উল্লেখ করা যায়, রেনেলের মানচিত্রে (১৭৮০) বাংলাদেশের মেঘনা মোহনার ভূমির আয়তন ছিল ২৭৬৬ বর্গ কিঃ মিঃ। ১৮৮০ সনে বা ১০০ বছর পর তা কমে গিয়ে ২৩৬২ বর্গ কিঃ মিঃ-এ দাঁড়ায়। কিন্তু ঐ সময় থেকে পরবর্তী ১০০ বছর ১৯৮০ সনে ঐ উপকূলীয় অঞ্চলে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে মূল ভূ-খণ্ডে ভূমি গঠন প্রক্রিয়া কাজ করে। পরবর্তীতে যা বেড়ে ৪১১০ বর্গ কিঃ মিঃ-এ উন্নীত হয়। শুধু মেঘনা মোহনায় বাংলাদেশের পূর্বাঞ্চলীয় উপকূল ভূ-পরিবর্তনের এই চিত্র। ভূ-বৃদ্ধির এ তৎপরতা বাংলাদেশের অন্যান্য উপকূলাঞ্চলেই উল্লেখযোগ্য রূপে দেখা যায়। বৃহত্তর বরিশাল-নোয়াখালী অঞ্চলের দক্ষিণের অগভীর সমুদ্র উপকূলে উড়িরচর, চর ওসমান, নিঝুম দ্বীপ প্রভৃতি নতুন নতুন ভূ-ভাগ জেগে উঠেছে। ভাটার সময় দেখা যায় ঐসব দক্ষিণাঞ্চলীয় উপকূলের অগভীর অঞ্চলের বিস্তৃত এলাকাজুড়ে বিপুল আয়তনের বিপুল সংখ্যক মগ্নচড়া বা উপকূলীয় চর জেগে উঠছে। আগামী ২/৩ দশকের মধ্যেই বাংলাদেশের মেঘনা-পদ্মা মোহনার অগভীর সমুদ্র উপকূলের নিঝুম দ্বীপ উড়িরচর এবং পশ্চিমের রাবনাবাদ-হাড়িয়াভাঙ্গা মোহনাও জেগে উঠবে। এ রকম

www.nagorikpathagar.org

আরো অসংখ্য ছোট বড় নতুন ভূমি জেগে উঠতে থাকবে এবং এভাবে ব-দ্বীপ গঠন প্রক্রিয়ার স্বাভাবিক ধারায় ভাঙ্গা-গড়ার চূড়ান্ত সমীকরণে ক্রমে বাংলাদেশ একদিকে যেমন বিপুল আয়তনের নতুন নতুন ভূমি লাভ করে আয়তনে বড় হতে থাকবে ঠিক তেমনি একই কারণে সময়ের অতিবাহনে দেশের দক্ষিণাংশের উপকূল অঞ্চলীয় মানচিত্রের রূপ আর সীমানাও ক্রমে বদলাতে থাকবে।

সারণী ১ ঃ বাংলাদেশের পূর্বাঞ্চলীয় উপকূল ভূমির ক্রম-বিবর্তনের হিসাব (বর্গ কিঃ মিঃ)

সনঃ	হাতিয়া	সন্দ্বীপ	ভোলা	মানপুরা		অন্যান্য দ্বীপ	মূল ভূ-ভাগ	মোট
১৭৮০	৩৭২	৪৮০	৭৩০	১৮০		১৫০	২৭৬৬	৪৬৭৮
১৮৮০	৪৭০	৫০২	৮০০	৩৯	৬০	২৩	৬২	৪২৩৩
১৯৮০	৩৭০	২৯০	৩৪৭	১২০	৭০	৪১	১০	৫৩০৭

উৎস ঃ ইনকিলাব, ২৬ মার্চ, ২০০০ ইং ড. আ. রব এবং
রেনেল-১৭৮০, সার্ভে অব ইন্ডিয়া-১৮৮০, parrsos -১৯৮০।

পরিবেশ একটি সমন্বিত পরিমণ্ডল যেখানে সব প্রাণীজগতের জীবন ধারণের উপকরণ অত্যন্ত সুসমন্বিতভাবে প্রতিস্থাপিত হয়েছে, আর মানব জাতিকে এ সুসমন্বিত পরিবেশ ব্যবস্থাপনা ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। যদিও পরিবেশ বা "বি'য়া" শব্দটি পবিত্র কোরানে উল্লেখ নেই তবে পৃথিবী ও এর চতুর্পার্শ্বের গ্যাস সম্বন্ধীয় পরিমণ্ডলের কথা পবিত্র কোরানের বিভিন্ন আয়াতে ১৯৯ জায়গায় উল্লেখ রয়েছে (গোনায়মী, ১৯৯৬) সুরা হুজরাত (আয়াত ১৩) উল্লেখ রয়েছে যে, আল্লাহ তার বুদ্ধিমত্তা ও জ্ঞান দ্বারা অত্যন্ত স্পষ্টভাবে জেনে শুনে পরিবেশের প্রতিটি উপাদানের পরিমাণ, পরিমাপ প্রকৃতি ও তাদের কার্যাবলী যথাযথভাবে সৃষ্টি করেছেন। অনুরূপভাবে তিনি প্রতিটি জিনিসের মধ্যে সম্পর্ক ও পরস্পর নির্ভরশীলতা প্রকৃতি তার নির্ধারিত বিধান অনুসারে প্রতিস্থাপিত করেছেন। আর এর ওপর ভিত্তি করেই পরিবেশ সংস্থান (Ecosystem) এবং জীবনের ভারসাম্যতা রক্ষা হচ্ছে। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কোরানে আরো উল্লেখ রয়েছে, "আমরা জমিনকে বিস্তৃত করেছি, এতে পাহাড় এবং সব ধরনের উদ্ভিদ যথাযথভাবে পরিমাণ সহকারে সৃষ্টি করেছি"(সুরায়ে হজর ১৫ ঃ১৯)। সাইয়েদ কুতুব তার মুকাদ্দাসাতু তাসাববুর আল ইসলামেও উল্লেখ করেছেন এ ধরণী পূর্ব পরিকল্পিতভাবে তৈরি করা হয়েছে এবং প্রকৃতির প্রতিটি স্পন্দন আচরণ স্বর্গীয় বিধান মতে নির্ভুলভাবে গণনা করা হচ্ছে। পবিত্র কোরানেও উল্লেখ রয়েছে এ সুন্দর পরিবেশকে উদ্দেশ্যহীনভাবে তৈরি করা হয়নি (সুরা আল মোমিনুন ঃ১৮ঃ১৬)।

ইসলাম প্রতিবেশ সংস্থান (Ecosystem) এর প্রতিটি উপাদানকে যথাযথভাবে সংরক্ষণ করার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে। এ ক্ষেত্রে মানুষের কর্মকাণ্ড কোন অবস্থাতেই কোন প্রকার জীব ও উদ্ভিদের ক্ষতির কারণ হতে পারবে না। অবশ্য টেকনিক্যাল বিবেচনায় যে কর্মকাণ্ড মানুষের কল্যাণে আসবে সে ক্ষেত্রে প্রাণী ও উদ্ভিদ আহরণ এবং ব্যবহার করা

www.nagorikpathagar.org

যাবে। তাই পবিত্র কোরানে উল্লেখ রয়েছে আল্লাহর সৃষ্টিতে কোন প্রকার অনাকাঙ্খিত পরিবর্তন সাধন করা যাবে না। পবিত্র কোরানে আরো উল্লেখ রয়েছে যে, "স্থল ও জলভাগে বিপর্যয়ের সৃষ্টি হয়েছে মানুষের নিজেদের কৃতকর্মের পরিণামের ফলস্বরূপ" (সূরা বাকারা ২ঃ২১১)।

Bangladesh States of Environment Report, ১৯৯৮ এর তথ্য অনুসারে ১৯৯৮ সালে বাংলাদেশের সমুদ্র উপকূলে কক্সবাজার থেকে চট্টগ্রাম পর্যন্ত মারাত্মক আকারে মাছ মড়ক দেখা দেয়। এ সময় বিরাট পরিমাণের বড় বড় মাছ মারা গেছে। ১৯৯৮ সালে বিরাট পরিমাণ ইলিশ মাছও ধরা পড়েছিল। বিশেষজ্ঞদের অভিমত, গভীর সাগরের পানি দূষণের ফলে মারাত্মক খাবারের অভাব দেখা দিয়েছিল বিধায় তারা উপকূলীয় এলাকায় চলে আসে। এ দূষণের কারণ পানির উত্তাপ বেড়ে যাওয়ার জন্য অথবা বিষাক্ত বর্জ্য ফেলার জন্য হতে পারে।

সামুদ্রিক পরিবেশের গুরুত্ব

সামুদ্রিক পরিবেশ বলতে সাগর, উপসাগর ও সমুদ্রকে বুঝায়। পৃথিবীর ৭০.৪ শতাংশ ব্যাপী সমুদ্র, যার ৯০ শতাংশের বেশির ভাগেই পানি। তাই পৃথিবীর সব প্রাণীর অস্তিত্ব রক্ষায় সমুদ্রের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ সমুদ্রের বিশাল আকার স্রোত স্থলভাগের বিরাট পরিমাণ উচ্ছিষ্ট (waste) কে পানিতে মিশিয়ে তরল করে দেয়। সমুদ্রের অন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা হল পৃথিবীর জলবায়ুকে (climate) নিয়ন্ত্রণ করা, সূর্যের তাপকে সমুদ্রের স্রোতের এবং পৃথিবীর hydrological cycle এর অংশ হিসেবে বাষ্পীয়করণের মাধ্যমে বিতরণ করে। এ ছাড়াও সমুদ্র লোহা, বালি, ফসফেট, ম্যাগনেসিয়াম, তেল, প্রাকৃতিক গ্যাস ও অন্যান্য জৈব ও অজৈব প্রাকৃতিক সম্পদের ভাণ্ডার। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কোরানে উল্লেখ রয়েছে, "তিনিই তোমাদের জন্য নদী সমুদ্রকে নিয়ন্ত্রণ করে দিয়েছেন। উহা থেকে তাজা গোশত আহরণ করতে পারো এবং সৌন্দর্য শোভার এমন জিনিস তোমরা বের করে দিবে যা তোমরা পরিধান করতে পার। তোমরা দেখিতেছ যে, নৌকা জাহাজ নদী সমুদ্রের বুক দীর্ণ করে চলে। এসব এজন্য যে, তোমরা তোমাদের প্রভুর মহাঅনুগ্রহ সন্ধান করে লইবে" (সূরা নহল ১৬:১৪)।

সমুদ্রে প্রধান দুইটি প্রাণী সম্পদের জোন রয়েছে। এদের একটি উপকূলীয় জোন অন্যটি খোলা সমুদ্রের জোন। উপকূলীয় জোন সাধারণতঃ উষ্ণ পুষ্টিসমৃদ্ধ অগভীর জলধার যা ক্রমান্বয়ে গভীরতর সমুদ্রের দিকে সম্প্রসারিত।

উপকূলীয় এলাকা সমুদ্রের দশ শতাংশ এলাকায় সমুদ্রের নব্বই শতাংশ প্রাণীর আবাসস্থল। সেখানে সর্ববৃহৎ বাণিজ্যিক মৎস্য সম্পদ আহরণ করা হয়। উপকূলীয় জলাভূমি (coastal wetlands) গুলো যা সমুদ্রের মোহনা পর্যন্ত সম্প্রসারিত সেগুলোও প্রাকৃতিক সম্পদের ভাণ্ডার।

www.nagorikpathagar.org

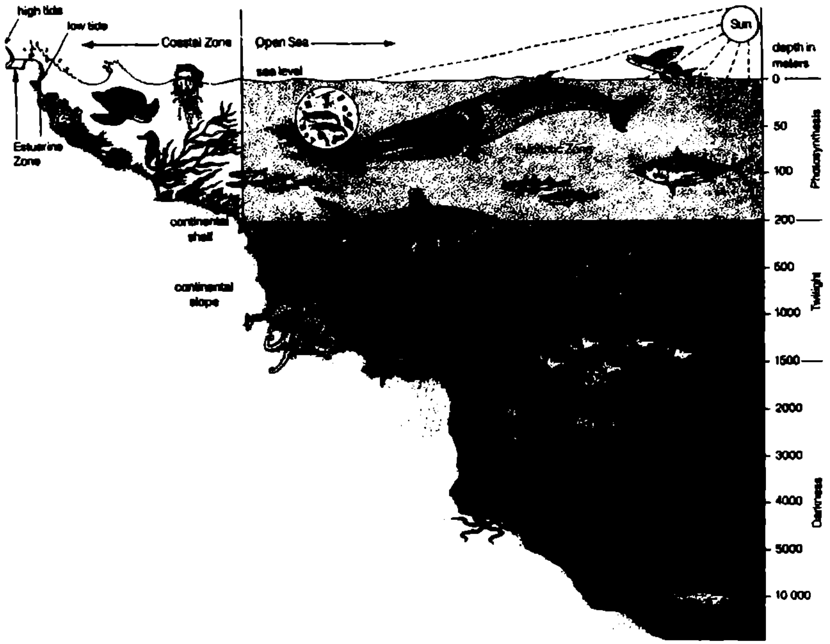

চিত্র ৪.১ : সামুদ্রিক জীববৈচিত্র্যের খাদ্যচক্র

উৎস : T. Miller, 1993

এ সব এলাকায় রয়েছে বিভিন্ন প্রজাতির ঘাস, সবুজ তৃণলতা এবং ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট। ট্রপিক্যাল কোস্টাল এলাকাগুলোতে লবণ পানি, সোয়াম্প ফরেস্ট অঞ্চলে পঞ্চান্নটি প্রজাতির গাছপালা রয়েছে। বাংলাদেশের সোয়াম্প ফরেস্টে একরপ্রতি সর্বোচ্চ নেট প্রাথমিক উৎপাদনশীলতা (Net Primary Productivity) রয়েছে। ইন্দোনেশিয়া, ব্রাজিল, অস্ট্রেলিয়া ও নাইজেরিয়াতে পৃথিবীর সর্ববৃহৎ ম্যানগ্রোভ সোয়াম্প ফরেস্ট রয়েছে। তন্মধ্যে বাংলাদেশের সুন্দরবন অন্যতম।

বঙ্গোপসাগরের মৎস্য সম্পদ ও এর অর্থনৈতিক গুরুত্ব

বাংলাদেশের রফতানি বাণিজ্যে এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নে মৎস্য সম্পদের গুরুত্ব অপরিসীম। বঙ্গোপসাগরে আমাদের একান্ত অর্থনৈতিক অঞ্চলে যে চিংড়ি ও মৎস্য ভাণ্ডার রয়েছে তা প্রতিবছর কয়েকশ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রার যোগান দিয়ে থাকে। বঙ্গোপসাগরের ১,২০,০০০ বর্গকিলোমিটার সামুদ্রিক এলাকা বাংলাদেশের অর্থনৈতিক পরিমণ্ডলভুক্ত দেশের সমুদ্র সীমায় মৎস্য সম্পদ আহরণের উদ্দেশ্যে ১৯৫৮ সাল থেকে আজ পর্যন্ত আন্তর্জাতিক, দ্বিপক্ষীয় এবং জাতীয় পর্যায়ে বহুসংখ্যক জরিপ কার্য সম্পাদিত হয়েছে। কিন্তু একের পর

www.nagorikpathagar.org

এক জরিপকার্য হয়েছে কেবল গভীর তলদেশীয় মাছের তথ্যানুসন্ধানের জন্য। তাই কেবল তলদেশীয় মাছ ছাড়া উপরিস্তরের (পেলাজিক) মাছ বা চিংড়ি সম্পদের ব্যাপ্তি, পরিধি এমনকি, অবস্থান সম্পর্কে প্রয়োজনীয় পরিমাণ তথ্য প্রদানকারী জরিপের সংখ্যা ছিল নিতান্তই নগণ্য।

মৎস্য সম্পদ একটি জীবিত ও সদা পরিবর্তনশীল নবায়নযোগ্য সম্পদ। এটি তেল বা কয়লার মত খনিজ পদার্থ নয়। তাই নিয়মিত আহরণ না করলে প্রাকৃতিক কারণেই সম্পদের অপচয় হবে এবং মোট সম্পদ হতে বিয়োগ হতে থাকবে।

চিত্র ৪.২ ঃ লবণচাষীদের মাঠে উৎপাদিত লবণ বিক্রি করতে না পারায় দুরবস্থা

অন্যদিকে যেহেতু এই সম্পদ নবায়নগযোগ্য, তাই টেকসই (sustainable) ভাবে ব্যবহার করতে পারলে অনন্তকাল ধরে মূল্যবান সম্পদের যোগান দিয়ে যেতে পারে এবং উত্তরোত্তর রাষ্ট্রীয় আয় বৃদ্ধিতে উল্লেখযোগ্য অবদানও রাখতে পারে। কিন্তু বৈজ্ঞানিক ধ্যান-ধারণা বর্জিত অপরিকল্পিত আহরণ প্রক্রিয়ার ফলে পৃথিবীর অনেক সাগর এমনভাবে মৎস্যশূন্য হয়ে গেছে যেখান থেকে প্রত্যাবর্তনের আর কোন পথই খোলা থাকেনি। অন্যদের অভিজ্ঞতা থেকে আমরা এ শিক্ষা লাভ করতে পারি, বিজ্ঞানভিত্তিক ব্যবস্থাপনা এ ক্ষেত্রে কেবল গুরুত্বপূর্ণ নয় বরং অপরিহার্য এবং সম্পদের সংরক্ষণ এবং উৎপাদন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে অত্যাবশ্যক। এ ছাড়া আমাদের সামনে আর কোন বিকল্প নেই।

বাংলাদেশ সমুদ্র সীমায় কি পরিমাণ মাছের মজুদ আছে এবং তার কতটুকু আহরণযোগ্য তা নিয়ে বিতর্কের শেষ নেই। ১৯৫৮ সাল হতে এ যাবৎ বিভিন্ন দেশ ও আন্তর্জাতিক সংস্থার সহযোগিতায় সময়ে সময়ে বঙ্গোপসাগরে খণ্ডকালীন যে সমস্ত জরিপকার্য সম্পাদিত হয়েছে তাতে তলদেশীয় মাছের মজুদের হিসাবে ৫০,০০০ থেকে ৪,০০,০০০ টন পর্যন্ত ব্যবধান পরিলক্ষিত হয়। তবে এটা আশাব্যঞ্জক যে, সম্প্রতি অনুষ্ঠিত তিনটি জরিপের ফলাফলে যথেষ্ট মিল রয়েছে। ১৯৭৮-৭৯ সালে নরওয়ের গবেষণা জাহাজ ডঃ ফ্রিডজিফ নানসেন জরিপে ১,৬০,০০০ টন, ১৯৮১-৮৩ সালে বাংলাদেশের গবেষণা জাহাজ অনুসন্ধানীর জরিপে ১,৫২,০০০ টন এবং একই জাহাজের ১৯৮৪-৮৬ সালের (জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার পরিচালনায়) জরিপে ১,৫৭,০০০ টন তলদেশীয় মাছের মজুদ দেখানো হয়েছে।

www.nagorikpathagar.org

অদ্যাবধি সামুদ্রিক উপরিস্তরের জন্য মৎস্য সম্পদের শ্রেণীবিন্যাস ও মজুদের পরিমাণ নির্ণয় সম্পর্কে তেমন কোন নির্ভরযোগ্য জরিপকার্য সম্পাদন হয়নি। তবে ১৯৭৮-৭৯ সালে ডঃ ফ্রিডজিফ নানসেন জরিপে একুয়েস্টিক পদ্ধতির মাধ্যমে সমুদ্রের উপরিস্তরের মাছের মজুদের পরিমাণ ৬০,০০০-১২০,০০০ টন নিরূপণ করা হয়। কিন্তু উক্ত পদ্ধতির ব্যবহারিক সীমাবদ্ধতার কারণে উল্লিখিত মজুদের পরিমাণ কম নিরূপণ (under estimate) হবার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে বলে ধারণা করা হয়। পূর্বে তলদেশীয় মাছের ওপর যে সমস্ত জরিপকার্য সংঘটিত হয়েছে বিশেষ করে বাংলাদেশ-থাই যৌথ জরিপে বাংলাদেশের একান্ত অর্থনৈতিক এলাকায় উপরিস্তরের মাছ যেমন টুনা জাতীয় মাছের প্রাচুর্যতা বিদ্যমান বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

সামুদ্রিক চিংড়ি সম্পদের মজুদের ওপর বেশকিছু প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে। তবে অদ্যাবধি যে সকল জরিপ প্রতিবেদনের ফলাফল পাওয়া যায় তাতে বিভিন্ন সূত্রের মজুদ নির্ধারণের পরিমাণে ব্যাপক পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। বিভিন্ন জরিপে হিসাব অনুযায়ী মজুদের পরিমাণ ১,০০০-৯,০০০ টন। তবে চিংড়ি সম্পদের মজুদের ওপর কোন তথ্যই বিতর্কের উর্ধ্বে নয় বলে বিশেষজ্ঞগণ অভিমত প্রকাশ করেন।

দেশীয় জীববিদগণ কর্তৃক কতিপয় বাণিজ্যিক গুরুত্বপূর্ণ চিংড়ি ও মাছের জীবন প্রবাহের (Population dynamics) ওপর সংগৃহীত বিভিন্ন তথ্য বিশ্লেষণ এবং সম্পদের মজুদ জরিপের মাধ্যমে সহনশীল পর্যায়ে সম্পদের আহরণযোগ্য ফলনের হিসাব নির্ণয় করা হয়েছে। তাদের জরিপের মাধ্যমে প্রতীয়মান হয় যে, অগভীর ও গভীর সমুদ্র এলাকা হতে বার্ষিক ৪,০০০ হতে ৫৫,০০০ মেট্রিক টন তলদেশীয় মাছ এবং ৭,০০০ হতে ৮,০০০ মেট্রিক টন চিংড়ি সর্বোচ্চ সহনশীল পর্যায়ে আহরণযোগ্য, যা আদৌ অনুসরণ করা হয় না।

বাংলাদেশ অন্যান্য নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলীয় দেশের মতোই মিশ্র প্রজাতির চিংড়ি ও মাছের আবাসস্থল। তলদেশীয় মাছের জাল দ্বারা বিভিন্ন জাতীয় মাছ ও চিংড়ি আহরণ করা হয়েছে। সমুদ্রের গভীরতার তারতম্যভেদে এদের ব্যাপ্তি, বিস্তৃতি, প্রাপ্যতা ও ঘনত্ব সম্পর্কযুক্ত। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সম্পদের বিবরণ নিম্নে প্রদান করা হলো।

প্রধান আহরিত চিংড়ি প্রজাতিসমূহ ঃ উপকূলীয় এলাকায় অধিকাংশ চিংড়ি ক্ষুদ্র মৎস্যজীবী ও ট্রলার বহর দ্বারা আহরিত হয়ে থাকে। এটা অতি গুরুত্বের সাথে লক্ষণীয় বিষয় যে, ট্রলার বহর দ্বারা অধিকাংশ চিংড়ি বা মাছ তাদের জীবনচক্রের অপ্রাপ্ত বয়সে ধরা হয়। চিংড়ি ও অন্যান্য মাছ যখন তাদের জীবনচক্রের কিশোর ও অপ্রাপ্ত বয়সে মোহনাঞ্চলে অতিবাহিত করে তখন ধরা পড়ে। অন্যান্য প্রজাতির মধ্যে রয়েছে বাগদা, চাগা/সাদা, বাঘা চামা/সাদা, বাদামি/লালিয়া/হরিণা, রুডা/পিংক। চিংড়ি প্রজাতির মধ্যে (Penaeus

www.nagorikpathagar.org

monodon) (বাগদা) এর মূল্য স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে বেশি থাকায় এর বাণিজ্যিক আহরণে সকলের আগ্রহ সর্বাধিক। চিংড়ির বাজার মূল্যের অধঃক্রম অনুসারে প্রজাতিগুলোকে সাজানো হয়ে থাকে। তবে হরিণা চিংড়ির (M. monoceros) মোট উৎপাদনে সর্বোচ্চ পরিমাণ (৬৩%) অবদান রাখে। আহরিত মৎস্য প্রজাতির মধ্যে তলদেশীয় ও অগভীর মোহনাঞ্চলের মাছের প্রাধান্য বেশি। অদ্যাবধি সাধারণতঃ ১০০ প্রজাতির অধিক তলদেশীয় মাছ শনাক্ত ও আহরণ করা হয়েছে। তন্মধ্যে সর্বাধিক বাণিজ্যিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ বা উল্লেখযোগ্য পরিমাণে আহরিত প্রজাতিগুলোর নাম হলো ঃ ফলি চান্দা, রূপ চান্দা, সাদা দাতিনা, রাঙ্গা চইক্ক্যা, ইলিশ, লাক্ষা, ছুরি, কাঁটা মাছ, রূপা পোয়া, লাল পোয়া, রূপবান, সোনালী বাটা, আচিলা, চইক্ক্যা, দারকুটা, কামিলা।

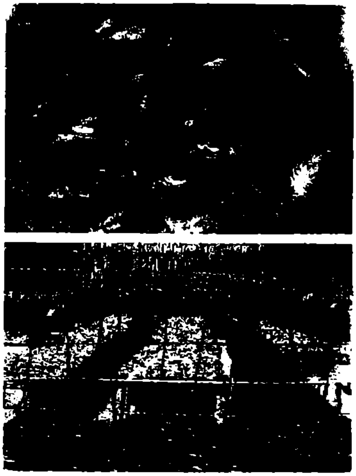

চিত্র ৪.৩ : উপকূলে মাছ ও চিংড়ি দেশের চাহিদা মিটায় ও বিদেশে রপ্তানী হয়

অনাহরিত/আহরণযোগ্য সম্পদ ঃ উল্লিখিত প্রজাতি ছাড়াও আরও অনেক প্রজাতির মৎস্য সম্পদ বাংলাদেশের সমুদ্রে বিদ্যমান, সেগুলো এখনও আহরণ সম্ভব হয়নি বা আহরিত হলেও তা বটম ট্রল, চিংড়ি ট্রল বা ফাঁস জালে বাইক্যাচ হিসাবে বা আকস্মিকভাবে ধরা পড়ে। এই প্রকার সম্পদ প্রধানতঃ সমুদ্রের উপরিস্তরেই বিদ্যমান। যেমন ঃ ম্যাকরাল (চাপা কাড়ি, মইটা, চম্পা) টুনা ও স্কিপজ্যাক (বামমাইটা)। এ ছাড়াও চার প্রজাতির সারডিন সাত/আট প্রজাতির কুপিডস, চার প্রজাতির লবস্টার, তিন প্রজাতির সেফালোপড, তের প্রজাতির হাঙ্গর এবং তের প্রজাতির ক্যারাস্ট্রিড এর অন্তর্ভুক্ত।

আর্টিসেনাল মৎস্য ক্ষেত্রেও ডিমারসাল ও চিংড়ি ট্রলিং এ উত্তরোত্তর প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। অনেক ট্রলার ও নৌকা/জাল মাছ ধরতে নামার জন্য অপেক্ষমাণ রয়েছে। অথচ উল্লিখিত পেলাজিক মৎস্য সম্পদ পুরোপুরি অপচয় হচ্ছে। এদের আহরণের কোন প্রচেষ্টাই নেওয়া হয়নি। এর প্রধান কারণ সম্পদের বিস্তার, বিস্তৃতি, মজুদের পরিমাণ ও আহরণযোগ্য সম্পদের হিসাব সম্পর্কিত জরিপ ও অনুসন্ধানমূলক কাজের এবং লাভ সম্ভাব্যতা পরীক্ষা-নিরীক্ষা প্রতিবেদনের অভাব। বস্তুতঃ আমাদের দেশে কারিগরী জ্ঞানের অভাব। এ অভাব পূরণ করে এ সম্পদের আহরণ যথাযথভাবে করতে পারলে জাতির জন্য প্রোটিন ও বৈদেশিক মুদ্রা দুই-ই যোগান দেয়া সম্ভব হবে।

www.nagorikpathagar.org

গভীর সমুদ্রে ট্রলার দ্বারা আহরণ ঃ গভীর সমুদ্রে মাছ ও চিংড়ির বাণিজ্যিক আহরণ শুরু হয় সত্তরের দশকে। পরবর্তীতে আন্তর্জাতিক বাজারে চিংড়ি চাহিদা ও উচ্চমূল্যে গভীর সমুদ্রে চিংড়ি আহরণকে উৎসাহিত করে এবং আমাদের মহীসোপান এলাকায় চিংড়ি আহরণ লাভজনক প্রমাণিত হওয়ার ফলে ট্রলারের সংখ্যা অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে যায়।

সামুদ্রিক মৎস্য জরিপ ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন প্রকল্পের অধীনে সংগৃহীত তথ্য বিশ্লেষণের এক প্রতিবেদনে তলদেশীয় মাছের মজুদ ১০-১০০ মিটার গভীরতা পর্যন্ত ১,৬১,৭৬০ টন এবং ১০০-২০০ মিটার গভীরতা পর্যন্ত ২৭,২৩০ টন। চিংড়ি মজুদের পরিমাণ ৩,৫০০টন ও বার্ষিক সর্বোচ্চ সহনশীল পর্যায়ে আহরণযোগ্য ফলন (MSY*) ৭,০০০-৮,০০০ টন নিরূপণ করা হয়। এ ছাড়াও সাগরের মজুদ চিংড়ির মধ্যে বাগদা চিংড়ি ১৭%, হরিণা চিংড়ি ৬৪.৪৫%, সাদা চিংড়ি ২.১৩% এবং ছোট চিংড়ি ১৫.৪২% বলে প্রতীয়মান হয়। গভীর মহীসোপান অঞ্চল ট্রলার দ্বারা সে সকল প্রজাতির চিংড়ি ও মাছ আহরিত হচ্ছে তাদের অধিকাংশই পরিপক্ব এবং বয়োপ্রাপ্ত। তবে ইদানীং কখনো ৪০ মিটারের কম গভীরতায়ও ঐ সকল ট্রলার দ্বারা মৎস্য শিকার করা হয় যার ফলে অপ্রাপ্ত বয়স্ক চিংড়ি ও মাছ ধরা পড়ে।

বিভিন্ন জালের ব্যবহারের দ্বন্দ্ব ঃ সামুদ্রিক মৎস্য অধ্যাদেশ-৮৩ অনুযায়ী ক্ষুদ্র মৎস্যজীবী সম্প্রদায় কর্তৃক আর্টিসেনাল জাল দ্বারা সমুদ্রে মহীসোপান অঞ্চলের ৪০ মিটার গভীরতা পর্যন্ত মৎস্য আহরণের জন্য সংরক্ষিত রাখা হয় এবং অধ্যাদেশ অনুযায়ী উক্ত সংরক্ষিত এলাকায় ফিশিং ট্রলার দ্বারা মৎস্য আহরণ নিষিদ্ধ করা হয়। কিন্তু কোন কোন এলাকায় বিশেষ করে সাউথ প্যাচের গ্রাউন্ডে এ ট্রলার দ্বারা ৩০ মিটার গভীরতায়ও মৎস্য আহরণ করা হচ্ছে।

এ অগভীর এলাকায় ট্রলার বহরগুলির সাথে ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীদের একই প্রজাতির মাছ বা চিংড়ি শিকারের জন্য প্রতিযোগিতা হয় না, কারণ ৩০ মিটার ও ৪০ মিটার গভীরতায় ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীগণ তলদেশীয় মৎস্য আহরণ করে না। কিন্তু অত্র এলাকায় ক্ষুদ্র মৎস্যজীবী ও ট্রলার বহরের মধ্যে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয় যখন ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীগণ ভাসমান ফাঁস জাল দ্বারা এই গভীরতায় কিংবা ৪০ মিটারের বেশি গভীরতার সমুদ্রের উপরিস্তরের বিশেষ করে ইলিশ মাছ আহরণ করে। এর ফলে ভাসমান ফাঁসজাল ট্রলার বহরের প্রপেলারের সাথে পেঁচিয়ে যায়। এতে ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীদের বিশেষ ক্ষতি হয় এবং পাশাপাশি ট্রলার বহরের মৎস্য আহরণে বাধাগ্রস্ত বা অসুবিধার সম্মুখীন হয়। তবে এর মধ্যে মূলতঃ ট্রলার বহরই দায়ী।

ট্রলার বহর দ্বারা উৎপাদন ঃ সমুদ্রের গভীরতম এলাকা হতে গত কয়েক বছরের সংগৃহীত উপাত্ত বিশ্লেষণের মাধ্যমে দেখা যায় যে, চিংড়ির মোট বাৎসরিক উৎপাদন ৪০০০ থেকে ৬০০০ মেট্রিক টন। এই হিসাব প্রকৃত ফলাফল হতে কিছুটা কম বলে প্রতীয়মান হয়।

সমুদ্রের গভীরতম এলাকা হতে গত কয়েক বছরের উৎপাদনের ওপর ট্রলার বহর কর্তৃক প্রদত্ত পরিসংখ্যান অনুযায়ী সাদা মাছ আহরণের পরিমাণ ছিল ৪,০০০ থেকে ১২,০০০

* MSY = Maximum Sustainable Yield

www.nagorikpathagar.org

মেট্রিক টন। এই উৎপাদন সর্বমোট আহরিত/ধৃত মাছের সমষ্টি নয়, কেবল ল্যান্ডিং মাত্র। কারণ চিংড়ি ট্রলার বহর দ্বারা আহরিত/ধৃত মাছের এক বিরাট অংশ ট্রাস ফিশ হিসেবে সাগরে ফেলে দেওয়া হয়। এক হিসাবে দেখা যায় যে, বাৎসরিক ৩৫,০০০ থেকে ৪,০০০ মেট্রিক টন সাদা মাছ ট্রাস ফিশ হিসেবে সাগরে ফেলে দেওয়া হয় (হোয়াইট এবং খান ১৯৮৫)।

যদি ডিসকার্ডেড ফিশ (ট্রাস) মোট উৎপাদনের হিসেবে যোগ করা না হয় তবে ট্রলার বহর দ্বারা আহরিত মাছের পরিমাণ মোট সামুদ্রিক উৎপাদনের ৫ ভাগের বেশি হবে না। ট্রাস ফিশকে হিসাবে আনলে সাদা মাছের উৎপাদন প্রায় ৫০ হাজার টন।

উপকূলীয় বনাঞ্চলের গুরুত্ব

উপকূলীয় এরাকায় সাধারণত ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল গড়ে উঠে। ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল সমুদ্র তীরকে ক্ষয় থেকে রক্ষা করে এবং টাইফুন, ঘূর্ণিঝড়, হ্যারিকেন, সুনামি ও সিডর থেকে উপকূলীয় সম্পদ ও প্রাণীকুলকে রক্ষা করে। ট্রপিক্যাল ও সাব-ট্রপিক্যাল এলাকার উপকূলে বিরাট পরিমাণে প্রবাল রয়েছে, যেখানে বিলিয়ন বিলিয়ন ছোট ছোট প্রবাল প্রাণী ও উদ্ভিদ সম্পদ রয়েছে। এ প্রাণী সম্পদও উদ্ভিদজগতের খাদ্য চক্রে (Food web) গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। তাছাড়া এসব প্রাণী ও উদ্ভিদ দ্বারা জীবজগতের প্রাণ রক্ষায় বিভিন্ন প্রকার ঔষধ তৈরি করা হয়ে থাকে। বাংলাদেশের ম্যানগ্রোভও পৃথিবীর অন্যতম বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ বনরাজি। এখানে রয়েছে চিরসবুজ বনরাজি এবং মৎস্য সম্পদের বিশাল প্রজনন ভূমি। এ ছাড়াও এ বনাঞ্চলের প্রধান সুবিধাদি যেমন উপকূলীয় সম্পদ ও প্রাণীর জীবন রক্ষায় মাছের খাদ্য সরবরাহের উৎস কেন্দ্র, চিংড়ি চাষের বিরাট ক্ষেত্র, ঘরবাড়ি ও বাণিজ্যিক গৃহস্থালির কাঠ সরবরাহের উৎস এবং প্রকৃতির লীলাভূমি হিসেবে বিনোদন কেন্দ্র।

পূর্বে দক্ষিণ টেকনাফ নদী থেকে দক্ষিণ-পশ্চিমে রাইমঙ্গল নদী পর্যন্ত উপকূলীয় এলাকায় বাংলাদেশের ম্যানগ্রোভ বনরাজি বিস্তৃত। বাংলাদেশের ম্যানগ্রোভ বনরাজিকে তিনটি অংশে ভাগ করা যায়। সুন্দরবন, চকোরিয়া এবং অন্যান্য উপকূল বেষ্টনী বনরাজি। চকোরিয়া সুন্দরবন কক্সবাজার জেলার ৭,৫০০ হেক্টর ম্যানগ্রোভ বন। মাতামুহুরী নদীর বদ্বীপের কেন্দ্রীয় অংশ পর্যন্ত এ বনাঞ্চল বিস্তৃত। পৃথিবীর অন্যতম বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ সুন্দরবন। এ বনাঞ্চলের মোট এলাকার ৫,৭১,৫০৮ হেক্টরের ভিতর ১,৬৯,৯০৮ হেক্টর নদী খাল ইত্যাদি। সরকার সুন্দরবনের বিভিন্ন প্রাকৃতিক সম্পদ থেকে প্রতি বছর প্রায় ১৫০ থেকে ২০০ মিলিয়ন টাকা রাজস্ব পেয়ে থাকে। গড়ে প্রতিদিন ৫৪ হাজার লোক সুন্দরবনে কাজ করে। ১৯৮৪ সালের জরিপের (সল্টার, ১৯৮৪) তথ্য অনুসারে ৩২ প্রকার স্তন্যপায়ী প্রাণী সুন্দরবনে ছিল বলে জানা যায়। তার মধ্যে ৪ প্রজাতি - জ্যাভান বাইনোসার / বাইনোসেরোরা (সান্তাইকাস) বুনো মহিষ (বুবালস দুইবালিস) জলা হরিণ (সরভাস) ডুভেকালি এবং হগডিয়ার (এক্সিস পোরসিনাস) এ শতাব্দীর শুরুর দিকেই বিলুপ্ত হয়ে

www.nagorikpathagar.org

গেছে। স্তন্যপায়ী প্রাণীর সাধারণ একটি পরিসংখ্যানে দেখা যায়, আশি হাজার হরিণ, তিন শত পঞ্চাশটি বাঘ, চল্লিশ হাজার বানর, বিশ হাজার ভোঁদড় এবং বিশ হাজার বুনো শূকর। এ ছাড়াও তিন শত পঞ্চাশ প্রজাতির পাখি, পঁয়ত্রিশ প্রজাতির সরীসৃপ, আট প্রজাতির ব্যাঙ এবং অন্ততঃ একশত বিশ প্রজাতি মাছ রয়েছে (পরিবেশ অধিদপ্তর, ১৯৯২)।

সমুদ্র দূষণের উৎস

চার দশক ধরে বাংলাদেশের সমুদ্র দূষণ মারাত্মক অবস্থার দিকে যাচ্ছে ক্রমান্বয়ে। এর মূল কারণগুলো হচ্ছে দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি, দ্রুত শিল্পায়ন। কারণ বেশির ভাগ শিল্প কারখানার অবস্থানই সমুদ্র উপকূলে অবস্থিত। দ্রুত শিল্পায়নের ফলে দ্রুত আবর্জনার ভলিউম ও পরিমাণ (তরল অথবা সলিড) ক্রমান্বয়ে বাড়ছে। প্রথাগতভাবে এসব আবর্জনা (waste) সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত করা হয়। এভাবে আবর্জনা নিমজ্জিত করা হলে ব্যক্তিগতভাবে কোন আর্থিক সংশ্লেষ থাকে না। এভাবে পরবর্তীকালের সমস্যা ও ক্ষতির পরিমাণের কথা বিবেচনা না করে সমুদ্রের জীববৈচিত্র্যসহ অন্যান্য প্রাকৃতিক দৃশ্য ও সম্পদকে ধ্বংস করা নৈতিকতার পরিপন্থী (unethical), ধর্মবিরোধী এবং নীতি বিবর্জিত কাজ। সমুদ্র দূষণের কারণ ও উৎস অনেক, তবে প্রধান কারণগুলোর মধ্যে রয়েছে জাহাজ থেকে ফেলা তেল, যা পরিবেশের জন্য সবচেয়ে জটিল সমস্যা। শিল্প এলাকার বর্জ্য ও নদীবাহিত পদার্থ দ্বারা দূষিত হয় বাংলাদেশের চট্টগ্রাম ও খুলনা বন্দরগুলো যা মূলতঃ তেল দ্বারা দূষিত হয়। চট্টগ্রাম বন্দরে প্রতি বৎসর এক হাজারের বেশি জাহাজ আসে এবং পঞ্চাশ / ষাটটির বেশি তেলবাহী জাহাজ এবং মংলা বন্দরে ছয় শতেরও বেশি জাহাজে মালামাল খালাস ও তোলা হয়। এ ছাড়া পরিসংখ্যান নেই এমন হাজার হাজার ছোট-বড় নৌযান নিয়মিত সমুদ্রের পানি প্রবাহে চলাফেরা করে স্বেচ্ছায় ও অনিচ্ছায় পানিতে তেল ফেলে। বন্দর এলাকাগুলোতে তেলবাহী জাহাজগুলোতে তেল সরবরাহকালে ও সরবরাহ যন্ত্রের ঐ কারণে তেল পানিতে মিশে থাকে। এ ছাড়াও প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে তেলের জাহাজ ডুবে যেতে পারে বা দুর্ঘটনায় তেলবাহী জাহাজ অন্য কোন জাহাজের সাথে সংঘর্ষ লেগে ডুবে যেতে পারে।

প্রাকৃতিক দুর্যোগ

প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ১৯০৩ সালে প্রথম থেকেই চকোরিয়া সমুদ্র বনকে রিজার্ভ বন হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছিল। গত ৯০ বৎসরের ক্ষয়ক্ষতির তথ্যের অভাব রয়েছে। তবে ১৯৯১ সালে ঘূর্ণিঝড়ের দৃশ্য নিঃসন্দেহে লোমহর্ষক। সে সময় এক লক্ষ চল্লিশ হাজার লোকের প্রাণহানি ঘটে এবং লক্ষকোটি টাকার সম্পদ বিনষ্ট হয়। সাম্প্রতিক সিডর, সুনামি ও নার্গিসে বাংলাদেশসহ অন্যান্য আঞ্চলিক দেশের উপকূলীয় এলাকায় মারাত্মক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে যা অবর্ণনীয়। এসবের ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণও দুঃসাধ্য ব্যাপার।

পরিবেশ/১১—

www.nagorikpathagar.org

সেন্টমার্টিনের প্রবাল ও শৈবাল

বঙ্গোপসাগরে অবস্থিত সেন্টমার্টিন দ্বীপ দেশি-বিদেশি পর্যটকদের কাছে একটা আকর্ষণীয় স্থান। দেশের এই একমাত্র প্রবাল দ্বীপটি থেকে এখন নির্বিচারে উত্তোলন করা হচ্ছে প্রবাল, শৈবাল ও ঝিনুক। এক পর্যায়ে সরকারিভাবে নিষেধাজ্ঞা জারি করায় উৎপাদন কিছুদিন বন্ধ থাকলেও আবার নির্বিচারে আহরণ শুরু করা হয়েছে। কিন্তু বর্তমানে পাচারকারীরা রাতের অন্ধকারে দ্বীপের দক্ষিণাংশের ছিরাদিয়া সংলগ্ন সাগরের তলদেশ থেকে প্রবাল ও শৈবাল উত্তোলন করে চলেছে। পরিবেশ পত্রের জানুয়ারি-মার্চ/০৪ এক প্রতিবেদনে দেখা যায় যে, টেকনাফ সীমান্তে শাহপরীর দ্বীপের এক ব্যক্তির মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে এই পাচারকারী সিন্ডিকেট। সেন্টমার্টিন থেকে উত্তোলিত মূল্যবান প্রবাল শাহপরীর দ্বীপের বদরমোকাম এলাকায় মজুদ করছে পাচারকারীরা।

চিত্র ৪.৪ : সেন্টমার্টিনে শৈবাল দ্বীপ

সুন্দরবন ঃ পরিবেশ সম্পদ ও মানুষ

সুন্দরবনের নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে অনেক মতামত রয়েছে। সুন্দরবনে সুন্দরী নামে এক প্রজাতির গাছ অনেক পরিমাণে দেখা যায়। এজন্য এই বনকে সুন্দরবন বলে। নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে এটাই প্রবল মত।

আবার অনেকের মতে এটা সমুদ্রবন শব্দের অপভ্রংশ, সাধারণ লোকে সমুদ্র বলতে সমুন্দর বলে থাকে। আবার অনেকের মতে বাখরগঞ্জ জেলার সুন্ধা নদী হতে সুন্দরবনের নামের উৎপত্তি হয়েছে। বাখরগঞ্জের সভ্যতা ও প্রতিভা এই সুন্ধার কূলেই প্রথম বিকশিত হয়েছিল। এই কূলবর্তী বনভাগ সুন্দারবন বা সুন্দরবনে পরিণত হয়েছে।

কথিত আছে, ইংরেজ আমলের বহু পূর্বে বিদেশী পর্যটকরা সুন্দরবন দর্শনে সুন্দরবনকে Jungle of Sundry Tress নামে অভিহিত করতেন। 'সানড্রি' অর্থাৎ নানা প্রকার, এই সানড্রি শব্দ হতে পরে জঙ্গলের নাম হয়েছে সুন্দরবন।

www.nagorikpathagar.org

বৃটিশরা এদেশের শাসন গ্রহণের পর থেকে সুন্দরবনের আয়তন ক্রমশ কমতে থাকে। ১৭৬৫ সালে কলকাতা ও খুলনা শহরের নিকটে সুন্দরবনের অবস্থান ছিল। রাজস্ব আয় বাড়ানো ও জীবজন্তুর হাত থেকে রক্ষার জন্য ১৭৭০ সালে কালেক্টর জেনারেল কড রাসেলের সময় থেকে সুন্দরবন প্রথম চাষের জন্য ইজারা দেয়া শুরু হয়। এ সময় বনের কোন সীমানা ছিল না। বন কেটে আবাদ করার জন্য ইজারা গ্রহণ করতেন জমিদাররা।

১৭৮০ সালে কিছু এলাকায় জঙ্গল সাফ করে আবাদ ভূমিতে রূপান্তরিত করা হলো। ১৭৮৩ সালে যশোরের তৎকালীন জর্জ ও কালেক্টর টিলম্যান হেংকেল এর আগ্রহে সুন্দরবনের সীমানা নির্ধারিত হয়। ১৭৮৫ সালে হেংকেল বনের ছোট ছোট জমি ১৫০ জনকে লীজ দেন। হেংকেলের এই তৎপরতায় বন নিধনের সাথে সাথে আবাদি জমি বাড়তে থাকে। ১৮১১-১৪ সালে লেফটেনেন্ট ডাবলু ই মরিশন সমগ্র সুন্দরবন এলাকা জরিপ কাজ করেন। মরিশনের ভাই ক্যাপ্টেন হিউজ মরিশন ১৮১৮ সালে এই জরিপ শেষ করেন। এ সময় একটি আংশিক ম্যাপও তৈরি করেন মরিশন ভ্রাতৃদ্বয়।

১৮২৩-২৪ সালে মরিশন ভ্রাতৃদ্বয়ের জরিপকৃত ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে সার্ভেয়ার টমাস প্রিন্সেপ সাহেব সুন্দরবনের প্রথম ম্যাপটি তৈরি করেন। ১৮৩০ সালে সুন্দরবনের প্রথম কমিশনার উইলিয়াম ড্যাম্পিয়ার ও জরিপ কর্মকর্তা লেঃ হজেস একটি সম্পূর্ণ ম্যাপ তৈরি করেন। ১৮১৭ সালে সুন্দরবন এলাকার জন্য জেলা কালেক্টরের ক্ষমতাসম্পন্ন পদ সৃষ্টি করা হয়। এই পদে সর্বপ্রথম নিয়োগ পান উইলিয়াম ড্যাম্পিয়ার। কলকাতার আলিপুরে সুন্দরবনের প্রথম দপ্তর স্থাপিত হয়।

পরবর্তীতে ১৮২৮ সালে উত্তরবঙ্গের ডুয়ার্স অঞ্চল ও দক্ষিণবঙ্গের সুন্দরবনকে ৩নং অস্থায়ী রেগুলেশন অনুযায়ী সরকারের আওতায় নেয়া হয়। ১৮৫৩ সালে অনাবাদি ও জঙ্গল এলাকা বিতরণের জন্য নতুন আইন করা হয়। ১৮৭৩ সাল নাগাদ আবাদের কাজে যথেষ্ট অগ্রগতি সাধিত হয়। সুন্দরবনের প্রথম বিভাগীয় কর্মকর্তা হিসেব দায়িত্ব পান এম ইউ গ্রিন।

সুন্দরবন এলাকার নদী

সুন্দরবনের বড় বড় নদীগুলো উত্তর থেকে দক্ষিণমুখী প্রবাহিত। পূর্ব দিকে বলেশ্বর পদ্মা থেকে মিষ্টি পানি নিয়ে সরাসরি বঙ্গোপসাগরে পড়েছে। পশুর থেকে একটি শাখা বের হয়ে উত্তরে লোকালয় থেকে সরাসরি সাগরে পড়েছে শলা নদী। সুন্দরবনের বাংলাদেশ অংশের মাঝ বরাবর ভাগ করেছে পশুর-শিবসার মিলিত প্রবাহ। মাইল বিশেক এগিয়ে আর একটি বড় নদী মালঞ্চ সাগরে পড়েছে। সর্ব পশ্চিমে রায়মঙ্গল নদী ভারত-বাংলাদেশের সীমা নির্ধারণ করেছে। বনসীমার দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর, উত্তরে লোকালয় কখনো নদী, কখনো খাল দিয়ে লোকালয় থেকে পৃথক হয়েছে।

গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা নদী ও উপনদী বিধৌত বাংলাদেশের এই ব-দ্বীপ এলাকার পশ্চিম কোণ ঘেঁষে এই বনের আরম্ভ। পূর্বে এই বন বলেশ্বর নদী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। পশুর এখানকার সবচেয়ে বড় নদী। শিবসা, আড়পাঙ্গাশিয়া, আড়ুয়াশিবসা, বলেশ্বর, ভোলা,

www.nagorikpathagar.org

বাংড়া, চালকী, চুনার, দোবেকী, ফিরিঙ্গি, মর্জাদ, আন্ধারমানিক, ডিংগিমারী প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য নদ-নদী সুন্দরবনের প্রায় ৩০ ভাগ এলাকা দখল করে আছে।

বনের গাছপালা

সুন্দরবনের গাছপালার বৈচিত্র্য ব্যাপক ও বিপুল। সুন্দরবনে সর্বমোট ২৫৪টি পরিবারের ৩৩৪ প্রজাতির ছোট-বড় বৃক্ষ, গুল্মলতা ও পরজীবী উদ্ভিদ পাওয়া যায়। এ পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্য মোতাবেক ১৩০টি সচরাচর দৃশ্যমান উদ্ভিদ প্রজাতি পাওয়া গেছে। সুন্দরবনের অর্থকরী প্রজাতির মধ্যে সর্বাগ্রে রয়েছে সুন্দরী। দ্বিতীয় প্রধান বৃক্ষ প্রজাতি হলো গেওয়া। বিশ্লেষণের সুবিধার্থে উচ্চতার মাপকাঠিতে এ সব বনকে নিম্নোক্তভাবে শ্রেণীকরণ করা হয়েছে।

প্রথম শ্রেণীর বন ঃ এখানে গাছের গড় উচ্চতা হবে ১৫.৩ মিটার অথবা এর চেয়ে বেশি।

দ্বিতীয় শ্রেণীর বন ঃ যে কোন গাছের উচ্চতা ১০.৭ মিটার হতে ১৫.৩ মিটার।

তৃতীয় শ্রেণীর বন ঃ যেখানে গাছের উচ্চতা হবে ৬.১ মিটারের নিচে।

গাছের মজুদ ও ঘনত্ব বিবেচনায় সুন্দরবনকে ৩টি অঞ্চলে বিভক্ত করা হয়।

(ক) মিষ্টি (স্বাদু) পানির অঞ্চল ঃ এখানে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর গাছের ভার এবং গাছের ঘনত্ব বেশি।

(খ) পরিমিত বা মৃদু লোনা পানির অঞ্চল ঃ এখানে রয়েছে তৃতীয় শ্রেণীর গাছ, ঘনত্ব কম।

(গ) তীব্র লোনা পানির অঞ্চল ঃ এখানে মূলত চতুর্থ শ্রেণীর গাছ ও অল্প সংখ্যক তৃতীয় শ্রেণীর গাছ রয়েছে।

মিঠা পানির বনাঞ্চল, মৃদু লবণাক্ত বনাঞ্চল ও তীব্র লবণাক্ত বনাঞ্চল

অবস্থান ঃ বনের উত্তর-পূর্বদিকে স্বাদু পানিযুক্ত বনাঞ্চল। বাগেরহাট জেলার প্রধান অঞ্চল নিয়ে অবস্থিত। খুলনার দক্ষিণে অবস্থিত মধ্যবর্তী অঞ্চলের বনাঞ্চল যা মৃদু লবণাক্ত বনাঞ্চল নামে খ্যাত। সাতক্ষীরা জেলায় অবস্থিত পশ্চিম-দক্ষিণে তীব্র লবণাক্ত বনাঞ্চল।

প্রধান বৃক্ষ ঃ সুন্দরী, গেওয়া, পশুর, কাঁকড়া, গোলপাতা প্রভৃতি। প্রধান বৃক্ষ ঃ সুন্দরী, গেওয়া, পশুর, ধুন্দল, ঝানা, কেওড়া, কাঁকড়া অধিক পরিমাণে জন্মে। প্রধান বৃক্ষ ঃ গেওয়া, গড়ান ও হেতাল বেশি জন্মে। এ অঞ্চলে সুন্দরী গাছের বৃদ্ধি একেবারেই কম।

(রূপান্তর, সুন্দরবন স্টাডি গ্রুপ, জুন, ১৯৯৯)

সুন্দরবনের এক বিশেষ সম্পদ হচ্ছে ছোট ছোট গাছ-গাছড়া ও গুল্মলতা। শুধু লোনা পানির এই জঙ্গলের ভিতর ও আশপাশেই দেখা যায় এসব গাছপালা। এগুলোর ভিতর আছে ঔষধি গুণসম্পন্ন অনেক রাসায়নিক দ্রব্য। এগুলোই হলো আসলে সুন্দরবনের রূপসী উর্বশী। ১২০ প্রজাতির বেশি হবে এগুলোর সংখ্যা। এগুলোর মধ্যে নোয়া লতা বা পানলতা, পরশপিপুল, গোলপাতা, হেতাল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

প্রতি বছর ৩.২ মিলিয়ন টনের অধিক উদ্ভিদপত্র জঙ্গলের তলদেশ পতিত হয়ে জোয়ারের প্লাবন দ্বারা সমুদ্রের মোহনায় জমা হয়ে সামুদ্রিক জীবের অন্যতম প্রধান খাদ্য সরবরাহকে

www.nagorikpathagar.org

নিশ্চিত করে। অন্যান্য অর্থকরী প্রজাতির মধ্যে রয়েছে গোলপাতা, গরান, বাইন, কাঁকড়া, ভাতকাটী, খলসি, কেওড়া, ওরা, পশুর, ধুন্দল, হেতাল, আমুর কিরপা, শিংড়া, ফানা, হুদো, ধানসি, বলা, হারগোজা, সুন্দরীতলা, নলখাগড়া প্রভৃতি।

সুন্দরবনে বন্যপ্রাণী

বিশ্বখ্যাত রয়েল বেঙ্গল টাইগার (Bengal Tiger Panthera tigris), চিত্রল হরিণ (Axis axis), ধারালো দাঁতের কুমির (Crocodylus Porosus) সুন্দরবনের ঐতিহ্য। চোরা শিকারী, মিষ্টি পানির অভাব, খাদ্যাভাব, ঝড়-জলোচ্ছ্বাসসহ বিভিন্ন কারণে এসব বন্যপ্রাণী হ্রাস পাচ্ছে।

বর্তমানে সুন্দরবন হতে ২ প্রজাতির উভচর, ১৪ প্রজাতির সরীসৃপ, ২৫ প্রজাতির পাখি এবং ৫ প্রজাতির স্তন্যপায়ী প্রাণী বিলুপ্তপ্রায়। বর্তমানে সুন্দরবন হতে বেশকিছু প্রাণী ও উদ্ভিদ বিরল প্রজাতিতে পরিণত হয়েছে এবং অনেকে হুমকির সম্মুখীন। সুন্দরবনের বুনো মহিষ, ব্রহ্মদেশীয় গণ্ডার, বারো শিংহা হরিণ বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

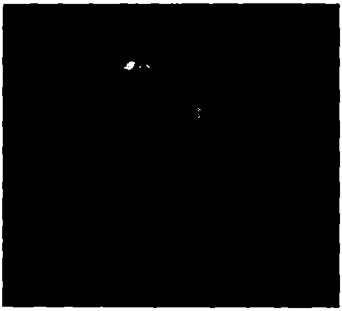

চিত্র ৪.৫ : সুন্দরবন বন্যপ্রাণীর আবাসস্থল

সুন্দরবনের মৎস্যসম্পদ

সামুদ্রিক এলাকার প্রাকৃতিক সম্পদের ভাণ্ডারের মধ্যে সুন্দরবনের মৎস্যসম্পদ অন্যতম। সুন্দরবন চিংড়িসহ কয়েকশত প্রজাতির মাছের আবাসস্থল। সুন্দরবনে ২৭ পরিবারের ৫৩ প্রজাতির (Species Pelagic) (সমুদ্র চর) মাছ, ৪৯ পরিবারের ১২৪ প্রজাতির (Demersal) (তলদেশবিহারী) মাছ, ৫ পরিবারের ২৪ প্রজাতির গলদা পাওয়া যায়। সুন্দরবন এলাকা থেকে মূলত ২ ধরনের মাছ আহরণ করা হয়। যেমন উপকূলবর্তী (Inshore) এলাকার মাছ ও উপকূল দূরবর্তী (offshore) এলাকার মাছ। খোলা নৌকায় করে ২ থেকে ৮ মিটার গভীরতায় সুন্দরবনে বার্ষিক মোট আহরণের এক-তৃতীয়াংশ মাছ আহরিত হয়। নদীর মোহনায় গভীর পানিতে offshore মাছ আহরিত হয়। প্রতি বছর অন্তত দুই/আড়াই লাখ মানুষ সুন্দরবনে মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহ করে থাকে। চিংড়ি পোনার ৮০ ভাগের উৎস সুন্দরবন। অতীতের যে কোন সময়ের তুলনায় এখানে মাছ শিকার বর্তমানে আশংকাজনকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। বেহুন্দি জাল (Set bag net), ইলিশা জাল (Hilsa Gill net) সহ বিভিন্ন ধরনের জাল দিয়ে বিভিন্ন প্রজাতির মাছ ও চিংড়ি ধরা হয়। এতে বিভিন্ন প্রজাতির ছোট মাছের বংশ নিশ্চিহ্ন হচ্ছে। বন ধ্বংসের অন্যতম অনুসঙ্গ হিসেবে মাছ শিকারকে চিহ্নিত করা যায়। বাগদা, গলদাসহ বিভিন্ন প্রকারের চিংড়ি ও ইলিশ

www.nagorikpathagar.org

মাছের প্রজনন ক্ষেত্র বা আবাসস্থল হিসেবে সুন্দরবনের সুখ্যাতি রয়েছে। বলেশ্বরের ইলিশ অত্যন্ত সুস্বাদু। সুন্দরবনের অন্যান্য মাছও খুবই সুস্বাদু ও আয়োডিনসমৃদ্ধ, এখানকার শুঁটকি মাছও বিখ্যাত। কিন্তু অনৈতিকভাবে আহরণের ফলে বিপুল মৎস্যসম্পদের ভাণ্ডার আজ বিপন্নপ্রায়। এ জন্যে প্রয়োজন মৎস্যসম্পদ সংরক্ষণে জনগণের অংশগ্রহণ এবং তাদের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও নৈতিকতা বোধ জাগিয়ে তোলা।

কর্মসংস্থানে সুন্দরবন

সম্পদে ভরা এই সুন্দরবনে প্রতিদিন ৫০ হাজার লোক কাজ করে। শীত মৌসুমে এ সংখ্যা বেড়ে যায় প্রায় দ্বিগুণ। কেউ কাঠ কাটে, কেউ মধু আহরণ করে। কেউ মাছ ধরে, গোলপাতা কাটে, শামুক কুড়ায় কেউ। আবার লাকড়িও কাটে অনেকে। শীতকালই বনে কাজের প্রধান মৌসুম। নভেম্বর-মার্চ গোলপাতা কাটার মৌসুম, জানুয়ারি-মার্চ গরান কাটার সময়, এপ্রিল-জুন মধু সংগ্রহ ও নভেম্বর-ডিসেম্বর ঝিনুক কুড়ানোর মৌসুম। মহাসম্পদশালী এ বন হতে সরকারের কোটি কোটি টাকার রাজস্ব আয় হয় প্রতি বছর। প্রতি ১০০ মণ গরানে রাজস্ব ৫০০ টাকা। গোলপাতার জন্য ৪০০ টাকা, যা বাজার মূল্যের চেয়ে অত্যন্ত কম বলে প্রতীয়মান হয়।

সুন্দরবন ব্যবহারকারীদের অধিকাংশই জেলে। আগে বেশি ছিল বাওয়ালী। মাছের সংখ্যা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে জেলের সংখ্যা বেড়েছে। 'বাগদা কালচার' তৈরি হওয়ার পর এদের সংখ্যা দ্বিগুণ হয়েছে। মৌসুমে প্রতি সপ্তাহে ৩০ হাজার নৌকা বাগদা পোনা ধরতে যায়। প্রতিদিন গড়ে ১০ হাজার জেলে মাছ ধরে সুন্দরবনে। তাছাড়া তারা এক বা দুই সপ্তাহান্তে বন থেকে বাড়ি ফিরে আসে। প্রতিবার বনে গিয়ে তারা নৌকার ছৈ তৈরি করে। আবার কাঠের নোঙর তৈরি করে। জেলেরা প্রতিদিন ৩ বার রান্না করে। এতে জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হয় ৫০ মেঃ টন শুকনা কাঠ। তাছাড়া অন্যান্য কাজেও প্রতিদিন হাজার হাজার গাছ কাটা হয়। ৫০০০ মৌয়াল প্রতি মৌসুমে সুন্দরবনে প্রবেশ করে। ২০০ মেঃটন মধু তারা সংগ্রহ করে। সাতক্ষীরা রেঞ্জ মধুর জন্য বিখ্যাত।

দেশের দক্ষিণ উপকূলীয় অঞ্চলের লাখ লাখ অধিবাসীর জন্য সুন্দরবন যেন এক মহারক্ষাকবচ। সাগর তটভূমির ষাট মাইল লম্বা একটানা সুন্দরবন সামুদ্রিক ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের ছোবল থেকে এ অঞ্চলের মানুষকে রক্ষা করে চলেছে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে। বিশ্ববিখ্যাত এই ম্যানগ্রোভ প্রাচীর না থাকলে দক্ষিণ উপকূলীয় জনপদ দুর্যোগমুক্ত রাখা অত্যন্ত কঠিন কাজ ছিল।

বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট ঘূর্ণিঝড়গুলো অধিকাংশই আঘাত হানে চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, কক্সবাজার উপকূলীয় এলাকায়। সুন্দরবনের কারণেই দক্ষিণ উপকূলীয় এলাকায় প্রাণহানি ও ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ অনেক কম হয়। চলতি শতকে দক্ষিণ উপকূলীয় সুন্দরবনে এ পর্যন্ত ১৭টি ঘূর্ণিঝড় আঘাত হানে। সুন্দরবনের বিশালত্বের কারণে এসব ঘূর্ণিঝড়ের আঘাতে উপকূলীয় অধিবাসীদের ক্ষয়ক্ষতি তেমন একটা হয়নি। বিশাল এই বনপ্রাচীর না থাকলে উপকূলীয়

www.nagorikpathagar.org

জনপদ এতোদিনে ঘূর্ণিঝড়ের তাণ্ডবে লণ্ডভণ্ড হয়ে পরিণত হতো বিরানভূমিতে। এ কারণেই সুন্দরবন যুগ যুগ ধরে বিবেচিত হচ্ছে প্রকৃতির ঢাল বা রক্ষাকবচ হিসেবে। তাই এ সম্পদকে রক্ষা করার জন্য দেশের আপামর জনগোষ্ঠীকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। জাগিয়ে তোলা প্রয়োজন তাদের সামাজিক দায়িত্ব ও নৈতিক মূল্যবোধকে।

সুন্দরবন নিধনের কারণ

চিত্র ৪.৬ : অপরূপ দৃশ্যে সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভ

এ দেশের সুন্দরবন পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ম্যানগ্রোভ অরণ্য হলেও এর স্বাভাবিক অস্তিত্ব আজ মারাত্মক হুমকির সম্মুখীন। এর প্রধান কারণ ইকোলজি বা প্রতিবেশ ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণকারী নিয়ামকসমূহের অবস্থার পরিবর্তন। যেসব কারণে সুন্দরবনের প্রাকৃতিক পরিবেশের দ্রুত অবক্ষয় ঘটছে এগুলো হলো : মিঠা পানির সরবরাহ হ্রাস, লবণাক্ততা বৃদ্ধি, পোল্ডার বা বেড়িবাঁধ নির্মাণ, পানি দূষণ, বনজসম্পদের অতিরিক্ত ও অপরিকল্পিত আহরণ ও ব্যবহার, ঘনঘন প্রাকৃতিক দুর্যোগ, উদ্ভিদের বিভিন্ন রোগের আক্রমণ, যেমন-টপডাইং সুন্দরী, সমুদ্রস্তরের উচ্চতা বৃদ্ধি, প্রশাসনিক দুর্বলতা ও টেকসই সংরক্ষণ ব্যবস্থাপনার অভাব, প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য প্রকৃতির মূল জেনেটিক বৈচিত্র্য সংরক্ষণের ও বিভিন্ন প্রাণী ও উদ্ভিদ-প্রজাতি ও বস্তুতন্ত্রের (Ecosystem) প্রয়োজনভিত্তিক সুষ্ঠু ব্যবহারের অভাব।

মিঠা পানির প্রবাহ হ্রাস ও সুন্দরবন অঞ্চলে পরিবেশগত প্রতিক্রিয়া

মিঠা পানির প্রাপ্যতা সুন্দরবনের বর্ধনকে প্রভাবিত করে। সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভ উদ্ভিদ প্রজাতিসমূহের বিন্যাস মিঠা পানির প্রাপ্যতা ও পরিমাণের ওপর ব্যাপকভাবে নির্ভরশীল। সুন্দরবনে মূলত দুটি উৎস হতে মিঠা পানি আসে ; নদীবাহিত মিঠা পানি ও স্থানীয় বৃষ্টির পানি। বৃষ্টির পানির প্রাপ্যতা জলবায়ুর ওপর নির্ভরশীল : অন্যদিকে নদীর পানি প্রবাহ স্থানীয় অববাহিকার বৈশিষ্ট্য, ভূমি ব্যবহার, ভূগর্ভস্থ পানি সঞ্চয় ও জলবায়ুর ওপর নির্ভরশীল। সুন্দরবন মিঠা পানির জন্য প্রধানত গঙ্গা (পদ্মা) ও তার বিভিন্ন শাখা নদীগুলোর ওপর নির্ভরশীল। কিন্তু সুন্দরবনের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত বেশ কিছু নদী ভৌগোলিক কারণে আর কিছু মানবসৃষ্ট হস্তক্ষেপের ফলে তাদের মাতৃনদী গঙ্গার সাথে সংযোগ হারিয়েছে। মানবসৃষ্ট হস্তক্ষেপের একটি নিদর্শন হল ফারাক্কা ব্যারেজ। ফারাক্কার কারণে সুন্দরবনসহ বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিম ও দক্ষিণ-পশ্চিম অংশে মিঠা পানির সরবরাহ ব্যাপক হ্রাস

www.nagorikpathagar.org

পেয়েছে। এছাড়াও বাংলাদেশের বিভিন্ন অংশে নদীর পানির প্রবাহ পথ পরিবর্তন করায় সুন্দরবনের পরিবেশে মারাত্মক ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হচ্ছে। এর মধ্যে একটি হল মধুমতি ও নবগঙ্গা নদীর 'হেলিফ্যাক্স কাট'।

লবণাক্ততা

সুন্দরবন সংলগ্ন উপকূলীয় অঞ্চলসহ পুরো উপকূলীয় এলাকায় লবণাক্ততা এক বিরাট সমস্যা। উপকূলীয় শহর খুলনায় এর বিরূপ প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষণীয়। সমুদ্রতল বৃদ্ধির ফলে অবস্থার আরো অবনতি হবে। মিঠা পানির প্রবাহে যে কোন প্রতিবন্ধকতা বা সমুদ্রতল বৃদ্ধির ফলে লবণাক্ত ঝুঁকির কারণ হবে এবং সুন্দরবনের অস্তিত্ব হুমকির সম্মুখীন হবে।

আমেরিকা ইন্টারন্যাশনাল ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানির (এ,আই, ই, কো) দুটি সমীক্ষায় (১৯৭৭ ও ১৯৮০) দেখা গেছে, মিঠা পানির পরিমাণ এবং পানিবাহিত পলি সুন্দরবনে মাটির উর্বরতা শক্তি ধরে রাখতে বিশেষভাবে কার্যকর। মিঠা পানি ও লবণাক্ততার পরিমাণের ওপর সুন্দরী গাছের বাণিজ্যিক কাঠের (৬৪%) বাঁচা-মরা নির্ভর করে। ইতোমধ্যে সুন্দরবনের পশ্চিমাঞ্চলে যেখানে মিঠা পানির স্বল্পতা ক্রমবর্ধমান, সেখানে পানির লবণাক্ততা বাড়ছে এবং সুন্দরী গাছের পুনর্জন্মের হার কমিয়ে দিচ্ছে।

ইংল্যান্ডের ওভারসিজ ডেভেলপমেন্ট এজেন্সির (ওডিএ) এক সমীক্ষায় দেখা যায়, সুন্দরবনের সব গাছগাছড়ার (সুন্দরী যার ভেতরে প্রধানতম প্রজাতি) ১৭% সাধারণ বা মারাত্মকভাবে আগা মরে যাওয়ায় আক্রান্ত। অন্যান্য কারণের বিষয় পুরোপুরি নিশ্চিত হতে না পারলেও আগা মরার সাথে লবণাক্ততার সম্পর্ক প্রায় নিশ্চিত। বর্তমান উপকূলীয় অঞ্চলে প্রায় ১৪ লক্ষ হেক্টর জমি লবণাক্ত অথবা লোনা পানির জোয়ার ভাটায় বৎসরের কিছু সময় বা সর্বক্ষণ ডুবে থাকে। জেলাওয়ারী হিসাবে দেখা যায়, লবণাক্ত মাটির পরিমাণ সর্বোচ্চ খুলনায় ৩ লক্ষ ৮০ হাজার হেক্টর। চাষযোগ্য লবণাক্ত জমির বাইরে রয়েছে সুন্দরবনের ৬ লক্ষ ২০ হাজার হেক্টর।

পোল্ডার বা বেড়িবাঁধ নির্মাণ

এখন পর্যন্ত দেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অংশে সুন্দরবনের উপর ১২৫টিরও বেশি পোল্ডার বা বেড়িবাঁধ নির্মাণ করা হয়েছে। এগুলো কৃষি জমিতে লবণাক্ততার অনুপ্রবেশ নিয়ন্ত্রণে ১৯৬০-৭০ এর মধ্যে নির্মাণ করা হয়েছে। এখন পর্যন্ত এ অঞ্চলে ৩৭০০ কিঃ মিঃ মাটির বাঁধ নির্মাণ করা হয় যা প্রায় ১৩ লক্ষ হেক্টর (১ হেক্টর=২.৪৭ একর) জমি ঘিরে রেখেছে। পোল্ডার নির্মাণ অনেক অংশে আবাদি জমিকে লবণাক্ত পানির হাত থেকে রক্ষা করেছে, কিন্তু নদীর দুই তীরে পোল্ডার নির্মাণের ফলে অনেক নদীতে দ্রুত অত্যধিক পলি পড়ে নদীর পানি প্রবাহের ধারা বদলে গেছে, বিশেষ করে সুন্দরবন অঞ্চলে। আর পানি প্রবাহের পরিবর্তিত ধারা সুন্দরবনের পরিবেশে মারাত্মক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করছে।

www.nagorikpathagar.org

সুন্দরবনের অনেক নদী বেড়িবাঁধ নির্মাণের সরাসরি প্রতিক্রিয়ার শিকার। অর্ধ শতক পূর্বের নাব্য অনেক নদীই বর্তমানে পলি পড়ে ভরাট হয়ে গেছে। ভদ্রা নদী সুন্দরবনের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে পশুর নদীতে প্রবেশ করেছে। কিন্তু বর্তমানে এ নদী অত্যন্ত দ্রুত পলি সঞ্চয়ের শিকার হচ্ছে এবং আশঙ্কা করা হচ্ছে, অদূর ভবিষ্যতে সুন্দরবন এ নদীর মাধ্যমে নদীর উপরের অববাহিকা অঞ্চলের সংযোগ হারাবে। সুন্দরবনের সীমান্তবর্তী আরেকটি নদী বর্ম যা পূর্ব দিকের মিঠাপানি সরবরাহকারী নদীগুলোকে পশুরের সাথে সংযুক্ত করেছে। কিন্তু এ নদী বর্তমানে পলি জমে পুরোপুরি ভরাট হয়ে গেছে। ফলে পূর্ব দিকের অনেক নদী পশুরের সাথে সংযোগ হারিয়েছে।

পানি দূষণের মাত্রা বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে এক সময় সীমিত থাকলেও সাম্প্রতিককালে মারাত্মক আকার ধারণ করেছে। এখানকার নদী তীরবর্তী বিভিন্ন শিল্পাঞ্চল থেকে সব ধরনের কল-কারখানার বর্জ্য কঠিন বা তরল আকারে বিভিন্ন নদীতে নিক্ষেপ করা হচ্ছে। আর এসব বর্জ্য সুন্দরবনের উপর দিয়ে বিভিন্ন নদী দিয়ে বঙ্গোপসাগরে পতিত হচ্ছে। সুন্দরবনের পরিবেশের ওপর দূষিত পানির প্রতিক্রিয়া নিয়ে তেমন কোন সমীক্ষা বা গবেষণা পরিচালিত হয়নি। তবু মারাত্মক দূষিত পানি সুন্দরবনের ইকোলজি বা পরিবেশগত ব্যবস্থায় মারাত্মক প্রভাব ফেলবে- একথা বলা যায় নিঃসন্দেহে।

বিশ্বঐতিহ্য ও সুন্দরবন

পৃথিবীতে এমন কিছু স্থান রয়েছে যা গুরুত্ব ও সৌন্দর্যের দিক থেকে অনন্য। এসব অনন্য স্থানগুলোকে তাই কোন একটি দেশ বা জাতির সম্পদ না ভেবে পুরো বিশ্ববাসীর সম্পদ হিসেবে গণ্য করা হয়। সঙ্গত কারণেই এসব স্থানের রক্ষার দায়িত্ব সকলের-বিশ্ববাসীর। পৃথিবীতে এমন সর্বজনীন স্থান রয়েছে ৫২২টি। বিশ্বের বহু পর্যটক প্রতি বছর এসব স্থান পরিদর্শন করে। ইউনেস্কোর তত্ত্বাবধানে পৃথিবীর সকল দেশের রাষ্ট্র প্রতিনিধিদের নিয়ে ১৯৭২ সালে ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে "Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage" শীর্ষক এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনের উদ্দেশ্য ছিল পৃথিবীর গুরুত্বপূর্ণ সাংস্কৃতিক ও প্রাকৃতিক ঐতিহ্যগত স্থানগুলো সম্মিলিত প্রচেষ্টায় রক্ষা করার আধুনিক বৈজ্ঞানিক উপায় খুঁজে বের করা।

সকল রাষ্ট্র প্রতিনিধি ঐ সম্মেলনে একটি বিষয়ে একমত হন যে,

(ক) সকল রাষ্ট্র তাদের গুরুত্বপূর্ণ স্থানসমূহ চিহ্নিতপূর্বক তা সংরক্ষণের ব্যবস্থা করবে যাতে ভবিষ্যতে এই সম্পদ হতে বিশ্ববাসী বঞ্চিত না হয় (ধারা-৪)।

(খ) একাধিক রাষ্ট্র সম্মিলিতভাবে ঐ স্থানসমূহ সুষ্ঠু পরিকল্পনা সাপেক্ষে সংরক্ষণের জন্য লোক নিয়োগ করবে এবং প্রয়োজনীয় নৈতিক, বৈজ্ঞানিক, প্রযুক্তিগত, প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। সেই সাথে বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত গবেষণা চালাবে (ধারা-৫)

www.nagorikpathagar.org

(গ) প্রত্যেক রাষ্ট্র তার জাতীয় ঐতিহ্যময় স্থানের তালিকা ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ কমিটির কাছে হস্তান্তর করবে এবং কমিটি উক্ত তালিকা থেকে যথাযোগ্য স্থানগুলো নির্বাচিত করে ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ তালিকার অন্তর্ভুক্ত করবে (ধারা ৮-১১)

(ঘ) আগ্রহী বিভিন্ন রাষ্ট্র বা সংস্থার কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করে ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ ফান্ড প্রতিষ্ঠিত হবে (ধারা-১৫)

(ঙ) যে কোন রাষ্ট্র তার তালিকাভুক্ত স্থানের সম্পদ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে অন্য রাষ্ট্রের সহযোগিতা চাইতে পারবে। এই সহযোগিতা বিশেষজ্ঞ আদান-প্রদান, প্রশিক্ষণ, গবেষণার উপকরণ বা আর্থিক ঋণ প্রদানের মাধ্যমে হতে পারে (ধারা ১৯-২২)

জাতিসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি বিষয়ক সংস্থা (ইউনেস্কো) ৬ই ডিসেম্বর '৯৭ ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ কমিটির ২১তম অধিবেশনে সুন্দরবনকে হেরিটেজ সাইট বা 'বিশ্বসম্পদ' হিসেবে ঘোষণা করেছে। এই ঘোষণার মধ্য দিয়ে পৃথিবীর ৫২২টি বিশ্ব ঐতিহ্যের মধ্যে সুন্দরবনের নাম অন্তর্ভুক্ত হলো। এটা বাংলাদেশের জন্য গর্বের বিষয়। মোট ৫ লক্ষ ৭৭ হাজার ২৮৫ হেক্টর আয়তনের এই উপকূলীয় জলাবন বা ম্যানগ্রোভ ফরেস্টে এর তিনটি অভয়ারণ্য (কটকা-কচিখালী, নীলকমল ও সুন্দরবন পশ্চিম) মিলে সুন্দরবন (পূর্ব), সুন্দরবন (পশ্চিম) এবং সুন্দরবন (দক্ষিণ) এর মোট ১ লক্ষ ৩৯ হাজার ৭০০ হেক্টর বা ১৪ শত বর্গ কিঃ মিঃ এলাকা ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট হিসেবে ঘোষিত হয়েছে। বিশ্বসম্পদ এলাকার জমির পরিমাণ ১৪০০ বর্গ কিঃ মিঃ। ৯ শত ১০ বর্গ কিঃ মিঃ ভূমি এলাকা ও ৪৯০ বর্গ কিঃ মিঃ জলজ এলাকা।

সার্বিক দিক বিবেচনায় একথা বলা যায়, নৈসর্গিক দৃশ্যের লীলাভূমি সুন্দরবন বিশ্বঐতিহ্য ঘোষণায় বাঙালির সংস্কৃতি ও জীবনধারায় স্বকীয়তা আরো বিকশিত হবে। সুন্দরবনের ঐতিহ্যকে অক্ষুণ্ন রেখে এর আস্বাদন দেশবাসী ও বিশ্ববাসীর কাছে তুলে ধরতে হবে। এই সুন্দরবনের খ্যাতি বিশ্বব্যাপী। এটা শুধু আমাদের একার গর্ব নয়- এটা সমগ্র বিশ্বের গর্ব। তাই এই শ্লোগানই আজ বাস্তবসম্মত হবে- শুধু সংরক্ষণ নয়, সমৃদ্ধির মাধ্যমে সুন্দরবনকে বাঁচাতে হবে। প্রাকৃতিক ও মনুষ্য সৃষ্ট কারণে অপরূপ সৌন্দর্যের এই সুন্দরবন ধ্বংস হচ্ছে। আগামরা রোগের ব্যাপক বিস্তারসহ জগৎবিখ্যাত রয়েল বেঙ্গল টাইগার ও কুমিরের অস্তিত্ব আজ হুমকির মুখে।

সুন্দরবনের এই সংকটজনক অবস্থা উত্তরণের লক্ষ্যে বন সম্পর্কে সাধারণ মানুষের অজ্ঞতা, অশিক্ষা ও মূল্যবোধের পরিবর্তন করে তাদের সচেতন করে তুলতে হবে। বন বিভাগের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের দায়িত্বশীলতা সম্পর্কে সরকারের পাশাপাশি জনসাধারণকে আরো সম্পৃক্ত করতে হবে। এ ছাড়াও বন পরিকল্পনা, ব্যবস্থাপনা এবং মালিকানায় স্থানীয় তৃণমূল জনসাধারণকে সম্পৃক্ত করতে হবে। সেক্ষেত্রে জনগণই হবে বনসৃজন, সংরক্ষণের অতন্দ্র প্রহরী। একথা অনস্বীকার্য যে, 'বন বাঁচলে আমরা বাঁচবো। বাঁচবে বাংলাদেশ।'

www.nagorikpathagar.org

এই সুন্দরবন সারা পৃথিবীতে তুলনাহীন। সম্পদে, প্রাচুর্যে, বৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ এই বনভূমি। এসব আমাদের গৌরব, গর্বের ধন। বিশ্ববিখ্যাত এই বন কেবল এই দেশের সম্পদ নয়, এটা বিশ্বেরও সম্পদ। আমরা নিজেরা যত্নশীল হলে নবায়নশীল সম্পদ শত হাজার বছরেও নষ্ট হবে না। এ সম্পদের গৌরবময় সৌন্দর্য অক্ষুণ্ন রাখার জন্য আমাদের অঙ্গীকারবদ্ধ ও দায়িত্ব সচেতন হতে হবে। সার্বিকভাবে একথা আজ প্রমাণিত সত্য যে, আমাদের জীবনের প্রশ্নে, বেঁচে থাকার প্রশ্নে, অস্তিত্বের প্রশ্নে বনভূমির গুরুত্ব অপরিসীম। তাই কবিগুরুর সেই বিখ্যাত কবিতার চরণটি এখানে অত্যন্ত সময়োপযোগী যা না বললেই নয়-

"দাও ফিরে সে অরণ্য, লহ এ নগর
লও যত লৌহ লোষ্ট্র কাষ্ঠ ও প্রস্তর
হে নব সভ্যতা।"

ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত নীতিমালা ঃ বাংলাদেশের সমুদ্রসীমায় সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদের ব্যবস্থাপনা সংরক্ষণ ও উন্নয়নের জন্য সরকার ১৯৮০ সনে দি মেরিন ফিশারিজ অর্ডিন্যান্স (১৯৮৩ সনের ৩৫ নং অর্ডিন্যান্স) জারী-করতঃ তদানীন্তন দি মেরিন ফিশারিজ রুলস ১৯৮৩ প্রণয়ন করা হয়। উক্ত অর্ডিন্যান্সের আওতায় মৎস্য অধিদপ্তরের অধীনে মেরিন ফিশারিজ উইংকে চট্টগ্রাম থেকে সমুদ্রে গমনকারী ট্রলার বহর ও অন্যান্য জালের লাইসেন্স ও ব্যবহারযোগ্যতা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সাথে আলোচনা সাপেক্ষে শিল্প মন্ত্রণালয়কে ফিশিং ট্রলার ক্রয় করার জন্য সম্প্রতি ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। উক্ত অধ্যাদেশ এর ১২ ধারাতে মৎস্য অধিদপ্তরকে ১৫০ মেট্রিক টন বা তদূর্ধ্ব ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন ফিশিং ট্রলারের লাইসেন্স প্রদানের সুযোগ রাখা হয়েছে।

আর্টিসেনাল ফিশারিতে নিয়োজিত ১০ মেঃ টন এর নিম্নে ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন কোন যান্ত্রিক নৌকাকে লাইসেন্স প্রদান করা হয় না এবং তাদের মৎস্য আহরণ তদারকিও মৎস্য বিভাগ কর্তৃক পরিচালিত হয় না। বাংলাদেশ সরকারের মার্কেন্টাইল মেরিন বিভাগ কর্তৃক তাদের নিবন্ধীকরণ করা হয়।

উন্নয়ন বৈষম্য ঃ কোস্টাল জোন পলিসির প্রয়োগ ও ব্যবহার

বাংলাদেশে উপকূলীয় অঞ্চল একটি বৃহৎ স্থানজুড়ে থাকলেও এতদিন এ অঞ্চলের প্রতি বিশেষ কোন নজর পড়েনি সরকারের। খোঁজ নিয়ে জানা যায়, সরকার বিভিন্ন সময়ে উপকূলীয় এলাকার স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি নিয়ে বেশ কিছু পলিসি নির্ধারণ করেছে। পলিসিগুলো হচ্ছে- পরিবেশ নীতি (১৯৯২), জাতীয় বন নীতি (১৯৯৪), পশুসম্পদ উন্নয়ন নীতি (১৯৯৮), জাতীয় মৎস্য নীতি (১৯৯৬), জাতীয় গ্রাম উন্নয়ন নীতি (২০০১), জাতীয় শিক্ষানীতি (১৯৯৭), নারী উন্নয়ন নীতি (১৯৯৮), জাতীয় পানি নীতি (১৯৯৯), জাতীয় কৃষি নীতি (১৯৯৯), শিল্প নীতি (১৯৯৯), জাতীয় নৌ পরিবহন নীতি (২০০০), ভূমি ব্যবহার

www.nagorikpathagar.org

নীতি (২০০২), স্বাস্থ্য নীতি (২০০০), জ্বালানী নীতি (১৯৯৬), নিরাপদ পানি সরবরাহ ও পানি নিষ্কাশন নীতি (১৯৯৮), জাতীয় পর্যটন নীতি (১৯৯২)।

এসব পলিসি পৃথকভাবে উপকূলীয় উন্নয়নের দাবি করলেও সামগ্রিক অর্থে উপকূলীয় উন্নয়নের জন্য তেমন কোন বিশেষ গুরুত্ব পায়নি। ফলে উন্নয়নের গতিও ত্বরান্বিত হচ্ছে না। তবে একটি কোস্টাল জোন পলিসি তৈরির জন্যে ইন্টিগ্রেটেড কোস্টাল জোন ম্যানেজমেন্ট (আইসিজেডএম) নামের একটি প্রতিষ্ঠান কাজ করেছে বেশ কয়েক বছর ধরে। তারা ইতিমধ্যে একটি পলিসি তৈরি করেছে। বিভিন্ন জেলায় স্থানীয় জনসাধারণের সাথে আলোচনা ও মতবিনিময় করে এ নীতিটি তৈরি করা হয়েছে। এ পলিসিটি হচ্ছে উপকূলীয় অঞ্চল নীতি (২০০৫)।

উপকূলীয় অঞ্চল নীতিমালা ২০০৫ এর অনুচ্ছেদে (৪:৪) প্রাকৃতিক সম্পদের টেকসই ব্যবস্থাপনার কথা বলা হয়েছে। সেগুলো হলো -

(ক) উপকূলীয় অঞ্চল ও বঙ্গোপসাগরে মিলিত সব নদীর প্রয়োজনীয় পানি প্রবাহ নিশ্চিতকরণ।

(খ) উপকূলীয় অঞ্চলের কৃষি, বনায়ন ও মৎস্য চাষের সম্মিলিত ও যৌথ কর্মকাণ্ড নিশ্চিতকরণ।

(গ) জনগণের অংশ নিশ্চিতকরণ।

অনুচ্ছেদ ৪:৪(১ক) ভূমি ব্যবহার বিষয়ে যথাসময়ে এলাকাভিত্তিক ভূমি ব্যবহার কৌশল প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন নিশ্চিতকরণ। তাছাড়া পানি, প্রাকৃতিক মৎস্যসম্পদ কৃষি, পশুপালন, বনায়ন, শক্তি ইত্যাদি নিশ্চিত করা।

নীতিমালাটি বাস্তবায়নের জন্য Integrated Coastal Zone Management প্রক্রিয়া বাস্তবায়নের ভিত্তি হিসেবে কাজ করা।

উপকূলীয় অঞ্চল নীতিমালা ২০০৫ অত্যন্ত সময়োপযোগী কিন্তু তা বাস্তবায়নের জন্য অ্যাকশন প্রোগ্রাম ও কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের কাজ এখনো বাকি।

সামুদ্রিক পরিবেশ সংরক্ষণে ধর্মীয় বিধান

আল্লাহর সৃষ্টির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান সমুদ্র, যার ওপর পৃথিবীর সব প্রাণী ও উদ্ভিদ জগতের অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নির্ভরশীল যেমন খাদ্য চক্রের (Food web) মাধ্যমে স্পষ্টভাবে বুঝা যায় কিভাবে সমুদ্রের পানি বাষ্পীকরণের মাধ্যমে প্রাকৃতিক সম্পদকে আল্লাহ মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন।

তাছাড়া সমুদ্রের পানি বাষ্পীকরণের মাধ্যমে বৃষ্টিপাত হয়। বৃষ্টিপাতের মাধ্যমেই আল্লাহ সব প্রাণী ও উদ্ভিদের জীবনকে সতেজ রাখে। তাই সমুদ্র দূষণের অর্থ হবে আল্লাহর সৃষ্টির অস্তিত্বের প্রতি হুমকি সৃষ্টি করা। এ ধরনের ধ্বংসাত্মক ও ক্ষতিকারক কর্মকাণ্ডের বিষয়ে

www.nagorikpathagar.org

পবিত্র কোরআনে উল্লেখ রয়েছে, "মানুষ তাদের দ্রব্যে ক্ষতিগ্রস্ত করে দিও না এবং জমিনে ফ্যাসাদ সৃষ্টি কর না যখন এর সংশোধন ও সংস্কার সম্পূর্ণ হয়েছে"(সুরা আল আ'রাফ ৭ঃ৮৫)। এমনিভাবে যে ব্যক্তি বা গোষ্ঠী পরিবেশ দূষণের মাধ্যমে মানুষের তথা কোন প্রাণী বা কোন জীবনের ক্ষতিসাধন করে তাদের বিষয়ে পবিত্র কোরানে উল্লেখ রয়েছে, "আর যেসব লোক মোমেন পুরুষ ও স্ত্রীলোকদিগকে বিনা অপরাধে কষ্ট দেয়, তারা অতিবড় মিথ্যা দোষ ও সুস্পষ্ট গুনাহের বোঝা নিজেদের মাথায় চাপিয়ে নিয়েছে" (সুরা আল আহ্‌জাব ৩৩ঃ৫৮)।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে এ কথা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, যাদের অসতর্কতার জন্য তেল সমুদ্রে পড়ে এবং যারা সমুদ্রের প্রাণী ও উদ্ভিদের প্রতি গুরুত্ব না দিয়ে নির্বিচারে সমুদ্রে শিল্প বর্জ্য ত্যাগ করে অথবা অন্যান্য বর্জ্য ত্যাগ করে যা সামুদ্রিক প্রাণী ও উদ্ভিদকে ক্ষতি করে, পবিত্র কোরআনে তাদের হত্যাকারী বলা হয়েছে। তেল নির্গমন ও শিল্প বর্জ্য সমুদ্রকে কিভাবে দূষিত করে এবং তা প্রাণী ও উদ্ভিদকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কিভাবে ক্ষতি করে তা পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে। পবিত্র কোরআনে বর্ণিত রয়েছে, "যদি কেউ খুনের পরিবর্তে কিংবা জমিনে ফ্যাসাদ সৃষ্টি করা ছাড়া অন্য কোন কারণে কাউকে হত্যা করে, সে যেন সমস্ত মানুষকে হত্যা করল। আর যদি কেউ কাউকে জীবন দান করে তবে সে যেন সমস্ত মানুষকে জীবন দান করল" (সুরা মায়েদা ৫ঃ৩২)। পরিশোধন ব্যতিরেকে শিল্প বর্জ্য সমুদ্রে ত্যাগের ফলে সমুদ্রের পানি দূষিত হয়ে যায়। যার ফলে সমুদ্রের প্রাণী ও উদ্ভিদের জীবননাশের কারণ হয়ে এ অবস্থা সৃষ্টি হয় বিশেষ করে যখন শিল্পোন্নত দেশগুলো তাদের শিল্প বর্জ্য অনুন্নত দেশের সমুদ্র এলাকায় ত্যাগ করে। এমন কিছু ঘটনা ঘটেছে যখন জেনওবিয়া নামক জাহাজ লেবাননের সমুদ্র সীমানায় (১৯৮৮) ২,৪০০ টন বিপজ্জনক বর্জ্য ত্যাগ করে। অনুরূপ অন্য একটি ঘটনা ঘটেছিল যখন নাইজেরিয়ার কোকো বন্দরে ৫টি ইটালিয়ান জাহাজ বিষাক্ত শিল্প বর্জ্য ত্যাগ করে। এমন আরো একটি ঘটনা ঘটেছিল, আজমান জালরী জাহাজ কর্তৃক। এ জাহাজটি ইউনাইটেড আরব আমিরাতে এর উপসাগরীয় এলাকায় ১৯৮৯ সালে কয়েকশ ব্যারেল বিপজ্জনক বিষাক্ত বর্জ্য ত্যাগ করে গিয়েছিল, এরই প্রতিক্রিয়া হিসেবে ১৯৯৩ সালে আরব আমিরাত এলাকায় ব্যাপক মাছ মড়ক দেখা দিয়েছিল। এভাবে স্পষ্টতঃই প্রতীয়মান হচ্ছে যে, উন্নত দেশ শিল্প বর্জ্য ত্যাগ করে অনুন্নত দেশের জনজীবন ও পরিবেশকে বিষিয়ে তুলেছে। এসব অপকর্ম থেকে বিরত থাকার বিষয়ে পবিত্র হাদিসে উল্লেখ রয়েছে "অন্যকে ক্ষতি করো না এবং নিজের ক্ষতি হতেও দিবে না"(ইবনে মাজা)। পানিতে পেশাব ও পঙ্কিলতা ত্যাগ না করার জন্য ইসলাম বিশেষভাবে নির্দেশ দিয়েছে (যা নর্দমার অপরিশোধিত পানির সাথে তুলনাযোগ্য)। এ নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কে দুইটি প্রসিদ্ধ হাদিস উল্লেখযোগ্য। "তিনজন অভিশপ্ত ব্যক্তি থেকে সতর্ক থেকো যে পানিতে আবর্জনা ত্যাগ করে, যে ছায়াতে এবং জনপথে মলমূত্র ত্যাগ করে"(আবু দাউদ)।

www.nagorikpathagar.org

বোখারী শরীফের অন্য হাদিসে উল্লেখ রয়েছে, কেহ যেন পানিতে পেশাব না করে এবং এর থেকে পরিচ্ছন্নতা অর্জন করে"। তিরমানীতে উল্লেখ রয়েছে, এমনকি চলমান পানিতেও যেন কেউ পেশাব না করে।

উপরোক্ত হাদিসগুলো থেকে আরো স্পষ্ট হয়ে যায় "অন্যের ক্ষতি করো না এবং নিজের ক্ষতি করতে দিও না" (ইবনে মাজা)। এমতাবস্থায় পরিবেশ বিষয়ক সবার জ্ঞান থাকা উচিত যে, সমাজের প্রতিটি সদস্য যেন সম্যকভাবে অবগত থাকে যেন তার কর্মকাণ্ডের ফলে পরিবেশ কতটুকু ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং সে নিজে কতটুকু ক্ষতিগ্রস্ত হয় সে সম্পর্কে যেন অবহিত হতে পারেন। আল্লাহ মানুষ ও তার কল্যাণে সৃষ্ট সৃষ্টি জগৎকে সতেজ ও সজীব রাখার জন্য আকাশ থেকে বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ করে থাকেন। অথচ মানুষের অপরিণামদর্শী কর্মকাণ্ডের ফলে যখন বৃষ্টির পানির উৎস দূষিত হয়ে যায় তখন বিশুদ্ধ পানির পরিবর্তে নেমে আসে দূষিত পানি যা বিপন্ন করে সৃষ্টির সকল প্রাণী উদ্ভিদের জগৎকে। যাদের কর্মকাণ্ডে জীবজগতের এসব প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঘটে তাদের স্মরণ করিয়ে দিয়ে আল্লাহপাক বলেছেন- "এবং তিনিই স্বীয় রহমতের আগে আগে বাতাসকে সুসংবাদ পাঠিয়ে দিয়ে থাকেন। পরে আসমান থেকে পরিচ্ছন্ন পানি নাযেল করেন"(সুরা আল ফুরকান ২৫:৪৮)।

সমুদ্র সমীক্ষায় দেখা গেছে, পানির pH পরিবর্তনের ফলে মৎস্যসম্পদ মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। pH যদি ৪.৫ এর নিচে যায় তাহলে সমুদ্র বা লেকের প্রায় ৭০% মাছ মারা যেতে পারে। নিউহেমোস্পেয়ার বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৮৫ সালের এক সমীক্ষায় দেখেছে যে, এসিড বৃষ্টির ফলে স্যালমন মাছ সমুদ্রের গভীরে থাকার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে যেখানে তারা ডিম ছাড়ে এবং ইনকিউবেশান প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়। এর ফলে স্যালমন মাছের বৃদ্ধি মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়। প্রাণী ও উদ্ভিদ জগতের এরূপ প্রক্রিয়া প্রসঙ্গে পবিত্র কোরানে উল্লেখ করা হয়েছে, "যেন একটি মৃত অঞ্চলকে এর সাহায্যে জীবনদান করেন এবং স্বীয় সৃষ্টি লোকের বহু জন্তু জানোয়ার ও মানুষকে সিক্ত পরিতৃপ্ত করে দেন" (সুরা আল-ফুরকান ২৫:৪৯)।

আমাদের মূল্যবান সামুদ্রিক ও উপকূলীয় পরিবেশকে সংরক্ষণের জন্য আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও সমঝোতাভিত্তিক ব্যবস্থাপনা প্ল্যান তৈরি করা প্রয়োজন। ইতিমধ্যে সুন্দরবনকে বিশ্ব হেরিটেজ এলাকা ঘোষণা করা হয়েছে। এ বিষয়ে যে বিরাট পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে, তা অত্যন্ত সুনিপুণভাবে বাস্তবায়ন করা যেতে পারে। এ ক্ষেত্রে দক্ষ জনশক্তি নিয়োগ ও উন্নত কৌশল প্রয়োগের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। প্রাকৃতিক সম্পদ ধ্বংসের কারণগুলো চিহ্নিত করে প্রচলিত আইন কানুন প্রয়োগের পাশাপাশি ধর্মীয় বিধান সম্বন্ধে জনগণের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে। এভাবে প্রচলিত নীতি, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধকে পরিবেশ ও প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণে কাজে লাগানো যেতে পারে।

www.nagorikpathagar.org

উপসংহার

আমাদের দেশের টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়নে উপকূলীয় সম্পদের গুরুত্ব অপরিসীম। যেমন ব্যবসা-বাণিজ্য, প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণ, মৎস্য, বন বিশেষত সুন্দরবনের তাৎপর্য শুধু স্থানীয় পর্যায়েই গুরুত্বপূর্ণ নয়, এ সম্পদের গুরুত্ব বিশ্ববাসীর কাছেও অসীম। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে এ দেশের উপকূলীয় সম্পদ ও জনগোষ্ঠী মারাত্মক হুমকির মুখোমুখি। এহেন পরিস্থিতিতে এর সংরক্ষণের সফল বহু নীতিও রয়েছে। আমাদের মূল অভাব হলো এদের সমন্বয় এবং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে এসব নীতি ও কৌশলের বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা। শত প্রচেষ্টার পর বহুক্ষেত্রে বহু উদ্যোগ ব্যর্থ হয়েছে। এর কারণ বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, মানুষের মৌলিক নৈতিকতার অভাব রয়েছে। এক্ষেত্রে সব ধর্মীয় নৈতিকতা সাধারণ জনগোষ্ঠীর কাছে তুলে ধরলে বিদ্যমান নীতিমালা ও কৌশলের বাস্তবায়ন আরো সহজ হতে পারে।

www.nagorikpathagar.org

তথ্য সূত্র ঃ

Forest Department (1998) Integrated Resource Development of the Sundarbans Reserved Forest, Bangladesh, FAO/UNDP Project, BGD/84/056, Khulna, Bangladesh.

Mangrove of the Sundarbans. Volume two: Bangladesh, The IUCN- The World Conservation, 1994

Sundarbans Biodiversity Conservation Project Fact Finding-ADB

Sundarbans at a Glance - Helal Siddiqui

Studies on Mesophytic and Mangrove Species in the Poorly Regenerated Areas of the Sundarbans Bulletin-3

Sundarbans Forest Inventory Project, Bangladesh Wildlife Conservation in the Sundarbans. ODA-1985

Karim, A. (1988) Topdying of Sundarbans, An Ecological View of Point in Rahman et al. (Edited) proceedings of the seminar on topdying Sundri (Heritiera fomes) trees.

Rahman. M. A. (1995) Mangrove plant pathology of the Sundarbans Reserved forest in Bangladesh.

South Asian Disaster Management Centre (SADMC), 5th Workshop on Disaster Management.

শ্রী সতীশচন্দ্র মিত্র, যশোহর-খুলনার ইতিহাস।

শহীদুল্লাহ মৃধা, বঙ্গোপসাগর জীব সমুদ্র বিজ্ঞান ও সমুদ্র সম্পদ।

উপকূলীয় সামুদ্রিক মৎস্য ব্যবস্থাপনা প্রকল্প, মৎস অধিদপ্তর।

ফসিউদ্দীন মাহ্তাব, সালেহ মুস্তাফা কামাল ও জহুরুল হক - গ্রিনহাউস প্রতিক্রিয়া ও বাংলাদেশে তার স্বভাব।

ড. আবদুর রব, বিবর্তনের ধারায় বাংলাদেশের উপকূলীয় ভূ-ভাগ (ইনকিলাব ২৬ মে মার্চ ২০০০।

সামুদ্রিক স্বার্থ সংরক্ষণ (ড. কামাল) পরিবেশ পত্র ; উপকূলের মানুষজন, বর্ষ ৭ সংখ্যা ৪ জানুয়ারি-মার্চ ২০০৪

সুন্দরবন পরিচিতি- সুন্দরবন বিভাগ

রথীন্দ্রনাথ দে, সুন্দরবন, ধরিত্রী- ১ম সংখ্যা ১৯৯৫

শৈলী- জানুয়ারি ১৯৯৬

সাপ্তাহিক বিচিত্রা- ১ আগস্ট ১৯৯৭

সুন্দরবন সমাচার- ২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮

দৈনিক মুক্তকণ্ঠ- ১৯ জানুয়ারি ১৯৯৯

দৈনিক ইত্তেফাক- ৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৯

দৈনিক জনকণ্ঠ- ১২ মার্চ ১৯৯৯

দৈনিক সংবাদ- ৭ মে ১৯৯৯

দৈনিক ইনকিলাব- ১৮ জুন ১৯৯৯

www.nagorikpathagar.org

পানি ও জীবন

"পানিই জীবনের উৎস, ইহা সংরক্ষণ কর এবং প্রাণবন্ত সবকিছুই আমি পানি থেকে সৃষ্টি করলাম, এরপরও কি তারা বিশ্বাস স্থাপন করবে না" (সুরা আম্বিয়া ২৯:৩০)।

সার সংক্ষেপ

পানিতেই জীবনের উৎস। তাই পানিসম্পদ সংরক্ষণ সবার জন্য একান্ত অপরিহার্য। আলোচ্য প্রবন্ধে পানি ও পরিবেশের সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে, সে সাথে পানি কিভাবে বিভিন্ন পদার্থের সংমিশ্রণে দূষিত হয় তাও আলোচনা করা হয়েছে। পানিসম্পদ সংরক্ষণে সামাজিক গুরুত্ব ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। কিন্তু এ সম্পদ যথাযথভাবে সংরক্ষণে দেশে বহুল প্রচলিত আইন ও প্রতিকার খোঁজা হচ্ছে বহুভাবে। পানিসম্পদ সংরক্ষণ ও অংশীদারে শুধু স্থানীয় ও আঞ্চলিক পর্যায়েই নয়, এ সংকট আন্তর্জাতিক পর্যায়েও অত্যন্ত প্রকট। পানি সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ নেয়ামত, এ সম্পদকে সংরক্ষণ করার জন্য মানব সৃষ্ট অনেক বিধি বিধান রয়েছে রাষ্ট্রে, তবে তা যথাযথভাবে অনুসরণ করা হচ্ছে না। আলোচ্য প্রবন্ধের পর্যালোচনা থেকে প্রতীয়মান হয়, মূল্যবোধ ও ধর্মীয় বিধানের অনুপ্রেরণা ও দায়িত্বশীলতা মানুষকে এ সম্পদ সংরক্ষণে অত্যন্ত দায়িত্বশীল করে তুলতে পারে।

www.nagorikpathagar.org

পানি ও পরিবেশ

সূচনা : সাধারণ অর্থে চারপাশের জল, স্থল, জলবায়ু, জৈব-অজৈব এবং বাস্তুসংস্থান এসব কিছুর সম্মিলিত প্রকৃতিগত অবস্থা এবং এর ভারসাম্যই পরিবেশ বলে পরিচিত। সুন্দরভাবে বাঁচার সাথে পরিবেশের সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়। পরিবেশ সৃষ্টির ক্ষেত্রে পানির ভূমিকাও অত্যন্ত অপরিহার্য। গাছপালা ও প্রাণিজগৎ সম্পূর্ণরূপে পানির ওপর নির্ভরশীলতার প্রেক্ষাপটে পানির প্রাপ্যতা ও অবস্থানগত যে কোন পরিবর্তন পরিবেশের ভারসাম্যে বিঘ্ন ঘটায়।

যেকোন উন্নয়ন কর্মকাণ্ড মূলত জীবজগতের কল্যাণে নিয়োজিত। অপরিকল্পিতভাবে উন্নয়ন কার্যক্রমগুলো প্রকৃতির ভারসাম্য নষ্ট করে। এসব উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের প্রত্যাশিত সুফলের পাশাপাশি কিছু অনভিপ্রেত কুফল এড়িয়ে যাওয়া বাস্তবে কঠিন। পানিসম্পদের ব্যবহার এবং এতদসংক্রান্ত যে কোন উন্নয়ন কার্যক্রম, যেমন- সেচ প্রকল্প, জলবিদ্যুৎ প্রকল্প, বন্যা নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প এবং জল যোগাযোগ উন্নয়ন প্রকল্প ইত্যাদি প্রাকৃতিক ভারসাম্যে পরিবর্তন ঘটায়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, উন্নয়ন কার্যক্রমের ফলে অনেক ক্ষেত্রেই কৃত্রিম হ্রদ সৃষ্টি, কিছু এলাকা নিমজ্জিত হওয়া, কোন স্রোতধারার গতিপথ পরিবর্তন, নদীর তলদেশের উচ্চতা বৃদ্ধি, বনজ সম্পদের অবলুপ্তি, তাপমাত্রার হ্রাস-বৃদ্ধি এবং বৃষ্টিপাতের তারতম্য- এক কথায় এসব অপরিণামদর্শী কর্মকাণ্ডের ফলে প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঘটে থাকে।

আমাদের দেশের পানি ও পরিবেশ সংক্রান্ত ভারসাম্য পরিবর্তনের একটি উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত হলো ভারতের ফারাক্কা বাঁধ নির্মাণ করার ফলে পদ্মা নদীতে পানির পরিমাণ হ্রাস পেয়েছে। এতে দেশের বেশ কয়েকটি জেলার চাষাবাদ, নৌ-যোগাযোগ ব্যবস্থা বিঘ্নিত হয়েছে। ভূগর্ভস্থ পানির উচ্চতা নেমে গেছে, গাছপালা ও শস্যে এবং পানি প্রাপ্তির পরিমাণও কমে গেছে। লবণাক্ততা বৃদ্ধি পেয়েছে। এক কথায় ফারাক্কা বাঁধ একটি বিশেষ অঞ্চলে প্রাকৃতিক ভারসাম্যে যথেষ্ট ক্ষতিকর পরিবর্তন এনেছে। দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত হিসাবে কাপ্তাই বাঁধের কথা বলা যায়। কর্ণফুলীর উপর নির্মিত এ বাঁধ একদিকে বিদ্যুতের চাহিদা মিটাচ্ছে, অন্যদিকে তা নিমজ্জিত করেছে অমূল্য বনজসম্পদ সমৃদ্ধ বিস্তীর্ণ এলাকা। বিলুপ্তপ্রায় হয়েছে বেশকিছু প্রজাতির গাছপালা ও জীবজন্তু। পরবর্তীতে পুনর্বাসিত করা হয়েছে এক উল্লেখযোগ্য এলাকার প্রতিবেশ বিপন্ন জনগোষ্ঠীকে, পরিবর্তিত হয়েছে তাদের অনেক রীতিনীতি ও জীবন পদ্ধতি। এক কথায় পরিবেশে মারাত্মক পরিবর্তন এসেছে, তা সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও অর্থনীতিরও হতে পারে।

দেশের পানি উন্নয়ন প্রকল্পগুলো প্রধানত যেসব পরিবেশ সংক্রান্ত সমস্যার সৃষ্টি করে সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো : (ক) জলাধার সম্পর্কিত সমস্যা, (খ) সেচকৃত এলাকা সম্পর্কিত সমস্যা, (গ) বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও বাঁধ নির্মাণ সম্পর্কিত সমস্যা, (ঘ) ভূগর্ভস্থিত পানি উন্নয়ন সমস্যা।

www.nagorikpathagar.org

জলাধার সম্পর্কিত সমস্যাগুলোর মধ্যে রয়েছে বিস্তীর্ণ এলাকা জলমগ্নতা। এছাড়া রয়েছে নদীর উজানে তলদেশের উচ্চতা বৃদ্ধি, জলাবদ্ধতার কারণে নষ্ট হয় ফসল, বিস্তার ঘটে নানাবিধ রোগবালাইয়ের।

সেচ এলাকা সম্পর্কিত সমস্যার মধ্যে রয়েছে লবণাক্ততা ও ক্ষারত্ব বৃদ্ধি এবং জলাবদ্ধতার কারণে মাটির মানের অবনতি; ভূগর্ভস্থ পানির গুণাগুণ কমে যাওয়া; জনস্বাস্থ্যের ওপর এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া।

বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও বাঁধ নির্মাণ সম্পর্কিত সমস্যার মধ্যে রয়েছে প্রান্তীয় সিক্ত ভূমি এবং রক্ষণমূলক উদ্ভিদসমূহের অবলুপ্তি, ভাটি অঞ্চলে বন্যা পানির কর্দমাক্ততা বৃদ্ধি, ভূগর্ভে পানি পুনর্ভরণের ক্ষমতা কমে যাওয়া ইত্যাদি। বাঁধ নির্মাণের ফলে মুক্ত জলাশয়ের পরিমাণ সঙ্কুচিত হয় এবং উন্মুক্ত পানির মাছের বিচরণক্ষেত্র কমে যায় এবং মাছের উৎপাদন কম হয়। ফলে মাছের ওপর নির্ভরশীল জেলে সম্প্রদায়ের বেকারত্ব বাড়ে ও পেশার পরিবর্তন হয়। ভূগর্ভস্থ পানি উন্নয়ন কার্যক্রম সম্পর্কিত সমস্যাদির মধ্যে রয়েছে পানির স্তর নিচে নেমে যাওয়া এবং এ কারণে উত্তোলন ব্যয় বৃদ্ধি; ভূমির উৎপাদন ক্ষমতা কমে যাওয়া এবং লবণাক্ততার অনুপ্রবেশ।

মানুষের অবস্থা পরিবর্তনে উন্নত বিশ্ব ও উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসমূহ যেমন বিশ্বব্যাংক, বিশ্ব খাদ্য ও কৃষি সংস্থা, ওডিএ এবং অন্যরা পানি উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের সম্ভাব্যতা নিরূপণে পরিবেশ সংক্রান্ত গ্রহণযোগ্যতাকে সবার ঊর্ধ্বে স্থান দিচ্ছে। একথা আজ অত্যন্ত পরিষ্কার যে, পরিবেশ সংরক্ষণ মানবজাতির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধররা যাতে বিশুদ্ধ বাতাসে নিঃশ্বাস নিতে পারে, সে পরিবেশ আমাদেরই সৃষ্টি করতে হবে। এ জন্য পরিবেশ সংরক্ষণ করতে হবে উন্নততর পরিবেশ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে। মোট কথা, পরিবেশ সংরক্ষণে গোটা মানবজাতির বিবেক-বুদ্ধিকে সুচারুরূপে প্রয়োগ করতে হবে। তাহলেই মানব কল্যাণ আর সুন্দরের স্পর্শে আমাদের পৃথিবী আরও অপরূপ হয়ে উঠবে। এ জন্যেই সরকারি আইন-কানুন প্রবর্তনের পাশাপাশি সামাজিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধের বিষয়ে গণসচেতনতা সৃষ্টি করা আবশ্যক।

জীবজন্তু, উদ্ভিদ এবং মানুষের ব্যবহারের উপযোগী নয়- পানির এমন অবস্থাকে পানি দূষণ বলে। পৃথিবীর শতকরা ৯৭ ভাগ পানিই সাগরের। সমস্ত পানি সম্পদের মাত্র ৩% মিঠা পানি। মানুষ এ মিঠা পানির এক-তৃতীয়াংশ মাত্র ব্যবহার করতে পারে। এ পরিমাণ মিঠা পানি পৃথিবীর মানুষের প্রয়োজন মেটাতে যথেষ্ট। সুষম নিয়ন্ত্রণ ও সমন্বিত ব্যবস্থাপনার অভাবে পানিসম্পদের অপচয় ও দূষণ ক্রমান্বয়ে বাড়ছে। দূষিত পানি সেবনের ফলে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে গড়ে দৈনিক পঁচিশ হাজার মানুষের মৃত্যুর কারণ ঘটে থাকে বলে জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসূচি কর্তৃক চিহ্নিত করা হয়েছে। প্রস্রাব, ঘাম ইত্যাদির মাধ্যমে মানুষের শরীর থেকে পানি বের হয়ে যায়। এ লোকসান পূরণের জন্য নিয়মিত যথেষ্ট

www.nagorikpathagar.org

পরিমাণ পানি পান করতে হয়। দূষিত পানি ব্যবহার করলে রোগাক্রান্ত হবার সম্ভাবনা অত্যন্ত বেশি। এ ছাড়া দৈনন্দিন গৃহস্থালির ব্যবহারের কাজে, কৃষি কাজে এবং শিল্প কারখানায় দূষিত পানি পান করলে মানুষের বিভিন্নভাবে ক্ষতিগ্রস্ত ও রোগাক্রান্ত হবার সম্ভাবনা থাকে। আমাদের দেশে প্রচলিত রোগব্যাধির শতকরা ৬০ ভাগ পানিবাহিত। দূষিত পানি ব্যবহারের ফলেই এ রোগব্যাধি হয়ে থাকে।

ভূমির গঠন ও ভূমিক্ষয় উভয় ক্ষেত্রেই পানি সমানভাবে কাজ করে। বৃষ্টি আর নদী প্রবাহ এ কাজগুলো করে চলেছে। মাটি গড়ে উঠতে সুদীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন। কিন্তু তার মৃত্যুক্ষয় এত মন্থর নয় বরং অত্যন্ত দ্রুত। কৃষিনির্ভর অর্থনীতি হিসেবে এ দেশের প্রকৃতি ভাঙ্গা গড়ার খেলার নেশায় মাতাল হয়ে থাকে। মৌসুমি অঞ্চলের ভয়াবহ ব্যাধি ভূমিক্ষয়। ঢালু জমিতে একটানা ও প্রবল বৃষ্টিপাত সর্বক্ষণ ভূমিক্ষয় ঘটিয়ে থাকে। পরিণামে ভূমিহীন ও দারিদ্র্যের তীব্র চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হয় সর্বক্ষণ।

পানি সম্বন্ধে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হচ্ছে, আদি সমুদ্র প্রাগৈতিহাসিক জীব সৃষ্টির উৎস। কারণ রক্তরস অনেকটা সমুদ্রের পানির মতো লোনা। জীবদেহে স্বাভাবিক অবস্থায় যে পরিমাণ পানি থাকে তার শতকরা পাঁচ ভাগ বেরিয়ে গেলে যাতনা অনুভূত হয় এবং সর্বক্ষমতা হ্রাস পায়। শতকরা ১০ ভাগ বেরিয়ে গেলে কর্মক্ষমতা সম্পূর্ণ লোপ পায়। আর শতকরা ২০ ভাগ বেরিয়ে গেলে প্রাণীর দ্রুত মৃত্যু ঘটে। প্রাচীন গ্রীক দার্শনিকগণ, এই উপমহাদেশের শাস্ত্রকারগণ ব্যক্তি এবং সমাজ জীবনে শুধু নয়, বিপুল এ পৃথিবীর জীবনেও পানিকে একটি প্রধান মৌলিক উপাদান হিসেবে নির্দেশ করেছেন। যে জন্য বলা হয় 'পানিই জীবন'। খাবার জন্য পানি, ঘর গৃহস্থালির জন্য পানি, শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য পানি, নৌ চলাচলের জন্য পানি এবং বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য পানি। এমনকি খেলাধুলা ও চিত্তবিনোদনের জন্যও পানি। কৃষি ও প্রাণী জগতের অস্তিত্বতো পানি ছাড়া একেবারেই অসম্ভব।

আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় দারিদ্র্যের সঙ্গে যুদ্ধের একটি প্রধান হাতিয়ার পানির সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করা। পানি নিয়ে মূল সমস্যা দুটি - পানির আধিক্য (বন্যা, অতিবৃষ্টি) বা খরা। প্রয়োজন রয়েছে বিপরীতধর্মী দুটি অবস্থারই যথাযথভাবে মোকাবিলা করা। এজন্য প্রয়োজন কারিগরি জ্ঞান, প্রাতিষ্ঠানিক সুবিধাদি ও প্রয়োজনীয় নেটওয়ার্ক। শুধু পানির সুষ্ঠু ব্যবহারই খাদ্য সমস্যা ও দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য যথেষ্ট নয়। সেই সঙ্গে সঠিক প্রযুক্তির যথাযথ ব্যবহারেরও প্রয়োজন রয়েছে।

বাংলাদেশের ভূ-গর্ভস্থ পানিসম্পদ ও পরিবেশ

ভূ-গর্ভস্থ পানিসম্পদ প্রাকৃতিক উপায়ে পুনঃসঞ্চিত হয়ে থাকে। বৈজ্ঞানিক চক্রের একটি অংশ হিসেবে ভূ-গর্ভের পানিসম্পদের উৎপত্তি, অবস্থান, সঞ্চয় ও চলাচল প্রক্রিয়া চলে।

www.nagorikpathagar.org

তাই কোন এলাকার ভূ-তাত্ত্বিক গঠন ও জলবায়ুর প্রকৃতির মাধ্যমেই সেখানকার জলবায়ু চক্র আবর্তিত হয়। বাংলাদেশের অধিকাংশই পলল মাটির বদ্বীপ এলাকা রূপে চিহ্নিত, এলাকা বিশেষে সামান্য ব্যতিক্রম ছাড়া সমগ্র দেশ প্রায় সমতল। গড়ে সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে উচ্চতা পায় ২১ মিটার। দেশের অর্ধেক এলাকার উচ্চতা ১২.৫ মিটার।

প্রাকৃতিক ভূগোল অনুসারে বাংলাদেশের ২০টি ভূবিভাগকে প্রধানতঃ পাঁচটি অঞ্চলে ভাগ করা হয়েছে ঃ (ক) বন্যা প্লাবনজনিত পলি অঞ্চল (পদ্মা গঙ্গা অববাহিকা), (খ) পুরাতন মেঘনা প্লাবন পলি অঞ্চল, (গ) পুরাতন হিমালয় পাদভূমি অঞ্চল, পর্বত পাদদেশের মালভূমি সদৃশ অঞ্চল (মধুপুর ও বরেন্দ্র এলাকার পুরাতন পলল ভূমি অঞ্চল) এবং (ঘ) সিলেট উপত্যকার গভীরভাবে প্লাবিত এলাকা।

ভূজল বৈজ্ঞানিক তত্ত্বানুসারে পাললিক ভূ-স্তরকে আবার উচ্চ ও নিম্ন ভূগর্ভস্থ জলস্তর (Acquifer) এ দু ভাগে ভাগ করা হয়েছে। উচ্চ জলস্তর থেকে অগভীর নলকূপ ইত্যাদি দ্বারা পানি সংগৃহীত হয়ে থাকে। আবার বৃষ্টির পানি, নদীর প্রবাহ ইত্যাদি উৎস থেকে এ পানি পুনঃসঞ্চিত হয়ে থাকে। উচ্চস্তর জলাধারের পানির সরবরাহ পুনঃসঞ্চয়ই মূলত আমাদের পানি সরবরাহের অবস্থা ও পরিবেশকে প্রভাবিত করে থাকে।

উচ্চ জলস্তরের ৩টি প্রধান ভাগ রয়েছে; উপরে পলিময় কাদা, মাঝখানে ২০ মিটার পুরু অতি সূক্ষ্ম বালুকণা মিশ্রস্তর এবং সর্বাধিক ১৫০ মিটার গভীর মোটা দানা বালুগঠিত প্রধান জলস্তর। জলস্তর কর্দমস্তরই অন্যান্য ২টি স্তরের মাধ্যমে পুনঃসঞ্চয়ন প্রক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।

পানি দূষিত হয় কেন

কলকারখানার অপরিশোধিত বর্জ্য, পৌর এলাকার নর্দমার ময়লা, সার্ভিস ল্যাট্রিনের ময়লা, কৃষি কাজে ব্যবহৃত কীটনাশক ও রাসায়নিক সার, প্রাণিজাত আবর্জনা এবং তেজস্ক্রিয় বর্জ্য ইত্যাদি পানি দূষিত করে থাকে। পানি দূষিত হলে শুধু পানি প্রবাহের সাথে সম্পৃক্ত পানির উৎসই দূষিত হয় না, পানির ওপর নির্ভরশীল খাদ্য চক্র (Food Chain), জনজীবনও ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যায়। এ ছাড়া জলজ উদ্ভিদ, প্রাণী প্রভৃতি জীববৈচিত্র্য দূষিত এবং ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। কোন প্রকার দূষিত পদার্থ ছাড়াও বিদ্যুৎ কেন্দ্রের শুধু অধিকতর গরম পানিও জলাশয়ের পানি দূষিত করতে পারে। পানির তাপমাত্রা বেড়ে গেলে অক্সিজেন ধারণ ক্ষমতা কমে যায়। কোন প্রকার দূষিত পদার্থ না থাকলেও কেবল তাপ বৃদ্ধির কারণেই একটি নদী বা পানি প্রবাহের প্রকৃতিগত ভারসাম্য বিনষ্ট হতে পারে।

বাংলাদেশের পরিবেশ অধিদপ্তরের ১৯৯২ সালের এক প্রতিবেদনে নিম্নোক্ত কর্মকাণ্ড পানি দূষণের প্রধান কারণ বলে চিহ্নিত করা হয়েছে।

www.nagorikpathagar.org

(ক) জৈব আবর্জনা

শহর বা গ্রামের ঘরবাড়ি ও নর্দমার ময়লা আবর্জনা এবং উদ্ভিদজাত ময়লা আবর্জনাকে জৈব আবর্জনা বলা হয়। এসব আবর্জনা পানিতে পড়লে পানিতে দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ কমে যায়, যার ফলে জলজ প্রাণীর জীবন ধারণ কঠিন হয়ে যায়। বাংলাদেশে বিভিন্ন

চিত্র ৫.১ : আবর্জনা ও পানি দূষণ

শিল্পকারখানার অবস্থান মূলত নদী তীরবর্তী এলাকায়। কাঁচামালের যে কোন উৎপাদন পণ্যের পরিবহন ব্যবস্থার মতো অন্যান্য প্রয়োজনীয় সুবিধা এই ধরনের শিল্প গড়ে উঠার মূল কারণ। ফলে এসব শিল্প কারখানার নিঃসৃত বর্জ্য সরাসরি নদীতে নিক্ষিপ্ত হয়। আমাদের দেশের বস্ত্রশিল্প পাবনা সিরাজগঞ্জ এলাকায়। ট্যানারি শিল্প বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে অবস্থিত। তাছাড়া সার কারখানা, রাসায়নিক শিল্প ও তৈল শোধনাগারগুলি পানি দূষণ সমস্যা সৃষ্টিকারীর অন্যতম। এসব শিল্প কারখানার অপরিশোধিত শিল্পবর্জ্য সরাসরি নদী ও জলাশয়ে নিক্ষিপ্ত হবার ফলে মারাত্মক পানি দূষণ সমস্যার সৃষ্টি করছে। সর্ববৃহৎ সংখ্যক শিল্পকারখানার অবস্থান দেশের উত্তর-মধ্য অঞ্চলে। এ অঞ্চলের শিল্প কারখানার প্রায় ৩৩ শতাংশই বস্ত্র, পোশাক ও ট্যানারি শিল্প। এসব শিল্পের প্রায় অর্ধেক ঢাকা জেলায় এবং ৩২ শতাংশ নারায়ণগঞ্জ জেলায় অবস্থিত। রসায়ন, প্লাস্টিক ও পেট্রোলিয়াম জাতীয় সমুদয় শিল্প কারখানার প্রায় ৬৫ শতাংশ ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ ও গাজীপুর জেলায় অবস্থিত।

(খ) জীবাণু

রোগ সৃষ্টিকারী বিভিন্ন ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস পানিতে মিশলে তা দূষিত হয়ে যায়। যেমন- কলেরা, টাইফয়েড ইত্যাদি রোগ বিস্তার করে।

(গ) উদ্ভিদের পুষ্টিকর পদার্থসমূহ

উদ্ভিদের পুষ্টির জন্য বিশেষভাবে প্রয়োজনীয় রাসায়নিক পদার্থ যথা নাইট্রোজেন ও ফসফেটও পানি দূষণ করে থাকে। পানিতে অতিরিক্ত পরিমাণে এ ধরনের পুষ্টিকর উপাদান থাকলে অপ্রয়োজনীয় উদ্ভিদের জন্ম হয়। এসব উদ্ভিদ পরবর্তীতে পচলে পানি স্বাদহীন ও দুর্গন্ধময় হয়ে উঠে, ফলে জলজ প্রাণীর মৃত্যু ঘটাতে পারে।

www.nagorikpathagar.org

(ঘ) উদ্ভিদের পুষ্টিকর পদার্থ

ইউরিয়া, ট্রিপল সুপার ফসফেট (টিএসপি), মিউরেট অব পটাশ (এমপি) ও জিপসাম আমাদের দেশে ব্যবহৃত প্রধান প্রধান রাসায়নিক সার। এসব সারের রাসায়নিক পরিমাণ প্রায় ২০ লক্ষ টন। নব্বই দশকে উফশী ধানের চাষ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে রাসায়নিক সারের ব্যবহার বেড়েছিল ২০ শতাংশ। পরবর্তীতে ১৯৯৫ সালে নাইট্রোজেন সমৃদ্ধ রাসায়নিক সারের ব্যবহার ছিল সামগ্রিক রাসায়নিক সারের ৮৮ শতাংশ। এছাড়াও উফশী ধান চাষে বালাইনাশকের জন্য সচরাচর ব্যবহৃত কীটনাশকের পরিমাণও বেড়েছিল। ১৯৯০ সাল হতে ১৯৯৫ সাল পর্যন্ত সময়কালে সেচ ব্যবস্থাধীন রাসায়নিক সার ও বালাইনাশক ব্যবহারের ফলে ব্যাপকভাবে দূষণ করেছে এ দেশের পানিসম্পদও।

(ঙ) কৃত্রিম জৈব পদার্থ

বিভিন্ন ডিটারজেন্ট, পোকা মারার ঔষধ এবং অন্যান্য কৃত্রিম রাসায়নিক দ্রব্যকে কৃত্রিম জৈব পদার্থ বলে। এসব পদার্থ শিশু, সংবেদনশীল উদ্ভিদ, বিশেষ ক্ষেত্রে জলজ প্রাণীর জন্য ক্ষতিকর। এসব ক্ষতিকারক দ্রব্য কোন কোন মাত্রায় মাছ ও অন্যান্য জলজ জীবের মাধ্যমে খাদ্যচক্রে প্রবেশ করে এবং জনস্বাস্থ্যের ক্ষতি করে থাকে।

(চ) অজৈব রাসায়নিক পদার্থ

বিভিন্ন ধাতু যেমন সিসা, ক্রোমিয়াম, পারদ, তামা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। খনি, কলকারখানা এবং কৃষি ক্ষেত্র থেকে এসব রাসায়নিক পদার্থ পানিতে মিশে পানি দূষিত করে থাকে।

(ছ) পানিবাহিত পানি ও তলানি (Soil erosion)

বৃক্ষ নিধনের ফলে, পাহাড় ধ্বসে, ভূমি ক্ষয়ের মাধ্যমেও পানি দূষিত হতে পারে। এসব ঘোলাটে পানি জলজ প্রাণীর ডিম ও লার্ভার স্বাভাবিক বৃদ্ধি বন্ধ করে দিতে পারে।

(জ) তেজস্ক্রিয় পদার্থ

পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র, পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণজনিত বায়ুবাহিত তেজস্ক্রিয় বস্তুকণা ইত্যাদি দ্বারা পানি দূষিত হতে পারে। তেজস্ক্রিয় পদার্থযুক্ত পানি ব্যবহার করলে বা এসব পানির মাছ খেলে মানুষ ক্যান্সারসহ নানাবিধ রোগাক্রান্ত হতে পারে।

(ঝ) উষ্ণ পানি

কলকারখানার অথবা শিল্পকেন্দ্র থেকে উষ্ণ অবস্থায় পানি প্রাকৃতিক প্রবাহে ছেড়ে দিলে অতিরিক্ত তাপমাত্রায় পানি দূষিত হয়ে যেতে পারে। পানির দ্রবীভূত অক্সিজেন কমে যাবার ফলে জলজ প্রাণীর জীবন বিপন্ন হতে পারে।

www.nagorikpathagar.org

(ঞ) উপচে পড়া জ্বালানি তেল ও ইঞ্জিন তেল (Oil Spill)

বিভিন্ন জলযান থেকে নির্গত তেল দ্বারা পানি দূষিত হতে পারে। আমিষ জাতীয় খাদ্য সরবরাহকারী মাছ ও ঝিনুক জাতীয় প্রাণী এবং অন্যান্য জলজ প্রাণী এ তেলের প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকে। এরকম দূষিত পানিতে চিংড়ি মাছের বংশবৃদ্ধি কমে যায়।

উপরোক্ত যে সব কারণে পানি দূষিত হয়ে থাকে তার প্রতিটি বিষয়ের জন্য দায়ী মানুষের কর্মকাণ্ড বা আচরণ। পানিসম্পদ সংরক্ষণের জন্য প্রচলিত আইন রয়েছে, বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি প্রচেষ্টাও অব্যাহত রয়েছে। অধিক জনসংখ্যার চাপে, পানিসম্পদ সংরক্ষণে পর্যাপ্ত জ্ঞানের অভাব এবং এ সংক্রান্ত মূল্যবোধের অভাবের ফলে প্রত্যাশিত সুফল অর্জন করা সম্ভব হচ্ছে না। দেশের প্রধান দুইটি সমুদ্র বন্দর, চট্টগ্রাম ও মংলায় বাৎসরিক গড়ে ১৫০০ থেকে ১৬০০ জাহাজের আগমন ও নির্গমন ঘটে। প্রয়োজনীয় সংরক্ষণ ব্যবস্থার অভাবে উভয় বন্দরে পানির অবস্থান ভীষণ খারাপ।

বুড়িগঙ্গায় ট্যানারির বর্জ্য

বাংলাদেশের ২৭০টি চামড়া শিল্প কারখানার শতকরা ৯০ ভাগই হাজারীবাগে অবস্থিত। এসব শিল্প কারখানায় বর্জ্য শোধনের জন্য পর্যাপ্ত ট্রিটমেন্ট প্লান্ট নেই। ইউনিডো-এর সহায়তায় একটি শোধনাগার নির্মাণাধীন থাকলেও তার অগ্রগতি অত্যন্ত হতাশাব্যঞ্জক। এক প্রতিবেদনে প্রকাশ হয়েছে, প্রতিদিন হাজারীবাগের ট্যানারিগুলো থেকে ৭.৭ মিলিয়ন টন তরল এবং ৮৮ টন শুকনো বর্জ্য নির্গত হয় (১৮ ফেব্রুয়ারি/২০০০, জনকণ্ঠ)। এসব আবর্জনা বুড়িগঙ্গা নদীর পানিকে বিষাক্ত করে তুলেছে। এছাড়াও ট্যানারির বর্জ্য নিষ্কাশনের সুষ্ঠু ব্যবস্থা না থাকায় এ বর্জ্য খোলা ড্রেন দিয়ে হাজারীবাগের পশ্চিম পাশে নিচু জমিতে বেয়ে পড়ছে। এছাড়া ট্যানারি থেকে প্রতিদিন ২০ টনের মতো অদ্রবণীয় পদার্থ, পচনশীল লেদার কাটিং, ফেশিং লোম, রক্ত, সোডিয়াম, সালফেট ক্রোমিয়াম অক্সাইড, তেল, গ্রীজ ও অন্যান্য রাসায়নিক মিশ্রিত পানি এবং ৭.৫ বিওডি নদীতে ফেলা হচ্ছে।

এলাকা	প্রতিলিটার অক্সিজেন দ্রবীভূত (মিঃগ্রাঃ)
১। হাজারীবাগ	৫
২। চাঁদনীঘাট	২
৩। সদরঘাট	১
৪। ফরাশগঞ্জ	১.৫
৫। ধোলাই খাল	০
৬। পাগলা	১

উৎস : ১৩ অক্টোবর/২০০০, জনকণ্ঠ।

পানিতেই জীবনের অস্তিত্ব

পানির অপর নাম জীবন। প্রাণীকুলের জীবনের অস্তিত্ব এবং এদের বেঁচে থাকার জন্য এ সম্পদের গুরুত্ব অপরিসীম। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কোরআনে বর্ণিত রয়েছে, "পানি থেকে

www.nagorikpathagar.org

প্রত্যেক জীবন্ত জিনিসকে সৃষ্টি করেছি, তারা কি (আমাদের সৃষ্টির এ ক্ষমতাকে) স্বীকার করে না?"(সুরা আম্বিয়া ঃ ২১ঃ৩০)।

অপর এক আয়াতে বলা হয়েছে, পানিসম্পদ প্রাণীকুলের কল্যাণের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে, যেখানে তারা বসবাস করবে আর মানুষ এ থেকে তাদের খাদ্য সংগ্রহ করবে। পবিত্র কোরআনে এ সম্পর্কে বলা হয়েছে, "তোমাদের জন্য সমুদ্রের শিকার এবং এ থেকে খাওয়া হালাল করে দেয়া হয়েছে। যেখানে তোমরা অবস্থান কর, সেখানেও তা খেতে পার এবং কাফেলার জন্য সম্বল বানিয়ে নিতে পার" (সুরা মায়েদা ঃ ৫ঃ৯৬)।

প্রত্যেক প্রাণী সৃজনে পানির প্রভাব অনস্বীকার্য। বিজ্ঞানীদের মতে, শুধু মানুষ বা প্রাণীই নয়, বরং উদ্ভিদ এমনকি জড় পদার্থের মধ্যেও আত্মা ও জীবন প্রমাণিত আছে। মোট কথা সকল অবিষ্কার ও ক্রমবিকাশের জন্য পানির প্রভাব অপরিসীম। এক হাদিসে রয়েছে, হযরত আবু হুরায়রা বর্ণনা করেছেন যে, আমি রাসুল (সাঃ) এর কাছে জিজ্ঞেস করলাম, হে রাসুল (সাঃ) আমি যখন আপনার সাথে সাক্ষাৎ করি, তখন আমার অন্তর প্রফুল্ল এবং চক্ষু শীতল হয়। আপনি আমাকে প্রত্যেক বস্তুর সৃজন সম্পর্কে তথ্য বলে দিন। উত্তরে তিনি বললেন ঃ প্রত্যেক বস্তু পানি থেকে সৃজিত হয়েছে (তাফসিরে মা'আরেফুল কোরআন পৃঃ ৮৭৬)। এ ক্ষেত্রে দেশের ধর্মপ্রাণ মানুষের মধ্যে পানিসম্পদ সংরক্ষণে ধর্মীয় মূল্যবোধ তুলে ধরতে পারলে মানুষ এ প্রচেষ্টাকে পুণ্যের কাজ বলে মনে করবে।

পানিসম্পদের অর্থনৈতিক গুরুত্ব

পানির অর্থনৈতিক তাৎপর্য লিখে শেষ করার মতো নয়। শুধু সচেতনতা সৃষ্টির জন্য কতিপয় উল্লেখযোগ্য বিষয় আলোচনা করা হল। অবশ্য এসবের সম্পর্ক এবং তাৎপর্য চিন্তা করলে যে কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি এর গভীরতা ও বিস্তৃতি অনুভব করতে পারবে। আমাদের কৃষিনির্ভর অর্থনীতিতে পানির গুরুত্ব যে কত তা ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন নেই। কৃষি ব্যবস্থায়, জমি কর্ষণ, চারা রোপণ, এসবের পরিচর্যার সর্বত্রই বৃষ্টি এবং সেচের প্রয়োজন হয়। যে কোন বৎসর খরা বা বন্যা দেখা দিলে পানি প্রবাহের ঘাটতি বা অতিপ্রবাহের ফলে কৃষি উৎপাদন ব্যাহত হয়। এর ফলে সংকট সৃষ্টি হয় খাদ্য সরবরাহের, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের সর্বোপরি দারিদ্র্য বিমোচনের।

জীববৈচিত্র্য - গাছ, মাছ ও প্রাণীকুল রক্ষায়ও পানির কোন বিকল্প নেই। মৎস্যসম্পদের কথা যদি চিন্তা করা যায় তাহলে দেখা যাবে, এ দেশের জনগোষ্ঠীর ৭০-৮০% পুষ্টি আসে মাছ থেকে, বিশেষত অনেক দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবন ও জীবিকা (উপকূলীয় ও হাওর এলাকার) নির্ভরশীল মৎস্য চাষের মাধ্যমে। তেমনি নানাবিধ উদ্ভিদ, শাক-সবজি ও ফলফলাদির কথা বিবেচনা করলে দেখা যাবে, এ দেশের বিরাট জনগোষ্ঠীর আয় রোজগার ও পুষ্টি সরবরাহের

www.nagorikpathagar.org

অতিগুরুত্বপূর্ণ সম্পদ এই পানি। এসব অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সংগঠনের জন্যও পানিসম্পদ অপরিহার্য।

আমাদের নদীমাতৃক দেশে এবং সমুদ্র পথে অতিসহজে ও স্বল্পমূল্যে যোগাযোগ/যাতায়াত ব্যবস্থা অর্থনীতিতে অতিগুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

জীবন রক্ষায় ও জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থায় পানির গুরুত্ব অপরিসীম। পরিবেশ বান্ধব শিল্প প্রতিষ্ঠায়, বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় (শিল্প ও নগর বর্জ্য), সুপেয় পানি সরবরাহ নিশ্চিত করতে পারলে জনস্বাস্থ্যের উন্নতি নিশ্চিত করা যায়। ফলে স্বাস্থ্য খরচ কমে যায়। তাছাড়া সাধারণ জনগোষ্ঠীর কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি পায়। অর্থনীতির গতিও ফিরে আসে।

এমনিভাবে আমাদের দেশের কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পর্যটন, বাণিজ্য (যোগাযোগ) সর্বোপরি প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষায় পানির গুরুত্ব অপরিসীম ও অপরিহার্য। এ দেশে পানিসম্পদ অপরিহার্য যখন তা পরিমিত। আপদ যখন তা অতিরিক্ত (বিশেষত বর্ষাকালে ও বন্যা আসলে। এ জন্যে প্রয়োজন এ সম্পদ ব্যবস্থাপনায় সুচিন্তিত পরিকল্পনা ও দক্ষ ব্যবস্থাপনার।

আল্লাহর সৃষ্টির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রাকৃতিক সম্পদ পানি। মানুষ ও পৃথিবীর সব প্রাণীজগতের অস্তিত্ব এ পানির ওপর নির্ভরশীল। এ পানিসম্পদের গুণাবলী পরিবর্তন করার অর্থ হল আল্লাহর সৃষ্ট প্রকৃতিতে পরিবর্তন সাধন করা, যা আল্লাহর সাথে নাফরমানি করার শামিল। কেননা আল্লাহ সব জিনিস নির্দিষ্ট পরিমাপ করে তৈরি করেছেন। উন্নয়নের লক্ষ্যে মানব কর্মকাণ্ডই তার গুণাবলীর পরিবর্তন করে থাকে। পবিত্র কোরআনে বর্ণিত রয়েছে, "শপথ বৃষ্টি বর্ষণকারী আকাশ মণ্ডলের এবং (উদ্ভিদ উৎপাদনকালে) বিদীর্ণ জমিনের" (সুরা আত্ তারেক ঃ ৮৬ঃ১১)। হযরত কাতাদা (রাঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যা করেছেন বৃষ্টির মাধ্যমে আল্লাহ প্রতি বৎসর তার সৃষ্টিকে রিজিক প্রদান করে থাকেন। যদি এ বৃষ্টি না থাকতো তাহলে সৃষ্টির সব প্রাণী ধ্বংস হয়ে যেতো। পানি সম্পদকে জীবনের উৎস হিসেবে গুরুত্বদানের কথা উল্লেখ করে পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে, "তোমরা কখনো লক্ষ্য করেছো এ পানি যা পান করো। এ পানি তোমরা মেঘমালা থেকে বর্ষণ করো, না আমরা বর্ষণ করি। আমরা চাইলে এ পানিকে তীব্র লবণাক্ত করতে পারি। তা'হলে তোমরা শুকর আদায় করবে না কেন?" (সুরা ওয়াকেয়া ঃ ৫৬ঃ৬৮-৭০)।

পানি সম্পদের গুরুত্বের বিষয় কোরান শরিফের ৬৩ স্থানে উল্লেখ রয়েছে। আমাদের দেশের মতো অনুন্নয়নশীল দেশসমূহে বেশির ভাগ রোগ জীবাণু পানি দূষণের মাধ্যমে ছড়ায়। আল্লাহ বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ করে থাকেন অথচ পানি দূষিত হয় মানব কর্মকাণ্ডের ফলেই। পানির গুরুত্ব সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে আরো উল্লেখ রয়েছে, "সে খোদাই তোমাদের জন্য মাটির শয্যা বিছিয়ে দিয়েছেন, আকাশকে ছাদ হিসেবে তৈরি করে দিয়েছেন। উর্ধ্ব দেশ হতে বৃষ্টিপাত প্রদান করেন এবং এর সাহায্যে নানা প্রকার ফল উৎপাদন করে তোমাদের রিজিক

www.nagorikpathagar.org

সরবরাহ করেন" (সুরা বাকারা ঃ ২ঃ২২)। যেমন শিল্পায়নের ফলে অতিমাত্রায় কার্বন নির্গত হলে এসিড বৃষ্টি হয়। এসিড বৃষ্টির পানি অন্যান্য জলাশয়ের পানিকেও দূষিত করে। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কোরআনে বর্ণিত রয়েছে, "আমরা আসমান থেকে পরিচ্ছন্ন পবিত্র পানি নাযিল করি" (সুরা ফোরকানঃ ২৫ঃ৪৮)।

হ্রদ, সমুদ্র এবং সাগরের পানি বহু প্রাণীর আবাস হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে, যাদের অর্থনৈতিক এবং পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় অপরিসীম গুরুত্ব রয়েছে। পবিত্র কোরআনে বর্ণিত রয়েছে, "তিনিই যিনি তোমাদের জন্য নদী সমুদ্রকে নিয়ন্ত্রিত করে রেখেছেন যেন তোমরা তা থেকে নতুন তাজা গোশত আহরণ করে খেতে পার এবং এ থেকে সৌন্দর্য-শোভার এমন সব জিনিস তোমরা বের করে নিবে যা তোমরা পরিধান কর" (সুরা নহল ১৬ ঃ ১৪)।

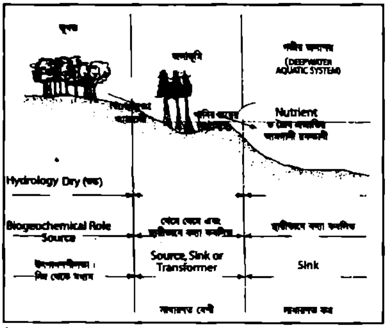

চিত্র-৫.২ : Wetlands এর জলাধার, সিঙ্ক এবং পানিবিশুদ্ধকারী প্রক্রিয়া
উৎস ঃ Mitch, 1993

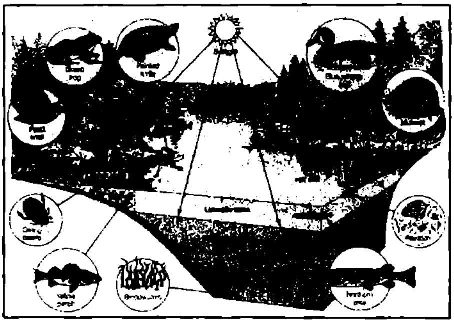

চিত্র-৫.৩ : Wetlands জীববৈচিত্র্যের সুপার মার্কেট
উৎস ঃ Miller, 1993

অন্য এক আয়াতে প্রাণীকুলের মতো মানব জাতির জন্যও পানিসম্পদকে খাদ্য ভাণ্ডার বলা হয়েছে, "তোমাদের জন্য সমুদ্রের শিকার ও খাওয়া হালাল করে দেয়া হয়েছে। যেখানে অবস্থান কর সেখানেও খেতে পার এবং কাফেলার জন্য সম্বল বানিয়েও নিতে পার (সুরা-মায়েদা ৫ঃ৯৬)। পানিসম্পদে যে সকল প্রাণী জগতের খাদ্য ভাণ্ডার এ সম্পর্কে অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে, আর যিনি আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করে তোমাদের জন্য ফসল উৎপাদন করেছেন তোমাদের খাদ্য হিসেবে (সুরা বাকারা ২ঃ২২)।

এমতাবস্থায় আল্লাহর সৃষ্টির বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সম্পদকে সংরক্ষণ করে প্রাণীকুলের যেমন গাছপালা, মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর জীবন রক্ষায় সহায়তা করা একান্ত আবশ্যক। ইসলামের অনুশাসনে নিজের জীবন রক্ষা এবং অন্য প্রাণীর জীবন রক্ষা প্রত্যেকের জন্য বাধ্যতামূলক। মানুষের যে কোন কাজ যা প্রাণী জগতের ব্যক্তিগত অথবা সামাজিক জীবনের ক্ষতির কারণ হয় তা সে প্রাণী ধ্বংস করে হোক অথবা যে কোন প্রকারে তার থাকার বাঁচার পরিবেশ দূষিত করে হোক সে জন্য পরিবেশ দূষণকারী ব্যক্তিই জীবজগতের অথবা প্রাকৃতিক সম্পদের ধ্বংসের জন্য দায়ী হবে। ন্যায়বিচারের বিধান হল, "নিষিদ্ধ কাজের প্রতি ধাবিত

www.nagorikpathagar.org

করতে পারে এমন আচরণও নিষিদ্ধ"। পানিসম্পদের অপরিসীম গুরুত্বের কথা বিবেচনা করেই সব মানুষ এবং প্রাণীর জন্য এ সম্পদ ব্যবহারের সমান অধিকার দেয়া হয়েছে। পানি ব্যবহারে কারো একচ্ছত্র অধিকার এবং কাউকে বঞ্চিত করা অথবা অপব্যয় করার কোন অধিকার নেই। পানিসম্পদের ব্যবহারের ক্ষেত্রে সা'মুদ সম্প্রদায়ের মানুষ এবং তাদের উট বিষয়ে হাদিসে বলা হয়েছে, "তাদের বলে দাও পানিসম্পদ তাদের এবং উটদের মধ্যে ভাগাভাগি করে ব্যবহার করতে হবে" (সুরা আল কামর ঃ ৫৪ঃ২৮)।

পানিচক্র (Water Cycle)

পানির প্রধান দুইটি উৎস রয়েছে (ক) ভূ-পৃষ্ঠীয় পানি (খ) ভূগর্ভস্থ পানি, যা থেকে স্পষ্টতই বুঝা যায়, বৃষ্টির (Precipitation) যে পানি জলীয় বাষ্প হয়ে আকাশ মণ্ডলে (Atmosphere) অথবা চুয়ে (Leaching) ভূগর্ভে যায় না তাকে আমরা ভূ-পৃষ্ঠীয় পানি বলি। এসব পানি ঝরনা, হ্রদ (Wetlands), অথবা কৃত্রিম জলাধারে জমা হয়ে থাকে। Riverbasin যা বৃষ্টি পানি বিধৌত যা ধরিত্রীর (Planet) প্রায় ৬০ শতাংশ ভূমি দখল করে আছে এবং যা পৃথিবীর ৯০ শতাংশ জনগোষ্ঠীকে ধারণ করে। বৃষ্টির (Precipitation) কিছু পানি মাটির নিচে চলে যায়। মাটির নিচে যে এলাকার মাটি এবং শিলা পানি দ্বারা ভরপুর থাকে তাকে Zone of saturation বলে। মাটি ও শিলার রন্ধ্রের তরল পানীয়কে ভূ-গর্ভ পানি বলে, যা চিত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে।

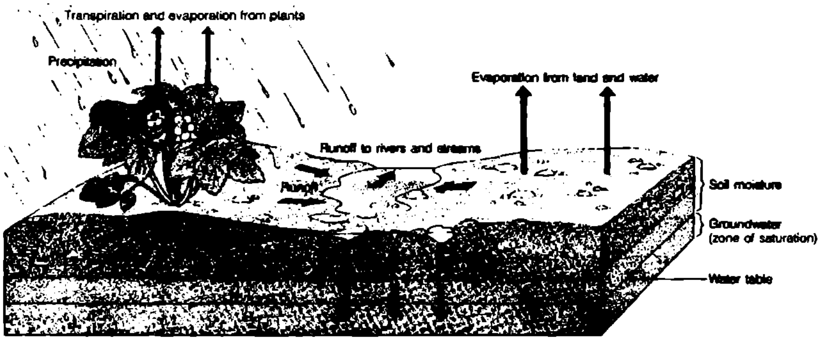

চিত্র ৫.৪ : পানিচক্র যা আবর্তিত হচ্ছে

উৎস ঃ T. Miller 1993

আধুনিক বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যায় পানি প্রবাহের গতিচক্রকে ব্যাখ্যা করে বলা হয় যে, সূর্যের রশ্মি থেকে উত্তাপ গ্রহণ করে সমুদ্র। পৃথিবীতে মজুদ পানির এলাকায় ও সিক্ত স্থানে বাষ্পের সৃষ্টি হয়। এই বাষ্প উপরে উঠে বায়ু মণ্ডলে যায় এবং সেখানে তা ঘনত্ব লাভ করে মেঘে পরিণত হয়। এ পর্যায়ে শুরু হয় বায়ুর ভূমিকা। উপরের প্রক্রিয়ায় যেসব মেঘ সৃষ্টি হয়েছিল, বায়ু সেসব মেঘ দূর-দূরান্তরের বিভিন্ন এলাকায় পরিচালিত করে থাকে। এই অবস্থায় কোন কোন

www.nagorikpathagar.org

মেঘ পানি বর্ষণ না করেই বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়ে। আবার কোন কোন মেঘ অপরাপর মেঘ পিণ্ডের সাথে মিলিত হয়ে লাভ করে আরো বেশি ঘনত্ব ও ব্যাপকতা। এভাবে এসব মেঘ তাদের এ ধরনের বিবর্তন প্রক্রিয়ার এক পর্যায়ে বিন্দু বিন্দুরূপে বৃষ্টির ফোঁটা হয়ে ঝরে পড়ে। এ বৃষ্টির পানি সমুদ্রে পৌঁছার সাথে সাথে আবহাওয়া ও গতিচক্রের পুনরাবৃত্তি শুরু হয়। বাকি পানি কমবেশি যা-ই হোক চুইয়ে মাটির ভেতরে চলে যায়। সেই পানি বিভিন্ন খাল, নদী-নালা বেয়ে সমুদ্রে গিয়ে পড়ে অথবা ঝরনা কিংবা উত্তোলনকারীদের মাধ্যমে পুনরায় ভূ-পৃষ্ঠে ফিরে আসে (ড. মরিস বুকাইল ও ময়নুল হক ২০০৩; পৃ ১৪)।

খাদ্য নিরাপত্তা ঃ নতুন এ সহস্রাব্দে আমাদের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হলো খাদ্য নিরাপত্তার লক্ষ্যে পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনা। এ ক্ষেত্রে ড. ফায়সাল ইসলামের বিশ্লেষণ থেকে দেখা যায় যে, আগামী ২০৩০ ও ২০৫০ সালে কি পরিমাণ সেচ জমিনের প্রয়োজন হবে তা নির্ভর করে ভবিষ্যতে উন্নত জাতের ধানের (HYV) উৎপাদনশীলতা কতটুকু বৃদ্ধি পাবে। গত দশকে এর হার ছিল প্রায় ২০ শতাংশ। আগামীতে একই হারে উৎপাদনশীলতা বাড়বে এমন কোন নিশ্চয়তা নেই। এ ক্ষেত্রে সংরক্ষণশীলভাবে ১০ শতাংশ এবং উচ্চাভিলাষী হিসেবে ২০ শতাংশ উৎপাদনশীলতার এবং ২০০০ সালের পর ভূমি উৎপাদনশীলতার কোন পরিবর্তন হবে না। এ তিনটি সিনারিও এর বিষয় আলোচনার প্রেক্ষাপটে সেচ ভূমির চাহিদার পরিমাণ চিত্রের সাহায্যে দেখানো যেতে পারে।

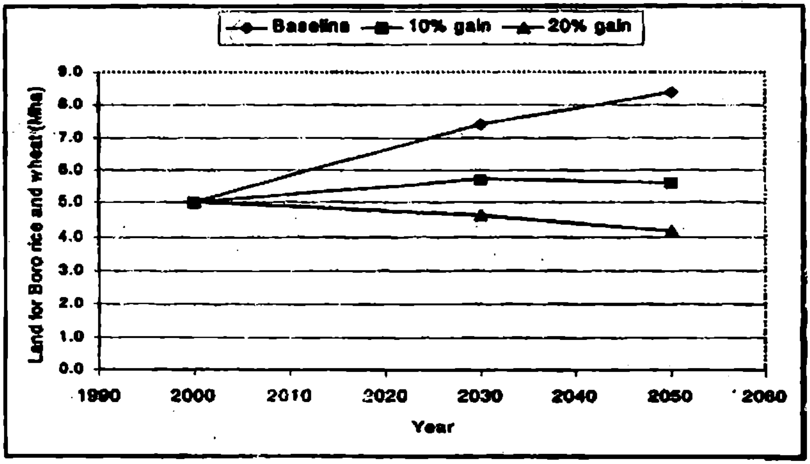

চিত্র ৫.৫ : সেচের আওতায় বোরো ধান ও গমচাষের ভূমির প্রয়োজনীয়তা

উৎস ঃ ফায়সাল, ২০০৩; বিশ্ব পরিবেশ দিবস স্মরণিকা, ২০০৩

চিত্র থেকে দেখা যায় যে, উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পাবে না। এ দৃশ্যটি অত্যন্ত ভয়াবহ, এক্ষেত্রে ২০৫০ সালে সেচ ভূমির চাহিদার পরিমাণ দাঁড়াবে প্রায় ৮.৫ মিলিয়ন হেক্টর। তার

www.nagorikpathagar.org

অর্থ হচ্ছে, শুষ্ক মৌসুমে কৃষিক্ষেতে সেচের পরিমাণ বাড়াতে হবে ২৫০ শতাংশ। এ কথা তাত্ত্বিকভাবে সম্ভব হলেও এতো ব্যাপক সম্প্রসারণ কারিগরি ও আর্থিকভাবে সম্ভব না-ও হতে পারে। সাধারণভাবে ১০ শতাংশ উৎপাদনশীলতার কথা বিবেচনায় আনলেও সেচ ভূমির চাহিদা বৃদ্ধি পাবে প্রায় ৫.৫ মিঃ হেঃ যা ২০০০ সালের লেভেলের চেয়ে ৬৫ শতাংশ কৃষি ভূমি বৃদ্ধি পেতে পারে। এই কারণে বর্তমান পৃথিবীর জনসংখ্যার নিরিখে মাথাপিছু পানির পরিমাণ দাঁড়ায় প্রতিদিন মাত্র ২ লিটার। টেকসই উন্নয়নে পরিবেশের সাথে পানির সম্পর্ক নানাভাবে বিস্তৃত। মূলত সব কাজে মানুষ পানি ব্যবহার করে। পানির সহজলভ্যতা ও গুণাগুণের ভিত্তিতে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন প্রজাতির উদ্ভিদ ও প্রাণী দেখতে পাওয়া যায়। মরু অঞ্চলে পানির স্বল্পতার কারণে কম পানি গ্রহণকারী উট এবং ক্যাকটাস জাতীয় উদ্ভিদ দেখতে পাওয়া যায়। পানির সহজলভ্যতার কারণে বাংলাদেশে ভূমির উচ্চ ফলনশীলতা এতো তীব্র এবং জনসংখ্যার ঘনত্ব এত বেশি।

পানি ব্যতীত জীবন ধারণ সম্পূর্ণ অসম্ভব। জীবদেহের স্বাভাবিক সতেজ ওজনের অধিকাংশই পানি বা জৈবিক প্রক্রিয়ার আধার হিসেবে কাজ করে। আবার উদ্ভিদ ও প্রাণীর দেহাভ্যন্তরে জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় কোন দ্রব্যের পরিবাহক হিসেবও কাজ করে। অনেক ক্ষেত্রেই পানি জীবের বিস্তৃতি এবং প্রজাতির পরিবর্তনের পরোক্ষ নিয়ন্ত্রক স্বরূপ।

সারণী-১ মানবদেহে পানির ভারসাম্য

গ্রহণ	-	নিঃসরণ	-
উৎস	পরিমাণ ঘনফুট	উৎস	পরিমাণ (ঘন সেমি)
তরল	১১০০	প্রস্রাব	১০০০
খাদ্যদ্রব্য	৪৫০	ঘর্ম	৯০০
বিপাক দহন	৪৫০	মল	১০০
মোট	২০০০	মোট	২০০০

উৎস ঃ আবুল হাসান, উচ্চ মাধ্যমিক উদ্ভিদবিজ্ঞান, ১৯৯৩ পৃঃ ৮৬৬

পানিসম্পদের সামাজিক গুরুত্ব

পানিসম্পদের উপরোক্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছাড়াও সামাজিক ও ধর্মীয় ভূমিকা রয়েছে, যেমন-শারীরিক পবিত্রতা অর্জন, কাপড় চোপড় ছাড়াও সকল প্রকার পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অর্জন করা এ প্রসঙ্গে পবিত্র কোরআনে উল্লেখ রয়েছে, "আকাশ থেকে তোমাদের জন্য পানি বর্ষণ করছেন এ জন্যে যে, তিনি তোমাদের পবিত্র করবেন এবং শয়তানের নিক্ষিপ্ত ময়লা ও অপবিত্রতা তোমাদের থেকে দূর করবেন" (সুরা আনফাল ৮ঃ১১)। অপর একটি হাদিসে পানিসম্পদের ব্যবহার সম্বন্ধে বলা হয়েছে, "মহানবী (সাঃ) বলেছেন, মুসলমানদের তিনটি জিনিসের ব্যবহার ভাগাভাগি করতে হবেঃ পানি, ঘাস এবং আগুন" (আবু দাউদ ও ইবনে মাজা)।

www.nagorikpathagar.org

আমাদের কৃষি অর্থনীতিতে সেচ ব্যবস্থার গুরুত্ব ও তাৎপর্য অনেক। গ্রামীণ অর্থনীতির সেচ ব্যবস্থার দিকে তাকালে অতিসহজেই অনুমেয় যে, গ্রামীণ সমাজের প্রতিপত্তি ও প্রভাবশালী ব্যক্তিরাই সেচ ব্যবস্থার সব কৃতিত্ব নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। ক্ষুদ্র ও মাঝারি কৃষকদের যথাসময়ে উপযুক্ত মূল্য দিয়ে প্রভাবশালীদের সুবিধামত সেচের পানি পাওয়ার জন্য অপেক্ষায় থাকতে হয়।

স্থানীয় জলমহাল, পুকুর, খাল-বিল ইত্যাদি লিজ নেয়ার বিষয় ও মালিকানা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, এ সবকিছুর কর্তৃত্ব সমাজের প্রভাবশালী লোকদের নিয়ন্ত্রণে। এ দেশের বড় দুটি হাওর, ট্যাংগুয়ার হাওর ও হাকালুকি হাওরের গত এক দশকের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, সমাজের অত্যন্ত প্রভাবশালী ব্যক্তিগণ নামমাত্র মূল্যে এসব নিয়ে অত্যন্ত লাভজনক ব্যবসা করেছেন। তাতে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত লোকজনের অংশীদারিত্ব ছিল। এসব জলমহাল থেকে সেচের পানি পেতে হলে সাধারণ কৃষকদের সালামি দিতে হয়। সাধারণ জনগোষ্ঠীর কাছে কতটুকু সুবিধা নিশ্চিত হচ্ছে তা পর্যালোচনা করলে বুঝা যাবে।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারতের ফারাক্কাসহ অন্য নদীগুলোর ক্ষেত্রে বৃহৎ প্রতিবেশীর কাছ থেকে বাংলাদেশ ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত। কলোরেডো রিভারেন্টের পানি বণ্টন নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র মেক্সিকো থেকে বেশি সুবিধা নিয়ে থাকে। তাই পানিসম্পদে সামাজিক গুরুত্বের বহুবিধ তাৎপর্য রয়েছে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

পানি ও আমাদের সংস্কৃতি

আমাদের সমাজে পানিকে কি অপ্রতুল বা দুষ্প্রাপ্য সম্পদ হিসেবে বিবেচনা করা হয়? এ প্রশ্ন সবার। আমরা সর্বত্র বলে থাকি, পানির অপর নাম জীবন এবং পানি দূষণ মৃত্যুতুল্য। কারণ পানি দূষণ করলে ব্যবহারকারীগণের স্বাস্থ্যহানি ঘটবে। ফলে মৃত্যু অনিবার্য পরিণাম হবে। এটা সর্বজন স্বীকৃত, সত্তর শতাংশ রোগ-বালাই এদেশে পানিবাহিত।

কোন সহজ কাজকেও পানির সাথে তুলনা করা হয় যেমন "জলবত তরলং" বা পানির মতো সহজ। আমাদের সমাজে আরো একটি প্রবাদ রয়েছে "পানি নিচের দিকে গড়ায়" এবং পানি তার পাত্রের আকার ধারণ করে। পানি নিচের দিকে গড়ানোর তাৎপর্য হল, একই অপরাধে গরিবকেই শাস্তি পেতে হয়। উচ্চবর্ণের লোকেরা সব সময় ধরা ছোঁয়ার বাইরে থাকে।

বাংলাদেশ যেহেতু নদীমাতৃক এবং ডেলটা এলাকায় অবস্থিত এখানে ভূগর্ভস্থ এবং ভূ উপরিভাগে পানির প্রাচুর্য রয়েছে। একথাও সত্য যে, বাংলাদেশ দ্বিতীয় বৃহত্তম জলাধার দেশ, যা কানাডার চেয়েও বেশি। কিন্তু রহস্যজনক হল, শীতকালে এদেশে পানির স্বল্পতা দেখা দেয়, যে সমস্যা কানাডার নেই। সরবরাহের প্রাচুর্য বিধায় মানুষ অপচয় করতে অভ্যস্ত। এক্ষেত্রে বলা হয়ে থাকে, লোকটি পানির মতো পয়সা খরচ করে যাচ্ছে। তাই বিবেকের কাছে প্রশ্ন রইল, পানি দূষণ করা কি কোন গর্বের বিষয় হতে পারে! আমাদের

www.nagorikpathagar.org

সমাজে হোটেলে খেতে গেলে পূর্ণ এক গ্লাস পানি সরবরাহ করে থাকে নাস্তা পরিবেশন করার আগেই। খাবার শেষে একটু পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যাবে, বেশির ভাগ কাস্টমার পঞ্চাশ শতাংশ পানিও ব্যবহার করে না। এভাবে প্রতিনিয়তই প্রয়োজনের তুলনায় সরবরাহ করে থাকে অনেক বেশি। আমাদের সমাজে আজকাল একটা কথা প্রচলিত রয়েছে, জিনিসপত্র পানির দামে বিক্রি হচ্ছে। এর তাৎপর্য হল পানি অত্যন্ত সস্তা, অন্য যে কোন জিনিসের চেয়ে।

এক সময় বলা হলেও হালে সে ধারণার পরিবর্তন হয়েছে বলা হয়। এর তাৎপর্য হল পানি আর সুলভ নয়। বরং দুর্লভ ও দুস্প্রাপ্য ও মূল্যবান সম্পদ।

আমাদের সমাজে বিশেষত ছাত্রাবাসে অপেশাদার গায়ক গোসল খানায় গুন গুন করে গান গেয়ে থাকে, তাদেরকে বলা হয়ে থাকে বাথরুম গায়ক। এ প্রবাদটির তাৎপর্য হল বিনা বাধায় অতিসহজে নির্বিঘ্নে যখন শাওয়ার থেকে পানি অনবরত মাথায় এবং শরীরে পড়তে থাকে, সে নির্বিঘ্নে অনাবিল শান্তি অনুভব করতে থাকে, তারই বহিঃপ্রকাশ হিসেবে সে গান করে থাকে। কোন কারণে যদি পানি সরবরাহ বিঘ্নিত হয় অথবা পানির স্বাদ বা রং পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয় সাথে সাথে তার গান বন্ধ হয়ে যাবে।

আমাদের দৈনন্দিন আরেকটি অভ্যাসের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে, সকালে শেভ করার সময় টেপটি ছেড়ে রাখি যতক্ষণ না শেভ করা শেষ হয়। আমরা কি কখনো ভাবি, শুধু শেভ করার জন্য কত লিটার পানি আমরা অপচয় করে থাকি প্রতিদিন। অনুরূপ অবস্থা আমাদের রান্নাঘরেও ঘটে থাকে। লেট্রিনে ফ্লাশ করার জন্য প্রায় ১০ লিটারের মত পানি খরচ করা হয়ে থাকে। আমাদের কিন্তু কখনো হিসাব করা হয় না বেশি প্রেসার ব্যবহার করে ন্যূনতম কতটুকু পানি ব্যবহার করলে কাজটি হয়ে যেতো। এভাবে চিন্তা করলে দেখা যাবে আমাদের সচেতনতা, সতর্কতা ও মিতব্যয়িতার অভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে সর্বত্র।

উন্নত দেশে টয়লেট ফ্লাশিং, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার জন্য এবং খাবার পানির ভিন্ন ভিন্ন মানের ও গুণের। তারা পানিকে দুস্প্রাপ্য সম্পদ হিসেবে অত্যন্ত সচেতনভাবে হিসাব করে ব্যবহার করে থাকে।

বিভিন্ন ধর্মেও পানিকে পবিত্র সম্পদ বলে অভিহিত করা হয়েছে। কিন্তু দুস্প্রাপ্য সম্পদ বলে কোথাও অভিহিত করা হয়নি। সঙ্গত কারণেই তা করা হয়নি কারণ সেকালে পানি ছিল সুলভ, জনসংখ্যা ছিল কম এবং ব্যবহার ছিল সীমিত। অনেক ধর্মেই পানিকে পবিত্র এবং কল্যাণের প্রতীক বলে বিবেচনা করা হয়। অনেক ধর্মের লোকজন সকালে দোকান খুলে পানি ছিটিয়ে তাকে পবিত্র করে নেয়, এমনকি ক্যাশ বাক্সে তারা পানি ছিটিয়ে পবিত্র করে নেয়। ইসলাম ধর্মানুসারে খরা দেখা দিলে মুসলমানরা এসৃত্তেসৃকার নামাজ পড়ে, যা প্রচণ্ড রোদের মধ্যে দাঁড়িয়ে দীর্ঘক্ষণ যাবৎ নামাজ আদায় করতে থাকে এবং আল্লাহর কাছে কান্নাকাটি করতে থাকে বৃষ্টির জন্য। বৌদ্ধ ধর্মে শেষকৃত্যানুষ্ঠানের জন্য পানি অপরিহার্য। এই বিশেষ অনুষ্ঠানে বলের মধ্যে পানি সন্ন্যাসী ও মৃতদেহের সামনে রাখে। খৃস্টান ধর্ম

www.nagorikpathagar.org

গ্রহণ করলে সম্পূর্ণ অথবা আংশিকভাবে পানিতে ডোবানোর নিয়ম রয়েছে। ন্যূনতম পানি ছিটিয়ে হলেও পবিত্রতা অর্জন করতে হয়। পানি পবিত্রতার প্রতীক এবং অতীতের পাপ মোচনের প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত হয়। নিউ টেস্টামেন্টের প্রভুর শক্তিকে প্রকাশ করে। হিন্দু ধর্মে পানি আধ্যাত্মিক ও পবিত্রতাকে অনুপ্রাণিত করে। তাই প্রতিদিন পানি দিয়ে প্রাতঃকালীন পবিত্রতা অর্জন তারা আবশ্যিকভাবে প্রতিপালন করে থাকে। তাই তাদের মন্দির সব সময় পানির উৎসের কাছে থাকে। ফুল সবসময় পানিতে চুবানোর পর মন্দিরে দেয়া হয়। দুই বা তিনটি নদীর মোহনাকে তারা সবসময় পবিত্র স্থান বলে বিবেচনা করে থাকে। শ্মশান সব সময় তারা নদীর পারে করে থাকেন। শ্মশানের ছাই তারা পোড়ানোর তিন দিন পর সরবরাহ করে থাকে এবং পাপ মোচনের জন্য চলমান পানিতে ফেলে থাকে। হিন্দু ধর্মে প্রতি বৎসর শত শত হাজার ধর্মানুরাগী মানুষ গঙ্গাস্নান ও ব্রহ্মপুত্রে পাপ মোচনের জন্য পবিত্র স্নান করে থাকে।

ইসলাম ধর্মে পানি পবিত্রতা অর্জনের উপকরণ হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তারা এবাদতের জন্য নিয়মিত পবিত্রতা অর্জন করে থাকে। তারা গোসল করে পবিত্রতা অর্জন করে থাকে। পাঁচ বেলা নামাজ আদায়ের জন্যও তারা মুখমণ্ডল, কনুই পর্যন্ত হাত, পা ভিজিয়ে অজু করে পবিত্রতা অর্জন করে। তাই প্রতিটি মসজিদেই আবশ্যিকভাবে অজু করার ব্যবস্থা রয়েছে।

জোরাস্টিয়ান ধর্মে পবিত্রতা এবং দূষণ বিশ্বাসের কেন্দ্রবিন্দু। পানি দূষণ পাপ, পানি পরিষ্কার রাখা পুণ্যের কাজ। পানিতে থুথু ফেলা, পেশাব করা, পানিতে হাত ডুবানো পাপ কাজ। মোট কথা সকল ধর্মেই পানির সদ্ব্যবহারের প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। সামাজিক সচেতনতার মাধ্যমে এসব প্রতিপালন করলে দুষ্প্রাপ্য পানির সদ্ব্যবহার নিশ্চিত এবং দূষণ রোধ করা অত্যন্ত সহজ হবে।

বাংলাদেশে পানিসম্পদের ব্যবস্থাপনা ও সংকট

গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র, সিন্ধু, মেঘনার মতো অববাহিকায় বাংলাদেশের অবস্থান বিধায় এ অঞ্চলের ভূ-গর্ভস্থ একই এ্যাকুফায়ারের পানি নবায়নের সম্ভাব্যতা ছিল অত্যন্ত ব্যাপক। এই অফুরন্ত প্রাকৃতিক সম্পদের অদূরদর্শী ব্যবহার ও ব্যবস্থাপনার ফলে এ অঞ্চলে ইতিমধ্যেই পানির তীব্র সংকট দেখা দিয়েছে। এছাড়াও বাংলাদেশের বৃহত্তর ময়মনসিংহ, সিলেট, বৃহত্তর যশোর, নাটোরের চলন বিলসহ বিরাট জলাশয়গুলো টেকসই ব্যবস্থাপনার অভাবে আজ বিপন্নপ্রায়। অদক্ষ ব্যবস্থাপনার জন্যে অফুরন্ত পানি সরবরাহের সুযোগ থাকা সত্ত্বেও পানি সরবরাহের সংকট ক্রমান্বয়ে তীব্রতর হয়ে উঠেছে। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা ও অপরিকল্পিত জনসংখ্যার চাপে বিদ্যমান মিঠা পানিও দ্রুত দূষিত হয়ে যাচ্ছে। এ জন্যে বাংলাদেশের পল্লী ও শহরাঞ্চলে নিরাপদ বিশুদ্ধ পানি হিসেবে মাটির নিচের পানি জনগণের কাছে বেশি গ্রহণযোগ্য বলে মনে করা হতো। আজকাল তা এতোটা নিরাপদ বলে প্রতীয়মান হয় না।

www.nagorikpathagar.org

কেননা বাংলাদেশের ৬৪টি জেলার মধ্যে প্রায় ৫০টি জেলার ভূ-গর্ভের পানি আর্সেনিক আক্রান্ত। এ দেশের ভূ-গর্ভস্থ পানি অত্যধিক উত্তোলনের ফলে পানি স্তর প্রায় ৮-১০ মিটার নিচে নেমে গিয়েছে। যেমন ঢাকা ওয়াসা ২০৫টি গভীর নলকূপের (Deep Tubewell) সাহায্যে প্রায় ৮৫০ মিলিয়ন লিটার পানি উত্তোলন করে নগরবাসীকে সরবরাহ করে, যা প্রয়োজনের তুলনায় ৬০ শতাংশেরও কম। এছাড়া ঢাকা ওয়াসার আরো ১৫০টি ডিপ টিউবওয়েল স্থাপনের পরিকল্পনা রয়েছে। এছাড়া শিল্প কারখানা ও কৃষি সেচের জন্য বিরাট পরিমাণ পানি ব্যবহৃত হয়, যা মোট সরবরাহকৃত পানির প্রায় ৭০ শতাংশ। Water Resource Planning Organization (WARPO) এর ১৯৯৪ সালের হিসাব অনুযায়ী বাংলাদেশের গ্রামীণ এলাকায় টিউবওয়েলের সংখ্যা ছিল ২.৪ মিলিয়ন। উজানে হিমালয়ে বন নিধনের ফলে পলি, পাথর, বালু ইত্যাদির দ্বারা নিম্নাঞ্চলের নদীগুলোর তলদেশ ভরাট হয়ে যাচ্ছে। ভূ-পৃষ্ঠের পানি (Surface Water) কমে যাবার ফলে ভূ-গর্ভের পানির স্তর নিচে নেমে যাচ্ছে। ফলে পাহাড়ি ঢাল, অতি বৃষ্টি, জলবায়ু পরিবর্তন এবং তাপ বৃদ্ধির কারণে তুষার গলে নিম্নাঞ্চলে অনাকাঙ্ক্ষিত বন্যার সৃষ্টি করে থাকে। তাছাড়া মিষ্টি পানির চাপ কমে যাবার ফলে এবং তাপ বৃদ্ধির ফলে সাগরের পানি স্ফীত হয়ে সাগরের লবণাক্ত পানি প্রবেশ করে যা দেশের জনস্বাস্থ্য ও কৃষি উৎপাদনে মারাত্মক হুমকি সৃষ্টি করছে। (পরিবেশচিত্র ১৪০৬ এবং এনায়েতুল্লাহ ২০০০ পানি ও পরিবেশ পৃঃ ১৩)।

পানি ব্যতীত মানব সভ্যতার অস্তিত্ব ছিল অকল্পনীয়। এ প্রসঙ্গে সান্দ্রা পোস্টেল তার বই World Watch এর "Pillar of Sand" (বালির স্তম্ভ)-এ উল্লেখ করেছেন, "পানি ছাড়া মানুষের সভ্যতার ইতিহাস ছিল অসম্ভব। যখন সে পানির কাছে আসে প্রকৃতি তখন শক্ত হাতে আচরণ করে"। নীল, ইন্দাছ, হলুদ এবং টাইগ্রীস নদীর বেসিনের মতো অনেক সভ্যতার উত্থান পতন এর সাক্ষী। ইতিহাসে পানির রাজনীতি ও সামরিক ঘটনার কোন অন্ত নেই। সমসাময়িককালে গত ৩০ বছরের যাবৎ ভারত, বাংলাদেশের গঙ্গার পানি বণ্টনের ঘটনা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ডেলটিয়াক বাংলাদেশের পদ্মা, ব্রহ্মপুত্র, মেঘনা নদীর পানিসম্পদ অত্র এলাকার জনগোষ্ঠীর জন্য আশীর্বাদ। দুর্ভাগ্য হল, মানুষের অপরিণামদর্শী হস্তক্ষেপের ফলে বর্ষা মৌসুমে অতি পানিতে বিশাল জনগোষ্ঠী ডুবে যায়। পক্ষান্তরে শুকনো মৌসুমে পানির মারাত্মক স্বল্পতার জন্য হাহাকার সৃষ্টি হয়। সময়োপযোগী নীতিমালা ও তার যথাযথ বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশের পানিসম্পদ সংরক্ষণ করতে না পারলে বন্যা ও খরার ভয়াবহ অবস্থা আমাদের নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা হয়ে দাঁড়াবে। যেমন মিষ্টি পানির চাহিদা নগর এলাকায়, শিল্প, কৃষি, মৎস্য চাষ, অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন এবং লবণাক্ততা নিয়ন্ত্রণের জন্য দ্রুত গতিতে বেড়ে চলছে।

www.nagorikpathagar.org

বিপন্ন বুড়িগঙ্গা

নদ-নদী গঠন করেছে আমাদের এই ভূখণ্ড। পলি ছড়িয়ে ভূমিকে করেছে উর্বর, শস্য-শ্যামলা আর সুজলা-সুফলা। গড়ে উঠেছে জনপদ। শুরু হয়েছে কর্মচাঞ্চল্য। জেগে উঠেছে প্রাণস্পন্দন। একটি জীবন্ত নদীকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প কারখানা। শুরু হয় নগরায়ন। সভ্যতা, প্রগতি, স্বাচ্ছন্দ্য ও প্রাণ-প্রাচুর্যের উৎস হচ্ছে নদী। এই নদী আমাদের যুগিয়েছে খাদ্য, স্বাস্থ্য এবং সমৃদ্ধ করেছে সম্পদে।

নগর সৃষ্টির পিছনে নদীর তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা থাকে অবশ্যই। আজ থেকে ৫শ' বছর আগে এখনকার বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা জাহাঙ্গীরনগর নামে গড়ে উঠেছিল বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে। মূল ভূখণ্ডের কেন্দ্রস্থলে নদীটির অবস্থান এবং সারা দেশের সাথে নৌযোগাযোগের পথ সহজতর, নিরাপদ ও সংক্ষিপ্ত হওয়ায় প্রতিরক্ষা, প্রশাসনিক, ব্যবসা-বাণিজ্যসহ সব ধরনের রাজকীয় ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য বুড়িগঙ্গার ভৌগোলিক অবস্থানগত গুরুত্ব বিবেচনা করে নগর স্থপতিরা বেছে নেন এই স্থানটিকে। এসব কারণে সেকালে এই নগরটি ভারতবর্ষে মর্যাদাপূর্ণ হয়ে ওঠে। তবে মুসলিম শাসনামলে ঢাকার খ্যাতি বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে। বুড়িগঙ্গা নদীর প্রাচীনত্বের উল্লেখ পাওয়া যায় 'বৃদ্ধ গঙ্গা' নামে দুই হাজার বছর আগে রচিত কালিকা পুরাণে।

এরপর বুড়িগঙ্গা দিয়ে অনেক পানি প্রবাহিত হয়ে যায়। ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে যে ঢাকার লোকসংখ্যা ছিল ৯ হাজার, কালের সাক্ষী বুড়িগঙ্গা নদীর তীরের সেই ঢাকার লোকসংখ্যা আজ ৯০ লাখ ছাড়িয়ে গেছে। আয়তন বেড়ে এখন দাঁড়িয়েছে ৮২৯ বর্গকিলোমিটারে। সময়, আয়তন, লোকসংখ্যা, অপরিকল্পিত নগরায়ন আর মানুষের অপরিণামদর্শী কর্মকাণ্ডের ফলে বুড়িগঙ্গার অস্তিত্ব আজ বিপন্ন। সচল-সজীব আর নৈসর্গিক সৌন্দর্যের প্রতীক বুড়িগঙ্গা এখন শ্রীহীন মৃতপ্রায় এবং বিষাক্ত এক বদ্ধ জলাধার। নদীটি মারাত্মকভাবে দূষিত হয়ে পড়েছে একশ্রেণীর মানুষের বিবেচনাহীন অপব্যবহারে। বর্তমানে এই দূষণ অতীতের সব রেকর্ড অতিক্রম করে গেছে। শিল্প কারখানার রাসায়নিক বর্জ্য, সুয়্যারেজের মলমূত্র, দূষিত পানি, গৃহস্থালি ও ব্যবসায়িক বর্জ্য, জীবজন্তুর বর্জ্য, নৌযানের তেল-মবিল-গ্রিজ- সব ধরনের তরল ও কঠিন বর্জ্য, ময়লা-আবর্জনা পচে দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে। দূষিত হচ্ছে নদীর পানি। বিপর্যস্ত হচ্ছে পরিবেশ। সেই সাথে ভরাট হয়ে যাচ্ছে নদীর তলদেশ। বহন ক্ষমতার অতিরিক্ত বর্জ্যের ভারে ক্লেদাক্ত, দুই তীরে গড়ে ওঠা অসংখ্য শিল্প কারখানা, ছিন্নমূল মানুষের শত শত বস্তি, অন্যান্য স্থাপনা এবং অবৈধ দখলদারদের কারণে ক্রমশ সঙ্কুচিত হয়ে আসছে নদীর প্রশস্ততা। বিরামহীন অজস্র নৌযান চলাচলের কারণে বর্জ্য-তেল-মবিল-আবর্জনা আর কাদা নদীর পানির সাথে মিলেমিশে ভিন্ন প্রকৃতির এক তরল পদার্থে রূপান্তরিত হয়ে গেছে। বুড়িগঙ্গার নোংরা ও কুৎসিত পানি এখন একেবারেই অস্বচ্ছ। আকর্ষণীয় বুড়িগঙ্গা এখন ঢাকার পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্যের প্রতি মারাত্মক আতঙ্কের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

www.nagorikpathagar.org

বুড়িগঙ্গার পানিতে মিশছে রাজধানীর প্রায় অর্ধকোটি মানুষের মলমূত্র, আবর্জনা এবং হাজারীবাগ ট্যানারিসহ বিভিন্ন কলকারখানার অপরিশোধিত বর্জ্য। প্রতিদিন রাজধানীর বিভিন্ন ধরনের বর্জ্যের ৪৯ শতাংশই ফেলা হচ্ছে এই নদীতে। বুড়িগঙ্গায় নিক্ষিপ্ত বর্জ্যের ৭৮ শতাংশ মানুষের মলমূত্র, গৃহস্থালি ও ব্যবসায়িক বর্জ্য আর ট্যানারি ও অন্যান্য শিল্প কারখানার বর্জ্য ২২ শতাংশ। ওয়াসার পয়ঃনিষ্কাশনের আওতায় আছে ঢাকার মাত্র ১৮ শতাংশ মানুষ। বাকি ৮২ শতাংশ মানুষের মলমূত্র মিশছে বুড়িগঙ্গায়। এ ছাড়া অনেক খাল বুড়িগঙ্গায় পড়েছে। এগুলো হচ্ছে কেরানীগঞ্জের কালীগঞ্জ দিয়ে প্রবাহিত খাল, খেজুরবাগ খাল, ধোলাই খাল, পারগেণ্ডারিয়া খাল, মীরেরবাগ খাল, কাটাসুর খাল, শ্যামপুর খাল, বাগানবাড়ী খাল, সেগুনবাগিচা খাল, কল্যাণপুর খাল, পশ্চিম মোহাম্মদপুর খাল এবং হাজারীবাগের ২০/২৫টি নালা। এরপর রয়েছে তুরাগ নদী। এসব নদী, খাল, নালা দিয়ে সারা বছর ধরে বিশাল পরিমাণ ময়লা-আবর্জনা, রাসায়নিক বর্জ্য, স্যুয়ারেজের দূষিত পানি বুড়িগঙ্গায় এসে মিশেছে। নগরীর আশপাশের নদী ও খালের অবস্থা আরও করুণ। নগরীর বর্জ্যের ১১ শতাংশ মিশছে তুরাগ নদীতে, বালু নদীতে মিশছে ২৭ শতাংশ আর মিরপুরের খালে মিশছে ১৩ শতাংশ।

বুড়িগঙ্গার পানি দূষণের আরেকটি প্রধান উৎস হচ্ছে হাজারীবাগ ট্যানারি শিল্প এলাকা। এখানকার প্রায় ১৭০টি ট্যানারিসহ আড়াই শ'র অধিক শিল্প-কারখানা থেকে প্রতিদিন বিপুল পরিমাণ অপরিশোধিত রাসায়নিক বর্জ্য সরাসরি বুড়িগঙ্গায় ফেলা হচ্ছে। প্রতিদিন হাজারীবাগ শিল্পাঞ্চল থেকে ১৫,৮০০ ঘন লিটার, তেজগাঁও শিল্পাঞ্চল থেকে ৩,৫০০ ঘন লিটার এবং অন্যান্য শিল্পাঞ্চল থেকে ২,৭০০ ঘন লিটার দূষিত পানি ও বিষাক্ত তরল বর্জ্য বুড়িগঙ্গায় নিক্ষেপ করা হচ্ছে। এ ছাড়া ট্যানারি থেকে প্রতিদিন ১৯ টন অদ্রবণীয় কঠিন বর্জ্য পদার্থ, ক্রোমিয়াম অক্সাইড, তেল গ্রিজ জাতীয় পদার্থ ও অন্যান্য রাসায়নিক মিশ্রিত পানি এবং ৭.৫ বিওডি নদীতে ফেলা হচ্ছে। এর সাথে প্রতিদিন গৃহস্থালির সৃষ্ট প্রায় ৫০ হাজার টন আবর্জনা নদীতে নিক্ষিপ্ত হচ্ছে। মোট কথা, শিল্প বর্জ্য মিশে বুড়িগঙ্গার অস্তিত্ব এখন উদ্বেগজনক পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছে। এর ফলে নগরীতে নানা ধরনের জটিল ও কঠিন রোগ ছড়িয়ে পড়তে শুরু করেছে।

> বুড়িগঙ্গার পানি এখন মাছসহ সব ধরনের জলজ প্রাণীর জীবনধারণের পক্ষে অনুপযোগী হয়ে পড়েছে। জলজ প্রাণী বেঁচে থাকার জন্য প্রতি লিটার পানিতে ৬ মিলিগ্রাম দ্রবীভূত অক্সিজেন থাকা প্রয়োজন। কিন্তু বুড়িগঙ্গার হাজারীবাগে দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ প্রতি লিটার পানিতে ৫ মিলিগ্রাম, চাঁদনীঘাটে ২ মিলিগ্রাম, সদরঘাটে ১ মিলিগ্রাম, ফরাশগঞ্জে ১.৫ মিলিগ্রাম, ধোলাই খালে ০ মিলিগ্রাম এবং পাগলাতে ১ মিলিগ্রাম।

বুড়িগঙ্গার হাজারীবাগ থেকে পাগলা পর্যন্ত এলাকায় অক্সিজেনের পরিমাণ মাত্রাতিরিক্ত কম বিধায় নদীতে কোন মাছ নেই। ট্যানারি কারখানা থেকে নির্গত ক্ষতিকর ক্রোমিয়াম ও আর্সেনিকের মাত্রা বুড়িগঙ্গায় দ্রুত হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রতি লিটার পানিতে ক্রোমিয়ামের গ্রহণযোগ্য মাত্রা হচ্ছে .০৫ মিলিগ্রাম। ৩ বছর আগে বুড়িগঙ্গায় এই মাত্রা ছিল .০২

www.nagorikpathagar.org

মিলিগ্রাম। ১৯৯৮ সালে এই মাত্রা পাওয়া গেছে .০৪ মিলিগ্রাম। চাঁদনীঘাটের কাছে মার্কারি ও ক্লোরাইডের মাত্রা খুবই ভয়াবহ। ভাটিতে প্রতি লিটার পানিতে নাইট্রেটের ঘনত্ব ৮.৫ মিলিগ্রাম। মিরপুরের কাছে এই মাত্রা ১.৯২ মিলিগ্রাম। বুড়িগঙ্গার ওয়াসা ডিসচার্জ সেন্টারে প্রতি এক শ' মিলিমিটার পানিতে কলিফর্ম জীবাণু পাওয়া গেছে ২শ'র মতো। পানি দূষণের মাত্রা অত্যধিক হলে তা পরিশোধনেরও অযোগ্য হয়ে যায় বলে জানিয়েছেন লন্ডন ইউনিভার্সিটি ও ঢাকা ইউনিভার্সিটির একদল গবেষক। তাদের যৌথ গবেষণার ফল থেকে জানা যায়, ট্যানারি শিল্প-কারখানার রাসায়নিক ও জৈব বর্জ্য পদার্থ বুড়িগঙ্গায় নিক্ষিপ্ত হওয়ার ফলে নদীর পার্শ্ববর্তী এলাকাসমূহের ভূগর্ভস্থ পানিও দূষিত হয়ে পড়েছে।

ঢাকা মহানগরীর প্রান্ত ছোঁয়া ১৮ থেকে ১৯ কিলোমিটার দীর্ঘ বুড়িগঙ্গার দু'পার অবৈধ দখলের ফলে নদীটি ক্রমশ ভরাট হয়ে যাচ্ছে। ফলে আশঙ্কাজনকভাবে নদীর নাব্যতা ও গভীরতা হ্রাস পাচ্ছে। ইতিমধ্যে বুড়িগঙ্গার পানির স্তর বিপজ্জনক পর্যায়ে নিচে নেমে গেছে। বর্তমানে নাব্যতা ও গভীরতা দেড় মিটার হ্রাস পেয়ে নদীর তলদেশ সাগর পৃষ্ঠদেশের উচ্চতার চেয়ে ৩.০৫ থেকে ৪.৫৭ মিটার উপরে উঠে এসেছে। ১৯৯১-এর পরিসংখ্যান থেকে জানা যায়, বুড়িগঙ্গার প্রস্থ অর্বাকালে ২০০ থেকে ৩৫০ মিটার পর্যন্ত ছিল। ২০০০ সালে তা আরও কমেছে, এটা নিঃসন্দেহে বলা যায়। পরিবেশ অধিদপ্তরের এক সমীক্ষার প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, সরেজমিন পর্যবেক্ষণ করে তারা ১১৩টি অবৈধ স্থাপনা চিহ্নিত করেছে - যার কারণে বুড়িগঙ্গা সংকুচিত হয়ে যাচ্ছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এগুলো হলোঃ বসতবাড়ি ও বস্তি ৩৫টি, স মিল, কাঠের দোকান, কাঠের আড়ত, বাঁশপট্টি ২০টি, ডক ইয়ার্ড ১৬টি, ফল ও সবজির আড়ত ১১টি, ম্যানুফ্যাকচারিং কারখানা ৪টি ও অন্যান্য (মার্কেট, টেক্সটাইল মিলস ইত্যাদি) ২৭টি। একটি বেসরকারি সংস্থার জরিপ থেকে জানা যায়, কামরাঙ্গীর চর, হাজারীবাগের বেড়িবাঁধ থেকে শুরু করে পাগলা পর্যন্ত বুড়িগঙ্গার তীর দখল করে ৮ থেকে ৯ লাখ মানুষ বসবাস করছে। রাষ্ট্রীয় জমি দখলের পুরনো কৌশল অর্থাৎ আল্লাহ রসুলের নামে একশ্রেণীর অবৈধ দখলদার বুড়িগঙ্গার দুই তীরে ২০টি মসজিদ ও ৮টি মাদ্রাসা বানিয়ে জীবিকা নির্বাহ করছে। এসব মসজিদ মাদ্রাসার পুরো অবকাঠামোই নির্মাণ করা হয়েছে নদীর ওপর। ঢাকা জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে সর্বশেষ এক জরিপে দেখা গেছে, ২৪৪ অবৈধ দখলদার বুড়িগঙ্গার সার্কেলে ১৫৭ জনের দখলে ৭ একর, তেজগাঁও সার্কেলে ১৫৭ জনের দখলে ৩৮ একর, তেজগাঁও সার্কেলে ৯ জনের দখলে ৭ একর এবং কেরানীগঞ্জ সার্কেলে ৭৮ জনের দখলে আছে ৪ একরের বেশি জমি। বুড়িগঙ্গার অস্তিত্ব আজ বিপন্ন হয়ে পড়েছে। নদীটির ওপর অত্যাচার আর দূষণের মাত্রা ক্রমাগত বাড়ছে। এই অশুভ তৎপরতা ঠেকাতে না পারলে বুড়িগঙ্গা খুব শীঘ্রই বিলীন হয়ে যাবে। ঢাকার প্রাকৃতিক পরিবেশ, নৈসর্গিক সৌন্দর্য আর অর্থনৈতিক জীবনপ্রবাহ সচল রেখে এই ভূখণ্ডের মানুষকে শিক্ষা-দীক্ষা, জ্ঞান-বিজ্ঞান, সংস্কৃতি ও প্রগতিশীলতায় উন্নত করে একটি স্বাধীন সার্বভৌম জাতি গঠনে বুড়িগঙ্গা তার গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা পালন করে এসেছে। অতীতের সেই

www.nagorikpathagar.org

জীবনদায়িনী, প্রাণচাঞ্চল্য জাগানিয়া, স্রোতস্বিনী সৌন্দর্যময় বুড়িগঙ্গা এখন জীর্ণ শীর্ণ নোংরা-মুমূর্ষু এক বিষের ভাণ্ডার। নদীটির এই বেদনাদায়ক পরিণতি নিয়ে পত্র-পত্রিকায় বিচ্ছিন্নভাবে কিছু লেখালেখি ছাড়া একে বাঁচানোর বিষয়ে উল্লেখযোগ্য তেমন কোন বাস্তব পদক্ষেপই পরিলক্ষিত হচ্ছে না। অথচ নদীটির আয়ু দ্রুত নিঃশেষ হয়ে আসছে।

বুড়িগঙ্গা দূষণের প্রধান উৎস

বিভিন্ন গবেষণা ও পত্রপত্রিকার প্রতিবেদন পর্যালোচনান্তে বুড়িগঙ্গা দূষণের প্রধান উৎসগুলো নিম্নোক্তভাবে চিহ্নিত করা যায় ঃ

(ক) বুড়িগঙ্গার উজানে হাজারীবাগ ট্যানারি শিল্প ;

(খ) তেজগাঁও ও খোলাইখাল এলাকার বিভিন্ন শিল্প কারখানা ;

(গ) ওয়াসার পয়ঃনিষ্কাশন প্রণালী ;

(ঘ) ঢাকা শহর ও তার উজানের নানা ধরনের গৃহস্থালি বর্জ্য ;

(ঙ) নদীতে চলাচলকারী নৌযান এবং এদের তেল নির্গমন ;

(চ) বুড়িগঙ্গার দু ধারে ১৫ হাজার ছোট-বড়, মাঝারি শিল্প ইউনিট। এছাড়াও

(ছ) এলুমিনিয়াম সামগ্রী কারখানা, ঔষধ, ব্যাটারি, হার্ডওয়্যার, ডাবিং, ওয়াশিং প্লাস্টিক সামগ্রীর জাহাজ নির্মাণ শিল্প।

উপরোক্ত অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডগুলি সচল রেখে বুড়িগঙ্গাকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। প্রয়োজন কার্যকরী ও যুগোপযোগী বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও দক্ষ নদী শাসন। সর্বোপরি প্রভাবমুক্ত নিরপেক্ষ প্রশাসনিক ব্যবস্থা ও রাজনৈতিক সদিচ্ছা থাকতে হবে সর্বাগ্রে।

ভবিষ্যতে বাংলাদেশের পানির চাহিদা

Bangladesh 2020 - A Perspective Study পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, জাতীয় পানি প্লান অনুসারে ২০২০ সালের মার্চ মাসে বোরো চাষসহ সর্বমোট পানির চাহিদা হিসাব করা হয়েছে ২৪,৩৭০ মিলিয়ন লিটার। অথচ সব উৎস থেকে আনুমানিক সরবরাহ হবে ২৩,৪৯০ মিঃ লিটার। এর ফলে ২০২০ সালের চাহিদা পূরণের জন্য ৮৮০ মিলিয়ন লিটার পানির স্বল্পতা দেখা দিবে। সেচ যোগ্য জমির পরিমাণ প্রায় ৭.৬ মিলিয়ন হেক্টর, তন্মধ্যে ১.৯ মিলিয়ন হেক্টর মাত্র সেচ কার্যক্রমের আওতাধীন আনা হয় ১৯৮৫ সালে। ১৯৯১ সালের পানি নীতি অনুসারে ৫.৫ মিলিয়ন হেক্টর ২০০৫ সালে সেচের আওতায় আনার কথা ছিল। ২০২০ সালে এর পরিমাণ দাঁড়াবে ৬.৯ মিলিয়ন হেক্টর। খাতওয়ারী পানির চাহিদা বিভাজন করলে দাঁড়ায়, কৃষি ক্ষেত্রের মোট চাহিদার শতকরা ৫৮.৬ ভাগ, নৌ-পরিবহন, লবণাক্ততা, মৎস্য চাষের জন্য শতকরা ৪০.৭ ভাগ এবং গৃহস্থালি ও শিল্পের জন্য চাহিদার পরিমাণ শতকরা ০.৭ ভাগ। আশা করা হচ্ছে, ২০২০ সালে শতকরা ৭৭ ভাগ পানির চাহিদা ভূ-পৃষ্ঠের পানি দ্বারা মিটানো হবে, শুধু ২৩ শতাংশে পানির জন্য ভূ-

www.nagorikpathagar.org

গর্ভের পানির ওপর নির্ভর করতে হতে পারে। Enyetullah Khan : Bangladesh 2020 - A Perspective Study & Water & Environment 2000

বিজ্ঞানীরা হিসাব করে দেখেছেন, বাংলাদেশের ৩২ শতাংশ আবাদযোগ্য জায়গা লবণাক্ততায় আক্রান্ত। অপর্যাপ্ত drainage ব্যবস্থার ফলে বাংলাদেশের মোট চাষযোগ্য জমির শতকরা ৫০ ভাগ জলাবদ্ধতার ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। বিভিন্ন গবেষণা থেকে দেখা গেছে, অপরিকল্পিত ও বিচ্ছিন্নভাবে ভূ-গর্ভের পানি উত্তোলনের ফলে পানির লেয়ার দ্রুত নিচে নেমে যাচ্ছে, শুকনো মৌসুমে পানি প্রবাহ কমে যাচ্ছে, এর ফলে ক্রমান্বয়ে লবণাক্ততাও বাড়ছে। ভূ-গর্ভের পানি সরবরাহে অতিমাত্রায় চাপ সৃষ্টির ফলে ভূ-গর্ভের পানিতে রাসায়নিক পরিবর্তন দেখা দিচ্ছে, ফলে বর্তমানে বেশির ভাগ এলাকাতেই আর্সেনিকের মতো মারাত্মক সমস্যা দেখা দিয়েছে। এ অবস্থা চলতে থাকলে, ভবিষ্যতে দেশের খাদ্যোৎপাদনের সমস্যা ও জনস্বাস্থ্য মারাত্মক হুমকির সম্মুখীন হবে।

আমাদের দেশের সেচ ব্যবস্থার সমন্বয়- সাধন করে অতিসহজেই বন্যাউত্তর বা বর্ষাউত্তর পর্যাপ্ত পানির সরবরাহকে যথাযথভাবে ব্যবহার করতে পারলে শুকনো মৌসুমে পানির চাপ কমানো যেতে পারে। স্থানীয় সরকার বিভাগ, কৃষি বিভাগসহ এবং বিনিয়োগকারী সংস্থাকে এ লক্ষ্যে এগিয়ে আসতে হবে, সে সাথে কমিউনিটি ভিত্তিক ব্যবস্থাপনা জোরদার করে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। এ লক্ষ্যে পানি সম্পদ সংরক্ষণ ও যথাযথ ব্যবস্থাপনার জন্য পানি উন্নয়ন বোর্ড অত্যন্ত দূরদর্শিতার সাথে পরিকল্পনা গ্রহণ করতে পারে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, গণসচেতনতা সৃষ্টি করার মতো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ কিভাবে করা যেতে পারে। এ উদ্যোগকে বাস্তবায়ন করার জন্য অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক কর্মসূচিকে কাজে সম্পৃক্ত করা যেতে পারে। এসব স্লোগান সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছানোর মতো আমাদের পর্যাপ্ত গণমাধ্যমের যথেষ্ট অভাব ও সীমাবদ্ধতা রয়েছে। কেননা শতকরা ৮০ ভাগ গ্রামীণ মানুষের বেশির ভাগ জনগোষ্ঠীর কাছে টেলিভিশন, রেডিও এবং পত্র-পত্রিকা পৌঁছায় না অথবা এসব সুবিধাদি তাদের সাধ্যের বাইরে। এ ক্ষেত্রে আমাদের গণমুখী এ চেতনাকে দ্রুত পৌঁছাতে এবং তা দ্রুত সফল করতে হলে এ দেশের ধর্মপ্রাণ মানুষকে প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণের বিষয়ে ধর্মীয় মূল্যবোধকে জাগিয়ে তোলা যেতে পারে।

বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকার লবণাক্ততার সমস্যাটি অত্যন্ত প্রকট। গঙ্গাসহ আন্তর্জাতিক নদীগুলোর উজানে পানির স্রোত বাধাপ্রাপ্ত হবার ফলে নিচের দিকে বিশেষ করে আমাদের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের ভূ-পৃষ্ঠের এবং ভূ-গর্ভের পানির লবণাক্ততা বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমান পানি চুক্তির ফলে শুকনো মৌসুমে যেটুকু পানি আসবে পরিকল্পিতভাবে তার যথোপযুক্ত ব্যবহার করে উপকূলীয় এলাকার বিরাট সম্ভাবনাময় অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ও জনস্বাস্থ্যকে দুর্যোগের হাত থেকে রক্ষা করতে হবে।

পানি দূষণের মূল কারণ নিরূপণ করতে গেলে এর তালিকা হয়তো অনেক বড় হয়ে যাবে। তবে বর্তমানে আর্সেনিক সমস্যার জন্য বিজ্ঞানীরা যেসব প্রধান কারণ চিহ্নিত করেছেন তা

www.nagorikpathagar.org

হল ঃ কৃষি উপকরণের মাধ্যমে বিভিন্ন বিষাক্ত কেমিক্যাল পানির সাথে মিশে পানি দূষিতকরণ; অনুরূপ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে শিল্পবর্জ্য পরিশোধন না করে নির্বিচারে আমাদের দেশের জলাশয় ও বড়-ছোট নদীতে নিক্ষেপ করা হয়, যা জলাশয়গুলোর পরিপাক ক্ষমতার চেয়ে অনেক বেশি। এছাড়াও রয়েছে ট্যানারির বিষাক্ত পানি নির্বিচারে এবং পরিশোধনবিহীন অবস্থায় নদী ও জলাশয়ে ফেলা। এ বিষয়ে বুড়িগঙ্গার পানি দূষণের ঘটনা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পাল্প, কাগজের কল এবং বিভিন্ন টেক্সটাইলের রং অহরহ নদীর পানিতে ফেলা হচ্ছে। এ ধরনের অনেক ঘটনা দেখা যাবে পাবনা, সিরাজগঞ্জ এলাকার ডাইং কারখানাগুলো তাদের কারখানার রং যমুনাতে নির্গমন করছে। খুলনার পশুর নদী, চট্টগ্রামের কর্ণফুলী কাগজের কল অন্যান্যদের আবর্জনার ফলে প্রায় মৃত বলা চলে। ঢাকা ও গাজীপুরের টেক্সটাইল শিল্প কারখানাগুলোও তাদের পার্শ্ববর্তী নদী ও জলাশয়গুলোকে মারাত্মকভাবে দূষিত করে ফেলেছে। অন্যান্য দেশের মতো আমাদের দেশেও আধুনিক নগরায়ন সম্প্রসারিত হচ্ছে অত্যন্ত ব্যাপকভাবে। সবার উদ্দেশ্য জীবন যাত্রার মান বৃদ্ধি, সুখী ও স্বাচ্ছন্দ্য জীবন যাপন। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলো, সুষ্ঠু পরিকল্পনা ও অপরিণামদর্শী কর্মকাণ্ডের ফলে ব্যাপক নগরায়ন এ দেশে প্রাকৃতিক বিপর্যয় ও জনস্বাস্থ্যের প্রতি মারাত্মক হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। সাধারণতঃ নগর বা শহর গড়ে ওঠে ছোট-বড় নদীর ধারে। শিল্প কারখানাকে ভিত্তি করে নগরেরই জন্ম, তার অর্থ এই নয় যে, পানির উৎস জলাশয়গুলিকে বিপন্ন হয়ে যেতে হবে।

বিভিন্ন প্রতিবেদন পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, সরাসরি নগরের পয়ঃনিষ্কাশনের ফলে অপরিশোধিত পানি ও বিষাক্ত কেমিক্যাল অতি সহজে নদীর পানিতে মিশে আমাদের জনস্বাস্থ্য নষ্ট করছে প্রতিনিয়তই। শহরে খুব বেশি হলে ৫০ শতাংশ জনগোষ্ঠী মিউনিসিপালিটির ওয়াসার পানি সরবরাহের আওতায়, বাকি ৫০ শতাংশ জনগোষ্ঠী গতানুগতিক (traditional) পানির উৎসের ওপর নির্ভর করে থাকে। ১৯৯৬ সালের বিশ্ব ব্যাংকের প্রতিবেদনে দেখা যায় যে, বৃহত্তর ঢাকার পানির গুণগত মান দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে কোন অবস্থাতেই তাল মিলিয়ে সম্প্রসারণ করা সম্ভব হচ্ছে না। বরং পানি সরবরাহের ঘাটতি বাড়ছে দ্রুত গতিতে। বর্তমানে নগর জনগোষ্ঠীর সংখ্যা ২৪-২৫ মিলিয়ন। তাদের পানির চাহিদা ৬৪৫ মিলিয়ন গ্যালন প্রতিদিন। ২০২০ সালে জনসংখ্যা যখন তিনগুণেরও বেশি বেড়ে প্রায় ৮০ মিলিয়ন তখন এ জনগোষ্ঠীর পানির চাহিদা বেড়ে দাঁড়াবে ৩,৩০০-৪,২০০ মিলিয়ন গ্যালন। বর্ণিত অবস্থার কথা বিবেচনা করে অত্যন্ত সুপরিকল্পিতভাবে, আধুনিক পদ্ধতিতে পানি সরবরাহের অবকাঠামো সম্প্রসারণ করা না হলে দেশের অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের সাথে সাথে মারাত্মক পরিবেশের বিপর্যয় ঘটবে- এ কথা নিশ্চিতভাবে বলা চলে। এ বিপর্যয় থেকে রক্ষা পেতে হলে দেশের জনগোষ্ঠীকেই সংগঠিত করতে হবে, কমিউনিটি ভিত্তিক ব্যবস্থাপনা জোরদার করতে হবে। এ জন্য অতিসহজে ও স্বল্প খরচে যা করা সম্ভব তা হল তাদের ব্যক্তিগত মূল্যবোধকে জাগিয়ে তোলা। এ জন্য প্রয়োজন শিক্ষা

www.nagorikpathagar.org

ব্যবস্থার সাথে সম্পর্ক করে প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারে ধর্মীয় মূল্যবোধকে জাগ্রত করা। আর এ কর্মসূচিকে গণমুখী ও জনপ্রিয় করার অন্যতম মিডিয়া হিসেবে কাজ করতে পারে এ দেশের সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি মসজিদ, মন্দির ও গীর্জাসমূহ। অবশ্য রাজনৈতিক অঙ্গীকার হতে পারে সবচেয়ে শক্তিশালী হাতিয়ার (instrument), যদি তা প্রয়োগ করা হয়।

পানি ঃ মরণাপন্ন মানুষ বিশ্বে আজ ২০০ কোটি মানুষ মরণাপন্ন শুধু নিরাপদ খাবার পানির অভাবে। পরিবেশগত বিপর্যয়ের কারণে বিশ্বের এক-তৃতীয়াংশ মানুষ বিশুদ্ধ পানি থেকে বঞ্চিত। পরিবেশ বিশেষজ্ঞদের মতে বিশ্বে বর্তমানে খরা দেখা দিচ্ছে।

বিশেষ করে আফ্রিকা মহাদেশে পানির সংকট প্রকট। মরুভূমির আয়তন ধীরে ধীরে বাড়ছে। তার সঙ্গে সঙ্গে নতুন নতুন মরুভূমির সৃষ্টি হচ্ছে। খাবার পানির অভাবে মারা যাচ্ছে বহু মানুষ। আর যারা বেঁচে আছে তাদের ৮-১০ কিলোমিটার পথ হেঁটে খাবার পানির সন্ধানে যেতে হয়।

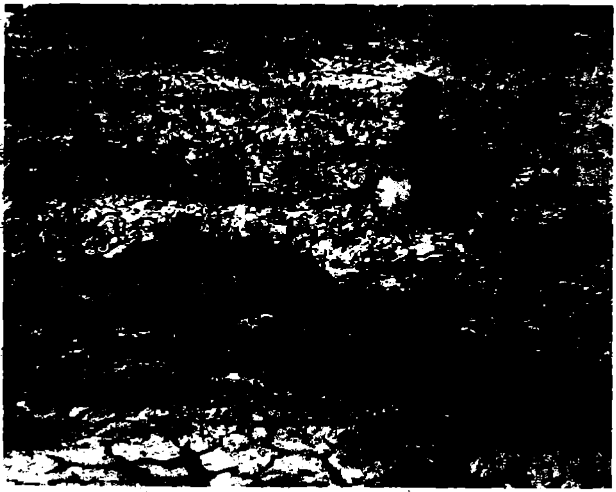

চিত্র ৫.৬ : পানি ঃ মরণাপন্ন মানুষ

জলবায়ু পরিবর্তন ও পরিবেশ বিপর্যয়ের কারণে বৃষ্টিপাতের পরিমাণও কম হচ্ছে, দেখা দিচ্ছে খরা। এমনটি শুধু কি আফ্রিকায়ই? না, শুধু আফ্রিকায়ই নয়, দক্ষিণ আমেরিকা, মধ্যপ্রাচ্য, অস্ট্রেলিয়া এশিয়াসহ বিশ্বের প্রায় সব অঞ্চলেই এমনটি দেখা যাচ্ছে। বাংলাদেশও এর ব্যতিক্রম নয়। বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের জেলাগুলোতে বিশেষ করে নাটোর, রাজশাহী, রংপুর, দিনাজপুর, পঞ্চগড়, লালমনিরহাটসহ বিভিন্ন জেলার মানুষকে ৩-৪ মাইল হেঁটে কলসিতে করে খাবার পানি নিয়ে আসতে হয়ে। এর কারণ সেখানে ভূ-গর্ভস্থ পানির স্বল্পতা। আবার দেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের জেলাগুলোতে ভূ-গর্ভস্থ পানিতে দেখা দিয়েছে আর্সেনিক, উপকূলীয় অঞ্চলের পানি লবণাক্ত।

www.nagorikpathagar.org

পানির রাজনীতি

১৯৯২ সালের বিশ্ব পরিবেশ সম্মেলনের অন্যতম আয়োজক স্যার ক্রিসপেন টিকেল (Sir Crispen Tickell) পানি সম্পর্কে কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, তেলের ন্যায় পানি নিয়েও বড় সংকট হতে পারে। ইউনেস্কোর মহাপরিচালক কইচিরো মাতসুরা সম্প্রতি এক বাণীতে উল্লেখ করেছেন, "এ শতাব্দীর পানি নিরাপত্তার জন্য গতিশীল কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।" বিশ্ব ব্যাংকের ভাইস প্রেসিডেন্টও ১৯৯৫ সনে বলেছিলেন, "বিগত শতাব্দীতে তেল নিয়ে পৃথিবীতে অনেক যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে কিন্তু এ শতাব্দীতে সেই বিশ্বেরই সংঘাত পানি নিয়ে ঘটতে পারে।" জাতিসংঘের হিসাব অনুযায়ী, আগামী ২৫ বছরে ১০০ কোটি মানুষের জন্য বিশুদ্ধ ও দূষণমুক্ত পানির অভাব দেখা দিতে পারে। পৃথিবীতে প্রতি বছর পানিবাহী অসুখে আক্রান্ত হয় ৩৩৫ কোটি মানুষ। দূষিত ও অস্বাস্থ্যকর পানি পান করার জন্য প্রতি বছর ৫৩ লাখ মানুষের মৃত্যু ঘটে। দূষিত পানি ব্যবহার করার ফলে পানিবাহী রোগে প্রতি ৮ সেকেন্ডে একটি শিশু মারা যায় ।

১৯৮১ সালে ইকোয়েডর ও পেরুর মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল আমাজনের হেডওয়াটার নাব্যতা সুবিধা নিয়ে। মধ্যপ্রাচ্যের প্রধান নদীগুলোর পানি বণ্টন বিষয়টি মারাত্মক আঞ্চলিক সংঘাতের কারণ ছিল। যেমন জর্ডান নদী ইসরাইল, জর্ডান এবং লেবাননের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। টাইগ্রিস ইউফ্রেটিস নদীর পানি ইরান, ইরাক, সিরিয়া ও তুর্কীর জন্য তাৎপর্যপূর্ণ। নীল উপত্যকার পানি মিসর, ইথিওপিয়া এবং সুদানের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। সাহারা মরুভূমি নিচের ফসিল ওয়াটার (Great Man - Made River Project) এবং অংশীদারিত্ব নিয়ে লিবিয়া ও মিসরের মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি করেছে। কলোরাডো রিভারের পানির অংশীদারিত্ব নিয়ে আমেরিকা ও মেক্সিকোর মধ্যে বিবাদ ছিল।

আল্লাহর দরবারে পানিসম্পদ পৃথিবীর জনগোষ্ঠীর কল্যাণে সৃষ্টি হয়েছে, এর ভাগাভাগিও হয়েছে আন্তর্জাতিকভাবে। নদীর উৎসস্থল, উজান দেশ অনেক সময় এ পানিসম্পদকে নিয়ন্ত্রণ করে শোষণ ও শাসনের ভূমিকা পালন করে থাকে। এ ক্ষেত্রে কূটনৈতিক কৌশলও ভীষণ তাৎপর্যপূর্ণ। বাংলাদেশের উজানে ফারাক্কা বাঁধ দিয়ে ভারত কলকাতার নাব্যতা ঠিক রেখেছে, যার পরিণতি হিসেবে বাংলাদেশের ৫টি এলাকার নদীগুলোর তলদেশ ভরাট হয়ে এদের অস্তিত্ব বিপন্ন হবার পথে। ফলে শুকনো মৌসুমে সৃষ্টি হয় পানির জন্য হাহাকার আর বর্ষা মৌসুমে বাঁধ খুলে দিলে ভাটি এলাকা বাংলাদেশে দেখা দেয় মহাপ্লাবন। (উৎস : পাক্ষিক চিন্তা জুন/১৯৯৯)

বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক নদীগুলোর উৎস ও এদের অবস্থা

উপমহাদেশের মতো বাংলাদেশের প্রধান নদীগুলোর উৎস হিমালয়ের হিমবাহগুলো। এসব উৎস দ্রুত পরিবর্তন হচ্ছে। এর প্রধান এবং অন্যতম কারণ হচ্ছে পৃথিবীর জলবায়ুর দ্রুত

www.nagorikpathagar.org

পরিবর্তন। পৃথিবীর উষ্ণতার বৃদ্ধির ফলে আন্তর্জাতিক জনগোষ্ঠী উদ্বিগ্ন। পৃথিবীর জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে এসব নদীর ওপর গড়ে উঠা জনজীবন, অন্যান্য প্রাণী ও উদ্ভিদের ওপর মারাত্মক প্রতিক্রিয়া দেখা দিচ্ছে। আন্তর্জাতিক তুষার ও বরফ কমিশন (আই সি এস আই) এক সমীক্ষা প্রতিবেদনে জানিয়েছে যে, এভাবে তুষার গলতে থাকলে ২০৩৫ সাল নাগাদ এগুলোর অস্তিত্বের আশংকা রয়েছে। হিমালয়ের হিমবাহের মোট সংখ্যা ১৫টি। সিন্ধু, গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্রের পানির উৎস এ হিমবাহগুলো। গঙ্গার অববাহিকার জনবসতির সংখ্যা প্রায় ৫০ কোটি বা পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার শতকরা প্রায় ১০ ভাগ।

হিমবাহ বিশেষজ্ঞদের মতে, হিমালয়ের হিমবাহগুলোতে জমে আছে প্রায় ১২ হাজার ঘন কিলোমিটার বিশুদ্ধ পানি। এ অঞ্চলে আবহাওয়ার তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণে এর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই বিচিত্র প্রাণী ও উদ্ভিদের এ লীলাভূমির নিয়ামক হিসেবে কাজ করছে হিমবাহগুলো। সূর্যতাপ, মানুষের বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের ফলে হিমবাহ ক্রমান্বয়ে ছোট হয়ে যাচ্ছে এবং পাতলা হয়ে যাচ্ছে। পৃথিবীর আবহাওয়া পরিবর্তনের ফলে এর উষ্ণতা বৃদ্ধিই মূলত দায়ী। বিজ্ঞানীরা হিমালয় পর্বতমালার হিমবাহ সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে (মধ্য ও পূর্বাঞ্চল) বলে আশংকা করছেন। কারণ হচ্ছে, এসব এলাকায় যারা বসবাস করছেন, তারা অর্থনৈতিক দিক দিয়ে অত্যন্ত অনগ্রসর ও পশ্চাৎপদ। তাদের জীবিকা নির্বাহের জন্য বৃক্ষ নিধন, শিফটিং কালটিভেশন, বন্য প্রাণী শিকার ও অবকাঠামোর উন্নয়ন, জনবসতি ও শিল্প কারখানা স্থাপন এ জন্যে বিশেষভাবে দায়ী। গত এক দশকে গঙ্গা নদীর উৎসে দোকরিয়ানী বামাক গঙ্গোত্রির পরিধি সংকুচিত হচ্ছে অত্যন্ত আশংকাজনকভাবে। বিজ্ঞানীরা বলেন, ১৮৪২ থেকে ১৯৩৫ সাল পর্যন্ত হিমবাহ সংকুচিত হচ্ছে গড়ে প্রতি বছর ৭.১৩ মিটার হারে। এ সংকোচনের পরিমাণ ১৯৩৫ সাল থেকে ১৯৯০ এ দাঁড়িয়েছে গড়ে প্রতি বছর ১৮ মিটার হারে। এভাবে প্রাকৃতিক পরিবর্তনের নিম্নভাগের দেশ হিসেবে বাংলাদেশে বর্ষা মৌসুমে অতিরিক্ত পানি প্রবাহের ফলে মারাত্মক বর্ষার প্রাদুর্ভাব দিন দিন আরো বৃদ্ধি পাবে। পক্ষান্তরে নদীর তলদেশগুলো শুকিয়ে যাবার ফলে শুকনো মৌসুমে কোন পানি প্রবাহ থাকবে না। যার পরিণামে বিপন্ন হবে এ দেশের জন-জীবন ও অর্থনীতি। (পরিবেশপত্র ২রা জুন/১৯৯৯ ইং)।

পানি সৃষ্টির শ্রেষ্ঠতম নেয়ামত

পানি আল্লাহর সৃষ্টির অমূল্য সম্পদ। প্রাণের অস্তিত্বের সঙ্গে পানির সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়। পানি মহান আল্লাহ প্রদত্ত সৃষ্টি জগতের জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ নেয়ামত। পবিত্র কোরআন ও হাদিসে পানির গুরুত্ব সম্পর্কে ব্যাপক আলোচনা করা হয়েছে। অপরদিকে আধুনিক বিজ্ঞান পানিকে প্রাণের উৎপত্তি হিসেবে বর্ণনা করে এ নিয়ে গবেষণা করে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সফলতা অর্জন করছে। পানি এমনি এক পদার্থ যার কোন স্বাদ, গন্ধ ও রং নেই অথচ এর ব্যবহার ব্যাপকভিত্তিক। পানি অত্যন্ত সহজলভ্য এবং এর সংকট কখনও দীর্ঘস্থায়ী হয় না। পানির

www.nagorikpathagar.org

পর্যাপ্ত সরবরাহের কারণেই সৃষ্টি জগৎ সচল রয়েছে। পানির সাময়িক সংকট প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষায় হুমকি হয়ে দাঁড়ায়। বিজ্ঞানীদের মতে, সৌরজগতের একমাত্র গ্রহ 'পৃথিবী'তেই পানির অস্তিত্ব বিদ্যমান। পৃথিবীকে সৃষ্টি করা হয়েছে এমনভাবে যেখানে প্রয়োজনীয় ও পর্যাপ্ত পানির সুব্যবস্থা রয়েছে। তাই পৃথিবী মানুষের বসবাসের ক্ষেত্রে সর্বাধিক উপযোগী। কারণ মানুষের বসবাসের জন্য অন্যান্য প্রাণী ও উদ্ভিদের সহাবস্থান সম্পর্কযুক্ত। পানির উপস্থিতির কারণেই পৃথিবীতে প্রাণী ও উদ্ভিদের অবস্থান, বংশ বৃদ্ধি এবং অস্তিত্ব টিকে আছে। মহান আল্লাহ পৃথিবীকেই একমাত্র মানুষের আবাসস্থল ও তাতে পানির গুরুত্ব সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে উল্লেখ করেছেন, 'তিনিই পৃথিবীকে করেছেন বসবাস উপযোগী এবং এর মাঝে প্রবাহিত করেছেন নদী-নালা' (সূরা- নমল, আয়াত ৬১)। 'তুমি কি দেখ না আল্লাহ আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেন, তারপর ভূমিতে স্রোতরূপে তা প্রবাহিত করেন এবং তা দিয়ে বিচিত্র বর্ণের ফসল উৎপাদন করেন?' (সূরা যুমার আয়াত-২১)। আল্লাহ সমস্ত পৃথিবীর ৭০ ভাগ পানিতে পূর্ণ করে রেখেছেন. যা কখনও হ্রাস পায় না। সাগরের মাধ্যমে তিনি পানি সংরক্ষণ প্রক্রিয়া অব্যাহত রেখেছেন এবং তা থেকেই বৃষ্টি আকারে পানি পরিশোধন করে পরিমিতভাবে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে মজুদ করে রাখেন। 'আমি আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করি পরিমিতভাবে, তারপর আমি সেই পানি মাটিতে সংরক্ষণ করি, আমি সেই পানি অপসারিত করতেও সক্ষম' (সূরা মুমিনুন, আয়াত-১৮)। আল্লাহ যে পানি কুদরত হিসেবে আমাদের দান করেছেন তার সংরক্ষণ ও বিতরণ ক্ষমতা একমাত্র তারই হাতে। তিনি ইচ্ছে করলে পানি আমাদের নাগালের বাইরে নিয়ে যেতে পারেন, আবার সমস্ত পানিকে লবণাক্ত করে দিতে পারেন, যা আমাদের ব্যবহারের ক্ষেত্রে অপ্রতুল্য হয়ে যেতে পারে। কিন্তু আল্লাহ পানিকে করেছেন অবারিত ও সহজলভ্য। 'আমরা ফলদায়ক বায়ু প্রেরণ করি, তারপর আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করি এবং তা তোমাদের পান করতে দেই, এ পানির ভাণ্ডার তোমাদের নিকট নেই' (সূরা হিজর, আয়াত-২২)।

পানিসম্পদের অব্যবস্থাপনা সম্পর্কে আল্লাহ্ মানুষকে সতর্কও করে দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে 'বল, তোমরা চিন্তা করে দেখেছ কি যদি ভূগর্ভ তোমাদের নাগালের বাইরে চলে যায়, কে তোমাদের এনে দিবে প্রবহমান পানি?' (সূরা মূলক, আয়াত-৬৭)। মহান আল্লাহ্ পানি ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে আমাদের চিন্তা করতে বলেছেন এবং এই মহামূল্যবান পানি প্রাপ্তিতে আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের কথা বলেছেন। 'তোমরা চিন্তা করেছো? তোমরাই কি পানি মেঘ থেকে নামিয়ে আন, না আমি তা বর্ষণ করি? আমি ইচ্ছা করলে তা লবণাক্ত করে দিতে পারি। তবুও কেন তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর না?' (সূরা ওয়াকিয়া, আয়াত ৬৮-৭০)। প্রাণী ও উদ্ভিদের জীবন পানির ওপর নির্ভরশীল। বিজ্ঞানীদের মতে, সাগরের পানিতে প্লাবিত ও ডুবন্ত অবস্থায় রয়েছে ভূপৃষ্ঠ অপেক্ষা অধিক প্রাণী ও উদ্ভিদ, পানিকে ঘিরেই যাদের অস্তিত্ব। নানাভাবে ব্যবহারের ফলে পানি নিয়ে চলছে ব্যাপক গবেষণা। পানিকে কাজে লাগিয়ে উদ্ভাবিত হয়েছে বিদ্যুৎ শক্তি, অপরদিকে পানিকে বাষ্পে

www.nagorikpathagar.org

পরিণত করে বিভিন্ন দেশ কৃষি ও শিল্প ক্ষেত্রে ব্যাপক উন্নয়ন সাধিত করেছে। WHO, FAO, ISO-সহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্য সম্পর্কিত গবেষণামূলক প্রতিষ্ঠান পানি নিয়ে ব্যাপক গবেষণা চালাচ্ছে। তারা মানুষের দেহ সুস্থ রাখতে পানিতে বিভিন্ন খনিজ উপাদান ও পানিকে দূষণমুক্ত রাখার প্রক্রিয়া সম্পর্কে কাজ করে যাচ্ছে। আধুনিক বিশ্বে বিজ্ঞানীরা মানব শিশুর দাঁত গজানো থেকে শুরু করে দেহের পুষ্টি সাধন পর্যন্ত পানির প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেছেন। অঞ্চলভেদে ভৌগোলিক অবস্থানের ওপর নির্ভর করে পানিতে রয়েছে ২০/২৫ প্রকারের খনিজ পদার্থ। এসব খনিজ পদার্থের রয়েছে নানাবিধ কার্যকারিতা। পানিতে বিদ্যমান উল্লেখযোগ্য খনিজ পদার্থগুলো হচ্ছে ক্যালসিয়াম, বাই-কার্বনেট, সোডিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম, আয়রন, কপার সালফেট, ফ্লোরাইড ইত্যাদি। এসব খনিজ পদার্থ মানবদেহ এবং উদ্ভিদ ও অন্যান্য প্রাণীর দেহের জন্য অতি প্রয়োজনীয়। চিকিৎসা ক্ষেত্রে পানির ব্যবহার অতি প্রাচীন। বর্তমানে আধুনিক চিকিৎসা ক্ষেত্রেও পানির ব্যবহার ক্রমেই বাড়ছে। শুধু বিশুদ্ধ পানি বোতলজাত করে বিভিন্ন দেশে গড়ে উঠছে শিল্প কলকারখানা। আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির ক্ষেত্রে পানির ভূমিকা আদিকালের। সাম্প্রতিককালে পানিতে 'আর্সেনিক' সমস্যা মারাত্মক আকার ধারণ করছে। এ অবস্থায় আর্সেনিকমুক্ত বিশুদ্ধ খাবার পানি পাওয়াই দুষ্কর হয়ে পড়েছে। তবে আর্সেনিক থাকলেই পানি খাবার অযোগ্য হয় না। বাংলাদেশের জন্য পানিতে লিটারপ্রতি ৫০ মাইক্রোগ্রামের বেশি আর্সেনিক ক্ষতিকর। বাংলাদেশের অধিকাংশ এলাকার পানিতে মাত্রাতিরিক্ত আর্সেনিকযুক্ত পানি মিলছে- এ ক্ষেত্রে আর্সেনিক থেকে রক্ষা পেতে 'বৃষ্টির পানি' ব্যবহারের পরামর্শ দেয়া হচ্ছে বিজ্ঞানভিত্তিতে। অথচ আল্লাহ বৃষ্টির পানিকে 'বিশুদ্ধ পানি' হিসেবে ঘোষণা দিয়েছেন বহু আগেই। 'আল্লাহ স্বীয় অনুগ্রহের প্রাক্কালে সুসংবাদবাহীরূপে বায়ু প্রেরণ করেন, তা মৃত ভূখণ্ডকে সঞ্জীবিত করতে ও অসংখ্য জীবজন্তু এবং মানুষের তৃষ্ণা নিবারণের জন্য' (সূরা ফুরকান, আয়াত-৪৮-৪৯)।

আল্লাহ প্রদত্ত আবে জমজমের পানি ও হাউজে কাউছারের পানি সম্পর্কে পবিত্র কোরআন ও হাদিসে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করা হয়েছে। আল্লাহ তার পছন্দের বান্দাদের সর্বপ্রথম আপ্যায়িত করবেন কাঙ্ক্ষিত হাউজে কাউছারের পানি দিয়ে। আবে জমজমের পানির উপকারিতার খ্যাতি বিশ্বব্যাপী। এ পানি বহু জটিল রোগের মহৌষধ হিসেবে বিবেচিত। প্রতিদিন জমজমের পানি সরবরাহ হচ্ছে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে। নবজাতক থেকে শুরু করে মৃত্যু পথযাত্রী পর্যন্ত সবার কাছেই এ পানির চাহিদা। মহানবী (সাঃ) পানির উপকারিতা প্রসঙ্গে বিভিন্ন সময়ে উল্লেখ করেছেন, তিনি পানির অপচয় রোধ ও পানিকে দূষণমুক্ত রাখতে বলেছেন। আজ বিশ্বব্যাপী দাবি উঠেছে পানি দূষণমুক্ত রাখার জন্য। আল্লাহর দেয়া এ পানি মহান নেয়ামত, যার সুষ্ঠু ব্যবহার ও সংরক্ষণ সৃষ্টি জগতের জন্য অতি প্রয়োজন। (যুগান্তর ঃ ১৩.০৯.২০০২ ইং)।

www.nagorikpathagar.org

পানি সংরক্ষণ ঃ ইসলামের বিধান

পানিসম্পদ সংরক্ষণ এবং দূষণ নিষিদ্ধ প্রসঙ্গে কোরআন শরিফে বহু আয়াত এবং হাদিসের অনেক নির্দেশাবলী রয়েছে। পবিত্র কোরআনের এক আয়াতে উল্লেখ রয়েছে "খাও, পান কর এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি কর না।" (সূরা বাকারা ২ ঃ ৬০)। ফাসাদ বা বিপর্যয় দ্বারা আল্লাহর দেয়া রিযক ও পানীয় ক্ষতিগ্রস্ত করাকে বুঝানো হয়েছে। পানি অপচয় ইসলামে নিষিদ্ধ, এ বিধান ব্যক্তিমালিকানা পানি অথবা সরকারি মালিকানা পানি হোক সব ক্ষেত্রেই সমভাবে প্রযোজ্য। পানিসম্পদের সরবরাহ সীমিত হোক অথবা অতিরিক্ত হোক কোন অবস্থাতেই পানিসম্পদের অপচয় করা যাবে না। এ প্রসঙ্গে হাদিসে বর্ণিত রয়েছে যে, একদিন মহানবী (সাঃ) তাঁর সাহাবা হযরত সা'দ (রাঃ) কে পানি অপচয় করে অজু করতে দেখেছিলেন। মহানবী (সাঃ) সা'দ (রাঃ) কে জিজ্ঞেস করলেন, এভাবে পানি অপচয় করছ কেন সা'দ? সা'দ (রাঃ) মহানবীকে (সাঃ) জিজ্ঞেস করলেন নামাজের জন্য অজু করার সময় অতিরিক্ত পানি ব্যবহার করাও কি অপচয়? মহানবী (সাঃ) বললেন, হ্যাঁ, তুমি যদি প্রবহমান নদীতে থাক তথাপি তুমি পানি অপচয় করবে না" (ঈমান আহমাদ, মাসনাদ ও ইবনে মাজা)।

হযরত যাবেদ (রাঃ) বর্ণিত হাদিস- "স্থির পানিতে পেশাব করে অতঃপর সেখানে গোসল করবে না" (বোখারী শরীফ) কেননা সে পানি ব্যবহার করলে কলেরার মতো বড় মহামারী ও অন্যান্য রোগাক্রান্ত হতে পারে। অনুরূপভাবে প্রবহমান পানিতে পেশাব করাও নিষিদ্ধ, বলা হয়েছে, "মহানবী (সাঃ) প্রবহমান পানিতেও পেশাব না করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন" (তিবরানী)। এসব নিষেধাজ্ঞার উদ্দেশ্য হল পানিকে সকল প্রকার পঙ্কিলতার থেকে সংরক্ষণ রাখা।

পানি দূষণ করা গর্হিত পাপ, এ প্রসঙ্গে এক হাদিসে বলা হয়েছে, তিনজন অভিশপ্ত ব্যক্তি থেকে দূরে থেকো- যে ব্যক্তি মলমূত্র ত্যাগ করে পানিতে, গাছের ছায়ায় এবং মানুষের চলার পথে। পানিতে মলমূত্র ত্যাগ করা অত্যন্ত পাপের কাজ। এ কাজ থেকে সর্বদা বিরত থাকার জন্য মহানবী (সাঃ) তাঁর উম্মতদের সতর্ক করে দিয়েছেন। কেননা পানি দূষণ করলে প্রাণীকূলের রিযক ও আবাসস্থলও দূষিত হয়ে যায়, যা হত্যা করার শামিল। এক্ষেত্রে শিল্প কারখানায় বর্জ্য নদী বা পানি প্রবাহে প্রেরণ করা যে কত মহাপাপ তা সহজেই অনুমেয়। অনুরূপভাবে রাস্তার ধারে/পানিতে পেশাব করা বা মলমূত্র ত্যাগ করা অথবা রাস্তায় /পানিতে বর্জ্য ফেলাও অত্যন্ত পাপ কাজ।

পানি আল্লাহ তা'আলার নিয়ামতরাজির অন্যতম নিয়ামত বা অনুগ্রহ। পবিত্র কোরআনের ভাষ্যমতে- আল্লাহ্ তাঁর এই অনুগ্রহ সৃষ্টি জগতের জন্য পূত-পবিত্র, বিশুদ্ধরূপে অবতীর্ণ করেন ঃ আমি আকাশ থেকে পূত-পবিত্র পানি অবতীর্ণ করি। (আল কোরআন ২৫ : ৪৮) মানব জাতিকে তাঁর এই অনুগ্রহ স্মরণ করিয়ে দিয়ে পবিত্র কোরআনে আরো বলা হয়েছে -

www.nagorikpathagar.org

মানুষ তার খাদ্যের প্রতি লক্ষ্য করুক, আমি আশ্চর্য উপায়ে পানি বর্ষণ করেছি। এরপর আমি ভূমিকে বিদীর্ণ করেছি। অতঃপর তাতে উৎপন্ন করেছি শস্য, আঙ্গুর, শাক-সবজি, যয়তুন, খেজুর, ঘন উদ্যান, ফল এবং ঘাস, তোমাদের ও তোমাদের চতুষ্পদ জন্তুদের উপকারার্থে। (আন-নহল ১৬ : ৬৫)।

তাই "আল্লাহ্‌র এই অসামান্য অনুগ্রহের সংরক্ষণ করা আল্লাহ্‌র ফরযসমূহের মধ্যে অন্যতম ফরয, যা মানব কল্যাণের জন্য বিনা প্রয়োজনে তা ধ্বংস করা অন্যায়। ব্যবহারের ক্ষেত্রে পানির অপচয় (যদিও তা প্রবহমান নদীর পানি হয়) করা মাকরুহ এবং কোন কিছুর মাধ্যমে পানিকে দূষিত করা যাবে না।" (আল-ইসলাম ওয়া হিমায়াতুল বিয়া পৃঃ ৭৫)

পানিসম্পদের মালিকানা

পানিসম্পদের মালিকানা বা ব্যবহার কেউ এককভাবে দাবি করতে পারে না। এ প্রসঙ্গে একটি হাদিসে বর্ণিত রয়েছে যে, এক আনসারী হযরত জোবায়ের (রাঃ) এর সাথে হেরা ক্যানেলের পানি ব্যবহার নিয়ে মহানবী (সাঃ) এর সামনে ঝগড়া করেছিলেন। এ নালার পানি তারা খেজুর ক্ষেতে সেচের কাজে ব্যবহার করতেন। আনসারী ব্যক্তি হযরত জোবায়ের (রাঃ) কে বলেছিলেন তার ক্ষেতে পানি সরবরাহের অনুমতি দিতে, কিন্তু তিনি অস্বীকার করেন। অবশেষে বিষয়টি মহানবী (সাঃ) এর কাছে সিদ্ধান্তের জন্য উপস্থাপন করা হয়। মহানবী (সাঃ) জোবায়ের (রঃ) কে নির্দেশে দিলেন তোমার প্রতিবেশীর জমিনে সেচের পানি সরবরাহের সুযোগ দাও। (খান মোঃ মোহসীন, ১৯৭৯ বোখারী (ইং) ভলিয়ুম-২ পৃঃ ৩১৭)।

বহুবিধ ব্যবহারের ফলে পানিসম্পদের সরবরাহ ক্রমান্বয়ে সীমিত হয়ে আসছে। মুসলমান বিচারকদের দীর্ঘ ব্যবহারিক অভিজ্ঞতায় পানিসম্পদের সুষ্ঠু ও উত্তম ব্যবহারের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত রয়েছে, যা থেকে পানিসম্পদের ব্যবহারের সঠিক শিক্ষা নেয়া যেতে পারে। উপর্যুক্ত আয়াত এবং হাদিসসমূহের আলোকে এ কথা স্পষ্টতঃই প্রতীয়মান হয় যে, পানি দূষিত করলে তা অন্যকে বিশুদ্ধ পানি ব্যবহার করা থেকে বঞ্চিত রাখা হয়। তাই পানি দূষিত করা কোরআন হাদিসের নির্দেশ সরাসরি লঙ্ঘনের শামিল। বৃষ্টির পানি, হ্রদের পানি, পুকুরের পানি, ঝরনার পানি, নদী এবং সাগরের পানি স্বভাবতঃ বিশুদ্ধ। বিশুদ্ধতার অর্থ যে পানি দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করা যায়। প্রবহমান পানি দ্বারা পবিত্রতা অর্জন এবং পান করার যোগ্য। প্রাকৃতিক পানিসম্পদ স্বভাবতঃ বিশুদ্ধ যতক্ষণ এর রং, স্বাদ ও গন্ধ অপরিবর্তিত থাকে। পেশাব, পায়খানা, মলমূত্র, অথবা বিষাক্ত দ্রব্য মিশলে পানি দূষিত হয়ে যায়। পানিসম্পদ সংরক্ষণের মূল্যবোধ ধর্মপ্রাণ মানুষের মধ্যে তুলে ধরার ব্যাপারে শিক্ষিত ও আলেম সমাজের দায়িত্ব রয়েছে।

www.nagorikpathagar.org

পানিসম্পদ সংরক্ষণে অন্যান্য ধর্মের বিধান

জন হাইনেলস উল্লেখ করেছেন জোরাস্টার (Zoroaster) শিক্ষা দেয়- "মানুষের গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল একতা সংরক্ষণ করাই নয় শুধু, বরং সকল প্রাণীকুলের একতা বা সমন্বয় সাধন করাও" (সেখনা, ১৯৯২)। জোবাসত্রিয়ানদের প্রার্থনা হল পাহাড়, ঝরনার পানি, সমুদ্র, সবুজ শস্য এবং উড়ন্ত পাখী, ধরিত্রী ও তার সকল সৃষ্টির প্রশংসা করা।

বৌদ্ধ ধর্মের অত্যন্ত পরিচিত প্রার্থনা হল, "সকল প্রাণীর জন্য সুখ শান্তি কামনা করা।" পানি সব জীবের জীবনধারণের অত্যাবশ্যক উপাদান এবং অনেক প্রাণীর আবাসস্থল। এ সম্পদের সংরক্ষণ বিঘ্নিত হলে, প্রাণীকুলের শান্তি বিঘ্নিত অবধারিত। হিন্দু ধর্মের প্রার্থনা ও পূজাঅর্চনা প্রকৃতির ভালবাসার প্রতি। এ ধর্মের আমাদের দেশের অত্যন্ত পরিচিত একটি অনুষ্ঠান গঙ্গাস্নান। যে পানি দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করা হয়, সে পানি দূষণ করার সুযোগ কোন ধর্মেই নেই।

পানিসম্পদ সংরক্ষণে ধর্মীয় মূল্যবোধ তুলে ধরা সংক্রান্ত সুপারিশ (Agenda) ২১এ ও রয়েছে। জাতিসংঘের এজেন্ডা (Agenda) ২১ এ ঐতিহ্যগত (Traditional) জ্ঞানকে আধুনিক বিজ্ঞান, দেশীয় প্রথা, ধর্ম এবং সংস্কৃতির সাথে সমন্বয় করার সুপারিশ করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে জাতীয় শিক্ষা কার্যক্রমে বিজ্ঞান এবং প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার ও সংরক্ষণের বিষয়গুলো সমন্বিতভাবে পাঠদানের জন্য উদ্যোগ নেয়া যেতে পারে। সব ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান যেমন মসজিদ, মন্দির ও গীর্জা তাদের প্রতিটি আলোচনার মধ্যে এসব আলোচনা তুলে ধরা যেতে পারে। পানিসম্পদ সংরক্ষণ সংক্রান্ত ধর্মীয় নির্দেশগুলোর উদ্ধৃতি দিয়ে প্রতিটি জলাশয়ের পাশে সচিত্র পোস্টারের মাধ্যমে গণসচেতনতা সৃষ্টি করা যেতে পারে। সচিত্র পোস্টারের মাধ্যমে করণীয় ও বর্জনীয় বিষয়গুলোও তুলে ধরা যেতে পারে। পানিসম্পদের ব্যবহার ও সংরক্ষণ সংক্রান্ত গণমাধ্যম, টেলিভিশন, রেডিও এবং পত্র পত্রিকায় বিশেষ সচিত্র প্রতিবেদন, টক শো, আলোচনা এবং বিতর্ক ও বিশেষজ্ঞদের সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে গণসচেতনতা সৃষ্টি করা যেতে পারে।

পানি সংরক্ষণে ব্যক্তিগত নৈতিক মূল্যবোধ

নদী বিশেষজ্ঞরা আশংকা করছেন, যদি এখনই বিশেষ উদ্যোগ না নেয়া হয় তাহলে ২০১৫ সালের মধ্যে বুড়িগঙ্গা চিরতরে বিলুপ্ত হয়ে যাবে। সেই সঙ্গে দেশের উচ্চ শ্রেণীর জনগোষ্ঠীসহ ১ কোটি লোকের আবাস বিপজ্জনক অস্তিত্বের সম্মুখীন হবে। ঢাকা মহানগরীতে মহামারী, জনস্বাস্থ্যের বিপর্যয়সহ নানাবিধ প্রাকৃতিক ও পরিবেশগত বিপর্যয় নেমে আসবে। নিঃসন্দেহে বিরাট ও ব্যাপকভাবে সরকারি উদ্যোগ নেয়া হয়েছে, কিন্তু সফল হয়নি কেন এ বিষয়ে অনেক গবেষণা করার সুযোগ রয়েছে। বাহ্যিক কারণ হিসেবে সরকার ও গবেষকরা নিশ্চয়ই বলবেন, বাজেটের সীমাবদ্ধতা, কারিগরি দুর্বলতার কথা। তাছাড়া আরো কিছু কারণ নিঃসন্দেহে চিহ্নিত করার প্রয়োজন রয়েছে, যেমন রাজনৈতিক সদিচ্ছা,

www.nagorikpathagar.org

আমরা গণসচেতনতা ও সাধারণ মানুষের সহযোগিতার অভাব। এ বিষয়েও উদ্যোগের তেমন অভাব আছে বলে মনে হয় না। রাজনৈতিক মঞ্চ ও স্থানীয় সরকার প্রশাসকরা নিজেরাও বহুবার তাদের এ সদিচ্ছার কথা বলে আসছেন। দেশী-বিদেশী এনজিওসহ বহু সরকারি প্রতিষ্ঠান, বহু প্রশিক্ষণ সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, পোস্টার ইত্যাদির মাধ্যমে বহু প্রচেষ্টার উদ্যোগ নেয়ার পরও কেন সুফল পাওয়া যাচ্ছে না, এ বিষয়টি আরো খতিয়ে দেখার প্রয়োজন রয়েছে। এতো প্রচেষ্টার মাঝে যে গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষার অভাব তাহল আমাদের মূল্যবোধ। এ প্রসঙ্গে আমাদের দেশের প্রচলিত সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে বিবেচনা করলে দেখা যাবে প্রতিটি মানুষই তার নিজ নিজ ধর্মের প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল। যদি ইসলাম ধর্মের কথা বলা হয়, তাহলে প্রশ্ন থেকে যায় প্রশাসক মহোদয় কি অবহিত আছেন। সামাজিক দায়বদ্ধতা ছাড়াও সমাজের প্রতিটি দায়িত্বশীল মানুষ তার নিজ নিজ অবস্থানের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করেছেন কি সে বিষয়ে, আল্লাহর কাছে জবাবদিহিতা করতে হবে। যেমন হাদিসে উল্লেখ রয়েছেঃ "প্রতিটি মানুষকেই তার নিজ নিজ দায়িত্ব সম্বন্ধে আল্লাহর কাছে জবাবদিহি হতে হবে।" তাই কোন প্রশাসকের এতটুকু ইমানী তাকিদ থাকলে তার রাজনৈতিক অঙ্গীকারের কথা নতুনভাবে স্মরণ করানোর নিশ্চয়ই প্রয়োজন হবে না।

এবার দেখা যাক সমাজের সাধারণ মানুষের কথা, তাদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করার জন্যও ঢাকা শহরসহ সারা দেশে বহু উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। তারপরও কোন সুফল নেই। এর একটি কারণ হচ্ছে নাগরিক দায়িত্বের প্রতি অবহেলা, অন্যটি হলো ধর্মীয় মূল্যবোধের অভাব। রাজনৈতিক ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের নেতৃবৃন্দের মতো দেশের ধর্মপ্রাণ মানুষের মধ্যে ইমানী চেতনা এবং আল্লাহকে খুশি করতে হলে তার প্রকৃতির প্রতি কি আচরণ করতে হবে এ বিষয়ে গণসচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে। মুসলমান সমাজে নামাজ-রোজা, যাকাতের মধ্যেই ধর্মকে সীমাবদ্ধ রাখলে হবে না। প্রাকৃতিক সমাজে বিভিন্ন উপায়ে আল্লাহর সৃষ্ট মানুষকে প্রাণী ও উদ্ভিদকুল সেবা প্রদান করে থাকে। এসব প্রাকৃতিক সম্পদের অপচয় অথবা নষ্ট (গুণগত পরিবর্তন) করলে অন্যান্য মানবগোষ্ঠী এ সেবা থেকে বঞ্চিত থাকে, তাকে "হক্কুল এবাদ" বলা হয়। বিচারের দিন প্রতিটি মানুষকে দু'টি বিষয়ে জবাবদিহিতা করতে হবে, একটি 'হক্কুল্লাহ' যেমন নামাজ, রোজা ইত্যাদি, এগুলো প্রতিপালন না করলে আল্লাহ তার অসীম করুণা দিয়ে অথবা অন্য কোন মহৎ কাজের জন্য মহান আল্লাহ অত্যন্ত সদয় হয়ে তাকে ক্ষমা করে দিতে পারেন। যেমন একটি তৃষ্ণার্ত কুকুরকে পানি পান করানোর জন্য একজন ব্যভিচারী মহিলাকে আল্লাহ মাফ করে বেহেস্তবাসী করে দিয়েছেন। মানুষকে অন্য যে বিষয়ে বিচারের দিন জবাবদিহিতা করতে হবে তা'হল "হক্কুল এবাদ", তার অর্থ হচ্ছে প্রতিটি মানুষেরই অন্য মানুষ এবং আল্লাহর অন্যান্য সৃষ্টির প্রতি দায়িত্ব রয়েছে তা সে যথাযথভাবে পালন করেছে কিনা। সে দায়িত্ব প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ হতে পারে। পরোক্ষ দায়িত্বের প্রকৃষ্ট উদাহরণ এ ক্ষেত্রে প্রকৃতি এবং পরিবেশের বিপর্যয়ের কোন কারণ ঘটিয়ে মানব সমাজ, প্রাণীকুল এবং উদ্ভিদ জগতের ক্ষতি সাধন থেকে রক্ষা করা।

www.nagorikpathagar.org

যেহেতু আল্লাহকে অত্যন্ত ন্যায়পরায়ণ বলে বিশ্বাস করি এ ক্ষেত্রে নিজের বিবেককে যদি প্রশ্ন করা হয়, অন্যের হক নষ্ট করার জন্য হাকিম আমাদের ক্ষমা করতে পারেন কি? নিঃসন্দেহে সচেতন বিবেক উত্তর দিবে, না। তাহলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, শুধু আল্লাহর এবাদত করে, তার বান্দার প্রতি প্রয়োজনীয় কর্তব্য ও দায়িত্বকে অবহেলা করলে মহান বিচারের দিন ক্ষমা প্রার্থনা করার জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বা আল্লাহর সৃষ্টির কাছে যেতে হবে। আমাদের গণসচেতনতার মধ্যে ঈমানী বা তাকোয়ার উপাদানগুলো তুলে ধরতে পারলে সব স্তরের জনগণের মধ্যে আরো দায়িত্বশীলতা বৃদ্ধি পাবে এবং জাগরণ সৃষ্টি হবে। তাই শুধু আইন নয়, সামাজিক অবক্ষয় রোধে সুশীল সমাজ গঠনের জন্য ধর্মীয় দৃষ্টিতে সামাজিক মূল্যবোধকে সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে তুলে ধরা একান্ত আবশ্যক। আমাদের মতো সীমিত আয়ের সমাজে শিক্ষা ও মূল্যবোধকে পুঁজি করে বেশিরভাগ শ্রম নির্ভরশীল হয়ে আর্থিক সাশ্রয় ও আত্মনির্ভরশীল সমাজ গড়ার কোন বিকল্প নেই।

পানি সংরক্ষণে নাগরিক ও ব্যক্তিগত দায়িত্ব ও কর্তব্য

আল্লাহ পানি পূত ও পবিত্র করে সৃষ্টি করেছেন, এর উদ্দেশ্যও স্পষ্ট, মানুষ ও প্রাণীজগতের খাদ্যসহ জীবজগতের বাঁচার জন্য সব অত্যাবশ্যকীয় উপাদান এর মধ্যে নিহিত। এ ক্ষেত্রে পানিসম্পদের বৈশিষ্ট্য এমনভাবে পরিবর্তন করা যাবে না যেন মানব তথা জীবজগতের কোন প্রকার ক্ষতির কারণ হতে পারে। তাই আল্লাহর বিশেষ নেয়ামত সম্পর্কে বলা হয়েছে, আমি আকাশ থেকে পূত-পবিত্র পানি অবতীর্ণ করি। (সুরা আল ফুরকান ২৫:৪৮)। আল্লাহর বিশেষ নেয়ামতকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে পবিত্র কোরআনে আরো বলা হয়েছে, মানুষ তার খাদ্যের প্রতি লক্ষ্য করুক, আমি আশ্চর্য উপায়ে পানি বর্ষণ করেছি। এরপর আমি ভূমিকে বিদীর্ণ করেছি। অতঃপর তাতে উৎপন্ন করেছি শস্য, আঙ্গুর, শাক সবজি, যয়তুন, খেজুর, ঘন উদ্যান ফল এবং ঘাস- তোমাদের ও তোমাদের চতুষ্পদ জন্তুদের উপকারার্থে (সুরা আন নহল ১৬:৬৫)।

আল্লাহর এ বিশেষ নেয়ামত এবং অসামান্য অনুগ্রহ মানব কল্যাণে সংরক্ষণ করা এবং এর যথাযথ ব্যবহার আল্লাহ প্রদত্ত ফরজসমূহের মধ্যে অন্যতম ফরজ, বিনা প্রয়োজনে তা নষ্ট/আহরণ গুরুতর অন্যায়। ইসলামী বিধানমতে ব্যবহার ক্ষেত্রে পানির অপচয় করা মাকরুহ এবং কোন কিছুর মাধ্যমেই পানি দূষিত করা যাবে না।

পানির প্রতিটি ব্যবহার যেন বিজ্ঞানসম্মত হয়, মানুষ এবং মানব জাতির কল্যাণে হয় সেদিকে প্রত্যেকটি নাগরিককে শিক্ষা দিতে ইসলামে বিধান রয়েছে। প্রতিটি ব্যবহারের তাৎপর্যও বহুবিধ। এ প্রসঙ্গে এক হাদিসে রয়েছে ঃ হযরত আবু কাতাদাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসুল (সাঃ) পানি পানকারীকে নিষেধ করেছেন পান পাত্রে নিঃশ্বাস ফেলতে (বোখারী)। এছাড়া অন্য হাদিসে রয়েছে, পানি পান করার সময় পাত্রে নিঃশ্বাস ফেলতে নিষেধ করার তাৎপর্য হল পরবর্তী পানকারীদের জন্য পানি দূষিত না করা। কেননা মানুষের নিঃশ্বাসের সাথে কার্বন ডাইঅক্সাইড থাকে, যা মানব স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর।

www.nagorikpathagar.org

এ বিষয়ে আরো বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, সামান্য নিঃশ্বাস ফেলে যেখানে পানির বিশুদ্ধতা নষ্ট না করার জন্য সতর্ক করা হয়েছে, সে ক্ষেত্রে নদীর পানি, পুকুর, জলাশয়/জলাধারে নির্বিচারে আবর্জনা, শিল্প বর্জ্য ফেলা হচ্ছে। সেদিকে কি আমরা লক্ষ্য রাখছি? উন্নয়নের নামে অথবা উন্নত ধান চাষের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের কীটনাশক দেয়া হয় তাতে ধান ক্ষেতের পানি, যা প্রতিনিয়ত প্রবাহিত হয়ে খাল-বিল, নদী ও সাগরে যাচ্ছে। আর সে পানিতে রয়েছে অসংখ্য প্রজাতির প্রাণীর খাদ্য ও আবাসস্থল। এলোপাথাড়ি কীটনাশক ব্যবহারের পরিণাম ব্যক্তিগতভাবে, সামাজিকভাবে, ধর্মীয়ভাবে, সর্বোপরি অর্থনৈতিক বিবেচনায় পর্যালোচনা করে দেখা একান্ত অপরিহার্য। অন্যথায় মূল্য দিতে হবে প্রতিটি জাতীয় অর্থনৈতিক খাতে। পরিবেশ বিপর্যয় সর্বোপরি পানি দূষণ করে পাপ কাজে নিজেকে সংশ্লিষ্ট করে। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কোরআনে মানবজাতিকে আল্লাহ সতর্ক করে দিয়েছেন : "তুমি কি তাদের দেখনি, যারা আল্লাহর নেয়ামতকে কুফরে পরিণত করেছে এবং স্বীয়জাতিকে সম্মুখীন করেছে ধ্বংসের দিকে, তারা তাতে প্রবেশ করবে। সেটা কতই না মন্দ আবাস (সুরা ইব্রাহীম ১৪:২৮)। তাই পানি সংরক্ষণ প্রতিটি মানুষের নাগরিক ও ব্যক্তিগত দায়িত্ব ও কর্তব্য।

উপসংহার

প্রকৃতির সৃষ্টি অসীম, এদের গুরুত্বও অপরিসীম। পানিসম্পদ তার মধ্যে অন্যতম যার অপর নাম জীবন। কারণ সব জীবনের উৎসই পানি। এ সম্পদ যতই অসীম হোক না কেন, অবস্থান এবং ব্যবহার ও সময়ের প্রেক্ষাপটে তার সীমাবদ্ধতা রয়েছে। শুষ্ক মৌসুমে সরবরাহ সীমিত, বর্ষাকালে প্রয়োজনের তুলনায় অনেক বেশি থাকে। কাজেই কোন অবস্থাতেই এ সম্পদ অপরিকল্পিত ও অপরিণামদর্শীর ন্যায় ব্যবহার করা উচিত নয়। আমাদের দেশে ভূ-গর্ভস্থ পানির ব্যবহার সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনামাফিক হচ্ছে বলে প্রতীয়মান হয় না। আমাদের নদী, জলাভূমিগুলোর ব্যবস্থাপনার যে দুরবস্থা তা দেশের টেকসই উন্নয়নের জন্য মারাত্মক হুমকি স্বরূপ। এমতাবস্থায় নীতি নির্ধারক থেকে শুরু করে সাধারণ নাগরিককে পানির গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা বুঝতে হবে। সে সাথে প্রচলিত নীতি ও অনুশাসন ও আচরণবিধি মেনে চলতে হবে। এ দেশের ধর্মপ্রাণ মানুষের মূল্যবোধ ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধকে পুঁজি করে অতিসহজে পানিসম্পদ সংরক্ষণ, নদী রক্ষা, নগর ও ভাটি এলাকার জলাধার রক্ষায় সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলা যেতে পারে। যাতে স্বল্পখরচে সবচেয়ে বেশি সুবিধা পাওয়া যাবে। এ ক্ষেত্রে শহরে ও গ্রামীণ মাদ্রাসা, স্কুল, মসজিদ, মন্দির, বিভিন্ন সমিতি এবং আজও নেটওয়ার্ককে সহজেই কাজে লাগানো যেতে পারে। সরকারি প্রতিষ্ঠানের কাজ হবে উপরোক্ত নেটওয়ার্ককে শক্তিশালী ও জোরদার করে তাদের সেবা নিশ্চিত করা।

www.nagorikpathagar.org

তথ্যসূত্র ঃ

Enayetullah Khan (2000), Bangladesh 2000 - A Prospective study, Water and Environment 2000, FEAJB.

Islam. M Faisal (2003), Food Security and Water Management in New Millenium World Environment Day, 5 June, 2003, MOEF

ড. এফ.এম. মনিরুজ্জামান, বিপন্ন পরিবেশ ও বাংলাদেশ

ড. মোহাম্মাদ আবুল হাসান, বিপন্ন পরিবেশ ও বাংলাদেশ

ডঃ মোহাম্মদ আবুল হাসান, উচ্চ মাধ্যমিক উদ্ভিদবিজ্ঞান, হাসান বুক হাউস, ঢাকা

শাহাব উদ্দীন আহমদ, "নিরাপদ পানি ঃ প্রেক্ষাপট অতীত থেকে বর্তমান," প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৭

এলাহী নেওয়াজ খান, বাংলাদেশে পানি ব্যবস্থাপনায় তীব্র সংকট, দৈনিক ইনকিলাব (ঢাকা, ৩-৭-২০০ইং) পৃষ্ঠা ১১ ও ১৪।

তদেব (তারিখ ১৬-৭-২০০০ইং) পৃষ্ঠা ১ ও ৬

শাহাব উদ্দীন আহমদ, "নিরাপদ পানি ঃ প্রেক্ষাপট অতীত ও বর্তমান," প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৭

আল-কোরআন ঃ ২৫ (আল-ফুরকান) ঃ ৪৮

আল-কোরআন ঃ ১৬ (আন-নাহল) ঃ ৬৫

ড. আবদুর রহমান আল-আদওভী, আল ইসলাম ওয়া হিমায়াতুল বিয়া, ফিকরুল-মুসলেম আল-মু'আসের মাত্রাবি ইয়াশওলুহ, মুয়াস-সাতুলা, কায়রো, ১ম সংস্করণ, ১৯৯৪ পৃষ্ঠা ৭৫

ড. এ এইচ এম মোস্তাইন বিল্লাহ, পানিসম্পদ সংরক্ষণ ও ধর্মীয় প্রভাব, যুগান্তর, ৩০ জুন, ২০০০

ড. এ এইচ এম মোস্তাইন বিল্লাহ (২০০০), জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে ধর্মীয় প্রভাব, যুগান্তর, ১৭ জুন ২০০০

পানি দূষণ ও ধর্মীয় মূল্যবোধ ঃ পানি মরণাপন্ন ২০০ কোটি মানুষ স্মরণিকা, বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০০৩

পাক্ষিক চিন্তা, জুন ১৯৯৯

পরিবেশ পত্র ২ জুন, ১৯৯৯

দৈনিক যুগান্তর, ১৩ সেপ্টেম্বর ২০০২

www.nagorikpathagar.org

ষষ্ঠ অধ্যায়

জলবায়ু পরিবর্তন ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ

স্থলে ও সমুদ্রে বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়েছে মানুষের কৃতকর্মের পরিণাম হিসেবে।
(সূরা-আররূম ৩০:৪১)

সার সংক্ষেপ

জলবায়ু পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জ নিয়ে বিজ্ঞানীরা ছাড়াও নীতি নির্ধারক, রাজনীতিবিদ, অর্থনীতিবিদ, পেশাজীবী, কৃষককুল, ব্যবসায়ী, সুশীল সমাজ সর্বস্তরের জনগোষ্ঠী উদ্বিগ্ন। বিস্ময়কর রহস্য হল, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রধান কারণ উন্নত বিশ্বের লাগামহীন অনৈতিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড। আর এর শিকার হল তৃতীয় বিশ্বের দরিদ্রতম জনগোষ্ঠী। আলোচ্য প্রবন্ধে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বিশ্বব্যাপী প্রভাবগুলো সম্বন্ধে আলোকপাত করা হয়েছে। এ বিষয়ে ধর্মীয় বিধান পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, প্রকৃতির অমোঘ বিধান লঙ্ঘন করে মানুষ অপরিণামদর্শী কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হয়ে সৃষ্টির অপূরণীয় ক্ষতি করে, প্রকৃতিও তার প্রতি বৈরী হয়ে ওঠে। প্রাকৃতিক দুর্যোগের মাধ্যমে তখন তাদের শিক্ষা দেয় এবং সতর্ক করে থাকে। তাই মানুষকে প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষার জন্য এর প্রতি আচরণ ও তাদের কর্মকাণ্ড সংযত ও প্রকৃতিবান্ধব হতে হবে।

জলবায়ু পরিবর্তন ও সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা নিয়ে বিশ্বব্যাপী ব্যাপক গবেষণা হয়েছে। সব গবেষণার ফলাফলে দেখা যায় যে, ২১০০ শতকে সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা ১ মিটারের বেশি বৃদ্ধি পাবে। আর এর পরিণাম হবে ভয়াবহ ও মারাত্মক। আলোচ্য প্রবন্ধে গত দুই দশকে বাংলাদেশে ঘন ঘন প্রাকৃতিক দুর্যোগের এবং এর তীব্রতা ও ক্ষয়ক্ষতির ব্যাপকতা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এসব দুর্যোগ মোকাবেলা না করতে পারলে এ দেশের টেকসই উন্নয়ন মারাত্মক ঝুঁকিপূর্ণ থেকে যাবে, সেই ভয়াবহ চিত্রও তুলে ধরা হয়েছে। সর্বোপরি মানবগোষ্ঠীকেই প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষায় গুরুদায়িত্ব পালন করতে হবে সর্বস্তরে এবং সর্বক্ষেত্রে। এ জন্যে অদূরদর্শী ও অপরিকল্পিত উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে নিজেদের সংযত রেখে প্রতিবেশ ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করতে হয়।

সামাজিক সম্প্রীতি, সৌহার্দ্য, পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে সামাজিক ভারসাম্যও রক্ষা করতে হবে। প্রাকৃতিক বিপর্যয়কে বন্ধ করা মানুষের জন্য সম্ভব নয় তবে অভিযোজনের (Adaptation) মাধ্যমে সম্মিলিতভাবে প্রকৃতিকে মোকাবিলা করা অবশ্যই সম্ভব। এক্ষেত্রে মানুষের নৈতিক বোধ এবং ধর্মীয় মূল্যবোধ ভীষণ সহায়ক ভূমিকা রাখতে পারে।

www.nagorikpathagar.org

সূচনা

জলবায়ু পরিবর্তন হালে বিশ্বের সবচেয়ে আলোচিত চ্যালেঞ্জগুলির অন্যতম বিষয়। বিজ্ঞানীরা ছাড়াও নীতিনির্ধারক, রাজনীতিবিদ, অর্থনীতিবিদ, পেশাজীবী, কৃষককুল ও ব্যবসায়ীসহ সমাজের সর্বস্তরের মানুষ জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রতিক্রিয়া নিয়ে ভীষণ উদ্বিগ্ন। এ বিষয়ে পৃথিবীব্যাপী ব্যাপক গবেষণা চলছে দীর্ঘদিন যাবৎ, কিন্তু এ সমস্যা থেকে উত্তরণের তেমন কোন নিশ্চিত সমাধান আবিষ্কৃত হয়নি আজো। এই পরিপ্রেক্ষিতে সবাইকেই মানুষের অভিযোজন (adaptation) ক্ষমতা বৃদ্ধির প্রতি বেশি গুরুত্ব দিতে হচ্ছে। জাতি, গোষ্ঠী, ধনী, দরিদ্র ও সব ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সম্মিলিত আন্তরিক চেষ্টা করলে নিঃসন্দেহে এ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করা সম্ভব হবে। এ জন্যে প্রয়োজন আধুনিক বৈজ্ঞানিক জ্ঞান, প্রযুক্তির পরিকল্পিত ব্যবহার, রাজনৈতিক অঙ্গীকার, সামাজিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধের সম্মিলিত প্রয়াস।

দুর্ভাগ্যজনক হল জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বিশ্বের দরিদ্র জনগোষ্ঠীই বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। অথচ জলবায়ু পরিবর্তনে তাদের ভূমিকা সর্বনিম্ন। পাশ্চাত্য সভ্যতা ও অপরিণামদর্শী উচ্চাভিলাষী অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ও ভোগবাদী অপসংস্কৃতি বিভিন্নভাবে এ ধরণীকে ঝুঁকিপূর্ণ করে তুলেছে অতিদ্রুত।

বিশ্বের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং এর ফলে সামগ্রিক জলবায়ুর পরিবর্তন ঘটছে ব্যাপক। তাপমাত্রা বৃদ্ধির জন্য গ্রিনহাউজ গ্যাস বলে খ্যাত কার্বন ডাইঅক্সাইড দায়ী। এজন্যে মানুষের অনিয়ন্ত্রিত উচ্চাভিলাষী জীবনযাপন, অপচয়, অনৈতিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড, নির্বিচারে জীববৈচিত্র্য নিধন ও প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণই মূলত দায়ী, যা সামাজিকভাবে এবং ধর্মীয় বিধান অনুসারে প্রকৃতিবিরুদ্ধ কাজ।

ইসলামের মতো সব ধর্মই প্রাকৃতিক বিধান অনুসরণে বিশ্বাসী। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সবকিছুই আল্লাহর সৃষ্টি, মানুষের সব কর্মকাণ্ডের জন্য তার কাছে জবাবদিহিও করতে হবে। তাই মানুষের সব কর্মকাণ্ড সংবেদনশীল এবং প্রকৃতির বিধানমত হতে হবে। সীমা লঙ্ঘনকারীদের এ জন্যে শাস্তি পেতে হবে। পবিত্র কোরআনে এ বিষয়ে বলা হয়েছে, "তিনি যিনি উদ্ভিদ, মানুষ এবং উহারা যাহাদিগকে জানে না তাহাদের প্রত্যেককে সৃষ্টি করেছেনে জোড়া জোড়া করে" (সুরা ইয়াসিন; ৩৬)। সৃষ্টির সব বস্তুকে তিনি মানুষের কল্যাণে সৃষ্টি করেছেন আর মানুষ আল্লাহর খলিফা হিসেবে প্রকৃতির ভারসাম্য ব্যবহার নিশ্চিত করবে। পবিত্র কোরানে ঘোষণা এসেছে, "পৃথিবীকে আমি বিস্তৃত করেছি এবং তাতে পর্বতমালা স্থাপন করেছি এবং উহাতে প্রত্যেক বস্তু উদ্ভূত করেছি সুপরিমিতভাবে" (সুরা হিজর;১৯)। কিন্তু মানুষ তার নিজ দায়িত্বশীলতার কথা ভুলে গিয়ে নির্বিচারে জীববৈচিত্র্য ধ্বংসে লিপ্ত এবং অসম অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতায় নেমে অসম কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হয়ে প্রকৃতির ভারসাম্য বিনষ্ট করে পৃথিবীকে মারাত্মক ঝুঁকিপূর্ণ করে তুলেছে।

www.nagorikpathagar.org

অসম উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছার জন্য পৃথিবীর প্রাকৃতিক সম্পদকে এমনভাবে ব্যবহার করছে যে ২০৫০ সালের দিকে মানুষের ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণের জন্য অনুরূপ দুইটি পৃথিবীর প্রাকৃতিক সম্পদের প্রয়োজন হবে, যা বাস্তবে সম্পূর্ণ অসম্ভব। তাই বিশ্বজনগোষ্ঠী আজ ঐক্যবদ্ধ যে মানুষকে প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারে সংযমী হতে হবে, প্রাকৃতিক বিধান মেনে চলতে হবে এবং সব ধর্মের মৌলনীতিগুলি অনুসরণ করতে হবে। অনেকেই হালে অভিমত প্রকাশ করছেন যে, ধর্মীয় মূল্যবোধই মানুষকে প্রাকৃতিক সম্পদ অপচয় থেকে রক্ষা করতে পারে। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা এখন ধর্মীয় জ্ঞানকে পরিবেশ সংরক্ষণের কাজে ব্যবহারে গুরুত্ব দিচ্ছে। ১৯৯৫ সালে বিশ্বব্যাংক 'আধ্যাত্মিক জ্ঞান টেকসই পরিবেশ উন্নয়নের জন্য আবশ্যক' শিরোনামে সম্মেলনের আয়োজন করে। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা ১৯৯৬ সালে 'স্বাস্থ্য রক্ষায় ধর্মীয় জ্ঞান' শীর্ষক পুস্তিকা প্রকাশ করে। এছাড়া হার্ভার্ড ও টরেন্টোসহ পৃথিবীর অনেক সেরা বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্ম ও পরিবেশ সংক্রান্ত গবেষণা বিভাগ/অনুষদ রয়েছে। তবে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে এ বিষয়ে পর্যাপ্ত সচেতনতার অভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে।

ইসলামী বিধান অনুসারে মানুষের প্রথম দায়িত্ব আল্লাহর খলিফা হিসেবে প্রকৃতির এ সম্পদ ব্যবহার করা, দ্বিতীয় দায়িত্ব সৃষ্টির প্রতি আমানতদার হিসেবে প্রকৃতির এ সম্পদ সংরক্ষণ করা। সুরায়ে বাকারা আয়াত ৩০-এ বলা হয়েছে, "আমি পৃথিবীতে এক খলিফা নিযুক্ত করতে ইচ্ছুক।" ফেরেশতারা বললো, "আপনি কি এমন জাতি সৃষ্টি করবেন যারা নিয়ম শৃঙ্খলা নষ্ট করবে এবং রক্তপাত করবে।" আল্লাহ্ বললেন, "আমি যা জানি তোমরা তা জান না। অর্থাৎ তারা হবে দায়িত্বশীল প্রতিনিধি।" অন্য আয়াতে বলা হয়েছে, "আল্লাহ্ তাঁর সব সৃষ্টি মানবকল্যাণে নিয়োজিত করে রেখেছেন।" স্রষ্টার সৃষ্টির মধ্যে মানুষকে শ্রেষ্ঠত্ব দেয়া হয়েছে এবং তার দায়িত্ব হচ্ছে আল্লাহর খলিফা হিসেবে অন্যান্য সৃষ্টির ব্যবহারে ভারসাম্য রক্ষা করা। মানুষ সব সৃষ্টির ব্যবহারকারী ও পরিচর্যাকারী, কোন অবস্থাতেই তারা এসব প্রাকৃতিক সম্পদের মালিক নয়।

জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বিশ্বব্যাপী প্রাকৃতিক দুর্যোগ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর অন্যতম কারণ হচ্ছে নির্বিচারে প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণ ও পরিবেশ দূষণ। ইসলাম দূষণকে অত্যন্ত গর্হিত কাজ বলে এসব কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ বলে চিহ্নিত করেছে। এর পরিণামও তাকেই ভোগ করতে হয়। পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে, "মানুষের কৃতকর্মের দরুন জলে ও স্থলে বিপর্যয় নেমে আসে, যার ফলে উহাদের কোন কর্মের শাস্তি তিনি আস্বাদন করান, যেন তারা ফিরিয়া আসে (সুরা আর রুম: ৪১)"। তাই প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কারণ মূলত অনৈতিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড।

জলবায়ু পরিবর্তন ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ

জলবায়ু পরিবর্তন সারা বিশ্বের টেকসই উন্নয়নের জন্য মারাত্মক হুমকি। এ নিয়ে বিশ্বের বিজ্ঞানীসহ সর্বস্তরের জনগোষ্ঠী উদ্বিগ্ন। এজন্যে ব্যাপক গবেষণা কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।

www.nagorikpathagar.org

IPPC Fourth Assesment Report পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, পৃথিবীর সব মহাদেশ ও মহাসাগরের প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে আঞ্চলিক জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বিশেষত বিশ্বতাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে বিশ্বের সব প্রাকৃতিক সিস্টেমের ওপর মারাত্মক নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। যেমন তুষার লেকের সংখ্যা ও পরিধি বাড়ছে। আর্কটিক ও এন্টার্কটিকা এলাকায় বাস্তুসংস্থানে পরিবর্তন আসছে ব্যাপকভাবে।

দ্রুত সহজলভ্য তথ্যের ভিত্তিতে আরো দেখা যায় যে, হাইড্রোলজিক্যাল সিস্টেম ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। যেমন পানির প্রবাহ বৃদ্ধির ফলে নদী উপচে বন্যার ঝুঁকি বাড়ছে এবং নদী ও লেকগুলোর পানির তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে পানির গুণগত পরিবর্তন হচ্ছে, ক্ষতিগ্রস্ত করছে জীবজগৎকে। সাম্প্রতিক বিশ্ব উষ্ণায়নের ফলে পৃথিবীতে বসবাসকারী টেরিস্ট্রিয়াল জীবজগতের জীবন প্রবাহের মারাত্মক ক্ষতি পরিলক্ষিত হচ্ছে। যেমন বসন্তকাল এগিয়ে আসছে, ঐতিহ্যগতভাবে মৌসুমের আগেই গাছের পাতা ঝরে যাচ্ছে, অসময়ে পাখির অভিবাসন, পাখি ডিম দিচ্ছে এবং গাছে ফুল ফুটছে, এমন আরো কত কি!

IPPC এর প্রতিবেদন অনুযায়ী সাম্প্রতিক জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে -

(১) তুষার লেকগুলি থেকে তুষার গলে প্রায়ই বন্যার ঝুঁকি বাড়ছে, তাই পাহাড়ি সম্প্রদায়ের বসবাসও ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠছে।

(২) আফ্রিকার সোহেলিয়ান এলাকায় উষ্ণতা বৃদ্ধির ফলে আবাদি মৌসুম সংক্ষিপ্ত হয়ে যাচ্ছে। পরিণামে খাদ্য নিরাপত্তা বিঘ্নিত হচ্ছে;

(৩) সমুদ্রস্ফীতিকরণের ফলে উপকূলীয় এলাকার ম্যানগ্রোভ মারাত্মকভাবে ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে; বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে সে এলাকার জীববৈচিত্র্য, ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে সে এলাকার উৎপাদন ব্যবস্থা তথা খাদ্য নিরাপত্তা;

(৪) এ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে বার্ষিক গড়ে নদীর রান অফ ও পানির সহজলভ্যতা উচ্চ অক্ষাংশে এবং আর্দ্র উষ্ণাঞ্চলে আনুমানিক ১০-৪০ শতাংশ বৃদ্ধির আশংকা রয়েছে। পক্ষান্তরে শুষ্কাঞ্চলে এবং মধ্যঅক্ষাংশে তা কমে যাবে আনুমানিক ১০-৩০ শতাংশে;

(৫) কোথাও কোথাও মরুময়তার মাত্রা বৃদ্ধি পাবে মারাত্মকভাবে, আবার কোন কোন এলাকায় বৃষ্টির মাত্রা বেড়ে যাবে ফলে তাতে বন্যার ঝুঁকি বৃদ্ধি পাবে মারাত্মকভাবে;

(৬) যদি বিশ্ব তাপমাত্রা ১.৫-২.৫ সেঃ বৃদ্ধি পায়, তাহলে ২০-৩০ শতাংশ প্রজাতির সংখ্যা বিলুপ্ত হবার আশংকা রয়েছে;

(৭) একবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝিতে পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতে শস্য উৎপাদন বাড়বে প্রায় ২০ শতাংশ।

IPPC Fourth Assesment Report 2007, Impacts, Adaptation and Vulnerability, 2007 Summary for Policy makers p 9-11.

www.nagorikpathagar.org

জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সম্ভাব্য প্রভাব ঃ এশিয়া

- ২০৫০ সাল নাগাদ সেন্ট্রাল, দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া বিশেষত বৃহৎ নদীর বেসিন এলাকায় জলপ্রবাহ কমে যাবে
- উপকূলীয় এলাকা বিশেষত দক্ষিণ, পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ঘনবসতি এলাকায় সমুদ্র এবং নদীর পানির বন্যার ঝুঁকি বাড়বে।
- জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর চাপ বাড়বে, দ্রুত নগরায়ন, শিল্পায়ন ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের ফলে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হবে।
- বন্যা ও খরার ফলে উল্লেখযোগ্য খাতের পরিকল্পিত অভিযোজন morbidity, mortality এর ঝুঁকি বাড়বে। কারণ পূর্ব, দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার হাইড্রোলোজিক্যাল সাইকেলে ব্যাপক পরিবর্তন আসবে।

ছোট ছোট দ্বীপপুঞ্জ

- সমুদ্র স্ফীতিকরণ (sealevel rise) এর ফলে প্লাবন এলাকা বেড়ে যাবে, ঝড়ের তীব্রতা বাড়বে, নদী ভাঙ্গন ইত্যাদি বৃদ্ধি পাবে। এভাবে জীবিকা নির্বাহের জন্য সহায়ক ও গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো ও জনবসতি মারাত্মক ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে যাবে।
- উপকূলীয় এলাকার অবস্থার মারাত্মক অবনতি ঘটবে। যেমন সমুদ্র সৈকতে ভাঙ্গন 'কোরাল রিফ' ডুবে গিয়ে স্থানীয় সম্পদ ও কর্মসংস্থানের সম্ভাব্য সুযোগ সুবিধা বিনষ্ট হয়ে যাবে।
- একবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝিতে অনেক ছোট ছোট দ্বীপপুঞ্জে পানি প্রবাহ কমে যাবে, বিশেষত বৃষ্টিপাত যখন কম থাকবে।
- তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাওয়ায় প্রতিবেশগত পরিবর্তন আসবে ফলে জীববৈচিত্র্য ও ইকোসিস্টেমে মারাত্মক পরিবর্তন ঘটবে।

উৎস ঃ IPPC Assesment Report (Synthesis Report) P-11-12

সারণী ৬.১ ঃ উল্লেখযোগ্য খাতসমূহ পরিকল্পিত অভিযোজন (Adaptation)

সেক্টর (Sector)	অভিযোজন কৌশল (Adaptation/Options)	সম্ভাব্য নীতি (Policy frame work)	সীমাবদ্ধতা/সুযোগ (Key Constrains/Opportunities)
পানি	বৃষ্টির পানি আহরণ বৃদ্ধিঃ পানি সংরক্ষণ/ সংগ্রহ কৌশল, পানি পুনঃ ব্যবহার, লবণাক্ততা দূরীকরণ, পানি ব্যবহার ও সেচক্ষেত্রে দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ।	জাতীয় পানি নীতি, সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবহার এবং পানি সম্পর্কিত হেজার্ড ব্যবস্থাপনা।	আর্থিক, মানবসম্পদ ও ভৌতিক বাধাসমূহ; সমন্বিত পানিসম্পদ ব্যবস্থাপন অন্যান্য সেক্টরের সাথে সমন্বয়।
কৃষি	ফলদ বৃক্ষ রোপণের সময়ের সাথে সমন্বয়, শস্য বৈচিত্র্য রক্ষা এবং এদের স্থান পুর্নধারণ করা, উন্নত ভূমি ব্যবস্থাপনা করা যেমন বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে ভূমি ক্ষয়রোধ করা।	গবেষণা ও উন্নয়ন নীতি ; প্রতিষ্ঠানিক সংস্কার ; ভূমি সংস্কার, প্রশিক্ষণ; দক্ষতা বৃদ্ধি; শস্য বীমা আর্থিক প্রণোদনা যেমন সাবসিডি/ট্যাক্স ও ক্রেডিট।	কারিগরি ও আর্থিক সীমাবদ্ধতা: কৃষিতে নতুন ভ্যারাইটি উদ্ভাবন; বাজারজাতকরণ। উচ্চ এলাকার দীর্ঘমেয়াদি চাষাবাদ নতুন ফসল থেকে অধিক রাজস্ব আহরণ।
ভৌত অবকাঠামো জনবসতি	স্টম সার্জ থেকে রক্ষার জন্য সী ওয়াল এর বিপরীতে থাকার সৃষ্টি করা প্রাকৃতিক ব্যারিয়ারকে সংরক্ষণ যেমন বাংলাদেশের সুন্দরবন।	স্ট্যান্ডার্ড/সমন্বিত নীতিমালা যে ক্ষেত্রে সমন্বিতভাবে প্রকল্প করা যাতে জলবায়ু পরিবর্তন বিষয় অন্তর্ভুক্ত রাখা যায়; ভূমি ব্যবহার নীতি, বিল্ডিং কোড, ইনস্যুরেন্স নিশ্চিত করা যায়।	অর্থনৈতিক ও কারিগরি প্রতিবন্ধকতা; স্থান ; সহজলভ্যতা ; উন্নয়নলক্ষ্য এর সমন্বিত নীতি ও ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণ।
জনস্বাস্থ্য	জলবায়ু রোগ সচেতনতা; দ্রুত স্বাস্থ্যসেবা; নিরাপদ পানি ও উন্নত পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থাপনা।	জনস্বাস্থ্য নীতি যা জলবায়ু পরিবর্তন ঝুঁকিকে আমল দেয়।	আর্থিক সীমাবদ্ধতা/জ্ঞানের দৈন্যতা ; প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যসেবা উন্নত করা এবং জীবন যাত্রাকে উন্নত করা।
	বাজার পুনঃপরিকল্পনা, ডিজাইন, ড্রেনেজ, রেল ও অবকাঠামো ব্যবস্থা জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে সুসমন্বয়করণ।	জাতীয় পরিবহন নীতিকে জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে সময়োপযোগী ও সুসমন্বয়করণ।	অর্থনৈতিক ও কারিগরি সীমাবদ্ধতা ; কম ঝুঁকিপূর্ণ রাস্তা তৈরিকরণ।
জ্বালানী	ও বিতরণ অবকাঠামোকে শক্তিশালীকরণ Utility সেবার জন্য সুবিধাদি স্থাপন, জ্বালানী দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ ; নবায়নযোগ্য জ্বালানী উৎস বৃদ্ধিকরণ, জ্বালানী উৎস সম্প্রসারণকরণ।	সময়োপযোগী জ্বালানী নীতি, বিকল্প জ্বালানী উৎস সৃষ্টির জন্য অর্থনৈতিক প্রণোদনা প্রদান climate change is design standard অন্তর্ভুক্ত করা।	কারিগরি দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ এবং প্রধান সেক্টরগুলোর কর্মকাণ্ড সমন্বিতকরণ যেমন জ্বালানী ও পানি গ্রহণযোগ্য ও নতুন টেকনোলজি উদ্ভাবন। দেশীয় টেকনোলজি উৎসাহিতকরণ এবং স্থানীয় সম্পদ ব্যবহারে অনুপ্রাণিতকরণ।

উৎস ঃ Climate change 2007, Synthesis report : p 15

www.nagorikpathagar.org

জলবায়ু পরিবর্তন ও বাংলাদেশ

IPPC Fourth Assesment Report 2007 এর প্রতিবেদন অনুযায়ী একবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে বিশ্ব তাপমাত্রা ১.৮-৪ ডিগ্রি সেঃ বৃদ্ধি পেতে পারে। তৎপরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশে নিম্নোক্ত পরিবর্তনগুলি লক্ষ্য করা যেতে পারে।

(ক) বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বৃদ্ধি পেতে পারে এবং তা অনিয়মিত হওয়ার ফলে বন্যার ঝুঁকি বাড়বে মারাত্মক ভাবে;

(খ) নদী ভাঙ্গনের ফলে ভূমি অবক্ষয় বৃদ্ধি পাবে ;

(গ) উষ্ণমণ্ডলীয় ঘূর্ণিঝড় ও এর তীব্রতা আরো বৃদ্ধি পেতে পারে;

(ঘ) সমুদ্রের উচ্চতা বৃদ্ধির ফলে উপকূলীয় নিম্নাঞ্চলে লোনা পানি প্রবেশ করে পরিবেশের মারাত্মক বিপর্যয়ের কারণ হবে (ম্যাপে দেখা যেতে পারে)।

Box 1. Bangladesh showing the areas affected by different types of climate-related disaster

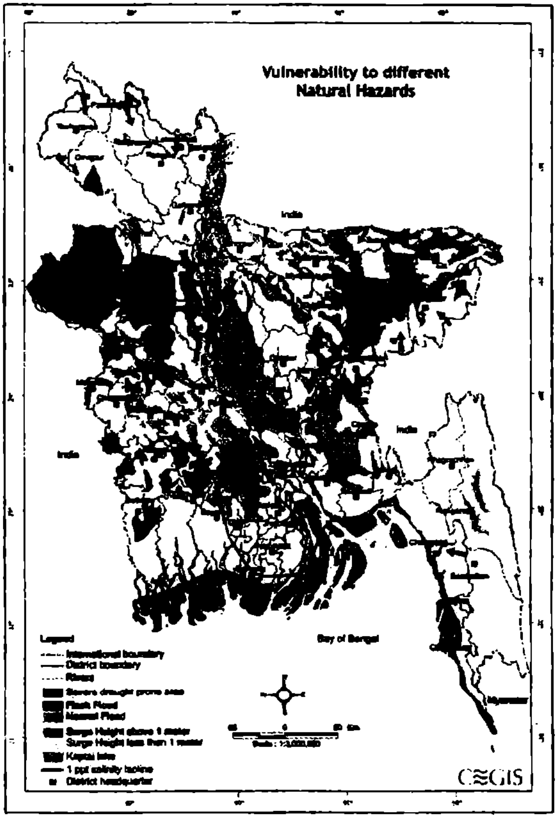

www.nagorikpathagar.org

(ঙ) গরম ও আর্দ্রতা বৃদ্ধি পাবে, পানিবাহিত রোগের প্রবণতা বৃদ্ধি পাবে যেমন ম্যালেরিয়া, ডেঙ্গু ও উদরাময় রোগের প্রকোপ বাড়বে।

জলবায়ু পরিবর্তন বিষয় বর্তমান অবস্থার প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের উন্নয়ন কৌশলের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। বর্ণিত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ সরকার আগামী ১০ বৎসরের (২০০৮-২০১৮) জন্য "The Climate Change Action Plan" তৈরি করেছে। এ পরিকল্পনার উদ্দেশ্য হচ্ছে দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ- সাধারণ জনগোষ্ঠীর, সুশীল সমাজের, ব্যক্তিগত খাত এবং সরকারি সংস্থার যেন নিয়মিত উন্নয়ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রক্রিয়াকে হ্রাস করা (mitigate) যেতে পারে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ সরকারের আন্তরিক রাজনৈতিক সদিচ্ছা রয়েছে, যার জন্য ২০০৯-১০ সালের অর্থ বৎসরে নিজস্ব বাজেটে ৭০০ কোটি টাকার অর্থ সংস্থান রাখা হয়েছে। এ জন্যে আন্তর্জাতিক সহায়তার প্রয়োজন রয়েছে। ইতিমধ্যে DFID এর সাথে বাংলাদেশ সরকার ৭৫ মিলিয়ন পাউন্ড স্টার্লিং আর্থিক সহায়তা প্যাকেজের চুক্তি করেছে। তাছাড়া ডেনমার্ক, জাপান, সুইডেনসহ অন্যান্য দাতা সংস্থাও সহায়তার জন্য এগিয়ে আসছে। এসব অর্থ ব্যবস্থাপনার জন্য বিশ্বব্যাংকের সহযোগিতায় Multi-Donor Trust Fund গঠন ও এর কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

তবে প্রকল্প দলিলে Climate Change Resilience এর বিষয়গুলো কত নিপুণভাবে সমন্বয় করতে হবে এবং লক্ষ্যার্জনে কতটুকু দক্ষতার পরিচয় দিবে, সে বিষয়গুলো এখনো সক্রিয় প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এর জন্য আর বেশি সময় দেয়ার সুযোগ নেই।

Photo: River bank erosion

Source: CNRS, Dhaka.

চিত্র ৬.১ ঃ প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও নদীভাঙ্গন

www.nagorikpathagar.org

Action Plan এর ছয়টি স্তম্ভ (Six Pillars) রয়েছে। যার আওতায় ৩৭টি কর্মসূচি রয়েছে। স্তম্ভ (Pillar) গুলো হচ্ছে -

১. খাদ্য নিরাপত্তা, সামাজিক নিরাপত্তা এবং স্বাস্থ্য ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ ;

২. সামগ্রিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা (Comprehensive Disaster Management)

৩. ভৌত অবকাঠামো ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণ.

৪. গবেষণা ও জ্ঞান ব্যবস্থাপনা

৫. জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রতিক্রিয়া হ্রাসকরণ (Mitigation and Carbon Development)

৬. দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ ও প্রতিষ্ঠান শক্তিশালীকরণ।

উৎস ঃ MOEF, 2008, Bangladesh Climate Change Strategy and Action Plan 2008, Ministry of Environment & Forest, GOB, Dhaka, Bangladesh (P1x V)

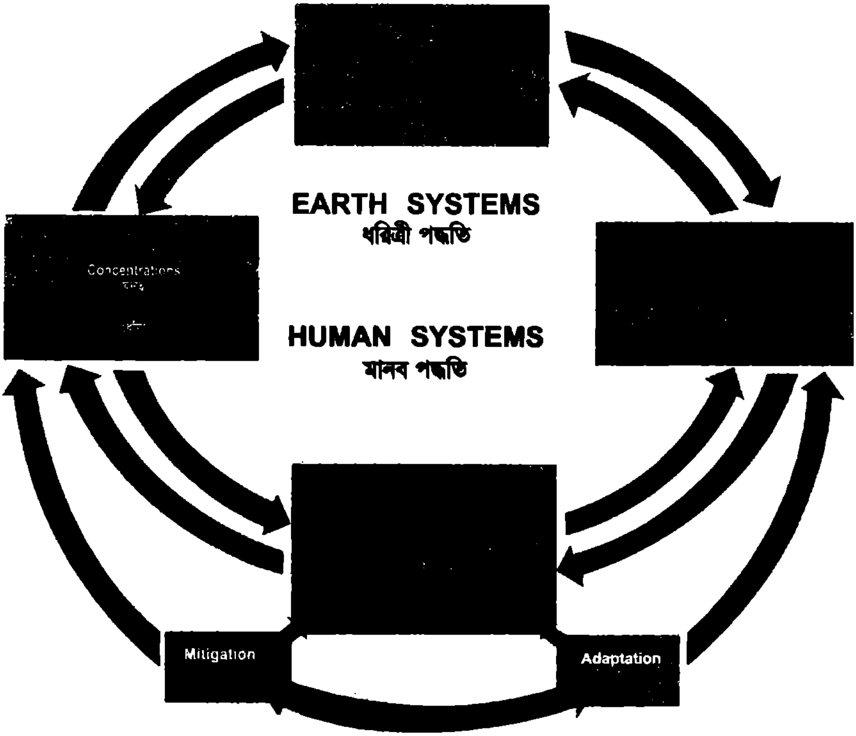

চিত্র ৬.২ ঃ ধরিত্রী ও মানুষের উপর জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব

উৎস ঃ IPPC, 2007 : climate change; Synthesis Report : P26

www.nagorikpathagar.org

ধর্মীয় দৃষ্টিতে প্রাকৃতিক দুর্যোগের তাৎপর্য

প্রাকৃতিক দুর্যোগের বৈজ্ঞানিক কারণগুলো বর্তমান অবস্থার সাথে মিলিয়ে দেখলে বিষয়গুলি দিবালোকের মতো স্পষ্ট হয়ে যাবে। পবিত্র কোরআন হাদিসে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের অনেক কারণের কথা উল্লেখ রয়েছে। এগুলি আমাদের সামাজিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশের সাথে মিলিয়ে দেখলে অতিসহজেই প্রতীয়মান হবে, মনুষ্য সৃষ্ট কারণেই বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ঘন ঘন প্রাকৃতিক দুর্যোগ হচ্ছে। আল্লাহ প্রাকৃতিক দুর্যোগ সম্পর্কে প্রাকৃতিক বিধান সম্বন্ধে বলেছেন, "আপনার পালনকর্তা জনপদসমূহকে ধ্বংস করে না। যে পর্যন্ত তার কেন্দ্রস্থলে রাসুল প্রেরণ না করেন। তিনি তাদের কাছে আমার আয়াতসমূহ পাঠ করেন। জনপদসমূহকে তখনই ধ্বংস করি, যখন তার বাসিন্দারা অত্যাচারী হয়ে উঠে" (সুরা আল কাসাস ঃ ২৮ঃ৫৯)। গবেষণা ও পর্যালোচনা থেকে সারা বিশ্বে মানব সৃষ্ট কর্মকাণ্ড থেকে পরিবেশ বিপর্যয়ের কারণগুলি দিনের সূর্যালোকের মতোই স্পষ্ট।

উপরোক্ত আয়াতের তাৎপর্য আমাদের সমাজের বর্তমান অবস্থার সাথে মিলিয়ে দেখার সময় এসেছে। এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা ও পর্যালোচনা ও আত্মসমালোচনার সময় এখনই। এক্ষেত্রে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের বিষয়ে আল্লাহর প্রাকৃতিক বিধান অত্যন্ত স্পষ্ট। পবিত্র কোরআনে আরো স্পষ্ট করে এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, "তোমাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে যে সব উত্তম বিধি-নিষেধ অবতীর্ণ হয়েছে তা যথাযথভাবে মেনে চল। হঠাৎ করে তোমাদের প্রতি শাস্তি অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে - এমন অবস্থায় যে তোমরা কিছুই বুঝতে পারবে না" (সুরা আযযুমার ৩৯:৫৫)।

কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগ আসার পূর্বে সামাজিক অবস্থা কিরূপ হয়, সে সম্পর্কে বলা হয়েছে, আমি যখন কোন জনপদকে ধ্বংস করার ইচ্ছা করি তখন তার অবস্থাপন্ন সম্পদশালী লোকদের উদ্বুদ্ধ করি, অতঃপর তারা পাপাচারে মেতে ওঠে। তখন সে জনগোষ্ঠীর ওপর আমার (শাস্তির) আদেশ অবধারিত হয়ে যায়। অতঃপর আমি তাকে উঠিয়ে আছাড় দেই (সুরা বনি ইসরাইল ১৭ঃ১৬)। এ আয়াতটি স্পষ্টীকরণে এক হাদিসে বলা হয়েছে, যখন কোন শাসকগোষ্ঠী রাজস্বকে নিজেদের ব্যক্তিগত সম্পদ মনে করে, যাকাত আদায় করাকে বোঝা মনে করে, আমানত দ্রব্যকে গণীমত মনে করে ভক্ষণ করতে থাকে, স্বামী স্বীয় স্ত্রীর অধীনতা পাশে আবদ্ধ হবে, সন্তানগণ মাতা-পিতার নাফরমানী করবে, দুস্কৃতকারীদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, ধর্মীয় শিক্ষক দুনিয়া হাসিল লাভে নিয়োজিত থাকবে। (ময়নুল হক পৃঃ ১৭২) (তিরমিজী কিতাবুল ফিতান হাদিস নং-২১৩৬)। তাই এখনই আমাদের সঠিক পরিস্থিতি মূল্যায়নের সময় এসেছে।

প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের বিষয়ে সুরায়ে রূম (আয়াত ৪১) এ স্পষ্টভাবেই বলা হয়েছে জলে স্থলে মানুষের কৃতকর্মের জন্যই বিপর্যয় ঘটে থাকে। আল্লাহ তাদেরকে তাদের কর্মের শাস্তি আস্বাদন করান যেন তারা সতর্ক হয়ে আবার প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মের অনুসারী হয়। মূলত মানবজাতির অনৈতিক কর্মকাণ্ডই বিপর্যয়ের মূল কারণ। তাই মানব জাতিকে সতর্ক

www.nagorikpathagar.org

করে অন্য আয়াতে বলা হয়েছে, "আপনি বলুন ঃ তিনি শক্তিমান, তোমাদের উপর থেকে কোন শাস্তি দিতে পারেন অথবা তোমাদের পদতল থেকে কোন শাস্তি প্রেরণ করতে পারেন। অথবা তোমাদের দলে উপদলে বিভক্ত করে সবাইকে মুখোমুখি করে দিবেন এবং একে অন্যের ওপর আক্রমণের স্বাদ আস্বাদন করাবেন। দেখ কিভাবে আমি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নির্দেশাবলী বর্ণনা করি যাতে তারা উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়।(সুরা আল-আনয়াম ৬ঃ৬৫)।

আল্লাহর প্রাকৃতিক বিধান লঙ্ঘন করে, নাফরমানী করার জন্য আল্লাহ যেমন মানুষকে সতর্ক করার এবং শিক্ষা দেয়ার জন্য বিপর্যয় দিয়ে থাকেন, অনুরূপভাবে আল্লাহ ঈমানদারদের তাদের ঈমানের দৃঢ়তা পরীক্ষা করার জন্যও মানব জাতিকে বিভিন্ন বিপদ আপদের মাধ্যমে স্মরণ করে থাকেন। পবিত্র কোরআনে এ বিষয় স্পষ্ট করে বলেছেন যে, এবং আমি অবশ্যই তোমাদের পরীক্ষা করব কিছু ভয়, ক্ষুধা, মাল ও জীবনের ক্ষয়ক্ষতি ও ফল ফসল বিনষ্ট করার মাধ্যমে। তবে সুসংবাদ দাও, ধৈর্যধারণকারীদের। তারা যখন বিপদে পতিত হয় তখন বলে, আমরা সবাই আল্লাহর জন্য এবং আমরা তারই সান্নিধ্যে ফিরে যাবো। (সুরা আল বাকারা ২ঃ১৫৫-১৫৬)।

পৃথিবীতে দুঃখ-কষ্ট সহ্য করে নিজের যোগ্যতা ও বুদ্ধিমত্তা দিয়েই চলার স্থান। সুতরাং এখানে সম্ভাব্য বিপদ আপদের মোকাবিলা হওয়াটা খুব স্বাভাবিক- এভাবে চিন্তা করলে ধৈর্যধারণ আরো সহজতর হয়। ঈমান পরীক্ষায় বিপদের সময় যে যতটুকু ধৈর্যধারণ করবে তার মর্যাদা আল্লাহর নিকট ততটুকুই বৃদ্ধি পাবে। প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় মানবজাতির জন্য আল্লাহ দুইটি সুযোগ সৃষ্টি করে দেন। প্রথমতঃ বাহ্যিকভাবে পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল ও সহযোগিতা করার মানসিকতা ও সুযোগ সৃষ্টি হয়। দ্বিতীয়তঃ আল্লাহ তাঁর অস্তিত্বকে মানবজাতির কাছে স্মরণ করিয়ে দেন যেন তারা তওবা করে পাপাচারের পথ পরিহার করে তার দেয়া প্রাকৃতিক বিধানের প্রতি যত্নবান হয়। এভাবে মানুষের মনে সহনশীল ও সহযোগিতার মনোভাব সৃষ্টি হলে সামাজিক ভারসাম্য ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের হার হ্রাস পেতে পারে।

দুর্যোগ সাধারণত দু' কারণে হতে পারে। প্রাকৃতিক কারণে যেমন ঘূর্ণিঝড় ও খরা হয়, তেমনি মানব সৃষ্ট কারণেও দুর্যোগ হতে পারে। অপরিণামদর্শী ও অপরিকল্পিতভাবে উন্নয়ন কর্মকাণ্ড ও নির্বিচারে বন ও প্রাকৃতিক সম্পদ নিধনের ফলে, পাহাড় কাটার ফলে যেমন আমাদের দেশে অপরিকল্পিতভাবে রাস্তাঘাট ও জলাভূমি সংকুচিত করার ফলে ঘন ঘন বন্যা এবং নির্বিচারে বন নিধনের ফলে ঝড়, বন্যা, খরা ও বন্যার ন্যায় (২০০৪ সালে ঢাকায় নগর বন্যা, ২০০৭ সালে চট্টগ্রামে পাহাড় কাটার ফলে নগর বন্যা) অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগ হয়ে থাকে। অতীতকাল থেকে এই উভয় প্রকার দুর্যোগের সাথে বাংলাদেশ পরিচিত। ঋতু বৈচিত্র্যের ফলে প্রতি মৌসুমে ঘূর্ণিঝড়, বন্যা অথবা খরার ফলে কোন না কোন বিপর্যয় লেগেই থাকে আর এজন্য এ দেশের মানুষকে দারিদ্র্য পীড়িত অবস্থায় কালাতিপাত করতে হয়। সে জন্য তাদের দৈন্য অবস্থার মাঝেও সতর্ক থাকতে হয়।

www.nagorikpathagar.org

বাংলাদেশে প্রতি বছরই একটা না একটা দুর্যোগ এসে বিপর্যস্ত করে দেয় মানুষের জরাজীর্ণ জীবন ব্যবস্থাকেও। কেড়ে নেয় কখনও লাখো মানুষের প্রাণ। গবাদিপশুসহ যাবতীয় স্থাবর সম্পত্তির বিনাশ তো ঘটেই। জাতীয় অর্থনীতিতেও পড়ে এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া। ভেস্তে যায় উন্নয়ন পরিকল্পনা। বিপর্যস্ত মানুষের হাহাকার দুর্ভোগ-মৃত্যু-লাশের স্পর্শ সবকিছু মিলে তৈরি হয় একটি বীভৎস চিত্র, যা ভিন দেশের প্রচার মাধ্যমগুলোতে স্থান পায়। তুলে ধরে আমাদের দেশের দারিদ্র্যকবলিত দুর্যোগপীড়িত বিপন্ন চেহারাটি, যা জাতির জন্য অত্যন্ত মর্যাদাহানিকর। কারণ তাতে ভরা ভিক্ষার ঝুড়ির বিনিময়ে জলাঞ্জলি দিতে হয় দেশ ও জাতির আত্মমর্যাদাকে। এ সাহায্যের সুবিধাভোগীরাও সমাজের উচ্চ মহলের কতিপয় কর্ণধার।

নিয়তি নয়, কর্মফল

পৃথিবীর মানুষ ও তার কৃতকর্মের জন্যই পরিবেশ বিপর্যস্ত হচ্ছে - ইউএন এনভায়রনমেন্টাল প্রোগ্রামের স্যাটেলাইটের পাঠানো ছবি আবারও প্রমাণ করল বিষয়টি। তারা জানাচ্ছে, শুধু মানুষের সংখ্যাধিক্য, বন কেটে উজাড় করা আর বিভিন্ন উপায়ে কার্বন ডাইঅক্সাইড বেড়ে যাওয়ার কারণেই পরিবেশ ধ্বংসের দিকে এগোচ্ছে। গত ৫ জুন পরিবেশ দিবস উপলক্ষে যুক্তরাষ্ট্রের সানফ্রান্সিসকোতে পরিবেশবিদ ও গবেষকদের এক সম্মেলনে ভয়াবহ পরিবেশদূষণের হাত থেকে বাঁচিয়ে পৃথিবীকে বাসযোগ্য রাখতে আমাদের করণীয় সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। গবেষকরা বলছেন, একটিমাত্র গ্রহে এত বেশিসংখ্যক মানুষের বিষয়টিই ভোগাচ্ছে আমাদের। পরিবেশগত বিপর্যয়গুলো খুব ধীরগতিতে সম্পন্ন হচ্ছে বলে আপাতদৃষ্টে এ পরিবর্তন চোখে পড়ে না। কিন্তু পাঁচ বা দশ বছরের একটি দীর্ঘ সময় বিবেচনায় আনলে পরিবেশগত বিপর্যয় যে দিন দিন আমাদের কি ভয়াবহ ভবিষ্যতের দিকে ঠেলে দিচ্ছে, তা অনুধাবন করে শিউরে উঠতে হয়।

সোচ্চার বিশ্বনেতারাও

সম্প্রতি উন্নত দেশগুলো নিয়ে ইতালিতে হয়ে যাওয়া জি-৮ সম্মেলনের মূল আলোচনায় ছিল বৈশ্বিক উষ্ণতার বিষয়টি। উন্নত দেশগুলোর এ সম্মেলনের দ্বিতীয় দিন 'পরিবেশগত বিপর্যয় মোকাবিলায় করণীয়' শীর্ষক আলোচনায় যোগ দিতে জি-৮-এ যোগ দিয়েছিল ভারত, ব্রাজিল, মিসর, মেক্সিকো ও দক্ষিণ আফ্রিকা। সেখানে ২০৫০ সালের মধ্যে গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমন ৫০ শতাংশে কমিয়ে আনার প্রতিজ্ঞা পালনে করণীয় বিভিন্ন কৌশল নির্ধারণ করা হয়। মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার নেতৃত্বে উন্নত দেশগুলো ২০২০ সালের মধ্যে কার্বন নির্গমনের হার ২০ শতাংশে নামিয়ে আনার প্রতিজ্ঞা করে এবার। বারাক ওবামা বলেন, আজকের এ সমস্যা সমগ্র মানবজাতির সমস্যা। এর সমাধানও সবাইকে নিয়েই করতে হবে। এ জন্য বিশ্বব্যাপী ব্যাপক প্রচারণা ও জনসচেতনতার মাধ্যমে সবার অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। জাতিসংঘের মহাসচিব বান কি মুন কার্বন-দূষণ কমাতে

www.nagorikpathagar.org

এবং বৈশ্বিক পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর জন্য উন্নয়নশীল দেশগুলোকে আর্থিকসহ সার্বিক সহযোগিতা করার জন্য জি-৮ ভুক্ত দেশগুলোর প্রতি আহ্বান জানান।

সারণী ৬.২ : বৈশ্বিক উষ্ণতার ঝুঁকিতে থাকা পাঁচটি ক্যাটাগরিতে ১২টি করে দেশের তালিকা

মরুকরণ	বন্যা	ঝড়	সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি	কৃষিতে অনিশ্চয়তা
মালাউয়ি	বাংলাদেশ	ফিলিপাইন	সব নিচু দ্বীপদেশ	সুদান
ইথিওপিয়া	চীন	বাংলাদেশ	ভিয়েতনাম	সেনেগাল
জিম্বাবুয়ে	ভারত	মাদাগাস্কার	মিসর	জিম্বাবুয়ে
ভারত	কম্বোডিয়া	ভিয়েতনাম	তিউনিসিয়া	মালি
মোজাম্বিক	মোজাম্বিক	মলদোভা	ইন্দোনেশিয়া	জাম্বিয়া
নাইজার	লাওস	মঙ্গোলিয়া	মৌরিতানিয়া	মরক্কো
মৌরিতানিয়া	পাকিস্তান	হাইতি	চীন	নাইজার
ইরিত্রিয়া	শ্রীলঙ্কা	সামোয়া	মেক্সিকো	ভারত
সুদান	থাইল্যান্ড	টোঙ্গা	মিয়ানমার	মালাউয়ি
শাদ	ভিয়েতনাম	চীন	বাংলাদেশ	আলজেরিয়া
কেনিয়া	বেনিন	হন্ডুরাস	সেনেগাল	ইথিওপিয়া
ইরান	রুয়ান্ডা	ফিজি	লিবিয়া	পাকিস্তান

উৎস : প্রথম আলো, ১৯ জুলাই ২০০৯

জলবায়ু পরিবর্তন, দুর্যোগ ও দুরবস্থা

এ দেশের দারিদ্র্য পীড়িত জনগোষ্ঠীকে সবচেয়ে বেশি বিপর্যস্ত করে বন্যা, খরা, কালবৈশাখী, সাইক্লোন, সিডর, নার্গিস, আইলা ইত্যাদি। বর্ষা মৌসুমে অনেক সময় এগুলোর সঙ্গেই যুক্ত হয়ে পাহাড়ি ঢল, নদী ভাঙন, শিলাবৃষ্টি, ভূমিধ্বস তছনছ করে দেয় কোটি কোটি মানুষের জীবন ব্যবস্থাকে। ইদানীং ভূমিকম্পের ব্যাপকতা বৃদ্ধি এবং এ ব্যাপারে বিশেষজ্ঞদের ভবিষ্যদ্বাণী সাধারণের মনে শঙ্কা তীব্রতর করছে। দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের মানুষ যেমন প্রতি বছর ঘূর্ণিঝড়-জলোচ্ছ্বাসের আশঙ্কায় প্রহর গুনে তেমনি উত্তরাঞ্চল ও উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের মানুষের রয়েছে অনাবৃষ্টি-খরার ভীতি। পূর্বাঞ্চল আবার ভূমিকম্পপ্রবণ। এছাড়া শহরের মানুষ আতঙ্কগ্রস্ত নগর বন্যায়। এভাবেই চলছে দেশজুড়ে দুর্যোগের চক্রাকার আবর্তন। সাম্প্রতিককালে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের এক রিপোর্টে প্রকাশ যে, দেশে কোন না কোন দুর্যোগে গড়ে মারা যায় প্রায় তেরো হাজার মানুষ, আহত হয় উনিশ হাজার, ক্ষতিগ্রস্ত হয় দশ লাখেরও বেশি। গত দশ বছরেই এদেশে নানা দুর্যোগে মারা গেছে ষোল হাজারেরও বেশি মানুষ। একমাত্র ১৯৯৯ সালে প্রায় পাঁচ লাখ লোক দুর্যোগকবলিত ছিল। এসব তথ্য প্রকাশ পেয়েছে ওয়ার্ল্ড ডিজাস্টার রিপোর্টে। এ রিপোর্টে আরও উল্লেখ করা রয়েছে যে, '৯০ থেকে '৯৮ পর্যন্ত এ দেশে গড়ে ১ কোটি ৪৫ লাখ ৭০ হাজার লোক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী প্রাকৃতিক দুর্যোগে বিশ্বে বাংলাদেশের ঝুঁকি সর্বোচ্চ। গত এক দশকে সার্ক ও আসিয়ানভুক্ত দেশগুলোর ওপর প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেসব আঘাত হেনেছে তার শতকরা নব্বই ভাগই ঘটেছে বাংলাদেশের ওপর। শুধু তাই নয়, প্রাকৃতিক দুর্যোগে

www.nagorikpathagar.org

বাংলাদেশে মৃত্যুর হারও সর্বোচ্চ। এখানে প্রতি দশ লাখে মারা যায় প্রায় চার হাজার। ঘূর্ণিঝড় ও বন্যায় এশিয়ায় সর্বমোট মৃত্যুর মধ্যে বাংলাদেশে মৃত্যুর হার সর্বোচ্চ। প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, বঙ্গোপসাগর হলো বিশ্বের সবচেয়ে ভয়ঙ্কর গ্রীষ্মমণ্ডলীয় ঘূর্ণিঝড় কবলিত অববাহিকা। গত শতাব্দীর দশটি ভয়ঙ্কর ঘূর্ণিঝড়ের মধ্যে সাতটিই বাংলাদেশে আঘাত হেনেছে। কেবল ঘূর্ণিঝড়, বন্যা ও জলোচ্ছ্বাসেই এ দেশে গত দশ বছরে প্রাণ হারিয়েছে আনুমানিক ১ লাখ ৫৩ হাজার লোক, ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের সংখ্যা পত্রিকায় প্রকাশ প্রতিবেদন অনুযায়ী ৫ কোটি, সম্পদ বিনষ্টের হিসাব দাঁড়িয়েছে ৭শ কোটি ডলার। কারণ প্রতিটি দুর্যোগই তার ভয়াবহ থাবার বিস্তার করে রাখে দীর্ঘদিন ধরে। ফলে দুর্যোগ পরবর্তীকালে ত্রাণ কার্যক্রম ব্যাহত হয়। যার ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণও কোটি ডলার, এর প্রতিক্রিয়া পড়ে উন্নয়ন পরিকল্পনায়। সে সাথে ব্যাহত হয় দেশের উন্নয়ন কার্যক্রম। বিশেষ করে আমাদের অবকাঠামো ও কৃষি খাত পর্যুদস্ত হয়। দুর্যোগ পরবর্তী মহামারী, বিপর্যস্ত মানুষের নতুন করে জীবন শুরুর সংগ্রাম, শহরমুখী অভিবাসন, দুর্ভিক্ষ ইত্যাদি সমস্যা দীর্ঘস্থায়ী ছাপ থেকে যায় দেশের অর্থনীতির উপর। কিন্তু সবচেয়ে বড় ট্রাজেডি হচ্ছে এটাই যে, একটি দুর্যোগের দুরবস্থার উত্তরণ ঘটতে না ঘটতেই দেশের ওপর নেমে আসে আরেকটি দুর্যোগের খড়গ ইদানীংকালে। এ যেন 'মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা'। এছাড়াও কোন কোন বছর শৈত্যপ্রবাহ দেখা দেয় যা জনজীবনকে আরো দুর্বিষহ করে দেয়। বেসরকারি এক হিসাবে জানা গেছে, জানুয়ারির প্রথম পক্ষ ১৯৯৯ পর্যন্ত সারা দেশে শীতে মৃত্যু হয়েছে সাতাত্তর জনেরও বেশি। এদের বেশির ভাগই দেশের উত্তরাঞ্চলের। আমাদের দেশে সচরাচর ১৯৯৯ সালের মতো এ ধরনের শীত পড়ে না। ইতোপূর্বে '৬৪ সালেই দেশের একটি অঞ্চলে তাপমাত্রা নেমে গিয়েছিল ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াসের নিচে। ঘটনাটি ঘটেছিল ঈশ্বরদীতে। এরপর আর এ রকম ভয়াবহ শীতের নজির না থাকলেও '৯৭ সালে এ দেশে প্রচণ্ড শৈত্যপ্রবাহ দেখা দিয়েছিল। '৯৮তেও শীতের তীব্রতা ছিল বেশি। যে কয়েক দিন শীতের তীব্রতা বেশি থাকে সে ক'দিনেই তা উত্তরাঞ্চলের দরিদ্র মানুষের মৃত্যু ও দুর্ভোগের কারণ হয়ে দাঁড়ায় (জনকণ্ঠ ২৯ সেপ্টেম্বর/ ২০০০)।

আবার স্বাভাবিক সময়ের আগেই শুরু হওয়া এই দাবদাহের ফলে সর্দি, পেটের পীড়াসহ নানা রোগের কারণ ঘটায়। সে সঙ্গে পানি সঙ্কটও তীব্র হয়ে ওঠে। বাংলাদেশে স্মরণকালের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ১৯৭২ সালের ১৮ মে রাজশাহীতে। ঐদিন সেখানে ৪৫ দশমিক ১ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়। এভাবে প্রচণ্ড গরমে জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। ২০০৯ সালে বর্ষা ঋতুর শুরুতেই প্রচণ্ড গরমে নগরবাসীর জীবন বিপর্যস্ত করে দিয়েছে যা স্মরণকালের সর্বোচ্চ। সে সাথে লোডশেডিং ও ওয়াসার পানির ময়লা নগরবাসীর জীবনকে দুর্বিষহ করে দিয়েছে।

জলবায়ু পরিবর্তন ক'বছর ধরেই বিশ্বজুড়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার বিষয়বস্তু। কয়েক দশক ধরে বিজ্ঞানীরা লক্ষ্য করছেন যে, পৃথিবীর উষ্ণতা ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। গ্লোবাল ওয়ার্মিংয়ের ফলে তাপমাত্রা বৃদ্ধির ব্যাপারটি আমাদের দেশেও বেশ টের পাওয়া যাচ্ছে।

www.nagorikpathagar.org

এপ্রিল থেকেই একাধারে অতিবর্ষণ ও ঝড়-টর্নেডোর দোর্দণ্ড প্রতাপ চললেও খরার আশঙ্কা কিন্তু কমেনি। এপ্রিল থেকে আগস্ট পর্যন্ত এ আশংকার মধ্যে থাকতে হয় গোটা জাতিকে। সে সময় দেশের অন্য অঞ্চলে দাবদাহের সঙ্গে সঙ্গে বরেন্দ্র অঞ্চলের পঁচিশটি উপজেলায় খরার আলামত দেখা দেয়। খরার ফলে ব্যাহত হয় কৃষিতে সেচ কার্যক্রম। খাল-বিল-নদী শুকিয়ে গিয়ে মাটি ফেটে চৌচির হয়। জুলাইতে ভরা বর্ষায়ও উত্তরাঞ্চলের কয়েকটি জেলায় বৃষ্টির দেখা মেলে না। আবহাওয়া অফিসের প্রতিবেদন অনুযায়ী ঐ অঞ্চলে ২০০০ সালের জুলাই মাসে বৃষ্টিপাত হয়েছিল মাত্র ৬৩ দশমিক ৫ মিলিমিটার। অর্থাৎ গড়ে প্রতিদিন ৩ মিলিমিটারের চেয়ে কম। অথচ ১৯৯৯ এর জুলাইয়ে বৃষ্টিপাত হয়েছিল ৪৩৬ দশমিক ৪ মিলিমিটার। উত্তরাঞ্চলের জনপদের শস্যভাণ্ডার হিসেবে পরিচিত এ অঞ্চলটিতে প্রায় খরা পরিস্থিতি লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী আমন ধান উৎপাদন করতে না পারার আশঙ্কাকে তীব্র করেছে। বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে বৃষ্টি হয়ে ভরা বর্ষায় বৃষ্টি না হলে কৃষিকাজের স্বাভাবিক সার্কেলে বিঘ্ন সৃষ্টি হয়। ফলে দেশের অর্থনীতিতে মারাত্মক প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় ও খাদ্যাভাবের আশঙ্কা সৃষ্টি করে।

সাম্প্রতিককালে এশিয়ার পাঁচটি দেশে মৃদু ভূমিকম্পন পরিলক্ষিত হয়েছে। এই পাঁচ দেশের মধ্যে বাংলাদেশও অন্তর্ভুক্ত। অবশ্য গত ক'বছর ধরেই ভয়াবহ ও বড় ধরনের ভূমিকম্পের আশঙ্কায় ভুগছে বাংলাদেশ। ২০০০ সালের মে মাসে আয়োজিত এক কর্মশালায় দেশি-বিদেশি বিশেষজ্ঞরা বিশ্বের যে বিশটি বৃহৎ নগরীকে সবচেয়ে বিপজ্জনক বলে রায় দিয়েছেন তার মধ্যে ঢাকা অন্যতম। বিজ্ঞানসম্মত ও সঠিক প্রযুক্তি ব্যবহার না করে ভবন নির্মাণের ফলে দেশের অনেক অঞ্চলে ৬/৭ রিখটার স্কেল মাত্রার ভূমিকম্পেই ধ্বংসস্তূপে পরিণত হতে পারে। ২০০৫ সালের মধ্যে ঢাকায় বড় কোন ভূমিকম্প হবার ব্যাপারে অনেক বিশেষজ্ঞ ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন। এর মাত্রা হতে পারে ৭.৫ রিখটার স্কেলের। আবহাওয়া দফতর বাংলাদেশকে ৩টি ভূকম্পন জোনে ভাগ করেছে। এর মধ্যে সবচেয়ে বিপজ্জনক জোনটি হলো চট্টগ্রাম, বান্দরবান, সিলেট, ময়মনসিংহ ও রংপুর। কয়েক বছর ধরেই এর আলামত চলছে। '৯৯ এর আগস্টে মহেশখালীতে বেশ কয়েকদফা ভূমিকম্প হয়। এর আগে '৯৭ এর নভেম্বর মাসে চট্টগ্রামে সংঘটিত ভূমিকম্পে একটি ভবন ধ্বসে গিয়ে বেশ কিছু লোকের প্রাণহানি ঘটেছিল (জনকণ্ঠ, শুক্রবার, ২৯ সেপ্টেম্বর ২০০০; দুর্যোগঃ প্রকৃতি যখন বৈরী হয়ে উঠে)। গত ২৬ মে ডিসেম্বর, ২০০৪ এশিয়ায় বিগত চল্লিশ বৎসরের মধ্যে ভয়াবহতম ভূমিকম্পে বাংলাদেশও অন্তর্ভুক্ত ছিল। আমাদের দেশের প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ক্ষয়ক্ষতির সঠিক পরিমাণ ও বিবরণ এবং তথ্যের অভাবে জনজীবন দুর্ভোগের আসল চিত্রগুলো তুলে ধরা সম্ভব হয় না। এখানকার প্রধান প্রধান প্রাকৃতিক বিপর্যয়সমূহ হচ্ছে : (ক) বন্যা যা পাহাড়ি ঢলের বা অতিবর্ষণের ফলে নগর বন্যা ও নদীভাঙনের সাথে সম্পৃক্ত (খ) সাইক্লোন, টর্নেডো, সুনামি, সিডর, নার্গিস, আইলা, সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসের লোনা পানি প্রবেশের ফলে ফসল, গাছপালা ও জীববৈচিত্র্য বিনষ্ট হওয়ার সাথে সম্পর্কিত (গ) খরা

www.nagorikpathagar.org

(Desertification), অনাবৃষ্টি, ভূগর্ভের পানিস্তর নিচে নেমে যাওয়ার ফলে ভূমি অবক্ষয় যা আমাদের বরেন্দ্র এলাকায় পরিলক্ষিত হচ্ছে (ঘ) ভূমিকম্প খুব ঘন ঘন না হলেও আমাদের দেশের কতিপয় এলাকায় যেমন চট্টগ্রাম, সিলেট এলাকায় ইদানীংকালে মাঝে মধ্যে ভূমিকম্পন অনুভূত হবার ফলে সর্বত্র আতঙ্ক সৃষ্টি হচ্ছে।

(ক) বন্যা

বন্যা বাংলাদেশের প্রাকৃতিক দুর্যোগের অন্যতম ভয়াবহ বিভীষিকা, যা প্রতিবৎসর দেশে অবকাঠামো, শিল্প কারখানা, কৃষি তথা জনজীবনকে বিপর্যস্ত করে দেয়। এছাড়াও বন্যার সময় নদী ভাঙনের ফলে নদীতীরবর্তী জনপদকে বিপর্যস্ত করে দেয়। পানি উন্নয়ন বোর্ডের এক রিপোর্ট থেকে জানা যায়, দেশের ৬৩টি নদীর তীরবর্তী স্থান সবচেয়ে বেশি ভাঙনের সম্মুখীন। এর ফলে মাইলের পর মাইল ভূমি নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যাচ্ছে। ব্রহ্মপুত্র-পদ্মা-মেঘনা-সুরমা-কুশিয়ারা-মনু-মাতামুহুরীর তীরবর্তী স্থানগুলোতে ভাঙনের ফলে হাজার হাজার ঘরবাড়ি, শস্যভূমি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নদীগর্ভে বিলীন হচ্ছে। এর ফলে প্রতি বছর কমপক্ষে ১০ লাখ লোক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এক জরিপ থেকে জানা যায়, ঢাকা শহরের বস্তিবাসীদের ষোলো শতাংশ নদী ভাঙনের ফলে গৃহহারা হয়ে বস্তিতে আশ্রয় নেয়। এভাবে বছর বছর নদী ভাঙনের ফলে হাজার হাজার বর্গকিলোমিটার এলাকা নদীগর্ভে বিলীন হয়ে দেশে ভয়াবহ বিপর্যয় দেখা দেয়। ফলে পরিবেশ বিপর্যয় ও জীবজগতের ভারসাম্য বিনষ্ট হবার মারাত্মক হুমকি দেখা দেয়।

জলবায়ু পরিবর্তন ঃ সমুদ্র পৃষ্ঠের স্ফীতিকরণ বাড়ছে - বিজ্ঞানীমহল উদ্বিগ্ন

সমুদ্রপৃষ্ঠের স্ফীতিকরণ বৃদ্ধি নিয়ে বিজ্ঞানীমহলে উদ্বেগের অন্ত নেই। সম্প্রতি কোপেনহেগেনে অনুষ্ঠিত হলো ইন্টারন্যাশনাল সায়েন্টিফিক কংগ্রেস অন ক্লাইমেট চেঞ্জ। এ অনুষ্ঠানে উপস্থাপিত গবেষণাপত্রে এ বিষয়টিই সুস্পষ্ট হয়েছে যে, ২১০০ সালের মধ্যে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির পরিমাণ এক মিটার হওয়ার সম্ভাবনা। এই উচ্চতা আরও বেশিও হতে পারে। এর অর্থ হলো, আমরা যদি গ্রিনহাউস গ্যাসের নির্গমন দ্রুত এবং উল্লেখযোগ্য পরিমাণে কমাতে না পারি, তাহলে আগামী দিনগুলোতে সাগর তীরবর্তী এলাকার প্রতি ১০টি বাসগৃহের মধ্যে একটি সমুদ্রের পানিতে প্লাবিত হবে।

তাসমানিয়ার হোবার্টে সেন্টার ফর অস্ট্রেলিয়ান ওয়েদার অ্যান্ড ক্লাইমেট রিসার্চের গবেষক জন চার্চ বিজ্ঞান সম্মেলনে বলেন, সাম্প্রতিককালের উপগ্রহ ও ভূ-ভিত্তিক পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে, ১৯৯৩ সাল থেকেই সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা প্রতিবছর তিন মিলিমিটার হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং এই হার বিশ শতকে সমুদ্রপৃষ্ঠের গড় উচ্চতা বৃদ্ধির হারের তুলনায় বেশি। সমুদ্রের উত্তাপ বৃদ্ধি ও প্রসারণও অব্যাহত রয়েছে। পর্বত-হিমবাহ গলে যাওয়ার ঘটনাও বাড়ছে। তদুপরি গ্রিনল্যান্ড ও আইসল্যান্ডের গলিত বরফও সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করছে।

অ্যান্টার্কটিকা ও গ্রিনল্যান্ডে ক্রমবর্ধমান হারে বরফের চাঁই হারিয়ে যাওয়ায় সতর্ক নজর রাখছেন বিজ্ঞানীরা। কলোরাডো বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ বিশেষজ্ঞ কনরাড স্টেফেন এ বিষয়ে আলোচনাকালে বলেন, গত দশকে বরফের চাঁই বিলুপ্ত হওয়ার ঘটনা উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বেড়েছে। ২১০০ সালের মধ্যে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি বিশ্বব্যাপী গড়ে এক মিটারের বেশি হতে পারে।

দু-তিন বছর ধরে সংগৃহীত উপাত্ত পর্যবেক্ষণে এ ধারণা প্রাধান্যে এসেছে যে, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির কিছু মৌলিক দিক অগ্রাহ্য করার কোনো উপায় নেই। বিশাল অঞ্চলজুড়ে হিমবাহের প্রবাহ বৃদ্ধির ফলে গ্রিনল্যান্ড ও

www.nagorikpathagar.org

অ্যান্টার্কটিকার চাউস বরফখণ্ডগুলো গলে আরও দ্রুততার সঙ্গে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বাড়ছে।
পটসড্যাম ইনস্টিটিউট ফর ক্লাইমেট ইমপ্যাক্ট রিসার্চের গবেষক স্টেফান র‍্যামসটর্ফ ব্যাখ্যা করে বলেন, বিভিন্নভাবে পরিমাপ করে দেখা গেছে, ১৮৮০ সাল থেকে এ পর্যন্ত সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা প্রায় ২০ সেন্টিমিটার বেড়েছে। দেখা গেছে, সমুদ্রের উপরিভাগ যত তাড়াতাড়ি উষ্ণ হয়, এর উচ্চতা বৃদ্ধিও ততটাই দ্রুততর হয়। তিনি বলেন, বিগত অভিজ্ঞতার আলোকে আমরা এ কথাই বলতে চাই, আমাদের গ্রহটা যেহেতু দ্রুত উষ্ণ হয়ে উঠেছে, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধিও দ্রুততর হবে।
সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির যে পূর্বাভাস বিজ্ঞানীরা দিচ্ছেন এর সর্বনিম্ন পর্যায়ের প্রভাবও যদি বিবেচনায় আনা হয়, তাহলেও সেটি হবে বাস্তবিকই বিপর্যয়কর। বিশ্বের মোট জনসংখ্যার প্রায় ১০ শতাংশ সমুদ্র তীরবর্তী অঞ্চলে বসবাস করে। এদের সংখ্যা ৬০ কোটির মতো। সাগরের উচ্চতা বাড়লে এই বিশাল জনগোষ্ঠী প্লাবিত হওয়ার পূর্ণ ঝুঁকিতে পড়বে।
গবেষক জন চার্চ বলেন, বর্তমানে যে ধরনের উপকূলবর্তী বন্যার ঘটনা আমরা প্রতি ১০০ বছরে মাত্র একবার প্রত্যক্ষ করে থাকি, ২১০০ সালের দিকে এ ধাঁচের বন্যা প্রতিবছর কয়েকবার করে ঘটবে। বিজ্ঞানীরা মনে করেন, বিভিন্ন পর্যবেক্ষক দলের গবেষণার ফলাফলে সামান্য পার্থক্য দেখা দিতেই পারে। তবে সার্বিক বিবেচনায় সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির সর্বনিম্ন পর্যায়ের ঘটনাও বিশ্ব পরিবেশে ভয়াবহ বিপর্যয় ডেকে আনবে। সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির কারণে অতীতে বারমুডাসহ অনেক দ্বীপেই ভূমিতে বাসা বাঁধে এমন অনেক পাখির আবাসস্থল সাগরের পানিতে তলিয়ে গেছে। বিলুপ্ত হয়েছে অনেক পাখি। একই কারণে বিলুপ্ত হয়েছে উত্তর আটলান্টিক তীরবর্তী অঞ্চলে বসবাসকারী ক্ষুদ্র লেজওয়ালা অ্যালবাট্রাসের একটি প্রজাতি।
এ বিষয়ে এ যাবৎ প্রাপ্ত তথ্যাবলি নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ; কারণ এগুলোর সম্ভাব্য পূর্বাভাসমূল্য কম নয়। সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির যে ঘটনা অতীতে আন্তঃহিমবাহ জমানায় ঘটেছিল, সেটি আজকের উচ্চতা বৃদ্ধিরই অনুরূপ। এ জন্যই অতীতের ওই বিপর্যয়কর ঘটনার স্থায়িত্ব ও ব্যাপকতা আরও গভীরভাবে অনুধাবন করার সময় এসেছে। এ ধরনের বিপর্যয় রোধে যা যা করণীয়, আমাদের সবাইকে একযোগে তা করতে হবে। (প্রথম আলো : ৭ জুন, ২০০৯)।

১৯৮৮ সালের ভয়াবহ বন্যার কথা অনেকেরই স্মৃতিতে এখনও জেগে আছে। এখনও স্মৃতিপটে তরতাজা অবস্থায় রয়েছে '৯৮'র দীর্ঘস্থায়ী বন্যার ছবি। সর্বোপরি ২০০৪ সালের বন্যা সারা দেশের আমন ফসল, রাস্তাঘাট, ব্রিজ, কালভার্ট বিধ্বস্ত ও জনজীবন দুর্বিষহ করে তুলেছিল, যার ধ্বংসাবশেষ এখনো দৃশ্যমান। বিশেষত অতিবর্ষণের ফলে নগরবন্যা। প্রতি বছর জুন মাসেই পাহাড়ি ঢলে উত্তরাঞ্চলে আকস্মিক বন্যা দেখা দেয়। জুলাই নাগাদ সারাদেশসহ রাজধানীর নিম্নাঞ্চলগুলো প্লাবিত হয়ে যায়। সেপ্টেম্বর পর্যন্ত দেশের বিভিন্ন স্থানে চলে বন্যা আর বন্যা, আর তাতে মৃত্যু-রোগের প্রকোপ ও খাদ্যাভাব দেখা দেয়।

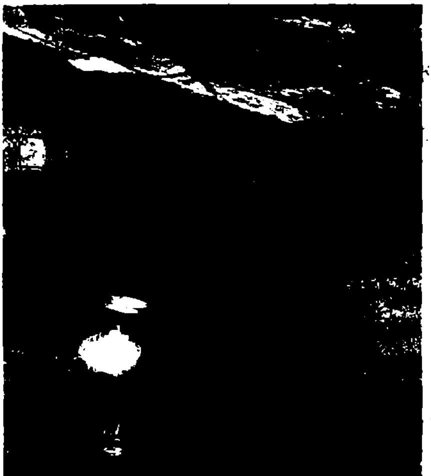
চিত্র ৬.৩ : বন্যায় জীবন সংগ্রাম

www.nagorikpathagar.org

গত কয়েক বৎসরের বন্যার ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ থেকে অনুমান করা যায়, বন্যার মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগ আমাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য কত মারাত্মক হুমকি।

বঙ্গোপসাগরীয় সাইক্লোন এবং বাংলাদেশ ঃ বঙ্গোপসাগরের অধিকাংশ সাইক্লোনের জন্মস্থান আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের আশপাশে। তাছাড়া আন্দামান সাগরে উৎপন্ন নিম্নচাপ এবং প্রশান্ত মহাসাগর থেকে দক্ষিণ চীন সাগর ও শ্যাম সাগর থেকে যত নিম্নচাপ আন্দামান এলাকায় এসে পৌঁছবে, ধরে নিতে হবে যে, সেগুলো তিন-চার দিনের মধ্যে বাংলাদেশে আঘাত হানবেই।

চিত্র ৬.৪ ঃ সাইক্লোনের তাণ্ডব ও অসহায় জীবন   চিত্র ৬.৫ ঃ দুই যুবক এক বৃদ্ধের লাশ উদ্ধার করছে

বাংলাদেশ কর্কট ক্রান্তি অঞ্চলের একটি আর্দ্র-উষ্ণ দেশ। এর দক্ষিণের উপকূলের ভৌগোলিক গঠন অদ্ভুত। উল্টো ফানেলের মতো এখানে উপরের দিকে সাগর ক্রমশ সঙ্কুচিত হয়ে গেছে। যতই দক্ষিণে যাওয়া যায় ততই বঙ্গোপসাগরের প্রস্থ বাড়তে থাকে। ভারতীয় উপকূলে পশ্চিমবঙ্গ থেকে উড়িষ্যা, অন্ধ্র প্রদেশ, তামিলনাডুর দিকে ক্রমশ দক্ষিণ-পশ্চিম এবং বর্মী উপকূল আরাকান থেকে রেঙ্গুন হয়ে দক্ষিণ বার্মার দীর্ঘ সরু ভূখণ্ডের দিকে ক্রমে ক্রমে দক্ষিণ-পূর্বে চলে গেছে। অন্যদিকে বিশেষ করে বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্ব উপকূল অর্থাৎ মেঘনার মোহনায় ভোলা থেকে কুমিরা পর্যন্ত সাগর উপরের দিকে খুবই সঙ্কুচিত, যা উল্টানো ফানেলের ছড়া মনে করা হয়। এই অদ্ভুত প্রাকৃতিক অবস্থানের ফলে বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট বেশিরভাগ সাইক্লোন এই ত্রিকোণ জলভাগের চূড়ার দিকে ধাবিত হয়ে বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে আঘাত হানে।

বাংলাদেশে লিপিবদ্ধকারে সবচেয়ে পুরানো ঘূর্ণিঝড় জলোচ্ছ্বাসের উল্লেখ দেখা যায় "আইন-ই-আকবরী" গ্রন্থে। এই গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে যে, ১৫৮৫ সালে এ ভূখণ্ডে (বর্তমান বাংলাদেশ) এক প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিঝড়-জলোচ্ছ্বাস সংঘটিত হয় এবং বিশ হাজার লোক এবং অগণিত পশুপাখি ও অন্যান্য সম্পদ ধ্বংস হয়। এরপর এই অঞ্চলে ঘূর্ণিঝড়-জলোচ্ছ্বাসের ইতিহাস পাওয়া যায় মাত্র ২০০ বছরের। ১৭৯৩ থেকে ১৯৯১ সাল পর্যন্ত বর্তমান বাংলাদেশ, পশ্চিমবঙ্গ, উড়িষ্যা উপকূলে ৪৩টি প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড়-জলোচ্ছ্বাস সংঘটিত হয়েছে।

www.nagorikpathagar.org

এর মাঝে ২১টি (শতকরা প্রায় ৫০ ভাগ) আঘাত হেনেছে চট্টগ্রাম-কক্সবাজার উপকূলে। এর পরেই রয়েছে বরিশাল ভোলা উপকূলের স্থান। এখানে ৯টি (শতকরা ২০ ভাগ) ঘূর্ণিঝড়-জলোচ্ছ্বাস আঘাত হেনেছে। তৃতীয় স্থানের অধিকারী সুন্দরবন-বাগেরহাট অঞ্চলে আঘাত হেনেছে শতকরা প্রায় ১৪ ভাগ। অন্যগুলো নোয়াখালী-খুলনা-মেঘনার অববাহিকা অঞ্চল এবং পশ্চিমবঙ্গ ও আসামে সংঘটিত হয়েছে। এসব ঘূর্ণিঝড় অধিকাংশ ঘটেছে শীত মৌসুমের আগের মাসগুলোতে অর্থাৎ অক্টোবর ও নভেম্বরে।

ভারতীয় উপমহাদেশে ৯টি বিধ্বংসী ঘূর্ণিঝড়-জলোচ্ছ্বাসের যে বর্ণনা ইতিহাসে পাওয়া যায়। তা এমন- ১৮৬৪ সালে উড়িষ্যার কন্টাই নামক স্থানে সংঘটিত ঘূর্ণিঝড়ে ১ লাখ লোক মারা যায়। ১৮৬৪ সালেই আরেকটি ঘূর্ণিঝড় অন্ধ্র প্রদেশের হাসুলিপট্রম নামক স্থানে আঘাত হানে এবং তাতে ৪০ হাজার লোক মারা যায়, ১৮৭৬ সালে বাকেরগঞ্জ জেলায় সংঘটিত ঝড়ে ২ লাখ মানুষের প্রাণহানি ঘটে। ইতিহাসে এটি 'দি গ্রেট বাকেরগঞ্জ কিলার' নামে উল্লেখিত হয়েছে। ইতিহাসে আরও উল্লেখ রয়েছে যে, ঘটনার ২২ দিন পরে এই প্রলয়ঙ্করী দুর্যোগের খবর কলকাতায় পৌঁছে এবং তার ১৩ দিন পরে ত্রাণ ও রিলিফ সামগ্রী আসে। ১৯৪২ সালে পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুরে আঘাত হানে একটি ঝড় এবং ৭৫ হাজার মানুষ মারা যায়। ১৯৭০ সালে ভোলা এবং সন্নিহিত দ্বীপপুঞ্জে ঘূর্ণিঝড় আঘাত হানে এবং এক লাখ লোক মারা যায়। ১৯৮৫ সালে উড়িরচরে আঘাত হানা ঝড়ে ৪০ হাজার লোক মারা য়ায়। সর্বশেষ প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিঝড়টি সংঘটিত হয় ১৯৯১ সালের ২৯ এপ্রিল রাতে। এটি চট্টগ্রাম উপকূল এবং সন্নিহিত দ্বীপমালায় আঘাত হানে এবং প্রায় ১ লাখ ৫০ হাজার লোকের প্রাণহানি ঘটায়। পরবর্তীতে সিডর হয় ২০০৭, নার্গিস ২০০৮ এবং আইলায় ২০০৯ এ ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে উপকূলীয় অঞ্চলে।

এডিবি রিপোর্ট ২০০৪

উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম প্রাকৃতিক দুর্যোগপূর্ণ দেশ। প্রাকৃতিক দুর্যোগের অন্যতম হলঃ বন্যা, খরা, সাইক্লোন, সিডর, নার্গিস ও ভূমিকম্প। বিশ্বব্যাংকের Flood drainage assesment report ২০০৪ অনুসারে বাংলাদেশের প্রায় ৮০ শতাংশ জনগোষ্ঠী বন্যাদুর্গত এলাকায় বাস করে। নিয়মিত হালকা ধরনের বন্যা সবসময়ই কৃষিকাজের জন্য সহায়ক। কিন্তু মারাত্মক এবং দীর্ঘস্থায়ী বন্যা সব সময়ই দেশের জনগোষ্ঠী এবং অর্থনীতির জন্য ভয়াবহ। দক্ষ সামাজিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার ফলে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হচ্ছে, দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মনে ক্ষমতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। পক্ষান্তরে দ্রুত ও অনিয়ন্ত্রিত নগরায়ন, দুর্বল পরিবেশ ব্যবস্থাপনা ভৌত অবকাঠামোর দুর্বল রক্ষণাবেক্ষণ এবং দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে দেশের জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন বিনিয়োগের সুফল খুব সামান্য উপভোগ করতে পারে।

২০০৪ সালের বন্যা পরিস্থিতি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের পাহাড়ি ঢলে বেশিরভাগ বোরো ফসল নষ্ট করে দিয়েছিল, যা দেশের প্রায় ৩৬ মিলিয়ন মানুষ যারা উত্তর-পশ্চিমে উত্তর-পূর্ব এলাকায় এবং দেশের মধ্যবর্তী জেলাসমূহে বাস করে। এ বন্যায় প্রায় ৮০০ লোক মারা যায়, প্রায় ২ মিলিয়ন একর কৃষি জমি, ভৌত অবকাঠামো, সামাজিক ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সরকারি ও ব্যক্তি মালিকানা বাড়িঘর, শস্য খামার, গরু ও মৎস্য খামার নষ্ট হয়েছিল।

www.nagorikpathagar.org

এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক বন্যায় ২০০৪ সালের ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ করে। তাতে সম্পদের প্রত্যক্ষ ক্ষতি (direct damage) এবং উৎপাদিত পণ্যের পরোক্ষ ক্ষতি (indirect losses) হিসাবে দেখা যায় যে, প্রাথমিক ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়ায় আনুমানিক ১৩৪ বিলিয়ন টাকা (২.৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার)। এর মধ্যে সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়ায় ৭১.৮ বিলিয়ন টাকা (১.৩৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার) এবং উৎপাদিত ফসলের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৫৪.৭ বিলিয়ন টাকা (যা ৯৩০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের সমান)।

২০০৪ সালের বন্যায় সম্পদ ও উৎপাদিত পণ্যের ক্ষয়ক্ষতির বিষয়ে নিম্নে আলোচনা করা হল :

সারণী ৬.৩ : ২০০৪ সালের বন্যায় সম্পত্তি ও ফসলের ক্ষয়ক্ষতির প্রাথমিক হিসাব (মিলিয়ন টাকা)

খাত	সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতি	ফসলের ক্ষয়ক্ষতি	মোট	শতকরা
গৃহায়ণ	২৭৫০০.০		২৭৫০০.০	২০.৪৫
পরিবহন ও ভৌত অবকাঠামো	২০০০০.০	১১৫০০	৩১৫০০.০	২৩.৪২
BWDB's FCD/I Scheme	৪,০০০.০		৪০০০.০	২.৯৭
পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন	৯০০.০		৯০০.০	০.৬৭
ঢাকা ওয়াসা	১,৪০০.০		১৪০০.০	১.০৪
নগর পৌরসভা	৩,১০০.০		৩১০০.০	২.৩০
প্রাথমিক স্কুল	২,৪০০.০		২৪০০.০	১.৭৮
মাধ্যমিক স্কুল ও কলেজ	১,৮০০.০		১৮০০.০	১.৩৪
স্বাস্থ্য	৪০০.০		৪০০.০	০.৩০
কৃষি ফসল ও মৎস্য	১১,৮০০.০	২৬,৬০০.০	৩৮৪০০.০	২৮.৫৫
শিল্প	৪,০০০.০	৫,৬০০.০	৯৬০০.০	৭.১৪
পাইকারি ও খুচরা ব্যবসা	-	১১,০০০.০	১১০০০.০	৮.১৮
বিদ্যুৎ	১,৬০০.০		১৬০০.০	১.১৯
অন্যান্য (বিভিন্ন সংস্থা থেকে ক্ষয়ক্ষতি)	৯০০.০		৯০০.০	০.৬৭
মোট (টা.মি.)	৭১,৮০০.০	৫৪,৭০০.০	১৩৪৫০০.০	১০০.০০
মোট (ডলার মি.)	১,৩৫০.০	৯৩০.০	২,২৮০.০	

Source : Based on GOB data and ADB, Staff estimates

Notes : Table Includes Public and Public sector losses (Exchange rate Tk 59 Per US dollar)

পরিবেশগত ক্ষয়ক্ষতি

বন্যায় পরিবেশগত ক্ষয়ক্ষতিগুলো মূলত ৪টি দিক থেকে উৎসারিত হয়েছে। সেগুলো হচ্ছে- (ক) নদী ভাঙ্গন (খ) ভূমি অবক্ষয় (গ) জলাবদ্ধতা (ঘ) পানি দূষণ এবং স্বাস্থ্য ঝুঁকি। নদী ভাঙ্গন ও ভূমিক্ষয়ের ফলে নদীর ধারের জনগোষ্ঠী সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। জলাবদ্ধতার জন্য সবচেয়ে বেশি ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে নগর জনস্বাস্থ্যের। এর জন্য মূলত দায়ী দুর্বল ড্রেনেজ ব্যবস্থাপনা এবং কঠিন বর্জ্য (Solid waste) ব্যবস্থাপনা। তাছাড়া রয়েছে অপর্যাপ্ত বিশুদ্ধ পানি এবং অপর্যাপ্ত পানি বিশুদ্ধকরণ সুবিধাদির অভাবে জনস্বাস্থ্য মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বাংলাদেশে সিডর সাইক্লোনের সঠিক ক্ষয়ক্ষতি ও লোকসান সংলগ্নি-ক সারণী-১।

www.nagorikpathagar.org

বাংলাদেশের বন্যায় বিধ্বস্ত অর্থনীতি ও যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রেক্ষাপটে বিশ্বব্যাংক ও এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক তাদের অভিজ্ঞতার আলোকে নিম্নোক্ত সুপারিশ প্রদান করে।

(ক) বন্যাউত্তর পুনর্বাসন ও পুনরুদ্ধার অধিকতর সফল হতে পারে, যদি শুধু ভৌত অবকাঠামো নির্মাণের দিকে গুরুত্ব না দিয়ে পুনর্বাসন কর্মসূচিকে থানা এবং কমিউনিটি পর্যায়ে উন্নয়ন এজেন্ডা হিসেবে গ্রহণ করা হয়।

(খ) পুনর্বাসন কর্মসূচিতে অর্থ বরাদ্দের এবং বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও সাম্য নিশ্চিত করতে হবে। বাংলাদেশে পুনর্বাসন কর্মসূচির বড় ধরনের জটিলতা হচ্ছে রাজনৈতিক প্রাধিকার দেয়া। এ ক্ষেত্রে রাজনৈতিক স্বচ্ছতা নির্বিশেষে তৃণমূল পর্যায়ে সরাসরি জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।

চিত্র ৬.৬ ঃ বন্যায় গ্রামীণ বাড়িঘরের অবস্থা

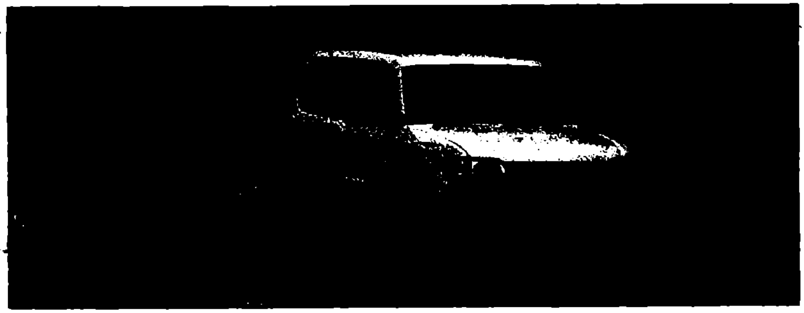

চিত্র ৬.৭ ঃ নগর বন্যার দৃশ্যে ঢাকা

(গ) দুর্যোগ প্রতিরোধ সংক্রান্ত অবকাঠামো পুনঃনির্মাণ এবং মেরামতের কাজ নিশ্চিত করে ঝুঁকি হ্রাস করা। সর্বোপরি সামাজিক ও নৈতিক মূল্যবোধ ও সবার দায়বদ্ধতাই সাফল্যের চাবিকাঠি।

এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক এবং বিশ্বব্যাংক যৌথভাবে ২০০৪ সালের বন্যার ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ টিম বন্যাউত্তর পুনর্বাসন ও পুনরুদ্ধার পদ্ধতি ও কর্মসূচির রূপায়ন করতে গিয়ে বলেছে যে, দুর্যোগের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার একটি চলমান প্রক্রিয়া। এ ক্ষেত্রে অতিগুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো

www.nagorikpathagar.org

হচ্ছে উদার কর্মকাণ্ডে ত্বরিত সাড়া দেয়া, ঝুঁকি প্রশমিত করা, দুর্যোগ প্রতিরোধ এবং পুনরুদ্ধার কর্মকাণ্ড জোরদারকরণ। সুশাসনের তাৎপর্য পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ত্বরিত ব্যবস্থা গ্রহণ শুধু দ্রুত সাহায্য প্রেরণের জন্যই জরুরি নয় বরং স্বাস্থ্য, সামাজিক ঝুঁকি এবং পুষ্টি ঝুঁকি হ্রাসকরণেও অত্যাবশ্যক। একইভাবে দুর্যোগাক্রান্ত জনগোষ্ঠীর দ্রুত আরোগ্যের ক্ষেত্রেও তা অত্যাবশ্যক। সময়ের প্রেক্ষাপট বিবেচনায় ADB-WB দল তিনটি পর্যায়ে একটি সুসমন্বিত পুনর্বাসন ও পুনরুদ্ধার কর্মসূচির সুপারিশ করেছে।

প্রথম পর্যায়ে স্বল্প মেয়াদী পুনর্বাসন কার্যক্রম হবে ১৫ মাসব্যাপী। এ কার্যক্রমে অত্যন্ত জটিল সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রগুলোকে স্বাভাবিক অবস্থায় পুনর্বাসন করবে।

দ্বিতীয় পর্যায়ে পাঁচ বৎসর মেয়াদী পুনর্গঠন ও পুনরুদ্ধার কর্মসূচি। এ পর্যায়ে সামাজিক ও বাস্তব ভৌত অবকাঠামো পুনর্গঠনের ওপর জোর দিতে হবে।

তৃতীয় পর্যায়ে দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়ন ও বাস্তবায়ন কর্মসূচি অন্তর্ভুক্ত থাকবে। এ ক্ষেত্রে সরকারি বেসরকারি যৌথ উদ্যোগে বিবিধ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। এ ক্ষেত্রে বিভিন্ন দেশের অভিজ্ঞতা কাজে লাগানোর সুযোগও রয়েছে। টেকসই উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা বিবেচনা করে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ঝুঁকি হ্রাসকরণ নীতিতে এসব বিবেচনায় আনতে হবে। এ জন্যে কারিগরি, প্রাতিষ্ঠানিক সুযোগ সুবিধা সম্প্রসারণে কমিউনিটিকে ক্ষমতায়ন করণের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। এভাবে দেশের নীতি ও আইনগত কাঠামোকে শক্তিশালী করা হলে জাতীয় পর্যায়ে সকল সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা সম্ভব হতে পারে। সিডরোত্তর পুনর্বাসন ও পুনর্গঠনের জন্য আর্থিক সহায়তা সংলগ্নি সারণী - ৬.২। দীর্ঘমেয়াদী দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বিনিয়োগ কর্মসূচি সংলগ্নি; সারণী-৬.৩।

সুপারিশমালায় তৃণমূল পর্যায়ে জনগোষ্ঠীকে ক্ষমতায়নের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যা ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের প্রয়োজন রয়েছে। বর্তমান গণতন্ত্রের যুগে আমাদের তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর উন্নয়ন প্রক্রিয়ার প্রধান সমস্যা হল অতি রাজনীতিকরণ। সম্ভবতঃ এর মূল ত্রুটি হচ্ছে সততা, স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতার অভাব। এজন্যে এখন প্রয়োজন দেখা দিয়েছে, তৃণমূল পর্যায়ে জনগোষ্ঠীকে সংগঠিত করে তোলা, সমাজের প্রতি তাদের দায়িত্ব কর্তব্য কি তা বুঝানোর জন্য। প্রতিনিধিনির্ভর কাজে তাদের কতটুকু অধিকার রয়েছে এ বিষয়ে অবহিত হবার জন্য। এ মূল্যবোধের ক্ষেত্রে প্রতিটি নাগরিককে একথা মনে রাখতে হবে যে প্রত্যেকটি মানুষকে তার পরিবারের, সমাজের এবং রাষ্ট্রের দায়িত্ব পালনকালে প্রতিটি বিষয়ে আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে। আর এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য স্বীয় অধিক্ষেত্রে নিজ নিজ জনগোষ্ঠীর কাছে স্বচ্ছ, সত্য ও দায়বদ্ধতার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতেই হবে। তৃণমূল পর্যায়ে জনগোষ্ঠীকে ব্যক্তিগত দায়বদ্ধতা থেকে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে এমন একটি মূল্যবোধ গড়ে তুলতে পারলে আমাদের সীমিত সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। সে সাথে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আমাদের প্রস্তাবিত কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হবো। আমাদের আত্মার পরিশুদ্ধি হলে আল্লাহও সহায় হবেন। এইতো প্রকৃতির অমোঘ বিধান।

www.nagorikpathagar.org

(খ) ঘূর্ণিঝড় ও পরিবেশ বিপর্যয়ের কারণ

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিক থেকে ভারতীয় উপমহাদেশ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের ভয়াবহতা ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের তীব্রতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। বলা হয়ে থাকে, গত ১০০ বৎসরে বঙ্গোপসাগরে বড় ধরনের সাইক্লোন হয়েছে ১৩১টি। গত পঞ্চাশ বৎসরের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, ১৯৬০-১৯৯৮ সাল পর্যন্ত উপকূলীয় এলাকায় ৩৯টি সাইক্লোন সংঘটিত হয়েছে। বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট এই ঘূর্ণিঝড়ের হার হচ্ছে ১.৩ প্রতি বছর। আমাদের সম্পদ ও জ্ঞানের সীমাবদ্ধতার জন্য এসব মারাত্মক জলোচ্ছ্বাসের সার্বিক ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ সম্ভব হয় না। গত শতাব্দীর ১৯৯১ সালের ২৯শে এপ্রিল প্রলয়ংকরী জলোচ্ছ্বাসে সন্দ্বীপ, হাতিয়া নিঝুম দ্বীপসহ নোয়াখালী জেলার ভোলা, কক্সবাজার ও চট্টগ্রামসহ অন্যান্য কয়েকটি এলাকায় মারাত্মক ক্ষতি হয়।

চিত্র ৬.৮ ঃ ঘূর্ণিঝড়ের তাণ্ডব ও বিপন্ন জীবন

চিত্র ৬.৯ ঃ ঘূর্ণিঝড়ের তাণ্ডবে নিরন্ন মানুষ

এসব এলাকার অধিকাংশই ১০-১৫ ফুট পানির নিচে চলে গিয়েছিল এবং বাতাসের গতিবেগ ছিল সর্বোচ্চ ঘণ্টায় ২২৫ কিলোমিটার। সরকারি হিসাবে মৃত্যুর সংখ্যা ছিল সোয়া লাখ। প্রকৃত সংখ্যা দু'লাখেরও বেশি। পরবর্তীতে সিডর দেশের অর্থনীতির ভিতকে পুনরায় ভেঙ্গে দেয়। প্রাকৃতিক বা মানব সৃষ্ট কারণে এমন কোন ঘটনা দ্বারা চলমান স্বাভাবিক ব্যক্তি বা সমাজ জীবনকে গভীরভাবে ব্যাহত বা ক্ষতিগ্রস্ত করে এবং তাতে মানুষ, সমাজ জনপদের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ও সংশ্লিষ্ট এলাকার প্রাকৃতিক পরিবেশ মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে। আর এ ক্ষতির পরিমাণ এত বেশি যে, নিজস্ব সম্পদ দিয়ে তা পূরণ করা সম্ভব হয়ে উঠে না।

বিগত ১৮৯০ সালের পর থেকে ভারতীয় উপমহাদেশসহ সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ঘূর্ণিঝড় জলোচ্ছ্বাস ও অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগ বৃদ্ধি পেয়েছে। পরিণামে প্রকৃতির ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে। বন সম্পদ নিধন, গাড়ির ধোঁয়া, প্রতিনিয়ত কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস বৃদ্ধি পাচ্ছে, সিএফসি এর পরিমাণ বাড়ছে আশংকাজনকভাবে এবং বাতাসের সাথে মিশছে। বিজ্ঞানীদের মতে, ১০০ বৎসর পূর্বে বাতাসে কার্বন ডাইঅক্সাইড ছিল এক লাখের ১৮ ভাগ।

www.nagorikpathagar.org

এখন তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩৫ ভাগ, ২০২৫ সালে তা ৬০-৭০ ভাগে দাঁড়াতে পারে বলে আশংকা করা হচ্ছে। ভূ-পৃষ্ঠের তাপমাত্রা ইতোমধ্যে শূন্য ৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেড়েছে। এসব অবিবেচক কর্মকাণ্ডের পরিণতি থেকে পরিত্রাণের জন্যই United Nations Framework for Climate Change (UNFCC) এবং Kyoto Protocol কর্মসূচি বাস্তবায়নের আলোড়ন সৃষ্টি হচ্ছে বিশ্বব্যাপী।

মিডলসেক্স বিশ্ববিদ্যালয়ের আবহাওয়াবিদ নিকোলাসের রিপোর্ট অনুসারে নতুন সহস্রাব্দের জলবায়ু হবে আরো ভয়াবহ। পৃথিবীর আবহাওয়া বিষয়ক গোটা তিরিশেক গ্লোবাল সার্কুলেশন মডেল রয়েছে। এসব মডেলের অভিন্ন বক্তব্য হচ্ছে, ২১০০ সালের নতুন বৎসরে পৃথিবী পৃষ্ঠের গড় তাপমাত্রা ২.৫ ডিগ্রি বাড়বেই। কার্বন ডাইঅক্সাইড বৃদ্ধির ফলে মেরু তুষারও গলতে শুরু করবে। তুষার গলতে থাকলে পৃথিবীর তাপ বিকিরণের ক্ষমতা কমবে। সূর্যরশ্মিও মহাকাশে বেরুতে পারবে কম। পৃথিবী উত্তপ্ত হতে থাকলে বরফ গলাও বাড়তে থাকবে ক্রমান্বয়ে। বিজ্ঞানীরা আশংকা করছেন, আগামী পঞ্চাশ বৎসরে সমুদ্রের পানি বাড়বে অন্তত ২১ সেন্টিমিটার। দক্ষিণ ভূ-মধ্যসাগর, আফ্রিকার পূর্ব ও পশ্চিম উপকূল এবং পূর্ব এশিয়ার বিপদ বাড়বে। মারাত্মক পরিণতির মুখোমুখি হবে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া। এতে করে ভারতের এবং বাংলাদেশের অনেক দ্বীপাঞ্চল স্থায়ীভাবে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে পারে (দৈনিক জনকণ্ঠ ২৯ সেপ্টেম্বর/২০০০)।

ঘূর্ণিঝড় এমন একটি প্রাকৃতিক দুর্যোগ যা মানুষ কখনও দমন করতে পারে না। এজন্য ঘূর্ণিঝড়কে শুধু সমস্যা হিসেবে না দেখে এ থেকে যতটা ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ সীমিত রাখার উপায় খুঁজে নেয়া উচিত। এজন্য উপকূলীয় এলাকায় জরিপ করে আক্রান্ত অঞ্চলগুলো শনাক্ত করা প্রয়োজন। দরকার উপকূলীয় এলাকায় বিক্ষিপ্ত বাড়িঘর না বানিয়ে দু'তিন তলা বহুমুখী পাকা বাড়ি নির্মাণ করা; যাতে দুর্যোগের সময় সহজেই মানুষকে আশ্রয় প্রদান করা যেতে পারে। দ্রুত নিরাপদ স্থানে যাওয়ার জন্য রাস্তাঘাট তৈরি করতে হবে। উপকূলীয় এলাকার জনগণ যাতে আবহাওয়া বার্তা শুনতে পারে সেজন্য প্রয়োজনীয় তথ্য প্রবাহ নিশ্চিত করতে হবে।

(গ) খরা ও মরুময়তা (Desertification)

এ ধরনের প্রতিকূল অবস্থার জন্য মানুষ প্রথমতঃ অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকে। যেমন কৃষি উৎপাদন ও পশুসম্পদের খাবার মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়। ফলে কৃষি নির্ভরশীল মানুষের বেকারত্ব বৃদ্ধি পায়। শিল্প পণ্যের চাহিদা কমে যায়। অর্থনীতিতে মন্দা দেখা দেয়, নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যসহ খাদ্য সমাগ্রীর দাম বেড়ে হয় আকাশচুম্বী। দ্বিতীয়তঃ খরার ফলে Surface water এবং Underground water এর ঘাটতি দেখা দেয়। কৃষি উৎপাদনের পাশাপাশি সুপেয় পানিরও ঘাটতি দেখা দেয়। যার ফলে স্বভাবত মানুষকে নিম্নমানের পানি খাবার জন্য ও অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় চাহিদা মিটানোর জন্য ব্যবহার করতে হয়। এভাবে জনস্বাস্থ্যের মারাত্মক ক্ষতি সাধিত হয়ে থাকে।

www.nagorikpathagar.org

ইতোপূর্বে খাদ্য সহায়তার মাধ্যমে সাময়িকভাবে এসব সমস্যার সমাধান করা হয়ে থাকলেও বাস্তবে দেখা যাচ্ছে, অতীতে খরা কবলিত এলাকায় বর্তমানে মারাত্মক আর্সেনিক সমস্যা দেখা দিয়েছে। সাম্প্রতিককালে গবেষণায়ও এরূপ মতামত প্রকাশ পেয়েছে।
প্রাকৃতিকভাবে সাধারণ বৃষ্টিপাতের চেয়ে কম বৃষ্টিপাত হলেই খরা দেখা দিয়ে থাকে। ফলে কৃষি কাজ, সেচব্যবস্থা সুপেয় পানি জীববৈচিত্র্যসহ স্বাভাবিক জনজীবনের বিপর্যয় ঘটে। গবেষণায় দেখা যায়, দীর্ঘকাল খরা আক্রান্ত এলাকায় আর্সেনিকের প্রাদুর্ভাব দেখা দেয় (রফিকুল ইসলাম সিদ্দীকী পৃঃ ১৮ ময়নুল পৃঃ ১৯৮)। খরার মাধ্যমেও আল্লাহ মানবজাতিকে সতর্ক ও সংশোধন করে থাকেন। তাই আল্লাহর নেয়ামতের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকার জন্য মানবজাতিকে সতর্ক করে বলেছেন, "আকাশ থেকে বৃষ্টির পানি আমি বর্ষণ করি না তোমরা বর্ষণ কর" (সুরা ওয়াকিয়া ৫৬:৫৯)।
আল্লাহ তাঁর নেয়ামতের প্রতি অকৃতজ্ঞ ও প্রকৃতির বিধানের পরিপন্থী কাজ করার জন্য মানবজাতিকে আরো স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, যদি আল্লাহ ভূগর্ভস্থ পানিকে আরো নিচে নিয়ে যান তবে কে সরবরাহ করবে সুমিষ্ট পানির স্রোতধারা। (সুরা আল মুলক ৬৭:৩০)।
আল্লাহর প্রকৃতির নিয়মের পরিপন্থী যে কোন কাজের জন্য মানুষকে তার কৃতকর্মের পরিণাম ভোগ করতে হবেই। তাই আমাদের কোন অবস্থাতেই প্রকৃতির নিয়মের পরিপন্থী উন্নয়ন কর্মকাণ্ড করলে তা কখনো টেকসই হবে না- একথা নির্দ্বিধায় বলা যেতে পারে।

(ঘ) ভূমিকম্প কেন হয়

আল্লাহ এ পৃথিবীকে অত্যন্ত সুন্দর ও আকর্ষণীয় করে সৃষ্টি করেছেন। তার সৃষ্টির সব কিছুই আনুপাতিকভাবে তৈরি করেছেন যাকে Ecologically balanced বলা হয়। আল্লাহর সৃষ্টির প্রতিটি জিনিসেই রয়েছে প্রাকৃতিক নিয়ম। সৃষ্টির প্রতিটি উপাদানকে প্রাকৃতিক নিয়ম মেনে চলতে হয়। এ নিয়মের ব্যত্যয় ঘটলেই প্রাকৃতিক বিপর্যয় অথবা প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঘটে থাকে। এবার দেখা যাক ভূমিকম্প কেন হয়? আমরা মনে করে থাকি, প্রাকৃতিক দুর্যোগ যথা ভূমিকম্প, ঘূর্ণিঝড় বা বন্যা সবকিছু প্রাকৃতিকভাবে হয়ে থাকে। আসলে এসব প্রাকৃতিক দুর্যোগের বৈজ্ঞানিক কারণ এবং ধর্মীয় তাৎপর্য রয়েছে। ভূমিকম্পের কথা ধরা যাক। আধুনিক বিজ্ঞানীদের মতে, প্রধানত চারটি কারণে ভূকম্পন হতে পারে। প্রথমত: ভূপৃষ্ঠের কোন প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কারণে, British বিজ্ঞানী ওল্ডহ্যাম গবেষণা করে দেখেছেন, অনেক সময় ভূমিকম্পনের পাহাড়ি জায়গায় বিরাট আকারে ধস নামতে শুরু করে। এর ব্যাখ্যা এমনও হতে পারে যে, deforestation এর ফলে অথবা পাহাড় কেটে উন্নয়ন কর্মকাণ্ড করলে অথবা পাহাড় কেটে ড্যাম্প তৈরি করলে ভূমিধ্বস হতে পারে। এসব অপরিকল্পিতভাবে এবং অদূরদর্শীভাবে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডেরই পরিণাম। দ্বিতীয় কারণটি অনেকটা প্রাকৃতিক, তাহলো আগ্নেয়গিরির অগ্নুৎপাত। ভূ-বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা নিরীক্ষা করে সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণের ফলে ভূ-গর্ভ থেকে গলিত লাভা বাইরে বেরিয়ে আসার জন্য প্রচণ্ড জোরে পাথরের স্তরে যখন ধাক্কা মারতে থাকে তখনই সৃষ্টি

www.nagorikpathagar.org

হয় ভূ-কম্পন। তৃতীয় কারণ শিলাচ্যুতিঃ এ তত্ত্বের প্রবক্তা হলো মার্কিন ভূ-বিজ্ঞানী H.F. Read। ভূ-ত্বকের বিভিন্ন ফাটল রয়েছে এবং এসব ফাটলের বরাবর শিলাস্তরের গতিশীলতার ফলেই ভূ-কম্পন হয়। চতুর্থ কারণ প্লেট টেকনিক্স তত্ত্ব। এ তত্ত্ব অনুসারে ভূ-ত্বক অনেকভাগে বিভক্ত। একেকটি ভাগকে বলা হয় প্লেট বা পাত। বহুকোটি বছর ধরে প্লেটগুলো একসঙ্গে জোড়া ছিল। এ প্লেটগুলো কখনো ভেঙ্গে গেলে তা সচল হয়ে উঠে। এভাবে চলতে চলতে একটি প্লেট আরেকটি প্লেটের সঙ্গে যখন ধাক্কা খায় তখনই সৃষ্টি হয় ভূমিকম্প। ভূ-বিজ্ঞানীদের মতে ভূ-পৃষ্ঠ ছোট বড় বারটি প্লেট দিয়ে তৈরি। ভূমিকম্প হয়ে থাকে এ প্লেটগুলোর সংযোগস্থলে।

মোট কথা শিলাস্তরে বছরের পর বছর ধরে চাপ ঘনীভূত হতে থাকে। এক সময় এ চাপ সহ্য সীমার বাইরে চলে গেলে, শিলাস্তরে ভাঙ্গন ধরে এবং শিলাস্তর চলতে শুরু করে। এ শিলাস্তরের সংঘাতের ফলে ভূমিকম্পন হয়। এ শতাব্দীতে বিশ্বের ১৮টি দেশে বড় ধরনের ভূমিকম্প সংঘটিত হয়েছে। চীন, জাপান, পেরু, ইরান, আর্মেনিয়া, গুয়েতেমালা, মেক্সিকো, আফগানিস্তান, কলম্বিয়া; সর্বশেষ আগস্ট/৯৯ এ তুরস্ক এবং সেপ্টেম্বর/৯৯ তাইওয়ানে। তুরস্কে যা সমুদ্র তীরবর্তী শহরগুলোর প্রায় ১২০ কিলোমিটার জুড়ে। ক্ষতির পরিমাণ ৪ বিলিয়ন ডলার। জাতিসংঘের মতে প্রায় ২০ বিলিয়ন ডলার। মৃতের সংখ্যা ৪০ হাজার। ২০০৩ সালে ইরানে শতাব্দীর ভয়াবহতম ভূমিকম্প হয়েছে।

ভূমিকম্প ঃ বাংলাদেশ

বাংলাদেশকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে এমন ভূমিকম্পের ১৫০ বৎসরের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, রিখটার স্কেল ৭.০ এর সমান অথবা বেশি পরিমাণের মাত্র দুইটি ভূমিকম্প হয়েছে, যে ক্ষেত্রে বাংলাদেশ মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তার বিবরণ নিম্নে প্রদান করা হলো ঃ

সারণী ৬.৪: অতীতের মারাত্মক ভূমিকম্পের বিবরণ

তারিখ	ভূমিকম্পের নাম	পরিমাপ রিখটার স্কেল	ঢাকা থেকে উপকেন্দ্রিক (Epicentral) দূরত্ব
১০ জানুয়ারি, ১৮৬১	কাছার ভূমিকম্প	৭.৫	২৫০
১৪ জুলাই, ১৮৮৫	বেঙ্গল ভূমিকম্প	৭.০	১৭০
১২ জুন, ১৮৯৭	বৃহত্তর ভারতীয় ভূমিকম্প	৮.৭	২৩০
০৪ জুলাই, ১৯১৮	শ্রীমঙ্গল ভূমিকম্প	৭.৬	১৫০
০২ জুলাই, ১৯৩০	দ্রব্রি ভূমিকম্প	৭.১	২৫০
১৫ জানুয়ারি, ১৯৩৪	বিহার নেপাল ভূমিকম্প	৮.৩	৫১০
১৫ আগস্ট ১৯৫০	আসাম ভূমিকম্প	৮.৫	৭০

উৎস ঃ Dr. Jamilur Reza Chowdhury : 35th Senior Staff course lecture in BPATC, 15th May 2001

www.nagorikpathagar.org

উল্লিখিত ৭টি ভূমিকম্পের মধ্যে বাংলাদেশে মারাত্মক ক্ষতি সাধিত হয়েছে ১৮৮৫ সালে বেঙ্গল ভূমিকম্পের ফলে। ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাগুলো হচ্ছে সিরাজগঞ্জ, বগুড়া এলাকা। সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাগুলো হচ্ছে জামালপুর, শেরপুর ও ময়মনসিংহ এলাকা, যে এলাকায় যমুনা বহুমুখী ব্রিজ অবস্থিত। এ বিষয়ে Bolt (১৯৮৭) একটি প্রতিবেদনে বিস্তারিত বিশ্লেষণ (analysis) করেছেন। ১৯১৮ সালে শ্রীমঙ্গল ভূমিকম্পেও বাংলাদেশে ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়েছে, যার পরিমাপ ছিল ৭.৬ রিখটার স্কেল। ঢাকা এলাকায় সামান্য ক্ষয়ক্ষতি হলেও মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা ছিল মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গল।

বাংলাদেশে সাম্প্রতিক ভূমিকম্প

৮ই মে, ১৯৯৭ সিলেট ভূমিকম্প (গন=৫.৬) উত্তর-পূর্ব সিলেটের জৈয়ন্তিপুর এলাকায় অনুভূত হয়েছিল। সিলেট বিমানবন্দর এলাকা, জৈয়ন্তিপুর কলেজ ও গ্রামীণ ব্যাংকের দালানসহ অনেক স্থায়ী স্থাপনায় ফাটল ধরেছিল। ২১শে নভেম্বর, ১৯৯৭ সালে বান্দরবন ভূমিকম্পণ (গন=৫.৬) যা বাংলাদেশ-মিয়ানমার সীমান্ত এলাকায় ছিল। এ ভূমিকম্পের ফলে চট্টগ্রাম অঞ্চলের অনেক বিল্ডিংয়ের ক্ষতি হয়েছিল। চট্টগ্রাম শহরে একটি দালান ভেঙ্গে বিশজনের মৃত্যুও হয়েছিল।

২২শে জুলাই ১৯৯৯ মহেশখালী ভূমিকম্পণ (গন=৫.১) এর ফলে মহেশখালী এলাকায় অনেক মাটির ঘর ও কিছু দালানের ক্ষতি হয়েছিল (জামিল ২০০১)। ভূতাত্ত্বিক গঠন অনুযায়ী বাংলাদেশকে ৩টি ভূকম্পন প্রবণ জোনে ভাগ করা হয়েছে। সবচেয়ে বিপজ্জনক জোন হচ্ছে বান্দরবান, চট্টগ্রাম, সিলেট, ময়মনসিংহ ও রংপুর। দ্বিতীয় বিপজ্জনক জোন হচ্ছে - কুমিল্লা, ঢাকা, টাঙ্গাইল, বগুড়া, দিনাজপুর, রাঙ্গামাটি ও কক্সবাজার। এছাড়া অন্যান্য এলাকা মোটামুটি নিরাপদ (বিচিত্রা ৩রা সেপ্টেম্বর/৯৯ পৃঃ ৩৩)।

হালে ভূমিকম্পের প্রকোপ বাড়ার ফলে পূর্ব সতর্কীকরণ ব্যবস্থা নেয়ার জন্য ১৯৯২ সালে সরকার জাতীয় বিল্ডিং কোড তৈরি করার একটি কমিটি গঠন করেছিল। সে কোডে ভূমিকম্প প্রতিরোধ Concrete and Steel Structure ডিজাইন তৈরি বিস্তারিত নীতিমালায় উল্লেখ রয়েছে। এ নীতিমালাটি অদ্যাবধি বাস্তবায়নের অপেক্ষায় রয়েছে। ১৯৯৭ সালে এ কোড বাস্তবায়ন পদ্ধতি নিরূপনের জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে, যা এখনো প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। কোড নীতিমালা বাস্তবায়ন পদ্ধতির অভাবে অনেক নতুন দালান-কোঠা তৈরি হচ্ছে যা অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। দ্রুত নগরায়নের ফলে অনিরাপদ আবাসনের সংখ্যা ক্রমান্বয়ে দ্রুত বাড়ছে। দুর্যোগের এ ঝুঁকি কমানোর জন্য বিল্ডিং কোড বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় সাধারণ মানুষের সচেতনতা ও নৈতিকতার বিষয়টি অতি আবশ্যক। স্ট্যামফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় ভূমিকম্প দুর্যোগের ঝুঁকি সূচক (Earthquake Disaster Risk Index) তৈরি করেছে, তাতে পৃথিবীর ২০ নগরীর তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। এসব নির্ণয়কালে ঝুঁকি (hazard) উদ্‌ঘাটন (vulnerability) ভয়াবহতা বাহ্যিক বিষয়াদি (External context) যেমন অর্থনীতি, যোগাযোগ অবকাঠামো, দ্রুত কার্যক্রম

www.nagorikpathagar.org

গ্রহণ এবং পুনর্গঠন ক্ষমতাগুলো সমন্বয় করে মোট মূল্য (Total Value) বের করে দেখানো হয়েছে যে, ঢাকা শহরের সূচক মূল্য সবচেয়ে বেশি। কারণ হিসেবে দেখানো হয়েছে অধিক ভয়াবহতা দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণের এবং পুনর্গঠনের সীমাবদ্ধতা। এছাড়া আরো একটি বড় সমস্যা হলো দুর্যোগ ঝুঁকি সূচক পরিমাপের নির্ভরযোগ্য উপাত্তের সীমাবদ্ধতা (জেআরসি ২০০১)।

নতুন শতাব্দী আমরা অতিক্রম করছি। বিশ্ব আজ ডিজিটাল যুগে তুঙ্গে। ইলেকট্রনিক এই যুগে শুনলে অবাক হতে হয়, আমাদের দেশে ভূমিকম্প নির্ণয় উপযোগী কোনো অত্যাধুনিক কেন্দ্র বা প্রতিষ্ঠান নেই। ছোটখাটো মৃদু ভূ-কম্পন মাঝে মাঝেই আমরা অনুভব করছি। কিন্তু এর মাত্রা বা উৎসস্থল সম্পর্কে আমরা জানতে পারছি না। তাই আমাদের দেশে একাধিক ভূ-কম্পন পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন অতিজরুরি। এ ব্যাপারে আমাদের নীতি নির্ধারক ও তৃণমূল পর্যায়ে এ দুর্যোগের পরিণতি ও প্রতিকার সম্বন্ধে সচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে। একেবারেই প্রাকৃতিক কারণের ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কমানো যেতে পারে। তাছাড়া মানবসৃষ্ট কারণগুলো পরিহার করা যেতে পারে।

পরিত্রাণের উপায় কী?

সাইক্লোন প্রবন্ধে কানাই চক্রবর্তী প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলার প্রতিকারের বিষয় পর্যালোচনা করে বলেন, আমাদের দেশে রাজনৈতিক বিরোধ নিয়ে সরকার এবং রাজনৈতিক দলগুলোকে যত বেশি মাথা ঘামাতে দেখা যায়, প্রাকৃতিক বিপর্যয় থেকে উত্তরণ কিংবা প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় তত সোচ্চার হতে দেখা যায় খুবই কম। উন্নত বিশ্বে সুশীল সমাজ তথা উন্নত রাজনৈতিক সংস্কৃতির কারণে প্রাকৃতিক বিপর্যয় মোকাবিলায় নতুন নতুন প্রযুক্তি এবং বিজ্ঞানীদের প্রচেষ্টা এগিয়ে চলেছে। যদিও ঘূর্ণিঝড় বা সাইক্লোন ধ্বংস করার কোন উপায় এখন পর্যন্ত আবিস্কৃত হয়নি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন বিজ্ঞানী সাইক্লোন নিশ্চিহ্ন করার জন্য অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছেন; কিন্তু সাফল্য অর্জন করতে পারেননি আজও।

একবার মার্কিন বিজ্ঞানীরা সাইক্লোনের কেন্দ্রবিন্দুতে বিমান দিয়ে সিলভার আয়োডাইড দ্রব্য ছিটিয়ে দেন। তাঁরা ভেবেছিলেন, এতে বোধ হয় সাইক্লোন নিশ্চিহ্ন হবে; কিন্তু দেখা গেল এতে সাইক্লোন শুধু তার গতি পরিবর্তন করেছে। এর বেশি আর কিছুই লাভ হয়নি। অর্থাৎ সাইক্লোনের গতি পরিবর্তন করা ছাড়া আর কিছুই করা যায় না। আর এই গতি যদি ক্রমাগত সফলতা অর্জিত হয়, তাহলে উন্নত দেশের ফিরিয়ে দেয়া ঘূর্ণিঝড়ের গতি নিঃসন্দেহে বাংলাদেশের মতো এলাকাসমূহে আঘাত হানবে। এতে করে প্রতিবছরই বাংলাদেশের মতো একটি গরিব রাষ্ট্রকে আরও ভয়াবহ ও অধিক সংখ্যক সাইক্লোন মোকাবিলা করতে হবে। কারণ বাংলাদেশে সৃষ্ট ঘূর্ণিঝড়ের গতি পরিবর্তনের কথা এখনও আমরা কল্পনাও করতে পারি না। সঙ্গত কারণে প্রশ্ন জাগবে, ঘূর্ণিঝড়ের ছোবল থেকে তাহলে বাঁচার কি কোন পথই নেই? এটা ঠিক, ঘূর্ণিঝড় একটি প্রাকৃতিক বিপর্যয়। এই

www.nagorikpathagar.org

বিপর্যয় মোকাবিলা একেবারে সম্ভব না হলেও ঘূর্ণিঝড় প্রাক-প্রস্তুতি এবং সতর্কতা দিয়ে প্রাণহানির সংখ্যা কমানো সম্ভব। আর এই কৌশলটি স্রেফ আত্মরক্ষা। প্রথমত প্রয়োজন ঘূর্ণিঝড় সম্পর্কে গণসচেতনতা গড়ে তোলা। ঘূর্ণিঝড় সৃষ্টির আশঙ্কা দেখা দেয়ামাত্র জনগণকে অবহিত করা। সঙ্কেত পদ্ধতিরও সংস্কার প্রয়োজন। আমাদের দেশে যে বিপদ সঙ্কেত রয়েছে, তা অত্যন্ত সেকেলে। এ থেকে মহাবিপদের কথা যথাযথ ভাবে বোঝা যায় না। তাই এর সংস্কার প্রয়োজন। নদীবন্দরের জন্য সঙ্কেত রয়েছে ৪টি। ৯ নম্বর মহাবিপদ সঙ্কেত হচ্ছে ঘূর্ণিঝড় সমুদ্রবন্দরের বাঁ দিক দিয়ে যাবে। ৮ নম্বর হচ্ছে ঘূর্ণিঝড় যাবে সমুদ্রবন্দরের ডান দিক দিয়ে। আর ১০ নম্বর ঘূর্ণিঝড় হচ্ছে সমুদ্রবন্দরের উপর দিয়ে (সাইক্লোন দৈনিক জনকণ্ঠ ২৯ সেপ্টেম্বর ২০০০)।

আমাদের দেশে অনেকেই মহাবিপদ সঙ্কেতের শ্রেণীবিন্যাসও জানেন না। ১০ নম্বর সঙ্কেত থেকে যদি ৯ নম্বর সঙ্কেত আনা হয় তবে সাধারণ মানুষ মনে করে থাকেন ঘূর্ণিঝড় বোধ হয় দুর্বল হয়ে পড়েছে। আসলে তা নয়। এসব কারণে জনসাধারণের জন্য সহজবোধ্য নতুন বিপদ সঙ্কেত করা উচিত। পৃথিবীর উন্নত দেশে আজকাল সাইক্লোন, টর্নেডো, গোর্কি ইত্যাদি দুর্যোগের সময় সতর্কতা প্রচারে সঙ্কেত ব্যবহার করা হয় না। ঝড়ের গতিপ্রকৃতি, তীব্রতা ইত্যাদি সবকিছু পুরোপুরি জানিয়ে দেয়া হয়। আমাদের প্রচারেও তেমন ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত। এ ছাড়াও সাইক্লোন যেসব এলাকায় বেশি আঘাত হানে, সেসব স্থানে পর্যাপ্ত সংখ্যক উঁচু সাইক্লোন শেল্টার তৈরি করে মানুষ বাঁচানো যায়। সুউচ্চ শক্তিশালী বেড়িবাঁধ রক্ষাকবচ হলেও নির্মাণ জটিলতা, প্রশাসন ও নির্মাতাদের অসাধুতা, স্থান নির্বাচনে পক্ষপাতিত্বের কারণে বাঁধ নির্মাণও এখন ব্যবসায় পরিণত হয়েছে। এ জন্য উপকূলীয় এলাকায় বেড়িবাঁধ নির্মাণে স্বচ্ছতা ফিরিয়ে আনা প্রয়োজন। ঘূর্ণিঝড় পরবর্তী সবসময় দেখা গেছে, বাইরের দেশ এবং প্রতিষ্ঠানের দিকে তাকিয়ে থাকতে। তাদের সাহায্য না পাওয়া পর্যন্ত ত্রাণতৎপরতা নামে মাত্র চলে। এতে ঘূর্ণিঝড়ের পর যারা বেঁচে থাকেন তাদেরও বাসস্থান, খাদ্য ও ওষুধ সামগ্রীর অভাবে চরম দুর্ভোগ পোহাতে হয়।

উপরোক্ত অবস্থার প্রেক্ষিতে মুসলমান হিসেবে আমাদের করণীয় হবে প্রথমতঃ আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে সকল প্রকার সামাজিক এবং ব্যক্তিগত অন্যায় অবিচার ও পাপাচার থেকে নিজেকে মুক্ত রাখা যেন যে কোন অবস্থায় মৃত্যু ঘটলে ঈমানের সাথে মৃত্যু হয়।

দ্বিতীয়তঃ আল্লাহর সৃষ্টির ভারসাম্যহীনতা নষ্ট না করা। এ ভারসাম্যহীনতাকে দু'ভাগে ভাগ করা যেতে পারে।

(১) প্রাকৃতিক ভারসাম্যহীনতা

(২) সামাজিক ভারসাম্যহীনতা

মানব সম্পদের অদূরদর্শী ও অপরিকল্পিতভাবে উন্নয়ন কার্মকাণ্ড করে প্রাকৃতিক পরিবেশের Ecological Imbalance সৃষ্টি করা। যেমন বৃক্ষনিধন, পানিদূষণ, বায়ু দূষণ, পাহাড় কেটে ড্যাম্প তৈরি করা, underground nuclear bomb test করা ইত্যাদি।

www.nagorikpathagar.org

উপরোক্ত কর্মকাণ্ডগুলোর পরিণামে বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ সংঘটিত হতে পারে। তাই কোরআন শরীফে উল্লেখ রয়েছেঃ মানুষের কর্মের পরিণতিস্বরূপ স্থলে ও সামুদ্রিকভাগে বিপর্যয় সৃষ্টি হয়েছে। যেন মানুষ ফিরে আসে। আল্লাহ্ তাদের কৃতকর্মের কিছুটা স্বাদ ভোগ করাতে চান। (সূরা রূম ৩০:৪১)।

অন্যায়, জুলুম, দুর্নীতি, ঘুষ, ব্যভিচার ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের মাধ্যমে সামাজিক ভারসাম্যতা হারায়। এর মধ্যে কতিপয় জনগোষ্ঠীর নির্বিচারে প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণ ও ব্যবহার করে নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য। অন্যদিকে দারিদ্র্য নীপীড়িত মানুষ বাঁচার জন্য নিরুপায় হয়ে প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর চাপ সৃষ্টি করে। এভাবেই আল্লাহর সৃষ্টির ভারসাম্য হারায়।

প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঃ ইসলাম ও ইতিহাসের শিক্ষা

অতীতের ঘটনাবলী থেকে দেখা যায় যে, নাফরমান জনগোষ্ঠীকে যখন তারা অপ্রাকৃতিক কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হয়, আল্লাহর স্বাভাবিক প্রাকৃতিক বিধানগুলো লঙ্ঘন করে তখন আল্লাহ মহাপ্লাবন বা বন্যার মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগ দিয়ে তাদের সতর্ক করেন। হযরত নুহ (আঃ) এর যুগে তার পুত্রসহ আল্লাহর বিধান লঙ্ঘনকারী জনগোষ্ঠীকে শিক্ষা দেয়ার জন্য মারাত্মক আকারের বন্যা ও তুফান দিয়েছিলেন।

বন্যার পূর্বেই ঈমানদার লোকসহ জোড়ায় জোড়ায় প্রত্যেক প্রাণীসহ মানব কল্যাণের সবকিছুকেই রক্ষা করার ব্যবস্থা নিশ্চিত করেছিলেন। আল্লাহ মানবজাতিকে বন্যা বা মহা প্লাবনের কথা মানব জাতিকে শিক্ষা নেয়ার জন্য স্মরণ করিয়ে বলেন, আমি যখন খুলে দিলাম আকাশের দরজা অনবরত বারি বর্ষণের জন্য এবং ভূমি থেকে প্রবাহিত করলাম প্রস্রবণ। অতঃপর সব পানি মিলিত হল এক পরিকল্পিত কাজে। আমি তাকে [নুহ (আঃ) কে] আরোহণ করালাম এক কাষ্ঠ ও পেরেক নির্মিত জলযানে। (সূরা আল কামার ৫৪:১১-১৩)

আবদ ইবনু হুমাইদ (রঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, লূত (আঃ) এর সম্প্রদায়ের কিছু লোক তাকে পথে ঘাটে কোথাও পেলে তার গলা টিপে ধরত। ফলে বেঁহুশ হয়ে যেতেন। তিনি হুঁশ ফিরে আল্লাহর কাছে দোয়া করতেন, আল্লাহ্ আমার যন্ত্রণাকারীদের মাফ কর তারা অজ্ঞ (আঃ রউফ, ১৯৯৫, পৃষ্ঠা ১০৫-১০৬ এবং মন্নুল হক ২০০৩; পৃষ্ঠা ১৯৫)।

প্রাকৃতিক বিধান অনুসরণ না করে, নিজেদের অপকর্মের জন্য তওবা না করে, গুনাহর কাজে দৃঢ় থেকে ইসলামিক বিধানকে উপহাস ও বিদ্রূপ করার দরুন, নবী হযরত হুদ (আঃ)-এর সম্প্রদায়ের ওপর নজিরবিহীন আযাব নাজিল হয়েছিল, যা তাদের দৈহিক শক্তি, মানসিক জ্ঞান-বৃদ্ধি আর আর্থিক শুদ্ধি বিন্দুমাত্রও বাঁচাতে পারেনি। যার প্রমাণ কোরআন-হাদিসে বিশদ আলোচিত হয়েছে। যেমন সূরায়ে হুদে ইরশাদ হয়েছে- অতঃপর তিনি (নবী হযরত হুদ (আঃ) স্বীয় জাতিকে) বলেন- তোমরা যদি এভাবে সত্যকে প্রত্যাখ্যান কর, তবে জেনে রাখ পয়গাম পৌঁছানোর জন্য আমাকে প্রেরণ করা হয়েছে। আমি তা যথাযথভাবে তোমাদের নিকট পৌঁছিয়েছি। অতএব, তোমাদের অনিবার্য পরিণতি এই যে, তোমাদের ওপর আল্লাহর

www.nagorikpathagar.org

আযাব ও গজব আপতিত হবে। তোমরা সমূলে নিপাত হয়ে যাবে। আর আল্লাহ্ তোমাদের স্থলে অন্য জাতিকে এ পৃথিবীতে আবাদের জন্য আবির্ভূত করাবেন। তোমরা যা করছ তাতে তোমাদেরই সর্বনাশ করছ, আল্লাহর্ কোন ক্ষতি করতে পারোনি। আমার পালনকর্তা সবকিছু লক্ষ্য রাখেন রক্ষণাবেক্ষণ করেন, তোমাদের সব ধ্যান-ধারণা ও কার্যকলাপের তিনি খবর রাখেন। এ ক্ষেত্রে কওমে হুদের ঘটনা পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে- হযরত হুদ (আঃ)-এর কথায় কর্ণপাত করল না। তারা নিজেদের হঠকারিতা ও অবাধ্যতার ওপর অবিচল রইল। অবশেষে প্রচণ্ড ঝড়-তুফান রূপে আল্লাহর আযাব নেমে এল। সাত দিন, আট রাত যাবৎ অনবরত ঝড়-তুফান বইতে লাগল। বাড়ি-ঘর ধ্বসে গেল, গাছপালা উপড়ে পড়ল, গৃহের ছাদ উড়ে গেল, মানুষ ও সকল জীব-জন্তু শূন্যে উত্থিত হয়ে সজোরে জমিনে নিক্ষিপ্ত হল। এভাবেই অত্যন্ত প্রতাপশালী ও শক্তিশালী একটি জাতি সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে গেল। আ'দ জাতির ওপর যখন প্রতিশ্রুত আযাব নাযিল হয়, তখন আল্লাহ্ তাঁর চিরন্তন বিধান অনুযায়ী হযরত হুদ (আঃ) ও সঙ্গী ঈমানদারগণকে সেখান থেকে সরে যাওয়ার নির্দেশ দিয়ে আযাব হতে রক্ষা করেন। ভারতের গুজরাটে ভূমিকম্পের পর জিটিভিতে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে ভারতের সাবেক প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী বলেন, কখনো কখনো মনে হয়, প্রকৃতি আমাদেরকে হুঁশিয়ারি দিবেই"।

আল্লাহর দেয়া বিধান অনুসারেই হালকা শাস্তির মাধ্যমে মানবজাতিকে সতর্ক করে দেন যেন তারা পথে ফিরে আসে। তারা যদি একেবারে ফিরে আসার মতো অবস্থায় পতিত হয় তাহলে কোন কোন ক্ষেত্রে তাদের জন্য চরম বিপর্যয় নেমে আসে। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে, "বড় ধরনের শাস্তির পূর্বে আমি (আল্লাহ) অবশ্যই তাদেরকে লঘু শাস্তি আস্বাদন করাব যাতে তারা সঠিক পথে ফিরে আসে" (নূরু আমাসিজদ ৩২:২১)। এ আয়াতের তাৎপর্য অনেক শেরক কুফরের ব্যাখ্যাও ব্যাপক। এক্ষেত্রে আল্লাহর সাথে শেরক এবং কুফরের ব্যাখ্যা এভাবেও করা যেতে পারে যে, তার অমোঘ বিধান করে মানুষের গড়া বিধান এবং ব্যবস্থাপনাকে যথার্থ মনে করে। ফলে প্রকৃতির নিয়মের বিপরীতে এমন সব উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বা আচরণ করে যার ফলে সামাজিক অনাচার অবিচার সৃষ্টি হয়। সমাজের ভারসাম্য হারিয়ে যায়, সামাজিক ন্যায়বিচার বিঘ্নিত হয়। আর এভাবে সামাজিক ও প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট হয়। গুজরাটের গৃহমন্ত্রী শ্রীহরেণ পান্ডে স্বীকার করেন যে, ভূমিকম্পের পূর্বে গত তিন বছর ধরে গুজরাটে বন্যা, দুটি সাইক্লোন ও দুটি খরার দুর্যোগ এসেছিল। (মুহাম্মদ সিদ্দিক, "ভারতের ভূমিকম্পের পরবর্তী পরিস্থিতি" দৈনিক ইনকিলাব ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০০১ ও মমনুল হক পৃঃ ১৮৫)।

'আদ' জাতির কাহিনী ও আযাবের ঘটনা বর্ণনা করার পর অপরাপর লোকদের শিক্ষা ও সতর্কীকরণের জন্য কোরআন ও হাদিসে এসব ঘটনার অবতারণা করা হয়েছে। এসব নাফরমান জাতি আল্লাহর প্রাকৃতিক নিয়ম লঙ্ঘন করে আল্লাহর রাসুলগণকে অমান্য করেছে। হঠকারী পাপিষ্ঠদের কথামতো কাজ করেছে। যার ফলে দুনিয়াতে তাদের প্রতি গজব নাজিল হয়েছে এবং আখেরাতেও অভিশপ্ত আযাবে নিক্ষিপ্ত হবে। এমনিভাবে আল্লাহপাক আযাব

www.nagorikpathagar.org

নাযিল করেছেন নবী হযরত নূহ (আঃ), হযরত লূত (আঃ), হযরত শোয়াইব (আঃ) অন্যান্য নবীগণের জাতির ওপর, যখন তারা ইসলাম ধর্মের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় না নিয়ে অপ্রাকৃতিক কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হয়ে পড়েছিল এবং পাপিষ্ঠ শয়তানের দলের ছত্রছায়ায় পাপাচারে লিপ্ত হয়ে গিয়েছিল।

অতীতে আমাদের পূর্ববর্তী অনেক জাতিকে তাদের নাফরমানী অর্থাৎ প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মের পরিপন্থী কার্যক্রম গ্রহণ করেছে বিধায় তাদের কালবৈশাখী ঝড়োহাওয়ার দ্বারা বিভিন্নভাবে শাস্তি দিয়েছেন। পবিত্র কোরআনে উল্লেখ রয়েছে এসব নাফরমানীর জন্য আদি জাতিকে শাস্তি দিয়েছেন।

"আদি সম্প্রদায় মিথ্যারোপ করেছিল, অতঃপর কেমন কঠোর হয়েছিল আমার শাস্তি ও সতর্কবাণী। আমি তাদের উপর প্রেরণ করেছিলাম ঝঞ্ঝা বায়ু এক চিরাচরিত অশুভ দিনে। তা মানুষকে উৎখাত করেছিল যেন তারা উৎপাদিত খর্জুর রূপে কাণ্ড" (সূরা আল কামার ৫৪:১৮-১৯)। অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে, আমি তাদের প্রতি প্রেরণ করেছিলাম প্রস্তর বর্ষণকারী প্রচণ্ড ঘূর্ণিবায়ু লূত যরিমরের উপর। তাদের উদ্ধার করেছিলাম রাত্রের শেষ প্রহরে। (সূরা আল কামার ৫৪:৩৪)। হালে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে তো বটেই আমাদের দেশেও বিভিন্ন এলাকায় এসব কালবৈশাখী টর্নেডো আঘাত হেনে থাকে। আল্লাহর এসব বালাই থেকে রক্ষা পেতে হলে আল্লাহর দেয়া প্রাকৃতিক বিধান অনুসরণ করতে হবে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, আল্লাহর দেয়া বিধান অনুসারে মানুষ যা কিছুই মানব কল্যাণের জন্য করবে তাই এবাদত। এক্ষেত্রে শর্ত হল, প্রাকৃতিক বিধান অনুসরণ করা। এর ব্যতিক্রম করাই হবে নাফরমানী। তাই এ বিষয়ে সতর্ক করে দিয়ে বলা হয়েছে, "তোমরা কি নিশ্চিত রয়েছ যে, তিনি তোমাদেরকে স্থলভাগের কোথাও ভূগর্ভস্থ করবেন না। অথবা তোমাদের উপর প্রস্তর বর্ষণকারী ঘূর্ণিঝড় প্রেরণ করবেন না। তখন তোমরা নিজেদের জন্য কোন কর্ম বিধায়ক পাবে না "(সূরা বনী ইসরাইল ১৭:৬৮)। নাফরমানী ও আল্লাহর দেয়া বিধানকে গুরুত্ব না দেয়ার জন্য বনী ইসরাইলকে যে শাস্তি দেয়া হয়েছিল তাহল হযরত মুসা (আঃ) তুর পর্বত থেকে তওরাত নিয়ে এসে বনী ইসরাইলের সামনে গিয়ে বললেন যে, এটা আল্লাহর দেয়া কিতাব যাতে তাঁর প্রদত্ত বিধানাবলী বিধৃত রয়েছে। তখন কিছু সংখ্যক লোক বললো, যদি স্বয়ং আল্লাহ বলে দেন যে, এ কিতাব তার দেয়া, তাহলে বিশ্বাস করব। হযরত মুসা (আঃ) আল্লাহর অনুমতি নিয়ে তাদেরকে তুর পর্বতে যেতে বলেন। বনী ইসরাইলরা কয়েকজন লোককে হযরত মুসা (আঃ) এর সাথে তুর পর্বতে পাঠায়। সেখানে পৌঁছে তারা আল্লাহর বাণী স্বয়ং শুনতে পেল। তখন তারা নতুন করে শর্ত দিল শুধু কথা শুনেতো আমরা তৃপ্ত হতে পারছি না। যদি আল্লাহকে স্বচক্ষে দেখতে পাই, তাহলে আমরা অবশ্যই বিশ্বাস স্থাপন করবো। কিন্তু যেহেতু পার্থিব জগতে কারো আল্লাহকে দেখার ক্ষমতা নেই, কাজেই এ ধৃষ্টতার জন্য তাদের উপর বজ্রপাত হল এবং তারা সবাই ধ্বংস হয়ে গেল। হযরত মুসা (আঃ) এর অনুরোধে আল্লাহ তাদেরকে পুনর্জীবিত করে দিয়েছিলেন।

www.nagorikpathagar.org

নাফরমানীর জন্য অনুরূপভাবে হযরত সামুদ (আঃ) এর সম্প্রদায়সমূহকেও বজ্রপাতের মাধ্যমে নিশ্চিহ্ন করে দেয়া হয়েছিল (সুরা আযযারিয়া : ৪৪-৪৫)।

তবে কি আল্লাহর শাস্তি থেকে রেহাই পাবার ব্যবস্থাও আছে? এসব প্রতিকারের ব্যবস্থা তো আল্লাহই বলে দিয়েছেন। তা হচ্ছে 'তওবা'। আল্লাহর নিকট খালেস নিয়তে তওবা করা। তওবা হচ্ছে অতীত কুকর্মের ওপর অনুশোচনা করতঃ ভবিষ্যতে এরূপ না করার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করা। গুনাহ যে মাপের, তার তওবাও সে মাপেরই হতে হবে এর তাৎপর্য ছিল দৃঢ় মনে এসব অপ্রাকৃতিক কর্মকাণ্ড পরিত্যাগ করা। সামাজিক ব্যভিচার, সুদ-ঘুষ, অপসংস্কৃতি থেকে তওবা করে এগুলোর বিপরীত ভাল কাজ করে সত্যিকার অর্থে তওবা করেছে তা কাজের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত করা।

হযরত ইউনুস (আঃ) এর সম্প্রদায়ের লোকেরা খাঁটি তওবা করার দরুন তাদের ওপর আসন্ন আযাবকে আল্লাহ্পাক রহিত করে দিয়েছেন এবং তারা বিপদ হতে মুক্তিলাভ করেছে। অথচ তখন সেই আযাব হতে তাদের রক্ষা পাওয়ার বিকল্প কোন ব্যবস্থা ছিল না। একমাত্র খাঁটি তওবা করাই তাদের নাজাতের কারণ হয়েছে। এ সম্পর্কে কোরআনে কারিমের সুরায়ে ইউনুসের ৯৮ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় পৃথিবীর সাধারণ জনপদের অধিবাসীদের সম্পর্কে আফসোস প্রকাশ করে বলা হয়েছে যে, তারা কেন এমন সময় ঈমান আনেনি, যে সময় পর্যন্ত ঈমান আনলে তা লাভজনক হত। অর্থাৎ আযাব কিংবা মৃত্যুতে পতিত হওয়ার আগে যদি ঈমান আনত, তবে তাদের ঈমান কবুল হয়ে যেত। (তাফসীরে মাআরিফুল কোরআন পৃষ্ঠা-৬১৮)।

হাদিসে বর্ণিত আছে, জনাব নবী করীম (সাঃ) বলেছেনঃ এই আমার উম্মতের মধ্যেও ভূমি ধসে যাওয়া, আকৃতি বিকৃত হয়ে যাওয়া এবং আসমান হতে পাথর বর্ষণের আযাবসমূহ আল্লাহর পক্ষ হতে নাজিল হবে। হযরত আয়েশা (রাঃ) জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া, রাসুলাল্লাহ্! আমাদের মধ্যে ভাল নেককার লোক বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও কি এসব আযাব আসবে? তদুত্তরে আল্লাহর নবী বললেনঃ হ্যাঁ, যখন পাপাচার ও গুনাহ্ করা প্রকাশ্য হতে থাকবে এবং আল্লাহর নাফরমানী অতিমাত্রায় হতে থাকবে (তিরমিজী)। অতএব খালেসভাবে তওবা করে আল্লাহর নাফরমানী হতে বিরত থাকা একান্ত জরুরি। খাঁটি তওবার চারটি শর্ত (এক) কৃত অপকর্ম ও গুনাহকে বর্জন করা। (দুই) কৃত গুনাহ ও পাপের ওপর অন্তঃস্থল থেকে লজ্জিত হওয়া। (তিন) আগামীতে এ ধরনের পাপাচারে লিপ্ত না হওয়ার দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়া। (চার) উক্ত পাপ যদি আল্লাহর হক সম্পর্কীয় হয় তা সাধ্যমতে আদায় করা (ইনকিলাব, ১৩ জানুয়ারি ২০০০)।

আল্লাহ্ শুধু শাস্তি দেয়ার জন্য দুর্যোগ দেন- এমনটি সর্বক্ষেত্রে সঠিক নয়। কোন কোন ক্ষেত্রে মানুষের ঈমানের দৃঢ়তা পরিমাপ করার জন্যও দুর্যোগ দিয়ে থাকেন। মোট কথা সর্বাবস্থায় আল্লাহর নেয়ামতের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকতে হবে। দুর্যোগের সময়ে মানবতার কল্যাণের জন্য এগিয়ে আসতে হবে। যে কোন দুর্যোগ মোকাবেলার জন্য ব্যক্তিগত মানসিক

www.nagorikpathagar.org

ও ঈমানী শক্তি দিয়ে প্রস্তুত থাকতে হবে। আর এ প্রস্তুতি সামাজিক রাষ্ট্রীয় বা আন্তর্জাতিক পর্যায়েও হতে পারে।

কোরআনের আলোকে এসব প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রধান কারণগুলো হচ্ছে প্রথমত আল্লাহর প্রতি নাফরমানী করা, দ্বিতীয়ত : আল্লাহর সৃষ্টির প্রতি অবিচার করা অর্থাৎ উন্নয়নের নামে অপরিণামদর্শী কর্মকাণ্ড করা যেন প্রতিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যায়। যেমন আমাদের দেশের অতিবন্যার অন্যতম কারণ হিমালয়ে বন নিধন - যার পরিণামে পলি ও সেডিমেন্ট দ্বারা গঙ্গা নদীর তলদেশ ভরে যাচ্ছে। মানুষের অপরিকল্পিত উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের জন্যই (পশ্চিমাদেশে অতিমাত্রার ভোগ এবং অতিমাত্রায় উৎপাদনকারী শিল্প পণ্য উৎপাদন ইত্যাদি)।

জলবায়ু পরিবর্তন হয়ে হিমালয়ের বরফ গলছে প্রতিনিয়তই। অনুরূপভাবে পানির উৎসে (Catchment area) এলাকায় পাহাড় কাটার ফলে বিভিন্ন সময় ভূমিকম্প সংঘটিত হয়ে থাকে। এ বিষয়ে পবিত্র কোরআনে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে এবং (হে রসুল) আপনার প্রতিপালক সে পর্যন্ত কোন লোকালয়কে ধ্বংস করে না, যে পর্যন্ত না তার সদর স্থানে কোন রসুল প্রেরণ করেন। যে সেই জনপদবাসীর নিকট আমার আয়াতসমূহ পাঠ করে, আর যেসব জনপদের অধিবাসীরা অত্যাচারী, আমি শুধু তাদেরই ধ্বংস করি।" (সূরা কাছাছ : আয়াত ৫৭)।

পৃথিবীর ইতিহাস পর্যালোচনা করলে আরো দেখা যায় যে, আল্লাহ নাফরমান জাতিগুলোকে এ পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করার জন্য শাস্তি দিয়েছেন এবং ধ্বংস করে দিয়েছেন। পবিত্র কোরআনে এ বিষয়ে মানবজাতিকে সতর্ক করার জন্য উল্লেখ রয়েছে, তাহারা কি দেখে নাই যে, তাহাদের পূর্বে আমরা এমন কত জাতিকেই ধ্বংস করিয়াছি যাহারা নিজ নিজ সময়ে অতিপ্রভাবশালী ছিল, তাহাদিগকে আমরা জমিনের বুকে এমনই ক্ষমতা আধিপত্য দান করেছিলাম যা তোমাদিগকে দান করি নাই। তাদের জন্য আকাশ হতে আমরা প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টিপাত করেছি, তাদের নিম্নভূমি থেকে ঝর্ণা প্রবাহিত করেছি (কিন্তু যখন আল্লাহর নেয়ামতের প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিল) শেষ পর্যন্ত তাদের গুনাহের শাস্তিস্বরূপ তাহাদিগকে আমরা ধ্বংস করেছিলাম এবং তাদের স্থলে পর্যায়ক্রমে পরবর্তীতে জাতিসমূহে স্থলাভিষিক্ত করিলাম" (আনআম ৬:৬)।

পবিত্র কোরআনে আল্লাহতায়ালা অতীতের [illegible] জাতিসমূহের [illegible] বর্ণনা করেছেন যেন ভবিষ্যতের জাতিসমূহ তা থেকে উপদেশ গ্রহণ করে। [illegible] বিধানের লঙ্ঘন করেছে, তাদের মতো প্রকৃতির বিরুদ্ধে [illegible] সীমা লংঘন করে জমিনে অশান্তি সৃষ্টি না করে। সে জন্যে [illegible] সতর্ক করে দিয়েছেন। এ বিষয়ে সূরা তওবায় ([illegible] ১০১-১০২) [illegible] যে, মদিনাবাসীদের মধ্যে অনেক মোনাফিক রয়েছে, যারা [illegible] রয়েছে, সেদিন দূরে নয় আমি যখন তাদেরকে দ্বিগুণ শাস্তি দিব। [illegible]

www.nagorikpathagar.org

তিনি আল্লাহ্ যিনি তার বান্দাদের তওবা কবুল করে থাকেন। আয়াত থেকে স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয় যে, এ পৃথিবীতে বিভিন্ন প্রকার নাফরমানির জন্য দুর্যোগ আবির্ভূত হয়ে থাকে। পাশাপাশি আশ্বাস দিয়েছেন তওবা করে প্রাকৃতিক নিয়ম অনুসরণ করলে আল্লাহ তাদের প্রতি সদয় ও সহানুভূতিশীল।

আল্লাহ্ মানবজাতিকে সৃষ্টি করে তাদের মাঝে যথারীতি যুগে যুগে নবী, রসুল প্রেরণ করেছেন, তাদের দিনের আলোর পথের সন্ধান ও দিক নির্দেশনা দেয়ার জন্য। কিন্তু দুনিয়ার মোহে সমাজে নিজেদের প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠার জন্য সমাজে অনাচার-অত্যাচার, জেল-জুলুম করে থাকে। যার ফলে সমাজে অস্থিরতা, অনাচার ও অশান্তি সৃষ্টি হয়ে থাকে। তাছাড়া নিজেদের অর্থ ও সম্পদের মোহকে চরিতার্থ করার জন্য প্রকৃতিকে বিভিন্নভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে থাকে। যেমন বৃক্ষ নিধন করে বড় বড় রাজনৈতিক ও সরকারি কর্মকর্তা অসাধু ব্যবসায়ী রাতারাতি টাকার পাহাড় গড়ে তুলেছেন। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বন নিধনে যে সব দেশের রাজনৈতিক শক্তির সাথে পাশ্চাত্যের রাজনৈতিক শক্তি ও ব্যবসায়ীদের বিরাট যোগসাজশ রয়েছে। পানি রাজনীতি বিষয় পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে গঙ্গা, কলোবেড়া ও মিসরের নীল নদীর পানি বন্টনে কত মানবতাবিরোধী কর্মকাণ্ড ঘটছে। এছাড়াও এলোপাথাড়ি ও অপরিকল্পিত শিল্পায়নের মাধ্যমে বায়ু দূষণ ও এসিড বৃষ্টির ভয়াবহতা বাড়ছে উন্নত বিশ্বেও। ইন্দোনেশিয়া দ্রুত পামঅয়েল উৎপাদনের জন্য ফরেস্ট ফায়ার করেছিল ১৯৯৭ সালে। যার ফলে আল্লাহর সৃষ্টির মারাত্মক ক্ষতিসাধন করেছিল। অগণিত দুর্লভ গাছের প্রজাতি ও হাজার হাজার প্রাণী এ আগুনে পুড়ে গিয়েছিল। মানুষের এ দ্রুত উন্নয়নের জন্য প্রকৃতির যে ক্ষতি সাধন করেছিল সে মূল্য তাদেরই দিতে হয়েছে। সে জন্য প্রতি বৎসরই মারাত্মক বায়ু দূষণ দেখা দিচ্ছে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সব দেশে। ফলে এসব দেশে জনস্বাস্থ্যসহ সমগ্র এলাকায় মারাত্মক পরিবেশ বিপর্যয় ঘটেছিল। সর্বোপরি আগুনে যে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে তা বোধহয় কোন দিনই পূরণ করা সম্ভব হবে না। তাই পবিত্র কোরআনে এরশাদ হয়েছে, "মানুষের কর্মের পরিণতি স্বরূপ স্থলে ও সামুদ্রিকভাবে অশান্তি সৃষ্টি হয়েছে, যাতে করে মানুষ ফিরে আসে, আল্লাহপাক তাদেরকে তাদের কৃতকর্মের কিছুটা স্বাদ ভোগ করাতে চান" (সূরা রূম -৪১)।

সুপারিশ

বাংলাদেশ নদীবহুল দেশ, তাছাড়া বর্ষণ মৌসুমে ভৌগোলিক কারণে এখানে মাত্রাতিরিক্ত বৃষ্টিপাত হয়। তাছাড়া উজানে ভারতের পাহাড়ি এলাকায় অতিবৃষ্টির ফলে ও ভাটি অঞ্চল বাংলাদেশে পাহাড়ি ঢল নামার ফলে অনেক ক্ষেত্রে অসময়েও বন্যা হয়ে থাকে। বাংলাদেশের সিলেট সীমান্ত ঘেঁষে আসামের চেরাপুঞ্জি অবস্থিত যেখানে বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত পৃথিবীর সর্বোচ্চ (৫০০ ইঞ্চি)। দুর্বল নদী ব্যবস্থাপনার ফলে আমাদের দেশের নদীগুলির তলদেশ ভরাট হয়ে গিয়েছে। তাই অতিবৃষ্টি ও পাহাড়ি ঢলের ফলে আমাদের দেশে প্রতিবৎসরই বড় ধরনের বন্যা হয়ে থাকে। ভারত টিপাইমুখে বাঁধ দিলে তা আরো মারাত্মক

www.nagorikpathagar.org

Ecological Disaster হবে বলে বিশেষজ্ঞরা আশংকা প্রকাশ করছেন।
অনেক প্রাকৃতিক কারণে এবং মানুষের অপরিণামদর্শী কর্মকাণ্ডের জন্য বন্যা বা প্লাবন হয়ে থাকে। আমাদের দেশের প্রেক্ষাপট চিন্তা করলে অতি সহজেই প্রতীয়মান কেন বন্যা হয়। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ঃ হিমালয় অঞ্চলে বন নিধনের ফলে ভূমিক্ষয়ের মাধ্যমে আমাদের নদ-নদী, খাল-বিলগুলোর গভীরতা কমে যাচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বরফ গলে পাহাড়ি ঢল হচ্ছে অসময়ে। আমাদের নীতিনির্ধারকগণ নদী ও পানি নদী ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ নদী খোদাই না করে নদীর পাড় পাথর ও কংক্রিট দিয়ে বাঁধ দিয়ে পানি ব্যবস্থাপনা করার ব্যর্থ উদ্যোগ নিচ্ছেন। Catchment এরিয়াগুলো ভরাট হয়ে গেলে খোদাই করে পানি চলার পথকে সুগম না করে পানির গতিপথকে রোধ করে যত্রতত্র পর্যটন কেন্দ্র গড়ে তোলা হচ্ছে। নেত্রকোনা জেলার দুর্গাপুর বাজারের পেছনে কংস ও সোমেশ্বরী নদীর উৎসস্থলে চরের মধ্যে ক্ষমতাসীন লোকজন বিনোদন কেন্দ্র গড়ে তুলেছিলেন। সোমেশ্বরী নদীর প্রায় অর্ধেকেরও বেশি প্রশস্ততা কমিয়ে বেইলি ব্রিজ করার চেষ্টা করা হচ্ছে একদশক ধরে যা আজ সম্ভব। এ অপচেষ্টার ফলে গত পঞ্চাশ বৎসরে দুর্গাপুর বাজারে যেখানে বন্যার পানির উঠার ইতিহাস নেই সেখানে প্রতি বৎসরই পাহাড়ি ঢলে বাজারে অতর্কিতভাবে বন্যার পানি উঠে। প্রতি বৎসর বাজারের লোকজনের ব্যবসা-বাণিজ্য ভাসিয়ে দিচ্ছে। নষ্ট করে দিচ্ছে অত্র এলাকার মানুষের ফসল। কৃষি উদ্বৃত্ত এলাকা এখন প্রতি বৎসরই খাদ্যাভাব, বেকারত্ব, দারিদ্র্য ও অপুষ্টিই এখন অত্র এলাকার জনগণের নিত্যদিনের সাথী। সমাজের কতিপয় জনগোষ্ঠীর স্বার্থ ও অপরিণামদর্শী কর্মকাণ্ডের ফলে প্রকৃতিবিরোধী হয়ে উঠে। নেমে আসে মারাত্মক বিপর্যয়। সরেজমিন তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করে বিশ্লেষণ করলে হাজারো অপ্রাকৃতিক কর্মকাণ্ডের নজির মিলবে বাংলাদেশের আনাচে কানাচে। তাই সকল উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের পূর্বে Environment impact, Economic loss স্থানীয় জনগণের অভিজ্ঞতা ও মতামত পর্যালোচনা প্রয়োজন। সর্বক্ষেত্রে শুধু রাজনৈতিক বিবেচনায় সামাজিক ও অর্থনৈতিক সুফল না-ও বয়ে আনতে পারে। আর এসব অপরিণামদর্শী কর্মকাণ্ডই আল্লাহর নাফরমানীর শামিল, যে জন্য প্রাকৃতিক বিপর্যয় নেমে আসতে পারে গণহারে। বন্যার মতো সব প্রাকৃতিক দুর্যোগই আল্লাহর নিয়ন্ত্রণাধীন। আমাদের দেশের ১৯৮৭, ১৯৮৮ এবং সর্বশেষ ২০০৪ সালের নগর বন্যা, ২০০৭ সালের সিডরসহ সব বন্যা পূর্ব পরিস্থিতি দুর্যোগ পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, দেশে দুর্নীতি ও সন্ত্রাসের যে চিত্র ছিল তা হযরত নূহ (আঃ) এর মহাপ্লাবনের পূর্বাবস্থার সাথে অনেক সাদৃশ্য রয়েছে। বন্যাকালীন সময় এক সপ্তাহ অন্তত সন্ত্রাস, রাহাজানি এবং হানাহানির ঘটনা কম ঘটে থাকে। দেশের অর্থনীতি সামাজিক ব্যবস্থা জনজীবনের যখন বিপর্যয় ঘটল দ্রুত নগর বন্যাসহ সকল পানিই দ্রুত নেমে গিয়েছিল। কিভাবে এ পানি নেমে গিয়েছিল তার উপরও মানুষের কোন নিয়ন্ত্রণ ছিল না। যেমনটি ঘটেছিল হযরত নূহ (আঃ) এর যুগে আল্লাহর হুকুমে আকাশ থেকে প্রবল বেগে বৃষ্টি হতে লাগলো। ভূমি থেকে পানি প্রস্রবণের মাধ্যমে বন্যার পানি বাড়তে থাকে

www.nagorikpathagar.org

ফলে কাফেরদের ধ্বংস করা হয়। আর শেষে সব পানি আল্লাহর নির্দেশে চলে যায়।

এ প্রসঙ্গে পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে, "আর নির্দেশ দেয়া হল হে পৃথিবী! তোমার পানি গিলে ফেল, আর হে, আকাশ ক্ষান্ত হও"। আর পানি হ্রাস করা হল এবং কাজ শেষ হয়ে গেল এবং জুদী পর্বতে নৌকা ভিড়লো এবং ঘোষণা করা হল- দুরাত্মা কাফেররা নিপাত যাক (সুরা হুদ ১১:৪)। আল্লাহ এসব প্রাকৃতিক মহাদুর্যোগ থেকে কিভাবে মানুষকে রক্ষা করেন তার বর্ণনা দিয়ে বলেছেন- যখন জলোচ্ছ্বাস হয়েছিল তখন আমি তোমাদেরকে চলন্ত নৌযানে আরোহণ করিয়েছিলাম। (সুরা আলহাক্কা ৬৯:১১)।

কোরআন, হাদিস ও মানব সভ্যতার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, জলোচ্ছ্বাস, বন্যা ও প্লাবন দ্বারা আল্লাহ বিভিন্ন সময় বিভিন্ন জাতিকে শাস্তি দিয়েছেন এবং বিভিন্নভাবে তাদের সতর্ক করেছেন। ফেরাউনের সম্প্রদায়ের প্রতি তাদের ঔদ্ধত্য ও নাফরমানির কারণে আল্লাহ গজব নাযিল করেছিলেন। এ বিষয়ে পবিত্র কোরআনে উল্লেখ রয়েছে, "সুতরাং আমি তাদের উপর প্রভৃতি বহুবিধ নিদর্শন একের পর এক দেখাইলাম। তারপরও তারা অহংকারে মাতিয়া রইল। বস্তুত তারা ছিল অপরাধপ্রবণ"। (সুরা আল-আরাফ ৭:১৩৩)।

কালবৈশাখীও আমাদের দেশের এক প্রকার প্রাকৃতিক দুর্যোগ : "প্রতি বৎসরই দেশের বিভিন্ন এলাকায় আঘাত হানে। আমাদের দেশের উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে প্রচণ্ড বেগে যে দমকা ঝড়ো হাওয়া আসে তাকে কালবৈশাখী বলা হয়। এর ফলে ঘর-বাড়ি, গাছ পালা, ফসল ইত্যাদি নষ্ট ছাড়াও মানুষের জানমাল ও জনজীবন বিপর্যস্ত করে দেয়। অনেক সময় এসব ঝড়ো হাওয়া টর্নেডোর আকারও ধারণ করে থাকে। সর্বোপরি আমাদের জনগোষ্ঠীকে এ বিপর্যয়গামী মূল্যবোধ থেকে পরিত্রাণ পেতে হলে আত্মশুদ্ধির পথে এগিয়ে যেতে হবে। পাশপাশি যুগোপযোগী জ্ঞান বিজ্ঞানের বিকাশ ও উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহারও নিশ্চিত করতে হবে। এসব কর্মকাণ্ডে সর্বক্ষেত্রে সর্বস্তরের জনগোষ্ঠীর সম্পৃক্ততাই হবে দুর্যোগ থেকে পরিত্রাণের ও মানব কল্যাণের সোপান।

www.nagorikpathagar.org

সংলগ্নি সারণী - ৬.১ ঃ দীর্ঘমেয়াদি দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় বিনিয়োগ কর্মসূচি

দীর্ঘমেয়াদি দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় বিনিয়োগ কর্মসূচি				
প্রয়োজনীয় বিনিয়োগের পরিমাণ				
কর্মসূচি কম্পোনেন্ট	২০০৮-২০১২	২০১৩-২০১৭	২০১৮-২০২২	মোট
ঝুঁকি চিহ্নিতকরণ ও পরিমাপকরণ	১০.০	৩	৩.০	১৬.০
জরুরি অবস্থা মোকাবেলা প্রস্তুতি জোরদারকরণ	২৪০.০	২১৫	২৪৫.০	৭০০.০
প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা জোরদারকরণ	১০.০	২	২.০	১৪.০
ঝুঁকি প্রশমিতকরণ কর্মকাণ্ড	৮৬০.০	১১৬০	৮৩০.০	২,৮৫০.০
বাস্তবায়ন দক্ষতা জোরদারকরণ	২০.০	১০	১০.০	৪০.০
দুর্যোগ মোকাবিলা দ্রুত সহায়তা ফান্ড	৩০০.০	০	-	৩০০.০
বহুমাত্রিক দাতা সংস্থা জলবায়ু পরিবর্তন ফান্ড	৮০.০	০	-	৮০.০
মোট	১,৫২০.০	১,৩৯০.০	১,০৯০.০	৪,০০০.০

Source: Cyclone Sidr in Bangladesh: Damage, Loss and Need Assessment, 2008:P. 18 : ERD-WB

সংলগ্নি সারণী - ৬.২ ঃ সিডরোত্তর পুনরুদ্ধার ও পুনর্বাসনের জন্য আর্থিক সহায়তার প্রয়োজন

তাৎক্ষণিক পুনরুদ্ধার		সিডরোত্তর পুনরুদ্ধার ও পুনর্গঠনের জন্য আর্থিক সহায়তার প্রয়োজন	
		মধ্যমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি পুনরুদ্ধার ও পুনর্বাসন	
অত্যাবশ্যকীয় হস্তক্ষেপ	ইউ এস মিঃ ডলার	হস্তক্ষেপ	ইউ এস মিঃ ডলার
অস্থায়ী গৃহায়ণ	৪৫.০	কৃষি খাত পুনরুদ্ধার	২৫০.০
চাল আমদানি	২০০.০	অকৃষি খাত পুনরুদ্ধার	২১০.০
অবকাঠামো মেরামত	৩৭.০	গৃহায়ণ পুনঃনির্মাণ	২০.০
মৌলিক সেবা পুনঃস্থাপন	৫.০	গৃহায়ণ ও গৃহস্থালি আসবাব	১৮০.০
আর্থিক সহায়তা দান	৫.০	পণ্যের জন্য আর্থিক সহায়তা	১২৫.০
দক্ষ প্রশিক্ষণ	১.০	স্কুল ও আশ্রয়স্থল পুনঃনির্মাণ	২৭০.০
দুর্যোগ মোকাবিলা প্রস্তুতি	২.০	অবকাঠামো পুনঃনির্মাণ	২০.০
পরিবেশ সংরক্ষণ	৫.০	পরিবেশ সংরক্ষণ	১,০৭৫.০
মোট	৩০০.০		

Source; Cyclone Sidr in Bangladesh: Damage, Loss and Need Assessment, 2008: ERD-WB

www.nagorikpathagar.org

সংলগ্নি সারণী - ৬.৩ ঃ বাংলাদেশের সিডর সাইক্লোনের সার্বিক ক্ষয়ক্ষতি ও লোকসান (টাকা মিলিয়ন)

সামগ্রিক ক্ষয়ক্ষতি								মালিকানা			
খাত	উপখাত	ক্ষয়ক্ষতি	%	লোকসান	%	মোট	%	সরকারি	%	বেসরকারি	%
সামাজিক খাত		৪,৪৮২.০	৫.৬	১,৪৫৩.০	৪.১	৫,৯৩৫.০	২৫.৩	৫,৪৮৫.০	২৫.৩	৪৪৯.০	০.৫
	স্বাস্থ্য ও পুষ্টি	১৬৯.০		১,০৩৮.০		১,২০৭.০		১,১৮৮.০		১৮.০	
	শিক্ষা	৪,৩১৩.০		৪১৫.০		৪,৭২৮.০		৪,২৯৭.০		৪৩১.০	
অবকাঠামো		৭৩,২৬৮.০	৯১.৭	২,১৩০.০	৬.০	৭৫,৩৯৮.০	৭২.৭	১৫,৭৫৮.০	৭২.৭	৫৯,৬৪০.০	৬৩.৫
	গৃহায়ন	৫৭,৯১৫.০		০		৫৭,৯১৫.০		-		৫৭,৯১৫.০	
	সড়ক যোগাযোগ	৮,০০৬.০		১,৭২৫.০		৯,৭৩১.০		৮,০০৬.০		১,৭২৫.০	
	বিদ্যুৎ	৫৭৬.০		৩৫৯.০		৯৩৫.০		৯৩৫.০		-	
	পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন	১৫৭.০		৪৬.০		২০৩.০		২০৩.০		-	
	নগর ও পৌরসভা	১,৬৯৬.০		-		১,৬৯৬.০		১,৬৯৬.০		-	
	পানিসম্পদ	৪,৯১৮.০		-		৪,৯১৮.০		৪,৯১৮.০		-	
উৎপাদনশীল খাত		১,৭৩৪.০	২.২	৩২,০৮৩.০	৯০.০	৩৩,৮১৭.০	০.১	১৯.০	০.১	৩৩,৭৯৮.০	৩৬.০
	কৃষি	১,৪৭২.০		২৮,৭২৫.০		৩০,১৯৭.০		১৯.০		৩০,১৭৮.০	
	শিল্প	২৬২.০		২,০৩৫.০		২,২৯৭.০		-		২,২৯৭.০	
	বাণিজ্য	-		১,২৫৮.০		১,২৫৮.০		-		১,২৫৮.০	
	পর্যটন	-		৬৫.০		৬৫.০		-		৬৫.০	
ক্রসকাটিং বিষয়		৪২০.০	০.৫	-	-	৪২০.০	১.৯	৪২০.০	১.৯	-	-
	পরিবেশ	৪২০.০		-		৪২০.০		৪২০.০		-	
মোট		৭৯,৯০৪.০		৩৫,৬৬৬.০		১১৫,৫৭০.০		২১,৬৮২.০		৯৩,৮৮৭.০	

Source: Cyclone Sidr in Bangladesh: Damage, Loss and Need Assessment, 2008: ERD-WB

www.nagorikpathagar.org

সহায়ক গ্রন্থপুঞ্জী ঃ

IPCC Fourth Assessment Report (2007), Impacts, Adaptation and vulnerability, 2007, Summary for policy makers, P9-11.

Dr. Jamilur Reza Chowdhury, Earth Quake, 25th senior staff course lecture in BPATC, 15 May, 2007

Government of Bangladesh and ADB and WB (2004), 2004 Floods in Bangladesh, Damage and Needs Assessment and Proposed Recovery Program- Part-1 Main Report.

Government of Bangladesh assisted by WB, UN agencies and European Commission (2008) Cyclone Sidrs in Bangladesh Damage, Loss and Needs Assessment for Disaster Recovery and Reconstruction.

নূর আহমদ (২০০৩) পরিবেশ বিপর্যয় ও উন্নয়ন ভাবনা, বিচয়ন।

ড. মোঃ ময়নুল হক (২০০৩) ; ইসলাম : পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, গবেষণা বিভাগ

দৈনিক জনকণ্ঠ, ২৯ সেপ্টেম্বর, ২০০০

দৈনিক প্রথম আলো, ৭ জুন, ২০০৯

বিচিত্রা, ৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৯ পৃ: ৩৩

মুহাম্মদ সিদ্দিক, ভারতের ভূমিকম্পের পরবর্তী পরিস্থিতি, দৈনিক ইনকিলাব ১৫ ফেব্রুয়ারি, ২০০১

দৈনিক ইনকিলাব, ১৩ জানুয়ারি, ২০০০

www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

সপ্তম অধ্যায়

পরিবেশ সংরক্ষণ ও দারিদ্র্য বিমোচন ঃ বাংলাদেশ প্রসঙ্গ

"দারিদ্র্য কুফরীর কাছাকাছি চলে যায়"
- হযরত আনাস থেকে বর্ণিত আল হাদিস।
"হে প্রভু কুফর ও দারিদ্র্য থেকে আমি তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি"
- আবু দাউদ।
"হে প্রভু আমি দারিদ্র্য, ঘাটতি ও লাঞ্ছনা থেকে তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি"
- আবু দাউদ।

সার সংক্ষেপ

দারিদ্র্য বিমোচন ও পরিবেশ সংরক্ষণ উভয়ই নাগরিকের সাংবিধানিক অধিকার। পৃথিবীর সব দেশই দারিদ্র্য বিমোচন ও পরিবেশ সংরক্ষণে নানামুখী উদ্যোগ গ্রহণ করে থাকে। অনেকেই সফলভাবে তা বাস্তবায়ন করে তার সুফল পাচ্ছে। বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলো ঈপ্সিত লক্ষ্যার্জন করতে পারেনি বলে তারা পিছিয়ে রয়েছে। এখন প্রশ্ন হলো, কেন এসব লক্ষ্য অর্জন করা যায় না এ বিষয়টির বিভিন্ন দিক বর্তমান প্রবন্ধে পর্যালোচনা করা হয়েছে।

দারিদ্র্য ও পরিবেশের সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়। তবে দারিদ্র্য পরিবেশকে দূষণ করে, না দূষিত পরিবেশ দারিদ্র্য বাড়ায় তা নিয়ে বিতর্কের শেষ নেই। তবে আয় সংশ্লিষ্ট দারিদ্র্য (Income poverty) কমলে পরিবেশের উন্নতি হয় একথা বলা যায় নিঃসন্দেহে। বিষয়টি অনেকটা দারিদ্র্য চক্রের ন্যায়, তা থেকে বের হতে হলে নার্ক্সের বিগপুশ তত্ত্বের মতো কোথাও একটি বড় ধরনের ধাক্কার প্রয়োজন। সেই ধাক্কাটি মূলত আমাদের সামাজিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধকে জাগিয়ে তোলার মাধ্যমে হলে তা টেকসই হবে। বিষয়টি অনুল্লেখযোগ্য তবে এর গুরুত্ব অপরিসীম। আলোচ্য প্রবন্ধে দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি টেকসই করার জন্য প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণে সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধের ভূমিকার গুরুত্বের বিষয় আলোচনা করা হয়েছে।

জাতীয় দারিদ্র্য বিমোচন কৌশল (NSAPR) ও জাতীয় বাজেটে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী জোরদার করার সংস্থান রয়েছে। এসব কর্মসূচি শুধু সরকারি কোষাগার থেকে অর্থায়নে করা হয়েছে। এক্ষেত্রে যাকাত, সাদকা ও বিভিন্ন বেসরকারি দাতা সংস্থাকে উৎসাহিত করে আরো অধিক সম্পদ আহরণ করে এ সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীকে অধিকতর সম্প্রসারিত করার বিষয়ে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। ক্ষেত্র বিশেষে এ কর্মসূচিতে আয়বর্ধন কর্মকাণ্ডের সুযোগ সৃষ্টি করতে পারলে আরো বেশি সুফল পাওয়া যাবে। সর্বোপরি ব্যক্তিগত ও জাতীয় পর্যায়ে ভিক্ষাবৃত্তিকে নিরুৎসাহিত করে, স্বাবলম্বী কার্যক্রমকে উৎসাহিত করাই শ্রেয়।

www.nagorikpathagar.org

সূচনা

দারিদ্র্য বিমোচন ও পরিবেশ সংরক্ষণ নাগরিকের মৌলিক অধিকার। বাংলাদেশের সংবিধানে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি শীর্ষক অধ্যায়ের ১১ নং অনুচ্ছেদে গণতন্ত্র ও মৌলিক মানবাধিকার নিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছে। শাসনতন্ত্রের ১৫ অনুচ্ছেদে নাগরিকদের মৌলিক অধিকারগুলোর বিবরণী দেয়া হয়েছে। সেগুলো হল: (ক) অন্ন, বস্ত্র, আশ্রয়, শিক্ষা ও চিকিৎসাসহ জীবন ধারণের মৌলিক উপকরণ (খ) কর্মের অধিকার যা দারিদ্র্য বিমোচনের ক্ষেত্রে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক (গ) যুক্তিসঙ্গত বিশ্রাম, বিনোদন ও অবকাশের অধিকার এবং (ঘ) সামাজিক নিরাপত্তা। শাসনতন্ত্রের ২০ অনুচ্ছেদে এই বিষয়ে কর্মসংস্থান, নাগরিকদের অধিকার ও দায়িত্বের কথা বলা হয়েছে। রাষ্ট্রের কর্তব্য হলো, এসব সুবিধাদি নিশ্চিত করা। মোট কথা শাসনতন্ত্রে নাগরিকদের সব অধিকারসহ দারিদ্র্যমুক্ত এবং শোষণমুক্ত সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলার বিষয়ে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বর্ণনা রয়েছে। এখন শুধু প্রয়োজন এসব বিদ্যমান সুবিধাদি বাস্তবায়নে প্রাতিষ্ঠানিক ও দক্ষতা সমন্বয়ে ব্যবধান (Gap) কমিয়ে দেশে একটি শান্তিপূর্ণ শোষণ ও দারিদ্র্যমুক্ত সমাজ গড়ে তোলা।

ইদানীং পরিবেশ দূষণ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে মারাত্মক হুমকির বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই দারিদ্র্য বিমোচনের মতো পরিবেশ সংরক্ষণ কী নাগরিকদের মৌলিক অধিকার কি না তাও পর্যালোচনা করে দেখা প্রয়োজন। বাংলাদেশের সংবিধানে পবিবেশ সংরক্ষণের বিষয়টির বাধ্যবাধকতা নিয়ে কোথাও কোন কিছু সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ নেই। এমনকি টেকসই উন্নয়ন হালে একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিভাষা হওয়া সত্ত্বেও এর সংজ্ঞা নিয়ে শাসনতন্ত্রে কোথাও তেমন কোন উল্লেখযোগ্য ব্যাখ্যা দেয়ার সুযোগ নেই। এক্ষেত্রে আইনগত কারণে এর ব্যাখ্যা থাকা প্রয়োজন। যার দুটি তাৎপর্য রয়েছে। প্রথমত: বিষয়টির গুরুত্ব/ব্যাখ্যা শাসনতান্ত্রিকভাবে প্রতিষ্ঠিত না হলে রাষ্ট্রের জন্য নাগরিক অধিকার হিসেবে বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার আবশ্যকতা নেই। দ্বিতীয়ত: নাগরিকগণও তাদের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করার জন্য শাসনতান্ত্রিকভাবে রাষ্ট্রের ওপর চাপ প্রয়োগ করতে পারবে না। এ প্রসঙ্গে সার্কভুক্ত ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলির পরিবেশ বিষয়ক আইনগত কাঠামো পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, প্রতিবেশী দেশ ভারতে সংবিধানে একটি অনুচ্ছেদ (৪৮এ) সংযোজন করে পরিবেশকে নাগরিকের মৌলিক অধিকার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে।

The Indian constitution made a clear provision by inserting Article 48 A that the protection of environment is the fundamental right of the citizen. Besides, there are other constitutional provisions in the Indian constitution like Article 21 Protection of life and personal liberty- No person shall be deprived of his life or personal liberty except according to procedure established by law. It is also stated in the constitution that the Remedies for enforcement of rights

www.nagorikpathagar.org

conferred by the constitution can be ensured (Article 32). In other words, the right to move the Supreme Court by appropriate proceedings for the enforcement of the rights conferred by the constitution is guaranteed. There is also provision on the duty of the State to raise the level of nutrition and the standard of living and to improve public health (Article 47). The protection and improvement of environment and safeguarding of forests and wild life (Article 48A) is also guaranteed. The power of the Court, on review of judgments or orders by the Supreme Court Subject to the provisions of any law made by Parliament or any rules made under article 145, the Supreme Court shall have power to review any judgment pronounced or order made by it (Article 137). The court has also power on Enforcement of decrees and orders of Supreme Court and orders as to discovery, etc (Article 142). A judgment of the Supreme Court established the India - Constitutional Right, Environment Protection Fund, Polluter Pays Principle, and Precautionary Principle. For example, (VELLORE CITIZENS WELFARE FORUM v. UNION OF INDIA. SUPREME COURT OF INDIA AIR 1996 SC 2715 KULDIP SINGH, J., FAIZAN UDDIN, J., and K. VENKATASWAMI, J.). In the case it is stated that Petitioner, the Vellore Citizens Welfare Forum, filed this action to stop tanneries in the State of Tamil Nadu from discharging untreated effluent into agricultural fields, open lands and waterways. Among other types of environmental pollution caused by these tanneries, it is estimated that nearly 35,000 hectares of agricultural land in this tanneries belt has become either partially or totally unfit for cultivation, and that the 170 types of chemicals used in the chrome tanning processes have severely polluted the local drinking water.

The Supreme Court noted that although the leather industry is a major foreign exchange earner for India and provided employment, it does not mean that this industry has the right to destroy the ecology, degrade the environment or create health hazards.

www.nagorikpathagar.org

সার্কভুক্ত দেশ পাকিস্তানও আদালতের ব্যাখ্যা দ্বারা পরিবেশকে নাগরিকের মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে।

General Secretary Pakistan Salt Mines Labour Union (CBA) KWARA KHELUM vs THE DIRECTOR INDUSTRIES AND MINE DEVELOPMNT, (Punjab Lahore). Quoting Article 184(3) of the constitution, the Court observed that " It is well settled that in human rights cases/ public interest litigation under Article 184(3), the procedural trapping and restrictions, preconditions being aggrieved person and other similar technical objection cannot bar the jurisditicon of the court.

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশ মালয়েশিয়া "Environmental Quality Act 1974" প্রবর্তন করেছে, যা পরবর্তীতে ১৯৯৫ সালে সংশোধন করা হয়েছে। Malaysian Constitutional Provision-এ বলা হয়েছে :

A judgment of the High Court clearly revealed the constitutional binding upon it as follows:
KAJING TUBFK & ORS v. EKRAN BHD & ORS
ORIGINATING SUMMONS NO-55 (21 JUNE 1995) HIGH COURT (KUALA LUMPUR) JAMES FONG J. 19 JUNE 1996.

In this case, the plaintiffs claimed that they have been deprived of their right to obtain a copy of the EIA relating to the construction of the Bakum Dam and to be heard and make representations before the EIA is approved. Under the Environment Quality Act of 1974 activities prescribed by the Minister in charge of environment protection can only be carried out with the approval of the Director General of Environment Quality, the 2nd defendant.

The Guidelines approved by the DG requires a detailed EIA prepared by the project proponent to be made available to the public and the public afforded an opportunity to comment on the proposed project to a review panel.

উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে পরিবেশ সংরক্ষণে নাগরিকদের মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করার বিষয়ে সংক্ষিপ্ত পূর্ব ইতিহাস আলোচনা করা প্রয়োজন।

www.nagorikpathagar.org

বিশ্বের উন্নয়নের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, টেকসই উন্নয়নেরও (Sustainable Development) একটি সমৃদ্ধ ইতিহাস রয়েছে। বিশ্ব অর্থনীতির দ্রুত বিকাশ ও সম্প্রসারণের প্রেক্ষাপটে পরিবেশের দ্রুত অবক্ষয়, বিভিন্ন প্রজাতির বিলুপ্তির এবং বাস্তুসংস্থানের (Ecosystems) মারাত্মক বিপর্যয় সম্বন্ধে বিশ্ব জনগোষ্ঠী সোচ্চার হয় সত্তর দশকের শুরুর দিকে।

এ বিষয়ে নতুন দিগন্ত উন্মোচনের লক্ষ্যে United Nations Conference on the Human and Environmnet অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্মেলনে United Nations Environment Program (UNEP) প্রতিষ্ঠা করা হয়। তৎপরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন সরকার, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন চুক্তি স্বাক্ষর করে। যেমন জলাশয় সংরক্ষণ (Wetland protection), International trade in endanger species সংক্রান্ত রেগুলেশান ইত্যাদি। তাছাড়াও Toxic chemical and pollution নিয়ন্ত্রণ চুক্তি রয়েছে।

পরবর্তীতে ১৯৮৭ সালে World Commission on Environment and Development সুপারিশ করে যে, টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য অর্থনীতি ও প্রতিবেশের (Economy & Ecology) মধ্যে ভারসাম্য নিশ্চিত করতে হবে। টেকসই উন্নয়নের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে যে, অর্থনৈতিক উন্নয়ন এমন হতে হবে যে পরিমাণ সুযোগ সুবিধা যা বর্তমান প্রজন্মের প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম হবে, অবশ্য ভবিষ্যৎ বংশধরের প্রয়োজনের সাথে কোন অবস্থাতেই এ সুযোগ সুবিধার আপস করা যাবে না। অর্থাৎ ন্যূনতম রাখতে হবে।

উপরোক্ত অবস্থার প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশে টেকসই উন্নয়নের আইনগত ভিত্তিলাভ করে সুপ্রিম কোর্টের আপিলেট ডিভিশনের একটি যুগান্তকারী রায়ের মাধ্যমে [Dr. Mohiuddin Faruque VS Bangladesh and others 49 DLR (AD) (1997)]।

সুপ্রিম কোর্টের রায়ে বলা হয়েছে যে, কোন ব্যক্তি /প্রতিষ্ঠান দেশের যে কোন এলাকায় পরিবেশ বিষয়ে সংক্ষুব্ধ হয়ে আদালতে রিট পিটিশন করতে পারেন।

The concept of sustainable development emerged in Bangladesh from the classic decision of the Appellate Division of the Supreme court of Bangladesh Dr. Mohiuddin Faruque vs Bangladesh and others 49 DLR (AD) (1997).The Appellate Division gave a verdict in the context of growing concern of the conservation of environment, irrespective of locality where it is threatened, a national organization can and should be attributed a threshold

www.nagorikpathagar.org

standing as having sufficient interest in the matter and thereby regarded as a person aggrieved to maintain the writ petition.

The Chief Justice of Bangladesh in his judgment referred to the minority opinion of Justice Douglas of the US Supreme Court in Serria Club VS Morton, 401 US 907 (1971) (No. 70-34) in the following terms:
"Contemporary public concern of protecting nature's ecological equilibrium should lead to conferral of standing upon of environmental objects to sue for their own preservation"

The Chief Justice of Bangladesh thus recognizes that any ecological disaster, environment and ecology are now matters of universal concern. He also referred to Principle 10 of the Rio Declaration on Environment and Development ("the Rio Declaration") which provides that environmental issue are best handled with the participation of all concern citizen, at the relevant level. Thus the Appellate Division considers the Rio Declaration as theoretical foundation for grant of standing and environmental protection as part of fundamental rights of a citizen. In another judgment Justice B.B. Roy Chowdhury referred to the fundamental rights protected under Article 31 (Rights to Protection of Life) and 32 (Protection of rights to life and personal liberty) of the constitution of Bangladesh, which provides as follows: In the judgment (paragraph 102), the Justice B.B Roy Chowdhury stated that under the provision of the Article 31 and 32 of our constitution the protection to the right as fundamental right. This right encompasses with its ambits, the protection and preservation of environment, ecological, balance free from pollution of air and water, sanitation without which life can hardly be enjoyed. Any act or omission, which causes environmental damages or pollution, would thus be violative of the said right to life.

In the judgment of Writ Petition no 92 of 1996 (DLR XLVIII, pg 438), the petitioner Dr. Mohiuddin Faruque of BELA. In this

www.nagorikpathagar.org

petition court observed "right of life is not limited to the protection of life, limb, but extends to the protection of health and strength of workers, their means of livelihood, enjoyment of pollution free water and air bear necessaries of life, facilities for education, development of children, maternity benefits, free movement, maintenance and improvement of public health, by creating sustaining conditions congenial to good health and ensuring quality of life consistent with human dignity".

The approach can be supported by the principle of the State Policy which seeks the promotion of a condition in which "respect for the dignity and worth of human person shall be guaranteed" [Article 11), or stating as the primary duty of the State to raise the level of nutrition and improve public health (Article 18 (1)] .

The right to protect one's life and property is a fundamental right under the constitution which is enforceable as a prerogative and the extra ordinary jurisdictions of the High Court Division called the writ jurisdiction (Article 102) Power of High Court Division to Issue certain Order and Direction, etc. However the said court cannot issue an interim order if it is likely to have the effect of "prejudicing or interfering with any measures designed to implement any development program, or any development work" unless the Attorney General has been given notice, a hearing is held and the court is satisfied that the interim order would not prejudice the program [Article 102 (4)] .

Apart from these, Article 23 of the constitution, it is stated that state shall adopt measure to conserve the cultural traditions and heritage of the people of the country. The Article 24 stated to adopt measures for the protection against disfigurement, damage or removal of all monuments, objects or places of special artistic or historic importance or interest. In a recent High Court ruling it is established that well known Non-Governmental Organization may lodge a complaint in the court of in case of inference with any

www.nagorikpathagar.org

public interest. This was endorsed by High Courts Extraordinary Jurisdiction provided under article 102 of the constitution (Billah and Asad, 2006 integrating environmental accounting in development planning process (Final Report)

উপরোক্ত আলোচনা থেকে স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয় যে, বাংলাদেশের শাসনতন্ত্রে রাষ্ট্রীয় মূলনীতির অংশ হিসেবে মানবাধিকারের প্রতি সম্মান (অনুচ্ছেদ ১১) এবং রাষ্ট্রের প্রাথমিক দায়িত্ব হবে পুষ্টি বৃদ্ধি করা এবং জনস্বাস্থ্যের উন্নতি সাধন করা (অনুচ্ছেদ (১৮.১), যা মূলত পরিবেশ সংরক্ষণের মূল লক্ষ্য।

উল্লেখিত আলোচনা থেকে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে পরিবেশ সংরক্ষণের তাৎপর্য সম্পর্কে কিছুটা ধারণা পাওয়া যায়। দারিদ্র্য বিমোচন ও পরিবেশ সংরক্ষণ আমাদের সাংবিধানিক অঙ্গীকার এবং দেশের নাগরিকদের মৌলিক অধিকার। আমাদের দেশের মতো উন্নয়নশীল দেশের সাংবিধানিক অঙ্গীকার ও মৌলিক অধিকার বাস্তবায়ন পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তা লঙ্ঘিত হচ্ছে। এর কারণ এতো অল্প পরিসরে আলোচ্য বিষয় নয়। তবে কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ কারণসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল সর্বস্তরে নৈতিকতা ও ধর্মীয় মূল্যবোধের অভাব। প্রথমে দারিদ্র্য বিমোচন প্রসঙ্গে আলোচনা করলে দেখা যায় যে, আমাদের সমাজে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য বিমোচন রাষ্ট্রের সাংবিধানিক মৌলিক নীতি থাকা সত্ত্বেও তার যথাযথ বাস্তবায়ন করা সম্ভব হচ্ছে না। এ ক্ষেত্রে অনেক সীমাবদ্ধতা রয়েছে, তা কেউ অস্বীকার করে না। পক্ষান্তরে বিশেষ জনগোষ্ঠী রাতারাতি অতিদরিদ্র থেকে অতিবিত্তশালী হয়ে উঠেছে, একথাও অনস্বীকার্য। এ অবস্থা শুধু বাংলাদেশেই নয় বরং সব অনুন্নত দেশেরই এটা বৈশিষ্ট্য। যদিও আমাদের সমাজে এর গতি অতিদ্রুত, পরিমাণ অত্যন্ত ব্যাপক যা চোখে পড়ে সর্বত্রই। এ ক্ষেত্রে নৈতিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধের সবচেয়ে বেশি অভাব রয়েছে সর্বস্তরে ও সর্বক্ষেত্রে। দেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্য পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, পৃথিবীর কোন ধর্মই উপরোক্ত রাষ্ট্রীয় মূলনীতির সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ বা সাংঘর্ষিক নয়। আলোচনার প্রাসঙ্গিকতা বিবেচনায় প্রধান প্রধান কয়েকটি ধর্মের নৈতিকতার বিষয় এখানে প্রণিধানযোগ্য। দারিদ্র্য বিমোচন বলতে সাধারণভাবে সরকার বেশি সংখ্যক প্রকল্প গ্রহণ করে অধিক লোক নিয়োগ করে চাকরির সুযোগ সৃষ্টি করবে এমনটি ভাবা একেবারেই অনুচিত। কারণ স্বাধীনতা উত্তর এসব চর্চা একেবারেই টেকসই হয়নি তা প্রমাণিত হয়েছে সন্দেহাতীতভাবে। কর্মসংস্থান সৃষ্টির অর্থ হচ্ছে মানুষের যা আছে তা নিয়ে স্ব স্ব অধিক্ষেত্রে টেকসই কাজের সুযোগ সৃষ্টি করা। ধীরে ধীরে মানবসম্পদ উন্নয়ন করা, মূলধন বৃদ্ধি করা, প্রতিষ্ঠানিক ও সামাজিক দক্ষতা বৃদ্ধি করা এবং কর্মসংস্থান সুযোগের সম্প্রসারণ করা। কোন দেশের রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি ও ধর্মীয় বিধানের মূল্যবোধের বিকল্পগুলি বাস্তবায়ন এতোটা সাদামাটা ও সহজ-সরল নয়। পবিত্র কোরআনে সুরায়ে জুমায় বলা হয়েছে, নামাজ শেষে তোমরা জমিনে ছড়িয়ে পড়। নিজেরা

www.nagorikpathagar.org

নিজেদের ভাগ্য অন্বেষণ করো। আয়াতটির তাৎপর্য হল, নিজের সব প্রচেষ্টার মাধ্যমে আল্লাহর কাছে সাহায্য চাও। তাই এবাদত এবং হালাল উপায়ে ভাগ্য অন্বেষণ করাও এবাদত। ইসলাম বৈরাগ্যবাদ এবং ভিক্ষাবৃত্তিকে পছন্দ করে না। তাই কবির ভাষায় বলা হয়েছে, নবীর শিক্ষা করো না ভিক্ষা, মেহনত করো সবে। আমাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা বিশ্লেষণ করলে উপরোক্ত মূল্যবোধের অভাব অতিসহজেই চোখে পড়ে।

এক্ষেত্রে শাসনতান্ত্রিক বিধান এবং ধর্মীয় বিধানের সামঞ্জস্যপূর্ণ দিকগুলোর ব্যাখ্যা হলো, রাষ্ট্র লেভেল ফিল্ড তৈরি করবে যেমন স্বাস্থ্য, শিক্ষা, দেশে শিল্প, কারখানা ইত্যাদি আনুষঙ্গিক মৌলিক সুবিধাদি ও অবকাঠামো নির্মাণ নিশ্চিত করবে। আর নাগরিকদের দায়িত্ব হবে নিজ নিজ যোগ্যতা অনুসারে নিজের কর্মক্ষেত্র বেছে নেয়া এবং নিজ নিজ দায়িত্ব যথাযথভাবে সম্পাদন করে স্বীয় প্রতিষ্ঠানটিকে আর্থিকভাবে লাভজনক করা অথবা সেবা ও কল্যাণকারী হিসেবে কাস্টমারের সন্তুষ্টি নিশ্চিত করা। হাদিসে রয়েছে, কেয়ামতের দিন প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার ওপর অর্পিত দায়িত্ব সম্পর্কে জবাবদিহিতা করতে হবে। ধর্মীয় এসব মূল্যবোধ নিয়ে কর্তব্যে ব্রত থাকলে দারিদ্র্য বিমোচনের তথা সরকারি-বেসরকারি কোন প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্যার্জনে ব্যর্থ হবার কোন সুযোগ নেই। আমাদের সমাজে সর্বস্তরে দায়িত্বপালনে এসব মূল্যবোধের নিতান্তই অভাব রয়েছে, যা নিশ্চিত করতে হবে।

দারিদ্র্য বিমোচনে ইসলামের শিক্ষা ও আদর্শ

দারিদ্র্য বিশ্বমানবতার জন্য এক মারাত্মক অভিশাপ। দারিদ্র্য মানুষকে স্বধর্মত্যাগী পশুত্বের পর্যায়ে নামিয়ে নিতে পারে। মহানবী (সাঃ) বলেন, "দারিদ্র্য মানুষকে কাফের বানিয়ে দিতে পারে।" এ জন্য তিনি প্রায় সব সময় আল্লাহর নিকট এ বলে প্রার্থনা করতেন, "হে আল্লাহ্ তুমি আমাদের খাদ্যে বরকত দাও। আর আমাদের এবাদত ও খাদ্যের মাঝে তুমি কোন ব্যবধান সৃষ্টি করো না। কেননা যথারীতি খাদ্য না পেলে আমরা নামায রোযা করতে পারব না, আমাদের মহান রব নির্দেশিত কর্তব্যসমূহ পালন করাও আমাদের দ্বারা সম্ভব হবে না।" কার্যত দারিদ্র্য রক্তশূন্যতার ন্যায়। মানুষের তথা সমাজের জীবনীশক্তিকে দুর্বল করে দেয়। রক্তের ন্যায় আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য মানুষের দেহ ও জীবনের স্থিতির নিয়ামক। রক্তস্বল্পতা দেখা দিলে মানুষের দেহ নানা দুরারোগ্য ব্যাধির লীলাক্ষেত্রে পরিণত হয়। অনুরূপভাবে অর্থ সম্পদ না থাকলে মানুষের জীবনও অচল হয়ে পড়ে অনিবার্যভাবে। দারিদ্র্য যেমন ব্যক্তিজীবনে বিপর্যয় সৃষ্টি করে তেমনি করে সামষ্টিক জীবনেও। মানুষের আর্থিক প্রয়োজন রয়েছে জন্মলগ্ন থেকেই। অর্থ সম্পদহীন ব্যক্তির যেমন কোন শক্তি বা মান-মর্যাদা থাকে না তেমনি দরিদ্র জাতিও বিশ্ব জাতিসমূহের সামনে সম্মান সম্ভ্রম থেকে হয় বঞ্চিত। তাই সকল পর্যায়ে দারিদ্র্যমুক্ত হবার ব্রত থাকতে হবে। দারিদ্র্যমুক্ত হলে মানুষ অতিসহজেই পরিবেশ সংরক্ষণে মনোনিবেশ করতে পারে। তবে দারিদ্র্য বিমোচনের নামে পরিবেশ বিপর্যয় ধর্ম সমর্থন করে না।

www.nagorikpathagar.org

বাংলাদেশের দারিদ্র্য চিত্র ও মৌলিক অধিকার

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আইন সংবিধানের "রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি ও মৌলিক অধিকার" সংক্রান্ত ৮ থেকে ৪৩ অনুচ্ছেদে বর্ণিত জনগণের মৌলিক চাহিদা থেকে বঞ্চিতরাই দরিদ্র। এ হিসাবে বাংলাদেশের শতকরা ৬০ ভাগ জনগোষ্ঠী দরিদ্র। অর্থাৎ দারিদ্র্য বিমোচন জনগণের সাংবিধানিক অধিকার। প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক যে জনগণ (অনুচ্ছেদ ৭.১), তাদের ৬০ ভাগ দরিদ্র। কারণ ঃ

* আয়ের অথবা খাদ্য গ্রহণের নিরিখে দরিদ্র মানুষের সংখ্যা ৬-৭ কোটি (যা সংবিধানের ১৪ ও ১৫ অনুচ্ছেদের পরিপন্থী)।
* প্রায় ৮ কোটি মানুষ এখনও কার্যত নিরক্ষর এবং প্রকৃত শিক্ষা-সুযোগ (education poverty) বঞ্চিত (যা সংবিধানের ১৭ অনুচ্ছেদ, বিশেষত ১৭গ অনুচ্ছেদের সম্পূর্ণ পরিপন্থী)।
* প্রায় ৯ কোটি মানুষ প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবার সুযোগবঞ্চিত (health poverty) (যা সংবিধানের ১৮ অনুচ্ছেদের পরিপন্থী)।
* প্রতিবছর যে ৬ লাখ মানুষ এদেশে মৃত্যুবরণ করে তার অর্ধেকই পাঁচ বা আরও কম বয়সের শিশু। আরও বিস্ময়কর কথা, ৫০% ক্ষেত্রে মৃত্যুর কারণ দারিদ্র্য উদ্ভূত। নিউমোনিয়ার চিকিৎসায় মাথাপিছু ব্যয় মাত্র ১৩ টাকা, ডায়রিয়ার ১৭ টাকা, হামের ১২ টাকা এবং যক্ষ্মার ৯০০ টাকা। উল্লেখ্য, যক্ষ্মা রোগীর সংখ্যার দিক থেকে পৃথিবীতে আমাদের অবস্থান চতুর্থ শীর্ষে (সংবিধানের ১৫ ও ১৮.১ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী অবস্থা এমন হবার কথা নয়)।
* সাক্ষর-নিরক্ষর মিলে প্রায় ৩ কোটি মানুষ (যাদের অধিকাংশই যুবক) এখনও বেকার (সংবিধানের ১৫খ ও ২০ অনুচ্ছেদ কর্মের অধিকার নিশ্চিত করে)।
* প্রায় ১১ কোটি পরিবার এখনও বিদ্যুৎ সুবিধাবঞ্চিত (অথচ সংবিধানের ১৬ ধারা এ সুবিধা নিশ্চিত করে)।
* সীমিত আয়ের ব্যাপক সংখ্যক মানুষ প্রকৃত অর্থেই দুর্দশাগ্রস্ত এবং দুর্দশা ক্রমবর্ধমান। এর অন্যতম কারণ দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতির সঙ্গে সঙ্গে জীবনযাত্রার ব্যয় এবং বেকারত্ব বৃদ্ধি। গত এক বছরে মোটা চালের দাম বেড়েছে কেজিপ্রতি ৫-৬ টাকা, মসুর ডাল ৮-১০ টাকা এবং সয়াবিন তেল ১০ টাকা করে। খাদ্যে স্বয়ম্ভরতা অর্জিত হয়েছে কিন্তু দরিদ্র মানুষের খাদ্য পরিভোগ বৃদ্ধি পায়নি। অন্যদিকে বণ্টন-অসমতা বৃদ্ধি পেয়েছে (এসবই সংবিধানের ১৩, ১৫ ও ১৯ অনুচ্ছেদ-এর সামঞ্জস্যহীন)।
* দেশের অধিকাংশ নারী, শিশু ও প্রবীণ নিশ্চিতভাবেই বঞ্চিত (যা সংবিধানের ১০, ১১, ১৫, ১৭, ১৮ ও ২৮ অনুচ্ছেদের পরিপন্থী)।
* বিরাট এক জনগোষ্ঠী নিশ্চিতভাবেই উত্তরোত্তর অধিক হারে নিরাপত্তাহীন হয়ে পড়েছে খুন, ধর্ষণ, মাস্তানি-রাহাজানি এবং মহিলা ও শিশুদের প্রতি সব ধরনের নির্যাতনসহ নিরাপত্তাহীনতার সব কারণই বাড়ছে। বাড়ছে অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক-সামাজিক-

www.nagorikpathagar.org

সাংস্কৃতিক নিরাপত্তাহীনতাও (এসবই সংবিধানের রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি ও মৌলিক অধিকার সংক্রান্ত সব ধারার পরিপন্থী)।

* ধর্মীয় সংখ্যালঘু, ক্ষুদ্র জাতিসত্তা ও আদিবাসী মানুষের বঞ্চনা অনেক ক্ষেত্রে নিশ্চিত করা হচ্ছে না। শত্রু/অর্পিত সম্পত্তি আইনের মারপ্যাচে ইতোমধ্যে হিন্দু সম্প্রদায়ের ৫০ লাখ মানুষের ২০ লাখ একর ভূ-সম্পত্তি জবরদখল করা হয়েছে। এই জবরদখলকারীরা মোট জনসংখ্যার মাত্র ০.৪ শতাংশ (ক্ষমতাবান/ক্ষমতাধর গোষ্ঠীভুক্ত)। আর ক্ষুদ্র জাতিসত্তার আদিবাসীদের অর্থনীতি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য বিধৃত। সব দিক থেকেই প্রান্ত জনের অধিকার (এসব কিছুই সংবিধানের ২৭, ২৮ ও ৪১ অনুচ্ছেদের)।

সংবিধানে দারিদ্র্য দূরীকরণে যা নিশ্চিত করার কথা হয়েছে, তা বাস্তবায়নে, আরো ৩৮ বৎসর পরও আরো কত সময় লাগবে তাই এখন প্রশ্ন। আর বাস্তবে দেখা যায় অনেক সময় লাগবে।

সর্বোপরি দারিদ্র্য দূরীকরণে যে অবস্থায় আমরা উপনীত হয়েছি, তা বিশ্লেষণ করে দ্রুত জোরদার উদ্যোগ নেয়া অত্যাবশ্যক। (বারকাত, ২০০৪)।

দারিদ্র্য বিমোচনে ধর্ম ও কর্মে প্রণোদনা

ধর্মীয় মূল্যবোধ নিজ দায়িত্ব পালনে প্রণোদনা দিয়ে অবিরত কাজে ব্যাপৃত হয়ে সমাজ থেকে দারিদ্র্য দূরীকরণে উৎসাহিত করে। মহানবী (সাঃ) নিজে সব সময় কাজে ব্যস্ত থাকতেন এবং তার সাহাবীদেরকে কাজে উৎসাহ দিতেন। মহানবী (সাঃ) শ্রমের মাধ্যমে জীবিকার্জনে অভ্যস্ত ছিলেন। এক সময় কাজ করার জন্য তাঁর হাতে ফোস্কা পড়ে যায়, সে হাত দেখিয়ে তিনি বলেন, "আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল এরূপ শ্রমাহত হাত খুবই পছন্দ করেন ও ভালবাসেন।" মহানবী (সাঃ) সব সময় নিজের কাজ নিজে করাকে উৎসাহিত করতেন। তিনি বলেন, "হালাল রুজি উপার্জন করা সর্বাপেক্ষা প্রধান কর্তব্য।" তিনি আরও বলেন, "নিজ হস্তে উপার্জিত খাদ্য অপেক্ষা অধিক উত্তম খাদ্য আর কিছু নেই।" মহানবী (সাঃ) বলেন, "ইবাদতের সত্তরটি অংশ রয়েছে; তন্মধ্যে সর্বোত্তম হচ্ছে হালাল রিযিক সন্ধান।" একদিন সাহাবীগণ মহানবীকে (সাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, "কোন প্রকারের উপার্জন উত্তম?" মহানবী (সাঃ) বললেন, "ব্যক্তির নিজ হাতের কাজের বিনিময় বা সুষ্ঠু ব্যবসালব্ধ মুনাফা।" পবিত্র কোরআনে সূরায়ে বাকারায় আরো উল্লেখ রয়েছে যে "আল্লাহ বেচাকেনাকে হালাল করেছেন এবং সুদ হারাম করেছেন।" তাতে প্রতীয়মান হয় যে, ইসলাম ব্যবসা-বাণিজ্যকে উৎসাহিত করে। যেখানে স্ব-উদ্যোগ ও এন্টারপ্রাইজিং উদ্যমকে বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। শ্রম নিয়োগে উৎসাহ দিয়ে মহানবী (সাঃ) বলেন, "তোমাদের কেউ রশি নিয়ে গিয়ে জঙ্গল থেকে কাঠ কেটে স্বীয় পিঠের উপর বহন করে নিয়ে আসলে আল্লাহ্ তাকে সে ভিক্ষাবৃত্তি হতে রক্ষা করবেন যাতে কিছু পাওয়া না পাওয়ার নিশ্চয়তা নেই।" তিনি আরও বলেন "ফরয নামায পড়ার পর জীবিকা উপার্জনে লিপ্ত না হয়ে ঘুমিয়ে থেকো না।" মহানবী (সাঃ)

www.nagorikpathagar.org

নিজে ব্যবসা করতেন এবং বকরী চরাতেন। বস্তুত শুধু মহানবীই (সা:) নন, হযরত দাউদ (আ:), হযরত আদম (আ:), হযরত নূহ (আ:), হযরত ইদ্রীস (আ:) ও হযরত মূসা (আ:)সহ সব নবী-রসূলই নিজে কাজ করতেন। মহানবী (সা:) এমনিভাবে অনবরত কাজ করার জন্য উৎসাহ দানের মাধ্যমে তাঁর সমাজের লোকদের দারিদ্র্য নিরসনে ব্যাপক ভূমিকা রাখেন।

দারিদ্র্য বিমোচন ও পরিবেশ সংরক্ষণে সব ধর্মের মৌলিক আদর্শের মিল রয়েছে। যেমন বেশিরভাগ ধর্মের আদর্শগত বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, সৃষ্টির মাধ্যমে প্রভুর আত্মপ্রকাশ। প্রভু ও প্রকৃতির মধ্যে সম্পর্ক হল সৃষ্টি ও স্রষ্টার। Judaism এবং খৃস্টান ধর্মমতে সৃষ্টির কোন কিছুই প্রভুর দৃষ্টির অগোচরে থাকে না। তাঁর সৃষ্টির এসব সাক্ষ্য প্রমাণাদি আমাদের জীবনের সব কর্মকাণ্ড ঘিরেই। যেমন যথাসময়ে বৃষ্টি হওয়া, ফসল ফলানো, পাকানো এবং আমরা তা খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করি, আমাদের আত্মা তাতে তৃপ্ত হয়। সবকিছুতেই তার সৃষ্টির ভারসাম্যের প্রকাশ যা সংরক্ষণের দায়িত্ব একমাত্র মানুষের (Fernandes, ১৯৯১).

ইসলামী পরিভাষায় সারাবিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড একটি বইয়ের ন্যায় যেখানে প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্য নমুনা হিসেবে বিধৃত আছে (নসর, ১৯৯১)। সৃষ্টির সবকিছুই তার নির্দেশের অনুগত। পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে, দিনরাত্রি, চন্দ্র, সূর্য এবং তারকারাজি তার নির্দেশে নিয়ন্ত্রিত; য়া থেকে তোমরা জ্ঞান আহরণ করতে পারো (সুরায়ে নহল; ১২)।

সৃষ্টির প্রতিটি উপাদানকে সমানুপাতিক হিসেবে সৃষ্টি করা হয়েছে। তাতে জটিল ভারসাম্য রক্ষা করা হয়েছে। মানুষ তার খলিফা হিসেবে এ ভারসাম্য রক্ষা করবে এবং সৃষ্টির সব সুবিধাদি উপভোগ করবে মাত্র। এ ভারসাম্য নষ্ট করার অর্থ হল আমানতের খেয়ানত করা, যার জন্য সৃষ্টি ও স্রষ্টার কাছে জবাবদিহি করতে হবে।

In Christanity "The Gospel depicts Jesus as taking delight in contemplating nature and inviting us to take long and close at the flowers in the fields and the birds in the sky and to sense in them the presence of work and loving concern of the father who makes sure birds are fed and flowers are clothed more splendid than any queen or king (Fernandes, 1991).

পাখি, ফুল ও জীবজগতের সব জৈব ও জড় অধিবাসীই প্রভুর প্রতিচ্ছবি এবং তার ভালোবাসা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে (A. R. Agwan, 1997:p3-4). হিন্দু ধর্মে প্রকৃতির সাথে আচরণের ক্ষেত্রে কাম, ক্রোধ, রুক্ষতাকে সংবরণ করতে বলা হয়েছে (A. R. Agwan, 1997:p3-4).। Judaism এবং খৃস্টান ধর্মমতে সৃষ্টির বিশাল সাম্রাজ্যের সবকিছুই মানব কল্যাণে নিয়োজিত করা হয়েছে। মানবগোষ্ঠীর দায়িত্ব হল কেয়ারটেকার মাত্র। এ কর্তৃত্বে তাকে সীমিত ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে, যেন কোন অবস্থাতেই সৃষ্টির ভারসাম্য নষ্ট না হয় (A. R. Agwan, 1997:p5)।

www.nagorikpathagar.org

দারিদ্র্য বিমোচনে প্রাকৃতিক সম্পদ

দারিদ্র্য বলতে বহুমাত্রিক অতিজটিল সমস্যায় জর্জরিত একটি অবস্থাকে বুঝায় এবং এর সাথে সম্পৃক্ত রয়েছে নানাবিধ বঞ্চনা, চাহিদা ও প্রাপ্তির গ্যাপের সম্পর্ক। তাই এর গতি-প্রকৃতি এবং অনুসঙ্গ অতি সংক্ষেপে এক বাক্যে প্রকাশ করা অসম্ভব। হালে দারিদ্র্য সংক্রান্ত সূচক যেমন মানব উন্নয়ন, দারিদ্র্য এবং জেন্ডার উন্নয়ন সূচক প্রণয়নে মাথাপিছু আয় ছাড়াও সামাজিক (জীবন প্রত্যাশা, শিক্ষার হার) স্বাস্থ্য, মানবাধিকার ও সম্পদের সুষম বন্টন, ক্ষমতায়ন ইত্যাদি বিষয় বিবেচনায় আনা হয়ে থাকে (এডিবি ১৯৯৯)। মোট কথা কোন খণ্ড বিষয় দিয়ে বা পার্শ্বচিত্র দেখে এক ঝলকে দারিদ্র্যকে বুঝার কোন উপায় নেই। দারিদ্র্যের কারণ যা-ই হোক না কেন দারিদ্র্য সাধারণত পরিবেশগত ভঙ্গুর প্রতিবেশ এলাকায় পুঞ্জীভূত থাকে। যেখানে দরিদ্র জনগোষ্ঠী হয় বিপন্ন পরিবেশে বাস করে অথবা দারিদ্র্য নিপীড়ন তাদেরকে পরিবেশ দূষণে বাধ্য করে।

এসকাপের ২০০১ সালের প্রতিবেদনে ভূমি ব্যবহার ও পরিবেশ দূষণের পরিপ্রেক্ষিতে চার ধরনের দারিদ্র্য পরিলক্ষিত হচ্ছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে ঃ

প্রথমতঃ উর্বর কৃষি জমি এলাকায় দারিদ্র্য সৃষ্টি হয় দক্ষ ব্যবস্থাপনা ও সম্পদের সুষম ব্যবস্থাপনার অভাবে। কেননা সবুজ বিপ্লবের মাধ্যমে নিঃসন্দেহে মোট খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধি পেয়ে থাকে। কিন্তু বাস্তবে প্রান্তিক চাষী ও বর্গাদারদের ভাগ্যের কোন পরিবর্তন হয়নি। কারণ, বড় চাষীদের তুলনায় ছোট চাষীদের মূলধন প্রযুক্তি ও ব্যবস্থাপনার অভাবে বিনিয়োগ করতে পারে না। ফলে দরিদ্র জনগোষ্ঠী আধুনিক সুবিধা থেকে বঞ্চিত থাকে এবং সমাজে অর্থনৈতিক বৈষম্য সৃষ্টি করে।

দ্বিতীয়তঃ দারিদ্র্যের অন্য কারণ প্রান্তিক ভূমি মালিকানা। আধুনিক প্রযুক্তি ও সুযোগ সুবিধার সদ্ব্যবহার সম্ভব না হওয়ায় জমির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির সুযোগ সীমিত হয়ে যায়। এ জন্যে টেক্সই ভূমি ব্যবস্থাপনা এবং ব্যবহারও সম্ভব হয় না। ফলে ভূমি অবক্ষয় ও দারিদ্র্য বাড়ে। উল্লেখ্য, এসকাপ অঞ্চলের প্রায় ৬০ শতাংশ দরিদ্র জনগোষ্ঠী প্রান্তিক ভূমির মালিক বিধায় তারা দারিদ্র্যের শিকার।

তৃতীয়তঃ দারিদ্র্য সৃষ্টি হয় উপকূলীয় এলাকায়, যেখানে পর্যাপ্ত প্রাকৃতিক সম্পদের যথাযথ ব্যবহারের অভাব অথবা ঘন ঘন প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে এ সম্পদের অপচয় ও অবক্ষয় বাড়ছে। দরিদ্র জনগোষ্ঠী ভাগ্যান্বেষণে উপকূলীয় এলাকার অর্থনৈতিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে আকৃষ্ট হয়ে তাতে দরিদ্র জনগোষ্ঠী এমনকি বেপরোয়া আত্মনিয়োগ করে। অপরিকল্পিত উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের ধারা অনেক সময় উপকূলীয় সম্পদকে ধ্বংস/অবক্ষয় করে। যার ফলে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ভাগ্যোন্নয়ন আর সম্ভব হয়ে উঠে না।

চতুর্থতঃ নগরের বস্তিবাসীরা দরিদ্র যারা নগরে বাস করে ও নগর জীবনের সব সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত যেমন, বিশুদ্ধ খাবার পানি, পয়ঃনিষ্কাশন, জ্বালানী, শিক্ষা ও চিকিৎসা। ফলে তারা একদিকে পরিবেশ দূষণের শিকার, অন্যদিকে তারাও অনেক ক্ষেত্রে দূষিত করছে নগরীর পরিবেশকে।

www.nagorikpathagar.org

সম্পদের ব্যবহার, ব্যবস্থাপনা ও বন্টনের পরিপ্রেক্ষিতে দারিদ্র্যের প্রধানতঃ অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক দুইটি কারণ রয়েছে। অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে দেশের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য সম্পদের ব্যবহার, ব্যবস্থাপনা ও বন্টনের দুর্বলতার জন্য হয়ে থাকে। অভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক কারণে পরিবেশের অবক্ষয় হয় সেগুলো হচ্ছে, সম্পদে সীমিত অধিকার যেমন অসম ভূমি বন্টন, ঋণ সুবিধাদি, পানি ও জ্বালানী ব্যবহারের বৈষম্য। প্রাকৃতিক কারণে; পরিবেশ/ প্রতিবেশগত নাজুক এলাকায় আবাসস্থল যেমন উপকূলীয় এলাকায় বা পাহাড়ি এলাকায় আবাসস্থল। এছাড়া অধিক জনসংখ্যার চাপ এবং নগরায়ন সম্প্রসারণ শুধু পরিবেশ দূষণ করছে না, অনেক ক্ষেত্রে প্রতিবেশগত বিপর্যয়ের মুখে দেশ ও জাতিকে ঠেলে দেয় (বিল্লাহ, ২০০৭ : জীবন ও প্রকৃতি)।

পরিবেশ ও দারিদ্র্য প্রাথমিক সম্পর্ক

পরিবেশ ও দারিদ্র্য সম্পর্ক পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, দরিদ্র জনগোষ্ঠী পরিবেশ বিপর্যয়ের শিকার এবং ঘটক। প্রথমতঃ বাঁচার তাগিদে অস্তিত্বের জন্য তারা নির্বিচারে প্রাকৃতিক সম্পদ যেমন বন, মৎস্য ইত্যাদি আহরণ করে স্বল্পকালীন অভাব পূরণ করে, দীর্ঘমেয়াদি সুবিধার বিনিময়ে। মূলতঃ তারা পরিবেশ বিপর্যয়ের মারাত্মক শিকার-একথা বলা যায় সন্দেহাতীতভাবে। আমাদের সমাজে দরিদ্র জনগোষ্ঠী পরিবেশ সংরক্ষণে যেভাবে ভূমিকা রাখে তার মূল্য সঠিকভাবে মূল্যায়ন করা অত্যন্ত কঠিন কাজ। যেমন রাস্তায় বর্জ্য কুড়ায়ে তারা যেভাবে স্বাস্থ্য নিরাপত্তার হুমকি নিয়ে কাজটি সে করে, এক্ষেত্রে তার অবস্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দ্বিতীয়তঃ তারা এসব বর্জ্য বাজারজাত করে এ সম্পদের পুনঃব্যবহার এবং আত্মকর্মসংস্থানের সৃষ্টি করে অর্থনীতিতে গতি সঞ্চার করে। মোট কথা পরিবেশ বিপর্যয়ের হাত থেকে সমাজকে রক্ষা করে। ফলে তাদের জীবন অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে যায়। যেমন পৃথিবীর প্রায় ৫০ শতাংশ দরিদ্র জনগোষ্ঠী গ্রামে বাস করে তারা প্রান্তিক চাষী, বেশির ভাগের জীবিকা প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর নির্ভরশীল। তারা চাষ অযোগ্য জমি আবাদ করে জমিকে আরো ক্ষয় করে। তারা অশিক্ষা ও অসচেতনতা হেতু মৎস্য, বন ও পানি সম্পদের মারাত্মক অপচয় করে থাকে। কারণ তাদের জীবনধারণের মৌলিক সুবিধাগুলির অভাব রয়েছে যেমন পানি, জ্বালানী, স্বাস্থ্য সুবিধাদি ও পয়ঃনিষ্কাশনের ফলে তারা বিভিন্ন মারাত্মক রোগবালাইয়ে ভোগে। তাই গরিবদের সার্বক্ষণিক জীবন জীবিকার জন্যই প্রাকৃতিক সম্পদ ও পরিবেশ সংরক্ষণ করা প্রয়োজন। তাদের জীবন ব্যবস্থা অত্যন্ত ভঙ্গুর কারণ ঋণ গ্রহণ, তাদের উৎপাদিত দ্রব্যের বাজার ব্যবস্থা, সম্পত্তির সীমিত অধিকার তাঁদের জীবনকে দুর্বিষহ করে রাখে। দারিদ্র্য ছাড়াও জনসংখ্যাধিক্য ও দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর চাপ থাকে সীমাহীন। এভাবে প্রাকৃতিক ভারসাম্য বিনষ্ট হওয়ার পাশাপাশি সামাজিক পরিবেশ বিনষ্ট হচ্ছে মারাত্মকভাবে। পরিবেশ-দারিদ্র্যের প্রাথমিক সম্পর্কটি নিম্নবর্ণিত চিত্র ৭.১ এর সাহায্যে দেখানো যেতে পারে।

www.nagorikpathagar.org

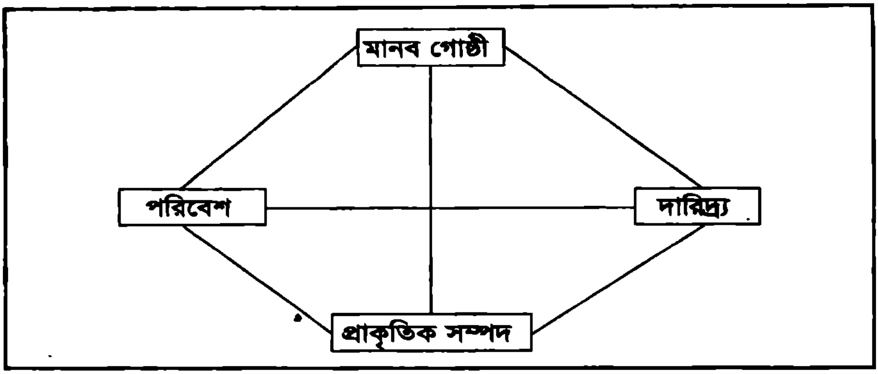

চিত্র ৭.১ : পরিবেশ ও দারিদ্র্য সম্পর্ক

পরিবেশ-দারিদ্র্যের মাধ্যমিক সম্পর্ক

উন্নত দেশের অতিভোগের ফলে অতিবর্জ্য তৈরি হয়। তাছাড়া অতিউৎপাদনের ফলে প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণের ওপর ব্যাপক চাপ সৃষ্টি হয়। পক্ষান্তরে উন্নয়নশীল দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার দিকে তাকালে দেখা যায় যে, দারিদ্র্যের পাশাপাশি জনসংখ্যাধিক্যের ও উচ্চ জন্মহারের ফলে প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর মারাত্মক চাপ সৃষ্টি হয়। এ ক্ষেত্রে বিরাট জনগোষ্ঠীর ন্যূনতম চাহিদা মিটাতেই প্রাকৃতিক সম্পদের নিবিড় আহরণ হচ্ছে। ফলে প্রাকৃতিক ভারসাম্য বিনষ্ট হচ্ছে। এক্ষেত্রে ভবিষ্যৎ উন্নয়নও মারাত্মক হুমকির সম্মুখীন হয়ে পড়ে। এভাবে পরিবেশ দূষণের ফলে বাস্তুসংস্থান দূষিত হয়ে যায়, পরিবেশ দূষণের ফলে ফলন ও উৎপাদন ব্যাহত হয়। ফলে অর্থনৈতিক বঞ্চনা ও প্রতিবেশগত বিপর্যয় দেখা দেয় সর্বত্র।

উন্নয়নশীল ও অনুন্নত দেশগুলোতে স্বভাবতই অধিক জনসংখ্যার চাপ থাকে, ফলে চাষাবাদযোগ্য জমির অভাবে অন্যান্য অকৃষি অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড না থাকায় অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর চাপ বৃদ্ধি পায়। যেমন ভূমিক্ষয়, বন নিধন, পানি দূষণ, মৎস্যসম্পদ ও জীববৈচিত্র্য বিলুপ্তি, দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে আরো দরিদ্র করে এবং তাদের জীবনকে দুর্বিষহ করে তোলে।

পরিবেশ ও দারিদ্র্য সম্পর্কের নিম্নগতির জন্য প্রধান ও অন্যতম কারণগুলো হল ঃ

(ক) জনসংখ্যার ঊর্ধ্বগতি হার ;

(খ) প্রাকৃতিক সম্পদের অদক্ষ ও অব্যবস্থাপনা

(গ) প্রাকৃতিক সম্পদের অসম প্রবেশাধিকার ;

(ঘ) অনুৎপাদনশীল উন্নয়ন নীতিমালা ও পদ্ধতি ; [পরিবেশ - দারিদ্র্যের বিভিন্নমুখী মাধ্যমিক সম্পর্ক চিত্র ৭.২ এর মাধ্যমে দেখানো যেতে পারে।]

www.nagorikpathagar.org

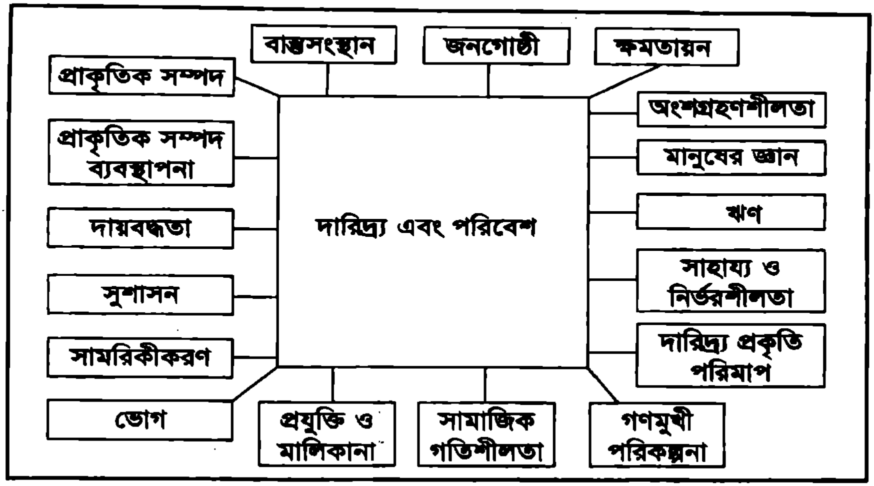

চিত্র ৭.২ : পরিবেশ ও দারিদ্র্যের মাধ্যমিক পারস্পরিক ও জটিল সম্পর্কের অনুষঙ্গ

দারিদ্র্য ভূমিহীন মহিলাদের ও শিশুদের সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত করে। কারণ তাদের জন্য সহজ ঋণ পদ্ধতি নেই। তাছাড়া প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারের সহজ সুযোগ থেকেও তারা বঞ্চিত।

দারিদ্র্য পরিবেশকে মূলতঃ দুইভাবে প্রভাবিত করে থাকে। প্রথমতঃ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর চতুপার্শ্বের অবস্থান পরিবেশগতভাবে ভঙ্গুর ও ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে থাকে। কারণ এসব এলাকায় দরিদ্র জনগোষ্ঠীর প্রবেশাধিকার সহজ যদিও তাদের স্বাস্থ্য ঝুঁকি অত্যন্ত বেশি ও ভয়াবহ। দ্বিতীয়তঃ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সম্পদের স্বল্পতা অথবা সম্পদের অংশীদারিত্বের সীমাবদ্ধতার ফলে বিকল্প জীবিকা নির্বাহের লক্ষ্যে তারা সহজলভ্য সীমিত সম্পদ এমন তীব্রভাবে আহরণ করে যার ফলে সম্পদের অবক্ষয় ও পরিবেশ বিপন্ন অনিবার্য। উন্নয়নশীল দেশে পরিবেশ ও দারিদ্র্য পারস্পরিকভাবে একটি অন্যটিকে মারাত্মকভাবে প্রভাবিত করে। তাই উন্নয়ন চিন্তায় দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি গ্রহণের ক্ষেত্রে পরিবেশ সংরক্ষণের বিষয়টি অত্যাবশ্যকীয়ভাবে বিবেচনায় আনা জরুরি।

বাংলাদেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠী বিশেষ করে গ্রামীণ লোকজন তাদের জীবিকা আহরণের প্রধান এবং প্রত্যক্ষ উৎস হচ্ছে : ভূমি, পানি, বন, মৎস্য এবং অন্যান্য উদ্ভিদ ও প্রাণী সম্পদ। এসব সম্পদের পরিমাণ ও গুণ যেদিকেই হ্রাস বা অবক্ষয় হোক না কেন তাতে সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকে দরিদ্র জনগোষ্ঠী। প্রাকৃতিক সম্পদের সংরক্ষণ, আহরণের তীব্রতা ও টেকসই ব্যবস্থাপনায় সরকারি নীতির প্রভাব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহারের সুফল ধনী-দরিদ্রের মধ্যে সুষম বণ্টনের ক্ষেত্রে সরকারি নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের প্রভাব রয়েছে। সুষম ও সুনির্দিষ্ট নীতিমালার অভাবে

www.nagorikpathagar.org

দারিদ্র্য বিমোচন এবং সামাজিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধের অভাবে সর্বক্ষেত্রে অবক্ষয় হচ্ছে অতিক্রুত। প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবস্থাপনায় দারিদ্র্য ও পরিবেশ কিভাবে প্রভাবিত হতে পারে এ বিষয়ে নিম্নে আলোকপাত করা হলো ঃ

জলমহাল ব্যবস্থাপনা

অতি প্রাচীনকাল থেকে জলমহাল ব্যবস্থাপনা জেলা কলেক্টর বা জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে হয়ে থাকে। বৃটিশ আমল থেকেই এর উদ্দেশ্য সরকারের রাজস্ব আয় বাড়ানো। পূর্ববর্তী সরকারগণ জনকল্যাণের কথা বিবেচনা করে সমবায় সমিতির মাধ্যমে জলমহাল লিজ দেয়া নীতি গ্রহণ করেছিল। দুর্ভাগ্য যে, এ পদ্ধতিতে "জাল যার জলা তার" তা কার্যকর করা সম্ভব হয়নি। ফলে দুঃস্থ জেলেরা ক্রমান্বয়ে নিঃস্ব হয়ে যেতে লাগল। পরবর্তীতে ১৯৯৫ সালে খোলা দরপত্রের মাধ্যমে জলাভূমি ও খাল-বিলগুলো লিজ দেয়ার পদ্ধতি চালু হয়। কিন্তু তাতে কি অবস্থার কোন উন্নতি হয়েছে? ১৯৯৭ বিআইডিএস এর সমীক্ষায় দেখা যায় যে, ৬৬.৭ শতাংশ জলমহাল সরকারি সমর্থকদের কাছে লিজ দেয়া হয়েছে। বাস্তব অবস্থা পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, অসহায় জনপ্রশাসন ও নিজেদের অবস্থান সংহত রাখার জন্য দুঃস্থ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর চেয়ে দলীয় নেতাকর্মীদের প্রাধান্য দিয়ে থাকে। এহেন অবস্থাতে লিজ গ্রহীতাগণ নির্বিচারে মাছ ধরে জীববৈচিত্র্যকে বিপন্ন করে তুলছে। এ ক্ষেত্রে স্থানীয় গরিব অধিবাসীদের মাছ ধরা তো দূরের কথা হাঁস, মুরগী, গরু, ছাগল পর্যন্ত স্থানীয় জলমহালে প্রবেশ করা নিষেধ। এভাবে মাছ চাষের ফলে অদূর ভবিষ্যতে গ্রামীণ মানুষের সহজলভ্য পুষ্টি হারিয়ে যাচ্ছে। তাই দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবিকা ও স্বাস্থ্য উভয়ই আজ হুমকির সম্মুখীন।

> **টাংগুয়ার হাওর**
> এ জলমহাল ব্যবস্থাপনা পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, হাওরটি প্রতি বৎসর ৫০ লক্ষ টাকায় লিজ দেয়া হতো। পরবর্তীতে ১ কোটি টাকায় উন্নীত করা হয়েছে। এক গবেষণায় দেখা যায় যে, বাণিজ্যিক সম্পদের মূল্যমান দাঁড়ায় ১,৮৮৩.৭৮ মিলিয়ন টাকা (বিল্লাহ, ২০০০)। এ হাওরটি অদৃশ্য (intangible) সম্পদের মূল্যমান করা হলে এর সম্পদের মূল্য আরো কয়েক গুণ বেশি হবে নিঃসন্দেহে। এসব সম্পদের ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় বিদ্যমান প্রতিষ্ঠানকে শক্তিশালী ও ক্ষমতায়ন করে স্থানীয় জনগণকে সম্পৃক্ত করা যেতে পারে। যার উদ্দেশ্য হবে সম্পদ সংরক্ষণ ও এসবের টেকসই ব্যবহার। তাহলে জনগণের ক্ষমতায়ন, টেকসই প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও দারিদ্র্য বিমোচনসহ সব দিকই নিশ্চিত করা যেতে পারে।

বৃক্ষ নিধন ও দারিদ্র্য

বৃক্ষ নিধন নানাবিধভাবে পরিবেশ বিপর্যয় ঘটায় এবং দারিদ্র্য সৃষ্টি করে। আমাদের দেশে বন নিধন করে জমি চাষের আওতায় আনা হয়। এ ক্ষেত্রে তীব্র চাষাবাদের ফলে জমির উর্বরতা হ্রাস পায়। এছাড়াও মারাত্মক সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে জ্বালানি সরবরাহের ক্ষেত্রে। বিভিন্ন পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায় যে, এ দেশের প্রায় ৭৫ শতাংশ লোক কাঠ ও চারকোল জ্বালানির ওপর নির্ভরশীল। তাই বৃক্ষ নিধন মানে জ্বালানি নিরাপত্তা সংকট সৃষ্টি। এফএও

www.nagorikpathagar.org

১৯৯৫ সালের পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে, কাঠ জ্বালানির পরিমাণ বাংলাদেশে ১৯৮২ সালে ৯.৫ শতাংশ থেকে ১৯৯২ সালে ১২.৪ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। কাঠ শুধু জ্বালানি ও টিম্বার ছাড়াও নানাবিধ সামাজিক এবং প্রতিবেশগত কার্যাদি করে থাকে। বন জীববৈচিত্র্যের আবাসস্থল ও জীবিকা সরবরাহের উৎস এবং বনবাসীদের সাংস্কৃতিক সংহতিও রক্ষা করে। বাংলাদেশে ১৯৬২ সালে মোট ভূমির ২০ শতাংশ বনাঞ্চল ছিল। ১৯৮৬ সালের পরিসংখ্যানে তা কমে ১৫ শতাংশে দাঁড়ায়। বাস্তবে গাছপালা রয়েছে এমন বনাঞ্চল এলাকা ৬-৭ শতাংশের বেশি নয়। তবে হালে সামাজিক বনায়নের মাধ্যমে বন সৃজন ও দারিদ্র্য বিমোচন হচ্ছে নিঃসন্দেহে, যা বিভিন্ন সমীক্ষা কেইস স্টাডির মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে।

প্রাকৃতিক দুর্যোগ, জলবায়ু পরিবর্তন ও দারিদ্র্য

বাংলাদেশ দারিদ্র্য পীড়িত ও দুর্যোগপূর্ণ দেশ বলে সর্বত্র পরিচিত। বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন বন্যা, সাইক্লোন, খরা, জলোচ্ছ্বাস, নদী ভাঙ্গন এ দেশে নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার। হালে ভূমিকম্পও এ দেশের জনগোষ্ঠীকে আরো আতংকিত করে তুলেছে। ১৯৯১ সালের সাইক্লোনে ৩ লাখ লোক মারা যায়, ১৯৮৫ সালে ১৯ হাজার লোক গৃহহারা এবং নিঃস্ব করে আরো লাখ লাখ মানুষকে। ১৯৮৭ ও ৮৮ সালের বন্যায় মৃত্যুর সংখ্যা কম হলেও ধ্বংস করে দেয় দেশের অর্থনৈতিক ভিত্তিকে। এ থেকে পরিত্রাণ পেতে না পেতেই ১৯৯৮ সালের দীর্ঘ বন্যা দেশের অর্থনীতির ভিত্তিকে আবার কাঁপিয়ে দেয়। নিম্ন আয়ের মানুষকে সর্বহারা ও নিঃস্ব করে দেয় সে সাথে বিপন্ন করে দেশের সুন্দর পরিবেশকেও। ২০০৪ সালের নগর বন্যা, ২০০৭ সালের সিডর, ২০০৮ সালে নার্গিস এবং ২০০৯ সালের আইলা এদেশের প্রাকৃতিক দুর্যোগের উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ১৯৯৮ সালে বিইউপি এর সমীক্ষায় দেখা যায় যে, ৬.৭ শতাংশ জনগোষ্ঠী ঢাকা শহরে এসেছে দুর্যোগপূর্ণ এলাকা থেকে। দুর্যোগপূর্ণ অবস্থার অন্য দিকটি হলো জলবায়ু পরিবর্তন, যার ফলে বাংলাদেশ মারাত্মকভাবে ঝুঁকিপূর্ণ দেশ বলে চিহ্নিত। জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে এ দেশের জনগোষ্ঠীর ঝুঁকি বাড়বে, সমুদ্র স্ফীত হয়ে লবণাক্ত পানির অনুপ্রবেশ, প্রতিবেশগত পরিবর্তনের ফলে জীববৈচিত্র্য হ্রাস, খাদ্য নিরাপত্তার হুমকি সর্বোপরি বিপন্ন হয়ে যাবে টেক্সসই উন্নয়ন কর্মকাণ্ড। এভাবে দারিদ্র্য ও বিপন্ন পরিবেশ অঙ্গাঙ্গিভাবে সম্পৃক্ত বাংলাদেশের উন্নয়ন পরিক্রমায়। স্বাধীনতা-উত্তর থেকে আজ পর্যন্ত এহেন পরিকল্পনা ও কৌশল গ্রহণ করা হয়নি যেখানে দারিদ্র্য বিমোচনের কৌশল ছিল না। নিঃসন্দেহে আশানুরূপ না হলেও দারিদ্র্য বিমোচন হয়েছে। প্রশ্ন থেকে যায়, কেন আশানুরূপ লক্ষ্য অর্জিত হয়নি এবং যতটুকু হয়েছে তা কী টেকসই হবে? এ প্রশ্নের জবাব খুঁজতে গেলে দেখা যাবে, প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতা, টেকসই পরিকল্পনা ও সমন্বিত নীতি ও নৈতিকতার অভাব রয়েছে। এ সবকটি বাস্তবায়ন করতে হলে সময় ও অর্থের প্রয়োজন। আমাদের হাতে এতটুকু সময় অপেক্ষা করার কী সুযোগ আছে? মনে হয় না। তাহলে কালক্ষেপণ না করে আমলাতান্ত্রিক জটিলতা ও আর্থিক সীমাবদ্ধতার কথা বিবেচনা

www.nagorikpathagar.org

না করে বিদ্যমান প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাকে ক্ষমতায়ন করে দারিদ্র্য বিমোচন ও পরিবেশ উন্নয়ন কার্যক্রমকে ত্বরান্বিত করা কি সমীচীন নয়? এ জন্যে আন্তঃসংস্থা সমন্বয় করে বিষয় ভিত্তিক (thematic) সমন্বয় ও বাস্তবায়ন কমিটি গঠন করা যেতে পারে, যার নেটওয়ার্ক ইউনিয়ন পর্যায় পর্যন্ত থাকবে। নীতি পরিবর্তন প্রাতিষ্ঠানিক জোরদারকরণ ও অন্যান্য সংস্কার কার্যক্রম সময়ের চাহিদা অনুসারে করে সে সাথে সামাজিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধ বিষয়ে গণসচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে যাকে আমরা সামাজিক বিবর্তন বলতে পারি।

প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ ও মালিকানা ঃ ধর্মীয় মূল্যবোধ

সম্পদের ওপর একচ্ছত্র মালিকানা মানুষের ভেতরে স্বেচ্ছাচারিতা ও অপচয়ে উৎসাহিত করে। এই স্বেচ্ছাচারী মানসিকতাই হচ্ছে শোষণের মূল কারণ যা সমাজে পরিবেশ ধ্বংস ও দারিদ্র্য বিকাশে সহায়তা করে। ইসলাম সম্পদের ওপর মানুষের নিরংকুশ মালিকানার ধারণা রহিত করে শুরুতেই শোষণবাদী মানসিকতার মূলোৎপাটন করে দিয়েছে। এক্ষেত্রে ইসলামে দু'টি যুগান্তকারী মূলনীতি রয়েছে। প্রথমতঃ সার্বভৌমত্ব ও মালিকানা কেবল আল্লাহ্‌র। সৃষ্টি জগতের কোন বস্তু, তা যত ক্ষুদ্রই হোক না কেন মানুষ তার আসল মালিক নয়। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্ বলেছেন, "আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে সমস্ত আল্লাহ্‌রই" তাছাড়া সুরা নহল আয়াত ৮-১৪ এ আল্লাহর বিভিন্ন নেয়ামতের উল্লেখ রয়েছে যেগুলি মানবতার কল্যাণে নিয়োজিত, তবে এসব সম্পদ আল্লাহর নির্দেশে নিয়ন্ত্রিত যা অপচয় করার অধিকার মানুষের নেই। দ্বিতীয়তঃ মানুষ এসব সম্পদ ব্যবহারে আল্লাহ্‌র বিধানকে পুরোপুরি মেনে চলবে, এর তাৎপর্য হল মানুষ প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারে ভারসাম্য রক্ষা করবে পরিবেশকে দূষণমুক্ত রাখবে। আর অন্য সম্পদ[১] ব্যবহারে সামাজিক অর্থনৈতিক ভারসাম্য রক্ষা করবে। মানুষ মূলত আল্লাহ্‌র প্রতিনিধি বা খলিফা[২]। পবিত্র কোরআনে আরো উল্লেখ রয়েছে যে, "তিনিই আল্লাহ্ যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, যিনি আকাশ হতে পানি বর্ষণ করে তদ্বারা তোমাদের জীবিকার জন্য ফলমূল উৎপাদন করেন, যিনি নৌযানকে তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন যাতে তাঁর বিধানে তা সমুদ্রে বিচরণ করে এবং যিনি তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন নদীসমূহকে।" পবিত্র কোরআনে আরও বলা হয়েছে, "তোমরা কি দেখ না আল্লাহ্ আকাশমণ্ডল ও নভোমণ্ডলে যা কিছু আছে সবই তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন এবং তোমাদের প্রতি প্রকাশ্যে অপ্রকাশ্যে নিয়ামতসমূহ পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন (সুরায়ে লোকমান আয়াত ১০)। অতএব, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সমস্ত কল্যাণ লাভ করার এবং ভোগ ব্যবহার করার ব্যাপারে দুনিয়ার সমস্ত মানুষ অভিন্ন ও সমান অধিকার সম্পন্ন। কেননা, আল্লাহ্ এসব কিছুকে বংশ, গোত্র, উঁচু-নীচু নির্বিশেষে সব মানুষের ব্যবহারের সমান অধিকার করে দিয়েছেন। এ সম্পদের ব্যবহার হবে সমাজের সার্বিক কল্যাণের জন্য। সম্পদের ব্যবহারের ক্ষেত্রে এ

১. সম্পদ যেমন ভৌত অবকাঠামো, অর্থনৈতিক সম্পদ, মানব সম্পদ।

২. আমি পৃথিবীতে খলিফা নিয়োগ করতে চাই (সুরা বাকারা ২:৩০)

www.nagorikpathagar.org

ধারণার প্রচলনের ফলে সম্পদ অর্জনের উন্মুক্ত ও অবৈধ প্রতিযোগিতা গড়ে উঠতে পারবে না। ফলে দিন দিন কমতে থাকে ধনী-দরিদ্রের ব্যবধান। এ মৌলিক নীতিতে বিশ্বাস করলেই ধনী-দরিদ্রের ব্যবধান কমে যাবে ব্যাপকভাবে। পাশ্চাত্যের লাগামহীন অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতা ও ধনী-গরিবের মারাত্মক বৈষম্য অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের অন্যতম কারণ। আমেরিকা ও ইউরোপের পাশ্চাত্যের পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক মন্দার ২০০৮-০৯ এর অন্যতম কারণ অনৈতিক ও লাগামহীন মুনাফা অর্জনের প্রতিযোগিতা- একথা আজ বাস্তব প্রমাণ।

তাকওয়া, অর্থবিত্ত মর্যাদার মাপকাঠি নয়

ইসলাম অর্থ-সম্পদ অর্জন সম্পর্কে প্রচলিত প্রাচীন ধারণাটি সম্পূর্ণ বদলে দিয়েছে। আবহমানকাল থেকে মানুষ এ ধারণা পোষণ করত যে, ধনার্জনই মানুষের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য এবং এর মাধ্যমেই তাদের সব মর্যাদা নির্ধারিত হয়। এ ধারণার পরিবর্তে ইসলাম ঘোষণা করে অর্থ-সম্পদ মানুষের জাগতিক জীবনের জন্য অপরিহার্য বটে তবে তা কখনই মানুষের একমাত্র ব্রত নয়। আল্লাহ্ মানুষকে জানিয়ে দেন, "তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তিই আল্লাহ্ নিকট অধিক মর্যাদাসম্পন্ন যে অধিক মুত্তাকি।" মুত্তাকি অর্থ হল আল্লাহ্ প্রদত্ত বিধান অনুসরণে অধিক যত্নশীল হওয়া।

সম্পদের সুষম বণ্টন ও আবর্তন

দারিদ্র্যের অন্যতম প্রধান কারণ হল সমাজে সম্পদের অসম বণ্টন ব্যবস্থা। এর ফলে ধন-সম্পদের আবর্তন সীমাবদ্ধ হয়ে যায় এবং ধন-সম্পদ বণ্টন ও বিতরণের সামঞ্জস্য রক্ষা করা যায় না। পুঁজিপতি শ্রেণী আরও ধনবান এবং দরিদ্র শ্রেণী আরও দরিদ্র হতে থাকে। এর ফলে ধনী মুনাফার জন্য এবং গরিব তার জীবিকার্জনের জন্য নির্বিচারে প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণ করে ও পরিবেশ ধ্বংস করে[৩]। এ অবস্থার অবসানকল্পে ইসলাম সমাজের সর্বস্তরের জনগোষ্ঠীর মাঝে সম্পদের সুষম ব্যবস্থা প্রবর্তনের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে। আল্লাহ্র পক্ষ হতে নবী (সঃ) বাণীপ্রাপ্ত হন- যারা স্বর্ণ, রৌপ্য ও সম্পদ পুঞ্জীভূত করে রাখে আর তা আল্লাহ্র পথে ব্যয় করে না, তাদেরকে ভয়াবহ শাস্তির সংবাদ দেয়া হয়েছে। সম্পদ শুধু বিত্তবানদের মাঝেই যেন আবর্তিত না হয়। ইসলাম এ বিষয়ে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য যাকাত, ফিতরা, উশর, মিরাসী আইন, দান, করযে হাসানা, হিবা ইত্যাদি সাম্যনীতি ব্যবস্থা প্রবর্তন করে। এর ফলে সম্পদের সুষম ব্যবস্থা নিশ্চিত করে দারিদ্র্য বিমোচনে সহায়তা করবে। অর্থনৈতিক দারিদ্র্য বিমোচন হলেই শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সামাজিক দারিদ্র্য বিমোচন ঘটবে সে সাথে পরিবেশ দূষণও রোধ হতে থাকবে।

কর্মসংস্থান নাগরিকের মৌলিক অধিকার

দারিদ্র্য দূরীকরণের অন্যতম প্রধান উপায় কর্মসংস্থান। ইসলাম ও আমাদের সংবিধান সব

[৩]ধনী শ্রেণী হাজারীবাগের ট্যানারি শিল্পের মাধ্যমে বুড়িগঙ্গাকে ধ্বংস করেছে। চিংড়ির ঘের দিয়ে ম্যানগ্রোভ ও উপকূলীয় পরিবেশ ধ্বংস করছে। গরিব শ্রেণী বাঁচার জন্য অধিক ফলনের আশায় নির্বিচারে পেস্টিসাইড ব্যবহার করছে।

www.nagorikpathagar.org

নাগরিকের সর্বপ্রকার কর্মসংস্থানের মৌলিক অধিকারের বিষয় নিশ্চিত করেছে। বস্তুত এ অধিকারের ক্ষেত্রে সব মানুষ সমান অংশীদার এবং এটি একটি মানবাধিকারও বটে। কোন মানুষকেই তার এ জন্মগত অধিকার থেকে বঞ্চিত করা যায় না। এক্ষেত্রে অন্যায়ভাবে একজন অন্যজনের ওপর প্রাধান্যও পেতে পারে না। বস্তুত ইসলাম প্রবর্তিত অর্থ ব্যবস্থায় সামাজিক সুবিচারের এটি একটি অনন্য দৃষ্টান্ত। ইসলামী বিধানে স্বীয় দক্ষতার পরীক্ষায় কেউ ব্যর্থ হলে সে রাষ্ট্রীয়ভাবে তার মৌলিক চাহিদা পূরণের ব্যবস্থাদি নিশ্চিত দেখতে পেত। ফলে কাউকেই দারিদ্র্যের কশাঘাতে জর্জরিত হবার আশংকা ছিল না। নবী ও সাহাবিদের শাসনামলের মতো কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা গেলেও বর্তমানে মুসলিম সমাজ ব্যবস্থার অবক্ষয়ের ফলে সর্বত্রই এ কর্মসূচি বাস্তবায়নে পিছিয়ে রয়েছে যা পুনর্বহাল অত্যাবশ্যক।

উপার্জন অক্ষম জনগোষ্ঠীর সামাজিক নিরাপত্তা বিধান (Social Safetynet Program)

সমাজের সকল মানুষই কর্মক্ষম ও উপার্জনে সমান যোগ্যতাসম্পন্ন হবে এমনটা কখনও সম্ভব নয়। তাই ইসলামী সমাজে কর্মক্ষমতাহীন, পঙ্গু, বৃদ্ধ, ইয়াতিম শিশু ও অক্ষম নিঃস্ব, সর্বহারা, আয়হীন এবং বেকার ও স্বল্প আয়ের নাগরিকদের মৌলিক চাহিদা পূরণের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা রাখা হয়েছিল। এ জন্যে ইসলামে যাকাত, সাদাকাতুল ফিতর, স্বেচ্ছাকৃত দান ইত্যাদির মাধ্যমে রাষ্ট্রীয়ভাবে দারিদ্র্য দূরীকরণ ও উপার্জনহীনদের কল্যাণের ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত নিশ্চিত করা হয়েছিল।

আমাদের দেশে শাসনতান্ত্রিক বাধ্যবাধকতা প্রতিপালনে দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলে সামাজিক নিরাপত্তার জন্য (Social Safetynet Program) বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্পে সরকারি কোষাগারের অর্থায়নে ভিজিডি, ভিজিএফ, বয়স্কভাতা, দুস্থমাতা ভাতা ইত্যাদি কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ২০০৯-১০ সালের বাজেটে এর পরিধি ও পরিমাণ দুটিই বৃদ্ধি করা হয়েছে। এ উদ্যোগটির দুইটি তাৎপর্য রয়েছে; প্রথমতঃ কর্মসূচির বিস্তৃতি ও পরিমাণ দেশের চাহিদার তুলনায় নিতান্তই অপ্রতুল। তাছাড়া এ কার্যক্রমের ফলে উন্নয়ন বাজেটেও ঘাটতি দেখা দেয়। যা খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মাননীয় মন্ত্রী ড. আ. রাজ্জাকও তার বক্তব্যে বলেছেন। এ ক্ষেত্রে বিকল্প অধিক উৎস থেকে অর্থায়নের সুযোগ করতে পারলে নিঃসন্দেহে অধিক দারিদ্র্য বিমোচন করা সম্ভব হবে। দ্বিতীয়তঃ বর্তমান কর্মসূচি সামাজিক বৈষম্য দূরীকরণে কতটুকু সহায়ক তা পর্যালোচনা সাপেক্ষ। ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় সরকারি উৎস ছাড়াও সমাজের সচ্ছল জনগোষ্ঠীর কাছ থেকে যাকাত, উসর, ফিতরা ও সাদকা ইত্যাদি ব্যবস্থা প্রাতিষ্ঠানিকভাবে নিশ্চিত করা গেলে সামাজিক বৈষম্য, সহমর্মিতা এবং ভ্রাতৃত্ব বৃদ্ধি করবে। তাছাড়া সমাজে ধর্মীয় মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠিত করতে পারলে, সমাজে ভিজিএফ, ভিজিডি কার্ড বিতরণ ও গম বিতরণে অনিয়মের যে কলঙ্ক রয়েছে তা থেকে পরিত্রাণ পাওয়া সম্ভব হবে। সে সাথে সামাজিক বৈষম্য দূরীকরণ এবং নিরাপত্তাও বৃদ্ধি পাবে। সমাজের মানুষ ধর্মীয় অনুশাসন মেনে যখন যাকাত আদায় করতে অভ্যস্ত হবে,

www.nagorikpathagar.org

তখন ওজনে কম দেয়া। অথবা এসব কর্মসূচির অর্থ আত্মসাৎ করার কথা চিন্তা, আসলে তাদের ঈমানী বিবেকই তাদের দংশন করবে। এভাবে দারিদ্র্য বিমোচন, সামাজিক নিরাপত্তা, আইনশৃঙ্খলার অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ সংকোচন করা সম্ভব হবে। তাতে সরকারের ব্যাপক আর্থিক সাশ্রয় হবে।

শ্রমিকের মর্যাদা দান ও দারিদ্র্য বিমোচন

সাধারণত সমাজের দরিদ্র শ্রেণীই অদক্ষ শ্রমিকের কাজ করে থাকে। পুঁজিপতি ও শিল্পপতিদের দ্বারা তারা হয় শোষিত ও নির্যাতিত। প্রতিদিন পত্রিকা খুললেই আমরা শ্রমিকদের বেতন, ভাতা বৃদ্ধির ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা আদায়ের আন্দোলনের খবর দেখতে পাই। নিঃসন্দেহে এসব পুঁজিবাদী সমাজ ও অর্থব্যবস্থার ফল, যেখানে চরমভাবে উপেক্ষিত হয় মানুষের নৈতিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধ। এ প্রসঙ্গে ইসলামী মূল্যবোধের বৈশিষ্ট্য পর্যালোচনা করলে স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয় যে, আমাদের নৈতিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধের মারাত্মক অভাব রয়েছে। ইসলামে শ্রমিকের অধিকার সম্বন্ধে অত্যন্ত স্পষ্ট নীতিমালা রয়েছে। পবিত্র কোরআনে উল্লেখ রয়েছে "যখন নামায পড়া সমাপ্ত হয়ে যায়, তখন তোমরা জমিনে ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহর নিকট অনুগ্রহ সন্ধান কর" (সূরা জুম'আ : ১০)। ইসলামী অর্থনীতিই সর্বপ্রথম সর্বজনীন মানবিক শ্রমনীতির প্রবর্তন করে। পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্র এ ব্যাপারে একে অন্যের চেয়ে শ্রেষ্ঠত্বের দাবি করলেও প্রকৃতপক্ষে এ দুটি সমাজ ব্যবস্থার অনুসৃত শ্রমনীতি মানবিক ও ন্যায়ভিত্তিক শ্রমনীতি নয়, ফলে সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠিত হয়নি কোথাও।

শ্রমিকের অধিকার, শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক, শ্রমিকদের সাথে ব্যবহার, তাদের বেতন ও মৌলিক প্রয়োজন পূরণ ইত্যাদি প্রসঙ্গে হাদিসে রয়েছে, "তারা (শ্রমিক অধীন বেতনভোগী কর্মচারী) তোমাদের ভাই, আল্লাহ তাদের দায়িত্ব তোমাদের ওপর অর্পণ করেছেন। কাজেই আল্লাহ যাদের ওপর এরূপ দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়েছেন তাদের কর্তব্য এই যে, তারা যে রকম খাবার খাবে তাদেরকেও সে রকম দেবে, তারা যা পরিধান করবে তাদেরকেও তা পরার ব্যবস্থা করে দিবে। আর যে কাজ তাদের পক্ষে কষ্টকর ও সাধ্যাতীত তা করার জন্য তাদেরকে কখনও বাধ্য করবে না। সে কাজ যদি তাদের দিয়ে করাতেই হয় তাহলে সে জন্য তাদের প্রয়োজনীয় সাহায্য অবশ্যই করতে হবে" (বুখারী শরীফ- কিতাবুল ঈমান)। অন্যত্র এক হাদিসে বলা হয়েছে, "শ্রমিকদের এমন কাজে বাধ্য করা যাবে না, যা তাদের অক্ষম ও অকর্মণ্য বানিয়ে দেবে।"

সুষ্ঠু ও যথানিয়মে সুনির্দিষ্ট মজুরিকে সুবিচারপূর্ণ পর্যায়ে নিয়ে আসার জন্য নিম্নোক্ত তিনটি শর্ত অনুসরণ করা :- প্রথমত: সার্বক্ষণিক শ্রমের মজুরি অন্তত এতটা পরিমাণ হওয়া দরকার যা মৌলিক প্রয়োজন পূরণে সক্ষম হবে। অন্য কথায়, প্রত্যেক শ্রমিক যেন তার প্রাপ্ত মজুরি দ্বারা তার নিজের ও পরিবারবর্গের মৌলিক প্রয়োজন পূরণ করতে সক্ষম হয়। দ্বিতীয়ত: মৌলিক চাহিদা পরিপূরণ করার পর চাকুরে বা শ্রমজীবীদের পক্ষে আরও অধিক অর্থ লাভের

www.nagorikpathagar.org

সুযোগ থাকতে হবে কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ যেমন, শৈল্পিক বা প্রকৌশলী, দক্ষতা, কর্মক্ষমতার পরিমাণ এবং উৎপাদন মান ও মুনাফা সৃষ্টির পরিমাণ অনুপাতের পার্থক্য দৃষ্টিতে। অনুরূপভাবে, শ্রমিককে তার দায়িত্বের প্রতি দায়বদ্ধতার বিষয়টি আবশ্যিক হিসেবে স্মরণ রাখতে হবে। রাসূল (সাঃ) বলেন, আল্লাহ তাদেরকে ভালোবাসেন, তোমাদের মধ্যে কেউ যখন কোন শ্রমের কাজ করে, তখন সে তা নিখুঁত ও নির্ভুলভাবে করে (বায়হাকী)। অন্য হাদিসে রয়েছে রাসূল (সাঃ) বলেন, কোন দাস বা চাকর-চাকরানী যখন তার কর্তব্য থেকে পলায়ন করে, তখন তার কোন নামাজ কবুল হয় না (মুসলিম)। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূল (সাঃ) বলেছেন "সর্বোত্তম উপার্জন হচ্ছে শ্রমিকের উপার্জন, যদি সে নিজ মালিকের কাজ সদিচ্ছা ও নিষ্ঠার সাথে সম্পন্ন করে।" (মুসনাদে আহমাদ)। তৃতীয়তঃ উপরোক্ত দুইটি শর্তের ক্ষেত্রে সাধারণ অবস্থায় মজুরি নির্ধারিত হবে শ্রমিক ও মালিকের স্বাধীন ইচ্ছা ও পারস্পরিক স্বেচ্ছামূলক সমঝোতার ও উৎপাদনশীলতার ভিত্তিতে। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, শ্রম অর্থনীতি (labor economics) প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা (Marginal Productivity) এর ভিত্তিতে মজুরি নির্ধারণ করার কথা। এর প্রয়োগ কি কোথাও হচ্ছে? তাহলে ইসলামী অর্থনীতির সাথে আধুনিক অর্থনীতির মৌলিক পার্থক্য কোথায়? আমাদের প্রয়োজন সংকীর্ণতার উর্ধ্বে উঠা এবং পন্থা নয়, কল্যাণ নিশ্চিত করা।

মালিক শ্রমিকদের ভ্রাতৃসুলভ সহযোগিতার পরিবেশ গড়ে দেবার উদ্দেশ্য এবং সুবিচারপূর্ণ মজুরি সংক্রান্ত ধারণার পূর্ণত্ব বিধানের জন্য নিম্নোক্ত কার্যাবলী সম্পাদন করা যেতে পারে। শরীয়তের বিধি-বিধানেই সুস্পষ্ট ভাষায় উপস্থাপিত হয়েছে- শ্রমিক মজুরের হাতে যেসব পণ্য উৎপন্ন হয়, তার একটা অংশ তাকে সহজলভ্য মূল্যে দিতে হবে। তাকে এবং তার পরিবারবর্গকে বাসস্থান, চিকিৎসা, শিক্ষা, নির্দোষ আমোদ-প্রমোদ ও অন্যান্য দিক দিয়ে সুবিধা প্রদান করতে হবে। মুনাফা বন্টনের সময় বোনাস হিসেবে তাকে কিছু পরিমাণ অর্থ দিয়ে দিতে হবে। একইভাবে কারখানা প্রতিষ্ঠানকে লাভজনক করার জন্য শ্রমিককেও দায়িত্বশীল হতে হবে। শিল্প-কারখানার ব্যবসায়ে কোন বিশেষ ফান্ড থেকে আর্থিক সাহায্য দেয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। সময় ও কাজ উভয় দিক দিয়েই শ্রমিকদের সাধ্যমত দায়িত্ব দেয়া যেতে পারে, তার বেশি নয়। শ্রমিককে এত বেশি কাজ দেয়া যাবে না, যাতে ক্লান্ত ও পীড়িত হয়ে পড়ে। এত দীর্ঘ সময় পর্যন্তও তাকে শ্রম দিতে বাধ্য করা যাবে না, যার ফলে সে অক্ষম হয়ে পড়বে। শ্রমিকদের কাজের সময় নির্দিষ্ট হতে হবে এবং বিশ্রামের যথেষ্ট সুযোগ থাকতে হবে। শ্রমিকদের কাজের ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটলে তাদের প্রতি অবিচার ও অমানুষিক নির্যাতন করা যাবে না। বরং সে ক্ষেত্রে যথাসম্ভব সহানুভূতিপূর্ণ ব্যবহার করাই উচিত। চুক্তিমতো কাজ হলেই অথবা নির্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হলে শ্রমিককে দ্রুত মজুরি বা বেতন পরিশোধ করতে হবে। উপরোক্ত ব্যবস্থার প্রায় প্রতিটিসহ আমাদের ব্যবস্থাপনায় রয়েছে। সমস্যা শুধু সুষ্ঠু বাস্তবায়নের অভাব।

www.nagorikpathagar.org

দুইয়ের সম্মিলিত চেষ্টা ও আন্তরিকতাপূর্ণ সহযোগিতার ফলে শিল্পের ক্রমাগত উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি হওয়াই স্বাভাবিক। সর্বোপরি মুমিন মুসলমানের শিল্প মালিক ও উদ্যোক্তারা ঈমানের তাগিদে ও পরবর্তীকালের কঠিন শাস্তি হতে রক্ষা পাওয়ার জন্যই এ শ্রমনীতি বাস্তবায়নে এগিয়ে আসবে। উপরোক্ত মূল্যবোধ অনুসরণই দারিদ্র্য বিমোচন ও সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সক্ষম হবে। এ নিরাপত্তা সামাজিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশ সংরক্ষণেও সহায়ক ভূমিকা রাখবে।

ধর্মীয় মূল্যবোধ শ্রমিকের জন্য যা অনুশীলনীয় তা হচ্ছে হালাল রুজি অন্বেষণ করা, যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং ইসলামের দৃষ্টিতে দ্বিতীয় স্তরের ফরয। হাদিসে ইরশাদ হচ্ছে ঃ শ্রমজীবীর উপার্জনই উৎকৃষ্টতর, যদি সে হয় সৎভাবে উপার্জনশীল (আহমদ)। হযরত রাসূলে আকরাম (সা.) কে একবার প্রশ্ন করা হল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! কোন ধরনের উপার্জন উত্তম-শ্রেষ্ঠতম? প্রতি উত্তরে তিনি বললেন ঃ "স্বীয় শ্রমলব্ধ উপার্জন" (আহমাদ, তাবরানী)। হাদিসে ইরশাদ হচ্ছে, যে ব্যক্তি আমার সাথে এ ব্যাপারে অঙ্গীকারবদ্ধ হবে যে, সে কোন দিন ভিক্ষাবৃত্তিতে নামবে না, তার জান্নাত লাভের দায়িত্ব আমি স্বয়ং গ্রহণ করলাম (আবু দাউদ শরীফ)। এ হাদিসটির শিক্ষা আমাদের ব্যক্তি জীবনে ও রাষ্ট্রীয় জীবনে অনুসরণ করা হলে দেশের অর্থনীতিকে স্বাবলম্বী করা যেত বহু আগেই। ত্রাণ ও সাহায্যনীতি আমাদের সমাজ ও দেশকে দুইটি অভিশাপ থেকে মুক্ত করতে পারে। প্রথমতঃ সমাজকে মুক্ত করতে পারে স্বেচ্ছায় বেকারত্ব বরণ ও কর্মবিমুখতার অভিশাপ থেকে। দ্বিতীয়তঃ আত্মনির্ভরশীল ও আল্লাহর প্রতি আস্থা হারিয়ে দাতা দেশ ও দাতা ব্যক্তির প্রতি নির্ভরশীল হয়ে শেরক করার অভিশাপ থেকে মুক্তি পাওয়া। পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে, "প্রত্যেক ব্যক্তি তার চেষ্টা সাধনার প্রতিফল লাভ করবে।" (সুরা ত্বহা-১৫ আয়াত)

বৈষম্য দূরীকরণে হালাল উপার্জন

সুদ সমাজ শোষণের সবচেয়ে শক্তিশালী মাধ্যম, যা সমাজে অর্থনৈতিক ও সামাজিক বৈষম্য সৃষ্টি করে থাকে। সুদের ব্যবসার মাধ্যমে সমাজের দরিদ্র শ্রেণী আরও দরিদ্র এবং ধনী শ্রেণী আরও ধনবান হয়। দরিদ্র ও অভাবগ্রস্ত মানুষ প্রয়োজনের সময় সাহায্যের কোন সুযোগ না থাকায় সুদের ওপর ঋণ গ্রহণে বাধ্য হয়। সুদের টাকা ফেরত দেয়ার বাধ্যবাধকতার কারণে ঋণগ্রহীতাকে অনেক সময় স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় করে হলেও সুদসহ আসল টাকা পরিশোধ করতে হয়। এর ফলে অপ্রতিহত গতিতে বেড়ে চলে দারিদ্র্য। প্রাক-ইসলাম ও ইসলামের আবির্ভাবকালীন আরব সমাজে এমনিতর চক্রবৃদ্ধি হারে সুদের কথা জানা যায়।

সুদের এই ভয়াবহ ও জঘন্য কুফল থেকে মানবতাকে রক্ষার জন্য ইসলামী বিধান অনুযায়ী সুদকে নিষিদ্ধ করে বিনিয়োগ ও উৎপাদনকে সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। সুদ নিষিদ্ধ হওয়ার ফলে অর্থ বণ্টন ব্যবস্থার সুসামঞ্জস্য ও ভারসাম্যের সৃষ্টি হয়। মদিনায় সুদমুক্ত অর্থনীতি প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় সুদজনিত মুদ্রাস্ফীতি, দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি.

www.nagorikpathagar.org

মন্দা ও অস্থিতিশীলতা থেকে অর্থ ব্যবস্থা রক্ষা পায় এবং বিনিয়োগ ও উৎপাদনে সুস্থ পরিবেশ বজায় থাকে। উল্লেখ্য, সুদ নিষিদ্ধ হলেও, ব্যবসাকে ইসলাম উৎসাহিত করেছে। সেক্ষেত্রে দারিদ্র্য বিমোচন, প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণ ও পরিবেশ সংরক্ষণের ধর্মীয়, সামাজিক ও অর্থনৈতিক মূল্যবোধের বিষয়গুলো অনুসরণ করা আবশ্যক।

মনীষী এরিস্টটল সুদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে বলেছেন, "একটি টাকা আর একটি টাকার জন্মদান করতে পারে না।" মনীষী প্লেটোও সুদকে সমর্থন করেননি। মনীষী পেটাস বলেন, "অর্থ হল বন্ধ্যা এবং এর ওপর সুদ ধার্য করা অযৌক্তিক।" সুদের প্রতি নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে মহান আল্লাহ্ বলেন, "আল্লাহ্ ক্রয়-বিক্রয় হালাল করেছেন এবং সুদকে হারাম করেছেন।" মহানবী (সাঃ) সুদের ব্যাপারে এতই কঠোর ছিলেন যে, তিনি বলেন, "সুদখোর, সুদদাতা, এর লেখক ও সাক্ষী অভিশপ্ত। তারা সকলেই এক পর্যায়ভুক্ত।" হযরত ঈসা (আঃ) এক লোককে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কি করেন? সে জবাব দিল আমি ইবাদত করি। তখন ঈসা (আঃ) আবার বললেন, আপনার সংসার চলে কিভাবে? সে বলল, আমার ভাই কাজ করে আমার সংসার চালায়, হযরত ঈসা (আঃ) বললেন, আপনার ভাই আপনার চেয়ে বড় ইবাদতকারী। তাই তো পবিত্র কোরআনে আল্লাহ বলেন, পবিত্র (হালাল) ও অপবিত্র (হারাম) সমান নয়, যদিও অপবিত্রের প্রাচুর্য তোমাদেরকে বিস্মিত করে (সূরা মায়েদা-১০০)।

হালাল মাল ভক্ষণের নির্দেশ সম্বলিত অসংখ্য আয়াত পবিত্র কোরআনে উদ্ধৃত হয়েছে। ঘোষণা হচ্ছে- হে মানবমণ্ডলী পৃথিবীর হালাল ও পবিত্র বস্তু ভক্ষণ কর (সূরা বাকারা-২৬৮), হে মুমিনগণ তোমরা ঐ সব পবিত্র বস্তু হারাম কর না যা আল্লাহ তোমাদের জন্য হালাল করেছেন (মায়েদা-৮৭)। আল্লাহ তায়ালা তোমাদেরকে যেসব বস্তু দিয়েছেন তা থেকে হালাল ও পবিত্র বস্তু খাও (মায়েদা-৮৮), আল্লাহ তোমাদেরকে যেসব হালাল ও পবিত্র বস্তু দিয়েছেন তা তোমরা আহার কর এবং আল্লাহর অনুগ্রহের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর যদি তোমরা তারই ইবাদতকারী হয়ে থাক।

বায়তুল মাল প্রতিষ্ঠা ও দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) মদিনায় ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে বায়তুল মালও প্রতিষ্ঠা করেন। রাষ্ট্রের যাবতীয় অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি তাঁর প্রতিষ্ঠিত বায়তুল মাল জনকল্যাণ এবং মৌলিক চাহিদা পূরণ সংক্রান্ত কাজ করত। দারিদ্র্য বিমোচন ক্ষেত্রেও বায়তুল মাল ব্যাপক ভূমিকা পালন করত। বায়তুল মালের প্রধান আয়ের উৎস ছিল যাকাত, উশর, সাদাকাতুল ফিতর, আওকাফ, আমওয়াল আল ফাযিলা, নাওয়াইব, দান, মালে গানীমাহ্, খুমুস, আল ফাই, করয, উপহার সামগ্রী, জিযিয়া, খারাজ ইত্যাদি। উল্লিখিত খাতগুলো থেকে আয়ের পর যেসব ক্ষেত্রে তা ব্যয় হত, সেগুলো হলঃ সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন, বন্দী ও কয়েদীদের ভরণ-পোষণ, ইয়াতিম ও লা-ওয়ারিশ শিশুদের প্রতিপালন, অমুসলিমদের আর্থিক নিরাপত্তা প্রদান, জনসাধারণের মৌলিক মানবিক প্রয়োজন পূরণ, করযে হাসানা প্রদান এবং সমাজকল্যাণ ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন। বায়তুল মালের এসব ব্যয়ের খাত পর্যালোচনা করলে দারিদ্র্য বিমোচনে এর ভূমিকার কথা স্পষ্ট হয়ে

www.nagorikpathagar.org

যায়, বস্তুত বায়তুল মাল হল দারিদ্র্য নিরসনের জন্য প্রতিষ্ঠিত প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা। যা নিয়ে আরো ব্যাপক গবেষণা ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গড়ে তোলার বিরাট সম্ভাবনা রয়েছে। দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে সরকারি উৎসের বাইরে বর্ণিত উৎসগুলো থেকে অর্থ আহরণ করে আরো অধিক সংখ্যক দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান করা যেতে পারে।

আমাদের দেশে সরকারি সহায়তায় দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে দেখা যায় যে, আমলাতন্ত্রিক কায়দায় গতানুগতিক সরকারি অর্থে বিশেষ কতিপয় এনজিও'র মাধ্যমে ফাউন্ডেশনের কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এ বিষয়ে দানশীল, সমাজসেবক, কর্পোরেট সংস্থার মধ্যে কতটুকু সচেতনতা সৃষ্টি করা হয়েছে তা নিয়ে আরো আলোচনা প্রয়োজন। তাছাড়া কাগজে তথ্যের বাইরে তৃণমূল পর্যায়ে কতটুকু দারিদ্র্য বিমোচন হয়েছে সে বিষয়ে আরো পর্যালোচনা করার প্রয়োজন রয়েছে। আপাত দৃষ্টিতে দেখা যায়, অবসরপ্রাপ্ত আমলারা যারা ৩৫-৪০ বৎসর চাকরি করে সরকারের উচ্চাসনে বসে বিভিন্ন শাসকগোষ্ঠীর তাঁবেদারি করে সরকারি শীর্ষ পদ অলঙ্কৃত করেছেন এবং বিশ্বব্যাংক ও এডিবির সদর দফতরের মতো বড় বড় জায়গায় পদায়নের সুবিধা নিয়ে নিজেদের ভাগ্যোন্নয়ন করেছেন, তারাই আজ এর পরিচালনায় রয়েছেন। বর্তমানে তারা টেলিভিশনে টকশো ও বিভিন্ন ফাউন্ডেশন ও কমিশনের চেয়ারম্যান, মেম্বারের পদ দখল করে জাতিকে সুশাসন এবং দারিদ্র্য বিমোচনের প্রেসক্রিপশান দিচ্ছেন। তারা মুখে মুখে প্রলেটারিয়েট বাস্তবে বিশ্বব্যাংকের এবং বিশেষ দাতাগোষ্ঠীর সুবিধাভোগী বুর্জোয়া। নতুন প্রজন্মকে এসব সুবিধাভোগী জনগোষ্ঠীর স্থলাভিষিক্ত করে নবজাগরণে এগিয়ে নিতে হবে সমাজকে। কপটদের পুরানো বাণী নয়, সুদূর প্রসারী সম্ভাবনাময় ভবিষ্যতই হবে নতুন প্রজন্মের স্বপ্ন।

দারিদ্র্য বিমোচনে যাকাত ব্যবস্থার প্রবর্তন

যাকাত ইসলামের পাঁচটি মূল ভিত্তির অন্যতম একটি স্তম্ভ। যাকাতের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উদ্দেশ্য হচ্ছে দারিদ্র্য বিমোচন ও সামাজিক নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা করা। আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশ ও সমাজের জন্য দারিদ্র্য একটি জটিল সমস্যা। দারিদ্র্যের ফলে সমাজে হতাশা ও বঞ্চনার অনুভূতি সৃষ্টি হয়, পরিণামে দেখা দেয় মারাত্মক সামাজিক সংঘাত। দারিদ্র্যের ফলে সামাজিক বৈষম্য, অপরাধ, সন্ত্রাস, হতাশা, নৈতিক অবক্ষয় এবং সামাজিক অস্থিরতার সৃষ্টি হয়। সামাজিক বৈষম্য অবসানের লক্ষ্যে ইসলামে যাকাতের বিধান করা হয়েছে। যাকাত প্রদান ও আদায় ইসলামের অন্যতম মৌলিক ফরয। যাকাত ইসলামী অর্থনীতির মূল স্তম্ভ ও ইসলামী রাষ্ট্রের রাজস্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উৎস। পবিত্র কোরআনের বিরাশি স্থানে যাকাতের কথা বলা হয়েছে[৪]। যাকাত ব্যবস্থাকে মহান আল্লাহ্ সম্পদশালীদের সম্পদের পবিত্রতা অর্জনের জন্য বাধ্যতামূলক করেছেন[৫]।

[৪]নামাজ আদায় কর এবং যাকাত দাও। সূরা - বাকারা
[৫]যাকাত ধনীদের জন্য প্রদান এবং রাষ্ট্রের জন্য সংগ্রহ করা দুই-ই আবশ্যক।

www.nagorikpathagar.org

সূরা তওবা (আয়াত ৯:১০৩)। মহানবী (সাঃ) যাকাত প্রদানের ব্যাপারে অত্যন্ত কঠোর নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন, "যে ব্যক্তি সওয়াবের আশায় যাকাত দেবে, সে তার সওয়াব অবশ্যই পাবে। যে ব্যক্তি তা পরিশোধ করতে নারাজ হবে, আমরা তা অবশ্যই আদায় করব এবং তার মালের অর্ধেক (জরিমানাস্বরূপ) বাজেয়াপ্ত করব। এটা আমাদের মহান আল্লাহ্র সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্তসমূহের অন্যতম।" বুখারী শরীফে বর্ণিত আছে- "মহানবী (সাঃ) মুয়ায় ইবনে জাবালকে (রাঃ) ইয়ামেন পাঠাবার সময় তাঁকে এ নির্দেশ দেন যে, তুমি ইয়ামেনবাসীকে প্রথমে ঈমান আনতে আহ্বান করবে যে, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই। মুহাম্মদ (সাঃ) আল্লাহ্র রাসূল। তারা যদি এ ব্যাপারে আনুগত্য করে, তবে তাদেরকে জানিয়ে দেবে যে, আল্লাহ্ তাদের ওপর দিনে ও রাতে পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করেছেন। যদি তারা এটা মেনে নেয়, তবে তাদেরকে জানিয়ে দেবে যে, আল্লাহ্ তাদের ওপর যাকাত ফরয করেছেন। এ যাকাত তাদের ধনীদের থেকে গ্রহণ করে দরিদ্রদের মাঝে বিতরণ করা হবে।"

যাকাতের নির্ধারিত সময়, পরিমাণ, নিসাব, কার ওপর তা নির্ধারণ করা হবে, এর ব্যয়ের খাতসমূহ কি ইত্যাদি সব বিষয় ইসলামে অনুসৃত শরী'অত ব্যবস্থা অত্যন্ত স্পষ্ট।

ইসলামী ফিকাহ্ ও শরী'অত অনুসারে যে সব সামগ্রীর ওপর যাকাত ধার্য করা হয়েছে, সেগুলো হলঃ সঞ্চিত বা জমাকৃত অর্থ, সোনা, রুপা এবং সোনা-রুপা দ্বারা তৈরি অলংকার, ব্যবসায়ের পণ্যসামগ্রী, কৃষি উৎপাদন, খনিজ উৎপাদন এবং সব ধরনের গবাদি পশু। যাকাতের ব্যয়ের খাতসমূহও স্বয়ং আল্লাহ্ নির্ধারণ করে দিয়েছেন। পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে, যাকাত দিতে হবে (১) ফকিরদেরকে, (২) মিসকিনদেরকে, (৩) যাকাত আদায়ে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গকে (বেতন হিসেবে), মন জয় করার জন্য, (৪) গলদেশ মুক্ত করার জন্য, (৫) ঋণগ্রস্তদের ঋণ পরিশোধ করার জন্য, (৬) ফি সাবিলিল্লাহ্- (দ্বীন কায়েমের কাজে) ও (৭) পথিক মুসাফিরদেরকে (৮) মুয়াল্লিফ : নও মুসলিম যার আর্থিক সাহায্য প্রয়োজন। (সূরা তওবা ৯ আয়াত ৬০)। এখানে লক্ষণীয় যে, যাকাত ব্যয়ের ৮টি খাতের মাঝে ৪টি খাতই দারিদ্র্য দূরীকরণে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করে। অন্য ৩টি খাত ঈমান ও বিশ্বাস প্রসঙ্গে। সুতরাং এ কথা স্পষ্টতই প্রতীয়মান হচ্ছে যে, যাকাত ব্যবস্থার প্রবর্তন দারিদ্র্য দূরীকরণে নবযুগের সূচনা করেছে। বাংলাদেশ মুসলিম অধ্যুষিত রাষ্ট্র হিসেবে যাকাত আদায়ের একটি প্রাতিষ্ঠানিক রূপরেখা থাকা উচিত। মালয়েশিয়াতে Zakat Collection Department রয়েছে যাকে স্থানীয় ভাষায় Jabatan Pungutan Zakat বলা হয়।

উশরের বিধান

মুসলমানদের অধিকারভুক্ত জমিতে উৎপন্ন ফসলের যাকাতই উশর। উশর ফরয হওয়ার ঘোষণা দিয়ে আল্লাহ্ বলেন, হে ঈমানদারগণ। তোমরা হালাল উপার্জন থেকে এবং আমরা

www.nagorikpathagar.org

তোমাদের জন্য জমি থেকে যা কিছু বের করি, তা থেকে ব্যয় কর। উশর যাকাতরূপে গৃহীত হয় এবং এর ব্যয়ক্ষেত্রও যাকাতের মতোই। উশর আদায়ের মাধ্যমে কৃষিক্ষেত্রে ধনী-দরিদ্রের পার্থক্য যেমন হ্রাস পায়, তেমনি জমির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত হয়। এর ফলে সমাজের দারিদ্র্যও লাঘব হয়।

বাংলাদেশের ভূমি নীতিমালা ও রাজস্ব আদায়

বাংলাদেশে ভূমি ব্যবস্থাপনা ও ভূমি রাজস্ব আদায়ের ইতিহাস অতিপুরানো এবং বেশ জটিলও বটে। বিভিন্ন শাসনামলে এর বিবর্তন হয়েছে ব্যাপক ও বিস্তৃত যা আজো চলমান। সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে বঙ্গদেশে ভূমি ও রাজস্বের সুবন্দোবস্ত করা হয়। এই বন্দোবস্ত ইতিহাসে "ওয়াসিল তুল জমা" (Rent Roll of 1582) নামে পরিচিত।

শাহ সুজার শাসনকালে ১৬৫৭ খৃস্টাব্দে বাঙ্গালায় দ্বিতীয়বার রাজস্বের বন্দোবস্ত হয়। মুর্শিদ কুলি খাঁ'র সময় (১৭২২ খৃঃ) তৃতীয়বার বন্দোবস্ত করা হয়। মুর্শীদকুলী খার পূর্বে জমিদারী অপেক্ষা ইজারা প্রথার প্রচলন বেশি ছিল। তিনি ইজারা প্রথা রহিত করে জমিদারগণের হস্তে রাজস্ব আদায়ভার অর্পণ করেন।

ইংরেজরা ১৭৬৫ খৃস্টাব্দে বাঙালা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী লাভ করে। ১৭৭২ সালে ওয়ারেন হেস্টিংস পরিদর্শক পদের বদলে কালেক্টর পদ সৃষ্টি করে। রাজস্ব ব্যবস্থার বিভিন্ন ত্রুটি বিবেচনা করে এ ব্যাপারে একটি পাকাপোক্ত ব্যবস্থা চালু করার লক্ষ্যেই লর্ড কর্নওয়ালিশের সময় প্রথম দশ সনা বন্দোবস্ত চালু করা হয়। পরবর্তীতে ১৭৯৩ খৃস্টাব্দে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তরূপে গৃহীত হয়।

১৯৫০ সালে পূর্ববাংলা জমিদারী দখল প্রজাস্বত্ব আইন পাস করা হয়, যার ফলে জমিদারী প্রথাসহ সকল প্রকার মধ্যস্বত্বভোগীদের অধিকার বিলুপ্ত হয়। জমির উপর রায়তের স্বত্ব স্বীকৃত হয়। সকল প্রকার খাজনার মালিক হলেন সরকার। পরিবার প্রতি ১০০ বিঘা জমির উচ্চতর সীমা নির্ধারণ করা হয়। বিভিন্ন কারণে বাস্তবায়ন সম্ভব হয়নি বিধায় ১৯৬১ সালে জমির সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণ করা হয় ১০০ বিঘা থেকে বাড়িয়ে ৩৭৫ বিঘা। পরবর্তীতে স্বাধীনতা উত্তর ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির মালিকের কর মওকুফকরণ।

১৯৮৩ সালে ভূমি সংস্কার কমিটি জনমত যাচাই সুপারিশ করে বন্যা নিয়ন্ত্রণ এলাকার জন্য জমির সর্বোচ্চ পরিমাণ মালিকানা হবে ৭৫ বিঘা বা ২৫ একর অন্য অঞ্চলে হবে ১০০ বিঘা। অনুপস্থিত মালিকদের ক্ষেত্রে বন্যা নিয়ন্ত্রণ এলাকার জন্য সর্বোচ্চ সীমা হবে ৩০ বিঘা বা ১০ একর এবং বন্যা নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত এলাকার জন্য হবে ৫০ বিঘা বা ১৬.৬ একর। উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তি ৬০ বিঘা বা ২০ একর নির্ধারণ করা হয়।

১৯৮৪ সালের ভূমি সংস্কার অধ্যাদেশ সুপারিশ চূড়ান্তভাবে গৃহীত হয়। এই অধ্যাদেশে কোন ব্যক্তি বা পরিবার কর্তৃক ৬০ বিঘার উপর জমির মালিকানার অর্থ গ্রহণের ওপর সীমাবদ্ধতা আরোপ করে। সম্ভবত এ সুপারিশ বাস্তবসম্মত না হওয়ায় তা বাস্তবায়ন সম্ভব হয়নি।

www.nagorikpathagar.org

এভাবে ভূমি সংস্কারের উদ্যোগ বারবার হোঁচট খেয়েছে। ইতিহাস পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, অতীতের বিভিন্ন সময়ে প্রচলিত কৃষকস্বার্থবিরোধী আন্দোলন সংগঠিত হয়। প্রচলিত ভূমি ব্যবস্থার প্রতিবাদে পাগলপন্থী বিদ্রোহ (১৮২৪-৩৩), টঙ্ক আন্দোলন (১৯৩৭-৪৯) এবং তেভাগা আন্দোলন (১৯৪৬-৪৭) এভাবে বর্গাচাষীদের অধিকার সংরক্ষণ ও কর্মচারীদের মধ্যে চুক্তি হয় (বিল্লাহ ২০০৭, শওকত আলী ২০০২)।

এতো পরিবর্তন ও বিবর্তনের পরও অদ্যাবধি আমাদের কৃষিনির্ভর অর্থনীতিতে এখনো ভূমির সর্বোচ্চ যৌক্তিক ব্যবহার নিশ্চিত করা সম্ভব হয়নি। সম্ভবত সব শাসনামলেই সুবিধাভোগী জনগোষ্ঠীর স্বার্থ রক্ষাই প্রাধান্য পেয়েছে। তাই মূল্যবোধের পরিবর্তন না হলে শোষণ ও দারিদ্র্যমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠা মারাত্মক চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি। এদেশের ৭৫ শতাংশ জনগোষ্ঠী গ্রামীণ ও কৃষি অর্থনীতির ওপর নির্ভরশীল। দারিদ্র্য বিমোচন, পুষ্টি উন্নয়নসহ যে কোন উদ্যোগের জন্য ভূমি ব্যবস্থাপনা ও ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।

ফিতরার প্রবর্তন

পবিত্র রমযান মাসের সিয়াম সাধনা শেষে মুসলমানদের আনন্দের দিন ঈদুল ফিতর। ধনী গরিব সবাই এ আনন্দকে মিলে উপভোগ করার জন্য ইসলামে বিত্তশালীদের ওপর গরিব-দুঃখীদের জন্য নির্দিষ্ট হারে যে বিশেষ দানের নির্দেশ রয়েছে, তাকে সাদকাতুল ফিতর বলা হয়। সাদকাতুল ফিতর সম্পর্কে হাদিস এসেছে- হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সাঃ) মুসলমানদের প্রত্যেক গোলাম, স্বাধীন ব্যক্তি, নারী, পুরুষ, ছোট-বড় সবার ওপর সাদকাতুল ফিতর আদায় করা ওয়াজেব (আবশ্যিক) করে দিয়েছেন। প্রত্যেক বিত্তবানকে তার নিজের এবং পরিবারবর্গ ও পোষ্যদের পক্ষ থেকে ফিতরা আদায় করতে হয়। ঈদের এ আনন্দ সবাই সমানভাবে ভোগ ও ভাগ করার মাধ্যমে সমাজে সম্প্রীতি এবং গরিবদের প্রতি সহানুভূতি সৃষ্টি হয়। ফিতরা আদায় ব্যাপকভাবে উৎসাহিত করে দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য অতিরিক্ত একটি উৎস হতে অর্থায়ন করা যেতে পারে, যা সমাজে দারিদ্র্য ও সামাজিক বৈষম্য দূরীকরণে সহায়ক হয়। রমজান, ফিতরা এসব ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান দারিদ্র্য বিমোচনকরণ, সংযম ধারণ এবং অপচয় থেকে মানুষকে বিরত রাখে। অপচয় কম করার অর্থ হলো প্রাকৃতিক সম্পদ ধ্বংস হতে রক্ষা করা, সম্পদের পুনঃ ব্যবহার (Recycle) করা এবং পরিবেশকে পরিচ্ছন্ন রাখা যেমন পানি. বাতাস ও অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদ দূষিত না করা।

নবীর শিক্ষা করো না ভিক্ষা

দারিদ্র্যের বিকাশ ও প্রকাশের অন্যতম উপায় ভিক্ষাবৃত্তি। অনেক ক্ষেত্রে কর্মক্ষম মানুষও কষ্ট করে কোন কাজ করার চেয়ে সহজে ভিক্ষাবৃত্তি বেছে নেয় এবং তাকে সাহায্য করলে পরকালে হাজারো উপকারের বয়ান করে থাকেন। ভিক্ষা করা যে কত ঘৃণ্য কাজ তা নিজে

www.nagorikpathagar.org

একবারও জানার চেষ্টা করে না। ইসলাম ভিক্ষাবৃত্তি ঘৃণা করে। একদিন এক ব্যক্তি মহানবী (সাঃ) এর কাছে কিছু সাহায্য চেয়েছিল। মহানবী (সাঃ) তাকে প্রশ্ন করে জেনে নেন যে, তার কি সম্পদ আছে। রাসূল (সাঃ) তার সম্পদ অর্থাৎ একটা পেয়ালা ও একটা কম্বল আনতে বললেন। ঐগুলো নিলাম করে দিয়ে দুই দিরহাম সংগ্রহ করলেন। এক দিরহাম দিয়ে ঐ ব্যক্তির মাধ্যমে একটি কুঠার ক্রয় করে আনলেন। ঐ কুঠারে তিনি নিজে হাতল লাগানোর পর তার হাতে দিয়ে বলেছিলেন, "যাও, জঙ্গলে গিয়ে কাঠ কাট এবং পনের দিন তোমাকে যেন আর না দেখি।" এভাবে তিনি শ্রমের মাধ্যমে স্বনির্ভর হতে বলেছেন। "রাসূল (সাঃ) ভিক্ষায় অর্জিত সম্পদকে জাহান্নামের 'উত্তপ্ত পাথর' বলেছেন। তিনি আরও বলেছেন, "তারা জাহান্নামে উত্তপ্ত পাথর চিবাবে।" তিনি আরও বলেন "তোমাদের মাঝে যে ভিক্ষা করে, সে যখন আল্লাহ্‌র সামনে যাবে, তখন তার চেহারায় এক টুকরা গোশতও থাকবে না।" মহানবী (সাঃ) এমনিভাবে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ ও নিরুৎসাহিতকরণের মাধ্যমে ভিক্ষাবৃত্তি উচ্ছেদ করেন এবং আরব সমাজ থেকে দারিদ্র্যকে চিরদিনের জন্য বিদূরিত করেন। আমাদের সমাজের দরিদ্র লোকদের দুঃখ-কষ্টকে পুঁজি করে বিভিন্ন ডকুমেন্টারি চিত্র দেখিয়ে আন্তর্জাতিক সংস্থা, দেশি-বিদেশি এনজিওগুলি একইভাবে বিদেশ থেকে সাহায্য গ্রহণ করে থাকে। এসব অর্থের কোন হিসাব কারো কাছে স্বচ্ছতার সাথে দেয়ার নজির নেই। এসব ঘটনা বলে বা লিখে শেষ করা যাবে না এমনকি কারো অজানাও নয়। ১৯৮৬-৮৭ সালে উড়িরচরের জলোচ্ছ্বাসোত্তর দেশে ত্রাণোচ্ছ্বাস হয়েছিল, সে অর্থের হিসাব এরশাদ সাহেব জাতিকে দিয়েছেন বলে কারো জানা নেই। সর্বশেষ ২০০৭ সালে সিডরোত্তর ইউএনডিপি যে বিরাট অংকের সাহায্য বাংলাদেশের নামে সংগ্রহ করে তাদের নির্বাচিত এনজিওদের মাধ্যমে বিতরণ করেছে এবং ইউএনডিপি কি হারে কমিশন নিয়েছে সে বিষয়েও সরকার এবং জনগণ কেউই অবহিত নয় (পরিশিষ্ট ১)। এসব সংস্থা ও ব্যক্তির হাত অনেক লম্বা। সরকার তাদের কাছে অসহায়। তাই সাহায্যের নামে লুটতরাজ বন্ধ করা উচিত, স্বচ্ছ উপায়ে প্রয়োজনীয় সাহায্য গ্রহণ করে যত দ্রুত সম্ভব জাতিকে স্বাবলম্বী করে, ভিক্ষাবৃত্তির গ্লানি থেকে জাতিকে মুক্ত করতে হবে। মোটকথা, ধর্মীয় অনুভূতিকে পুঁজি করে এবং আর্তমানবতার নামে বিভিন্ন সংস্থা ও গোষ্ঠী যেভাবে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি বিশ্ব সম্প্রদায়ের কাছে হেয় করে প্রচার করছে তা দুর্ভাগ্যজনক। এ জন্যে ধর্মীয় মূল্যবোধ থেকে শিক্ষা নিয়ে দারিদ্র্য বিমোচন ও আত্মসম্মান রক্ষা করা প্রয়োজন।

উপসংহার

ইসলাম দারিদ্র্য বিমোচন ও আত্মনির্ভরশীলতার জন্য সর্বদা উৎসাহিত করেছে। ইসলামী অর্থ ব্যবস্থার মূল লক্ষ্য ছিল সমাজে সুষম, ভারসাম্যপূর্ণ ও কার্যকর সমাজ ব্যবস্থা প্রচলনের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন। ইসলামী বিধানের লক্ষ্য জীবন সাধনায় এমন এক সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করা যেখানে কোন শোষণ, নিপীড়ন, আর দুর্বলকে পিষে মারার জঘন্য প্রবণতা তিরোহিত হয়। প্রকৃতি সেখানে ভারাক্রান্ত হবে না শোষিত, নির্যাতিত

www.nagorikpathagar.org

দরিদ্রের কাতর আর্তনাদে। অনাবিল আনন্দ বয়ে আনবে জীবন প্রবাহে। শোষণমুক্ত সমাজই ভারসাম্য প্রকৃতি ও সংরক্ষিত পরিবেশের নিশ্চয়তা প্রদান করতে পারে।

সহায়ক গ্রন্থপুঞ্জী ঃ

Billah, A H M Mustain (2007), Environment - Poverty interface towards achiving MDGs: A case of two villages, Palok Publishers, Dhaka, Bangladesh.

Billah, A H M Mustain & Asaduzzaman M. (2006) : Integrating Environmental Accounting in Development Planning Process (Final Report).

Billah, A H M Mustain (2000) Green Accounting : Tropical Experience, Palok Publishers, Dhaka, Bangladesh.

Moving Ahead (2008), National Strategy for Accelerated Poverty Reduction (2009-11), Planning Commission, GOB

B. Sen and David Hume (2006), The State of the poorest 2005/06, Chronic Poverty in Bangladesh : Tales of Ascent, Dscent, Marginality and Persistance. Bangladesh Institute of Development Studies (BIDS), Dhaka, Bangladesh and Chronic Poverty Research Center (CPRC), Institute for Development Policy and Management (IDPM) University of Manchester, Manchester, UK.

Report of Emergency Relief fund Pledged and Recieved for Sidr 2007 (May 2008), ERD, Ministry of Finance, Dhaka

Quashem, Abul (2008) Development Strategies and Challenges Ahead of Bangladesh, Palok Publishers, Dhaka-1000

বিল্লাহ, এ এইচ এম মোস্তাইন (২০০৭), জীবন ও প্রকৃতি, পালক পাবলিশার্স, ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ।

কাশেম, আবুল (২০০৫), বাংলাদেশের কৃষি ও গ্রামীণ অর্থনীতি, পালক পাবলিশার্স, ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ।

শওকত আলী, এ এম এস (২০০২), বাংলাদেশের ভূমি ব্যবস্থা এবং রাজনীতি, গ্লোব লাইব্রেরি প্রাঃ লিঃ, ঢাকা।

বিল্লাহ, এ এইচ এম মোস্তাইন (২০০০), অর্থনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠায় মহানবী (সাঃ), সীরাতুন্নবী স্মারক ১৪২১ হিজরি।

ফজলুল হক, এ কে এম (১৯৯৯) দারিদ্র্য বিমোচনে মহানবী (সাঃ), সিরাতুন্নবী স্মারক, ১৪২০।

আতিউর রহমান ও আরিফুর রহমান (২০০১), দারিদ্র্য বিমোচন ঃ বাংলাদেশের অভিজ্ঞতা, বাংলাদেশ উন্নয়ন সমীক্ষা, উনবিংশ খণ্ড, বার্ষিক সংখ্যা ১৪০৮।

আবুল বারকাত (২০০৪), বাংলাদেশে দারিদ্র্য উচ্ছেদ ও দারিদ্র্য হ্রাস : উদ্বেগের বিষয়, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি সাময়িকী ২০০৪।

www.nagorikpathagar.org

পরিশিষ্ট ৭.১

সংলগ্নি সারণী-৭.১ : সিডরে (২০০৭) ক্ষতিগ্রস্তদের সহায়তার জন্য ইউএন বাংলাদেশের অর্থ আহরণ (US$M)

	সংস্থা	ইউএন কোর অর্থায়নে	CERF কোর অর্থায়নে	দাতা সংস্থা	সাহায্য	মোট
খাদ্য ও কাজের জন্য অর্থ	WFP	২.৩৪	৪.০	AusAid, Government of Germany, Spain and Canada	২.৬	৮.৯৪
মৌলিক সামাজিক সেবা	UNICEF WHO UNEPA	.৮৯ .০৩ --	.৭৫ .৬০ .০৬	CIDA, Netherlands, DFID, Greece NORAD	৪.৯৫ .৩৫	৭.৬৪
জীবিকা নির্বাহের জন্য	UNDP FAO	.৪১ --	.৩০ .৩৫	DFID	১.৮৩	২.৮৮
মোট	-	৩.৭০	৬.০৫		৯.৭২	১৯.৪৫

উৎস : অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, ২০০৮

CERF = Central Emergency Relief Fund

এ ক্ষেত্রে UN ও এর অন্যান্য উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা জাতীয় বাস্তবায়ন পদ্ধতি অনুসরণ না করে তাদের সরাসরি (direct) পদ্ধতি অনুসরণ করেছে। সরাসরি বাস্তবায়নে পদ্ধতি Fragile State এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যা তারা আফগানিস্তান ও ইরাকের প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রয়োগ করছে। এ পদ্ধতিতে প্রকল্প বাস্তবায়ন বাংলাদেশের মতো স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রের জন্য অত্যন্ত লজ্জাকর। এসব পদ্ধতি প্যারিস ঘোষণার (২০০৫) মৌলিক নীতির পরিপন্থি।

www.nagorikpathagar.org

"তোমরা কি দেখ না আল্লাহ নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে
সবই তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করে দিয়েছেন এবং
তোমাদের প্রতি তাঁর প্রকাশ/অপ্রকাশ নিয়ামতসমূহ পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন।"

(আল কোরআন, সুরা-লোকমান, আয়াত-২০)

খাদ্যচক্র

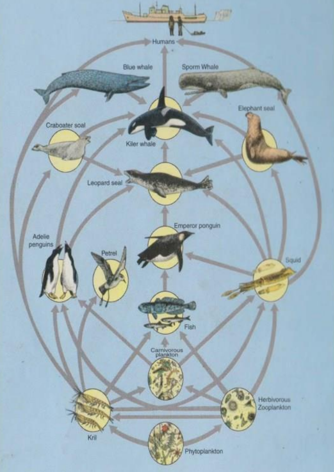

চিত্র ঃ সামুদ্রিক জীববৈচিত্র্যের খাদ্যচক্র

www.nagorikpathagar.org